শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—৫৭

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়

শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীহরিবোল কুটীর হইতে
শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

৪৬৫ শ্রীগৌরাব্দ

ভিক্ষা—পাঁচ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীমুকুন্দ দাস
শ্রীহরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ, পোড়াঘাট।

দ্বিতীয় সংস্করণ
চৈতন্যাব্দ—৪৭৩।

প্রিণ্টার—শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী
শ্রীতারা প্রেস
৩৭।৪, রামতনু বোস লেন,
কলিকাতা।

সূচীপত্র

প্রথমপর্য্যায়—

দ্বিতীয় পর্য্যায়—

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

মুখবন্ধ

'তেভ্যো নমোঽস্তু ভব-বারিধি-জীর্ণ-পঙ্ক,-
সংমগ্ন-মোক্ষণ-বিচক্ষণ-পাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগল-শ্রবণেন যেষা,-
মানন্দথুর্ভবতি নর্ত্তিত-রোমবৃন্দঃ॥'
'বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ।'

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার কৃপায় **'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবজীবনী'** দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভুপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন যে 'ভক্তি—ভক্তকৃপাবাহনা বা ভক্ত সঙ্গবাহনা'। মাদৃশ ত্রিতাপদগ্ধ জীবাধমের পক্ষে ভক্তকৃপা বা ভক্তসঙ্গ লাভ করা সুদুর্ঘট, বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে। ত্রিকালসত্য শ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলায় চিরকালই ভক্তগণ ধরার বুকে আছেন ও থাকিবেন; কিন্তু কালের কুটিল গতিতে এক্ষণে তাঁহারা স্বপ্রভাব সঙ্কুচিত করিয়া অথবা স্বয়ং মহা আবরণের মধ্যে রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ-প্রসঙ্গে কৃপালাভ সতত বহির্মুখ জীবের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা ভাব-সিদ্ধ হইয়াছিলেন—জনপ্রাণমনোনায়ক হইয়াছিলেন—চিরতৃষিত মানবের শুষ্ক কণ্ঠে অমৃতধারা ঢালিবার জন্য যাঁহারা এ মর জগতে আসিয়াছিলেন—যাঁহারা ছিলেন সমাজস্থিতির মেরুদণ্ড ও জাতীয়-জীবনের আলোক-স্তম্ভ—ভাবরাজ্যের সম্রাট্‌রূপে যাঁহারা বিশ্বাতিগ চিন্তা-তরঙ্গে ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন—অধিক কি বলিব, যাঁহারা 'কৃষ্ণ দিতে কৃষ্ণ নিতে

মহাশক্তি ধরিতেন'—সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণই পরবর্ত্তী কালের মোহান্ধ জীবনিচয়ের প্রীতি-ভক্তির আলম্বন হইয়া থাকেন। এই ভাবুক, রসিক ও প্রেমিক মহাজনগণকে বুকে ধরিয়াই ধরার গর্ব্ব ও আনন্দ। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণই আমাদের জীবাতু।

কলি-সন্তরণের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলানুচিন্তনই একমাত্র প্লব (ভেলা); ভক্তগণের হৃদয়-শতদলই সেই অচিন্ত্য অদৃশ্য অসীম ভগবানের বিহারভূমি—সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্ত-ভাব আস্বাদনের জন্য ভক্তভাবেই লীলাবিনোদ করিয়াছেন। ভক্ত-পূজাতেই ভগবান্ সহজে বশীভূত হন। 'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়'; সুতরাং অজ্ঞাত প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া মহাজনদিগের পরমপূত জীবন-বৃত্তের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ স্পর্শ করিবার লালসায় এ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আশা করি—(শ্রীরসিকোত্তংসের আনুগত্যে)

অস্থানল্পং জল্পতো দাসভাবাদ্
গূঢ়ং লীঢ়োচ্ছিষ্টবিন্দূন্মদস্য।
অন্তঃপীত-প্রেমমাধ্বীক-ঘূর্ণা-
বন্তঃ সন্তঃ সাহসং মা হসন্তু॥

পঙ্কজ পঙ্কে জন্মিলেও যেমন পঙ্কের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, তদ্রূপ ভক্তগণ যে কোনও কুলে উদ্ভূত হইলেও তাঁহারা সেই কুলের সহিত সম্বন্ধ-বিমুক্ত থাকেন। প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে আবির্ভূত হইলেও মহাভাগবত বলিয়াই পূজিত, ভুবন পাবন শ্রীহরিদাস ঠাকুরও যবনকুলে আবির্ভূত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নাম-প্রেম প্রচারের মুখ্য নায়ক ছিলেন; সুতরাং দীন হীন সঙ্কলয়িতার সনির্বন্ধ অনুরোধ—পাঠকগণ যেন এই পুস্তিকায় বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধামাদি

লিখিত হইল বলিয়া দুঃখ বা বিষাদ প্রাপ্ত না হয়েন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

(চৈ ভা আদি ১৬।২৩৮)

পক্ষান্তরে—চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎপথে চলে॥

(ঐ মধ্য ১।১৯৭)

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥

(মধ্য ১০।১০২)

সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥

(মধ্য ২৪।১০১)

শ্রীগঙ্গা ও শ্রীহরিনাম-বর্জিত, বৈষ্ণবদের গতাগতি-রহিত এক শোচ্য-দেশে শাক্তকুলে এ জীবাধমের জন্ম। জীবন-প্রভাতে জনৈক শ্যামল-সুন্দর কিশোরের পিকবিনিন্দি কণ্ঠে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া এ পথে প্রবিষ্ট হইয়াও আভিজাত্য এবং পাণ্ডিত্যাদির গৌরবে বৈষ্ণব-তত্ত্ব, বৈষ্ণব-মহিমা বা বৈষ্ণবপূজা জানি না—বুঝি না! যাঁহার সাহচর্য্যে ও অনুপ্রেরণায় ভক্তিবর্ত্ম ধরি, তিনি সততই বৈষ্ণবের তথ্য ও মর্য্যাদাদি শিখাইয়াছেন, তবু এ পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ে বৈষ্ণবগণের অলোকসামান্য মহিমাসিন্ধুর বিন্দুলেশও স্পর্শ হইল না!! সুতরাং এ মহাপাতকীর এ জাতীয় চেষ্টায় ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভ্রম, প্রমাদাদি অনি-বার্য্য। এক্ষণে গললগ্নীকৃতবাসে সকল পাঠক-মহাজনের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ

প্রণতিপূর্ব্বক সাক্ষুনয় নিবেদন যে তাঁহারা এ শিশুর যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করুন।

"জানামি বা ন জানামি স্বং পুঞ্চাম্যেব কেবলম্।
শুদ্ধং লিখাম্যশুদ্ধং বা ক্ষমন্তাং সাধবোঽলিখম্॥"

অধুনা সঙ্কলন-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনীয় সিদ্ধ মহাজনদিগের প্রায় ইতিবৃত্ত শ্রীপাদ অদ্বৈত দাস বাবাজি, শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু বাবাজি, শ্রীপাদ নবদ্বীপ দাস বাবাজি মোহন্ত মহারাজ, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাময়িক বৈষ্ণব পত্রিকাদি হইতেও কিছু কিছু সঙ্কলিত হইয়াছে। গৌড়ীয় মিশনের শ্রীমৎ জগজ্জীবন দাসজি এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের শ্রীচরণে এ জীবাধম চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিল। এ গ্রন্থের পর্য্যায়-বিভাগ কিন্তু সঙ্কলন-ক্রমেই ধর্ত্তব্য। মাতৃকাক্রমে বিন্যাস করিবার উদ্দেশ্যে ক্রম-ভঙ্গদোষ হইয়াছে। দিগ্‌দর্শন-ন্যায়ে এ পুস্তিকায় কতিপয় মহাত্মার জীবন-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। এ ভাবে সংগ্রহ করিয়া কেহ ইচ্ছা করিলে তৃতীয়'চতুর্থাদি পর্য্যায়েও মুদ্রিত করিতে পারেন। ইহাতে নিরপেক্ষভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবান্তর বিভাগ সমূহের প্রায় মহাত্মারই জীবন আলোচিত হইয়াছে। ইঁহাদের প্রত্যেক জীবনেই শিক্ষণীয়ত্ব, অভিনবত্ব, রসালত্ব ও উপাদেয়ত্ব বিদ্যমান। যাঁহাদের সবিস্তার জীবনী সংগৃহীত হয় নাই, তাঁহাদের সংক্ষেপ ইতি-বৃত্ত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি—যে সকল মহাত্মার সবিস্তার জীবনী অন্যত্র গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এ পুস্তিকায় তাঁহাদের ছায়াব-লম্বনে যৎকিঞ্চিৎমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন

দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম পর্য্যায়

[সিদ্ধগণ]

শ্রীশ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ

(শ্রীগোবর্দ্ধন)

শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবা উৎকলবাসী করণ-বংশ্য ছিলেন। ইহার পিতার নাম—শ্রীসনাতন কাননগো, ইহার মাতৃদেবী জরী মঙ্গরাজার কন্যা। শ্রীসনাতনের দুই বিবাহ—প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র—রামচন্দ্র, প্রসাদী ও **বটকৃষ্ণ**। এই বটকৃষ্ণই উত্তরকালে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-নিবাসী সিদ্ধ বাবা বলিয়া পরিচিত হন। ইহার পিতা দেহত্যাগ করিলে তদীয়া জননী সতীদাহ হন এবং পতির শ্মশানে যাইয়া স্বামীর মৃতদেহ ক্রোড়ে বসাইয়া অগ্নিদান-কালে তিন পুত্রকে কিছু আদেশ দিয়া যান—প্রথম পুত্রের মস্তকে শাড়ী বাঁধিয়া 'মঙ্গরাজ' উপাধি দিলেন, দ্বিতীয় পুত্রকে শিরোপা দিয়া বংশধর হইবার আজ্ঞা দিলেন এবং তৃতীয় পুত্রকে ব্রজে যাইয়া বৈষ্ণব হইবার জন্য শিরোপা দিলেন। বটকৃষ্ণের বয়স তখন ১২ বৎসর। ওড্র ভাষায় তিনি ভারণাকুলার ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ১৬ বর্ষ বয়ঃক্রমে ইনি গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজে আসেন এবং দুই বৎসর যাবৎ পাঠাভ্যাস করেন। ইনি সম্বন্ধ পরিবারেই আবির্ভুত হইয়াছিলেন।

শ্রীগোবর্দ্ধন-নিবাসী শ্রীপাদ অদ্বৈত দাস বাবাজি মহারাজের নিকটে লিখিত সিদ্ধবাবাজির পূর্ব্বাশ্রমের জনৈক উড়িষ্যাবাসী বংশধরের পত্র—

শ্রীশ্রীরাধারসিকরায়জীউ শরণং

সাং—দামোদরপুর

তাং ১০।১০।৪৬

মহামান্যবর শ্রীযুক্ত বাবাজি মহাশয়,

আপনাঙ্ক পত্র ১৪।১০।৪৬ তাং পাইলু। সিদ্ধ বাবাঙ্ক উৎসব ২৯।৯।৪৬রে গলা। অভাগ্যবশতঃ পত্রটী ঠিক সময়েরে পাইলি নাই। সিদ্ধবাবাজি মহাশয়ঙ্কর অবিবাহিতারে বৈষ্ণব হইছন্তি। তাঙ্ক মাতৃদেবী জরী কঙ্গরাজাঙ্ক ঝিয়। তাঙ্কর স্বামী ও সিদ্ধবাবাজীঙ্ক পিতা সনাতন কাননগো তাঙ্ক প্রথমস্ত্রীঙ্ক সন্তানাদি ন হেবারু এহাঙ্কু দ্বিতীয় বিবাহ হইথিলে, তাঙ্ক ঠারু তিনি পুত্র—রামচন্দ্র, প্রসাদী, বটকৃষ্ণ। সপত্নী বিবাদ নেই পিত্রালয়রে পাঁচ বর্ষ রহিলে। কাননগোঙ্কর মৃতাহ দুইদিন পূর্ব্বরু এঠারে আসিলেমধ্য প্রথম স্ত্রী সাক্ষাৎকু ছাড়ি দেলা নাই। তা পর দিন দিবা ৯ ঘটিকা সময়েরে তাঙ্ক স্বামী পরলোক গমন কলে, উক্ত কন্যা স্ত্রী সতীত্ব ধারণারে স্নান মার্জনা হোই গীতগোবিন্দ পাঠ করি সপত্নীকু কহিলে—তোর যদি স্বামী তাঙ্ক সহিত স্বর্গধামকু চাল। সে নির্ব্বাচিত হেলে। সতীঙ্ক আদেশমতেরে ১৬ হাত লম্বা ১৬ হাত প্রস্থ ৪ হাত গভীর খোঁড়াইলে। উক্ত শ্মশানরে ক্রোড়রে স্বামীকু বসাই অগ্নিদেবা সময়রে কহিলে—তিন সন্তানকু কিছ আদেশ দেবাকু অছি। থরে অগ্নিরু পদাকু আসিবি। যে এ প্রতি বাধা দেব তার বংশ রহিবে নাহি। পীতবস্ত্র শরীরাদি অগ্নি দ্বারা জ্বলান্তক হইথিলে শুদ্ধা উপরুকু আসি বড় পোঙ্কু শাড়ী ধড়ীরু খণ্ড মুণ্ডরে বাঁধি দেলে। আজ ঠারু 'মঙ্গরাজ' উপাধি করা

গলা। দ্বিতীয় সন্তানকু যাবচ্চন্দ্রার্ক বংশধর হইবাকু খণ্ডে শিরিপা দেলে। তৃতীয় সন্তানকু ব্রজধামরে বৈষ্ণব হেবার শিরিপা দেলে। সেতে বেলে তাঙ্কু ১২ বৎসর উমর। উড়িয়ারে ভারণাকুলর (ছাত্রবৃত্তি) স্থান হইথিলা। ১৬ বৎসরে ব্রজেরে বৈষ্ণব হেলে। সেঠারে সংস্কৃত টোলরে ২ বৎসর পড়িথিলে। ইহা আম্ভ পিতৃদেবঙ্ক ঠারু অবগত অছু।

মঙ্গরাজঙ্ক স্বপরিপ্রতাপ এ অঞ্চলেরে করিথিলে। দুই তিন পুরুষেরে তাঙ্ক বংশলোক ও সম্পত্তিলোপ হই গলা। আম্ভ বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রসাদচরণ দাসঙ্ক অংশরে আম্ভে মালিক (।/৪) পাঁচ অনা চারি পাই অংশরে অছুঁ। দশ আনা আট পাই ভদ্রক পঞ্চুমিয়া নেই গলা। আম্ভ পিতৃদেবমধ্য সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীঙ্কু চাকলেশ্বররে দর্শন করিথিলে। সে সময়ে তাঁঙ্ক ৮৮ বর্ষ উমর হইথিলা,। তাঙ্কর কীর্ত্তি বিখ্যাত যাহা এ শ্রুতি রে শুনিবাকু হইথিলা, তাহা পুরাতন বাবাজীঙ্ক ঠারু বিদিত থিবে। সিদ্ধ বাবাজী শ্রীজগন্নাথ দর্শনকু আসিবাকু উদ্যত থিলেহেঁ রাধারাণী নীলাচলসহ শ্রীজগন্নাথদর্শন সেই ঠারে করাই অছন্তি। আম্ভেমধ্য তাঙ্কর সজীবন সমাধি (?) ২।৩ বার করিথিলে শুদ্ধা মনর ধারণা ব্রজপ্রাপ্তি সেঠারে তাঙ্ক দয়ারু কি পরিহেব—এহাহিঁ চিন্তনীয়। আপনঙ্ক পত্রখণ্ড শিরধার্য্য পূর্ব্বক গ্রহণ কলি।……

লেখক

প্যারিমোহন।

সিদ্ধ বাবা শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের পরিবারভুক্ত ছিলেন—স্বজন্মস্থান হইতে পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা ব্রহ্মকুণ্ডবাসী শ্রীবৈষ্ণবচরণদাস বাবাজির নিকট ভজন-শিক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার অন্তর্ধানে ইনি শুনিলেন যে শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর সেবিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব জয়পুরে গিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ইনি

আকুলপ্রাণে জয়পুরে গেলেন। শ্রীগোবিন্দজীউর মাধুরী দর্শন করিয়া তদীয় অষ্টকালীন সেবা-লালসায় জয়পুরের রাজার নিকট সেবা প্রার্থনা করেন। তাহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে দ্বার-সেবকাদি যাবতীয় সেবায় অধিকার দেন। কথিত আছে যে ৮।১০ বৎসর সেবার পর তাঁহার যৌবনকালে (ত্রিশ বৎসর বয়সে) রাজভোগের প্রসাদ ভোজন করিয়া ইনি প্রবলতর কামবেগে ক্ষুব্ধ হন। জয়পুরে জিজ্ঞাসার স্থান বা সাধু না পাইয়া জয়পুর হইতে সেবা ছাড়িয়া কাম্যবনের সিদ্ধ শ্রীজয়কৃষ্ণ দাস বাবাজি মহাশয়ের নিকট চলিয়া আসেন। তাঁহার নিকট ব্যাকুলপ্রাণে নিজের অবস্থাদি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। প্রথমতঃ সন্দেহ জানাইলেন যে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা করিয়া এবং তাঁহার চিন্ময় প্রসাদ ভোজন করিয়াও কাম-বিকার কেন হয়? তাহাতে সিদ্ধ বাবাজি উত্তর দিলেন—'দেখ বাবা, একটি বৃক্ষ কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া কয়েকদিন জলে রাখিয়া পরে উঠাইয়া আগুন দিলে কি তাহাতে আগুন ধরিবে? না! শুকান পর্য্যন্ত আগুন ধরে না। সেইরূপ এই জীব অনাদি কাল হইতে সংসার-সাগরে নিপতিত আছে। তাহাকে উঠাইয়া হঠাৎ ভক্তি-অগ্নি ধরাইতে হইলে বিষয়ত্যাগ করাইয়া শুষ্ক করিতে হইবে।

ন বিনা সাধনৈর্দেবো জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিঃ।
দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ॥

[শ্রীগোবিন্দভাষ্য ৩।১]

যে পরিমাণে বিষয়-রস শুষ্ক হইবে, সেই পরিমাণে ভক্তিরসের অনুভব পাইবে। বিষয়-সুখ ইন্দ্রিয়যোগে অভিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ভগবদানন্দ বিষয়ত্যাগে অভিব্যক্ত হয়।

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ?

শ্রেয়োঽন্যৎ, প্রেয়োঽন্যৎ। অন্যদেব প্রেয়ো ভোগ্যজাতমন্যদেব শ্রেয়ঃ শুদ্ধাত্মতত্ত্বম্।

প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ?

[চৈচ মধ্য ৩।৭০]

স্বয়ং মহাপ্রভুও ইহা বলিয়াছেন আর আচরণ করিয়াছেন—'তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন।'

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী 'আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।' [চৈচ অন্ত্য ৬।৩১১]। যদি বল যে মহাপ্রসাদ চিন্ময়? শ্রীদাস-গোস্বামী মহাপ্রসাদ খরিদ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিতেন, তাহাতেও মহাপ্রভু বলিলেন 'বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ' [চৈচ অন্ত্য ৬।২৭৯] ইত্যাদি। স্তবাবলীর অভীষ্টসূচন-প্রবন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকটির * তাৎপর্য্য-বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে মহৎকৃপায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারাও অপ্রাকৃত রসাস্বাদন হয়। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ-গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, পরশ
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা-সবার গ্রাসশেষে, আনি' পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥" [চৈচ অন্ত্য ১৪।৪৯]

অতএব—'কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাম্' [পদ্যাবলী ১২]। যে পরিমাণে মহন্মনের সহিত সাধারণীকরণ হইবে, সে পরিমাণেই ভগবদ্রস-আস্বাদন হইবে। সাধারণীকরণ—'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥" ইত্যাদি......

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোস্বামিগণের অপ্রকটের অব্যবহিত পরের একটি

* যদ্ যত্নতঃ শমদমাত্ম-বিবেকযোগৈ,-রধ্যাত্মলগ্নমবিকারমভূন্মনো মে।
রূপস্য তৎস্মিতসুধং সদয়াবলোক,-মাসাদ্য মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্॥

ঘটনা শ্রবণ কর। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবমণ্ডলী নগরকীর্ত্তনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন—এমন সময়ে একটি প্রসিদ্ধ বেশ্যা অট্টালিকা হইতে তাহা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া কীর্ত্তনের রজে গড়াগড়ি দেয়। বৈষ্ণবগণের চরণ রেণুতে লুণ্ঠিত হওয়ায় তৎকালে তাহার মনে মহাবৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন ছুটিয়া গিয়া তত্রত্য মহান্তজির একান্ত শরণ লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। মহান্তজি করুণা-পরবশ হইয়া বলিলেন—'তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ?' বেশ্যা বলিল—"আমার নিকট লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কার আছে—সেইগুলি আপনার ঠাকুরের নিমিত্ত গ্রহণ করুন আর আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি লইয়া বৈষ্ণবসেবা করুন। আমাকে শিষ্যা করুন।" তখন মহান্তজি বলিলেন—'তোমার প্রার্থনা স্বীকার করিলাম, তুমি যখন আমার শিষ্যা হইলে, তখন আমার আদেশ পালন কর; তুমি এই ধনসম্পত্তি ও অলঙ্কার লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবকে সমর্পণ কর।' বেশ্যা তাহাই করিল। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোবিন্দের পূজারির নিকট আমুল ঘটনা জানাইলে তিনি বলিলেন—'আমি তোমার কিছুই গ্রহণ করিতে পারিব না।' ইহা শুনিয়া সেই বেশ্যা হতাশপ্রাণে শ্রীযমুনাতটে তিন দিন জলগ্রহণ না করিয়া পড়িয়া থাকিল। তখন শ্রীগোবিন্দ পূজারিকে আদেশ করিলেন—"তুমি যমুনাতটে গিয়া সেই বেশ্যাকে আনয়ন কর—সে নিজ হস্তে আমাকে সাজাইবে এবং তাহার সমস্ত অর্থ লইয়া আমার ভোগ লাগাও।" পূজারিজি তাহাই করিলেন—প্রাতঃকালে বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বেশ্যাটি স্নান করত নিজ মনোমত করিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের শৃঙ্গার করিল। শ্রীগোবিন্দের বিবিধ প্রসাদ বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান হইল। সেই রাত্রে প্রসাদ-ভোজনকারী বৈষ্ণবগণের স্বপ্নদোষ হইল। প্রাতঃকালে পরস্পর কথোপকথনে সকলের এক অবস্থাই প্রকট

হইলে তাঁহারা পূজারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পূজারী আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন—বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে তাড়না দিলে পূজারিজি বলিলেন—'আমার কোনই অপরাধ নাই। আমি সেই বেশ্যাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাদের শ্রীগোবিন্দদেব রাত্রে স্বপ্নাদেশ দিয়া বলাৎকারে এই কার্য্য করিয়াছেন।' এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ স্বস্ব ভজন-কুটীরে গিয়া কপাট রুদ্ধ করত তিন দিন পড়িয়া রহিলেন। তৃতীয় দিনের রাত্রিশেষে শ্রীগোবিন্দজি সকলকে বলিতেছেন—'তোমরা কেন আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া আত্মহত্যা করিতেছ?' বৈষ্ণবগণ বলিলেন—"তুমি এই জন্যই কি আমাদিগকে সর্ব্ব ত্যাগ করাইয়া স্বচরণে এতদিন রাখিয়াছ? এই বেশ্যার অন্ন খাওয়াইয়া আমাদের ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য? আত্মহত্যা না করিয়া আর কি করিব?" তখন শ্রীগোবিন্দ বলিলেন—"আমি কখন তোমাদিগকে বেশ্যার অন্ন খাইতে বলিলাম? না শতবার নিষেধ করিয়াছি—'ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে' ইত্যাদি। আমি সকল খাইতে পারি, তোমাদিগকে ত খাইতে বলি নাই।" তখন বৈষ্ণবেরা বলিলেন—'সম্মুখে মহাপ্রসাদ ধরিলে না খাইয়া কি করিতে হইবে?' তদুত্তরে শ্রীগোবিন্দদেব বলিলেন—'একটি ভবিষ্যৎ ঘটনা শ্রবণ কর—নিত্যানন্দ দাস নামে একজন সাধনসিদ্ধ বাবাজি হইবেন। তাঁহার নিকট একটি রাজা আসিয়া তাঁহার শিষ্যের নিকট সিদ্ধ বাবার দর্শন প্রার্থনা করিলে তিনি রাজার নাম শুনিয়া সঙ্কুচিত হইবেন। রাজা তাঁহার কুটীরের অল্প দূরেই ডেরা করিলেন। বাবাজি মহারাজ মধ্যাহ্নকালে শৌচে যাইবার সময় দেখিলেন—একটি ভক্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহার মস্তক মুণ্ডিত, গলায় তুলসীর মোটা মালা, অঙ্গে দিব্য তিলক, পরিধানে ছোট মোটা কাপড়, ভক্তির জ্যোতি সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে। বাবাজি মহাশয় তাহার নিকট গিয়া তাহাকে

আলিঙ্গন করত দুই ঘণ্টা যাবৎ প্রেমালাপ করিলেন। শেষকালে ভক্তবেশী সেই রাজা বলিলেন—'আমার প্রতি যদি আপনি এতই কৃপা করিলেন, তবে আমার মদনগোপালের প্রসাদ অঙ্গীকার করুন।' বাবাজি মহাশয় বলিলেন—'এই সৌভাগ্য কি আমি করিয়াছি? মনে ত হয় না। তবে আপনার কৃপায় সব অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।' রাজা পরদিন বিচিত্র ভোগ লাগাইয়া বাবাজি মহাশয়ের কুটীরের সম্মুখে প্রসাদ লইবার জন্য ঘেরা করিয়া একটি চালি বাঁধাইলেন। মধ্যাহ্নকালে সেখানে প্রসাদ আনীত হইলেন—বাবাজি মহাশয় আসিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সমস্ত প্রসাদ উপস্থিত হইলে বাবাজি মহারাজ সেই প্রসাদকে সাত বার পরিক্রমা করিয়া অনেক দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তদনন্তর প্রসাদোপরিস্থিত একটি তুলসী-মঞ্জরীর সহিত এক কণিকা উঠাইয়া সর্ব্ববিধ প্রসাদের স্পর্শপূর্ব্বক নিজকুটীরে গমন করত তাহা ভক্ষণ করিয়া ভজন করিতে থাকেন। এদিকে রাজা বাহিরে দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতেছেন—সেবক আসিয়া বলিল যে বাবাজি মহারাজ এক কণিকা প্রসাদ লইয়া ভজন-কুটীরে চলিয়া গিয়াছেন। এ কথা শ্রবণে রাজা বলিলেন—'তোমাদের আঁখি নাই, আমি দেখিয়াছি—তিনি সমস্ত প্রসাদ পাইয়াছেন, তাঁহার হস্ত-স্পর্শে প্রসাদ যেমন ছিল পুনর্ব্বার তেমন হইয়াছে!' শুনিলে ত—ইহাকেই **প্রসাদগ্রহণ** বলে। তোমরা কত কত মহাজনের সঙ্গ করিয়াছ, তথাপি কি এই শিক্ষা লাভ কর নাই? অবশ্যই করিয়াছ—তথাপি এইরূপ ভ্রমের কারণ—আমিই। তোমাদের কোনই দোষ নাই, তোমাদের এই ভ্রম উৎপাদন করাইয়া জগতে একটি শিক্ষা দিবার ইচ্ছা—যেমন ছোট হরিদাসের মিথ্যা দোষ দিয়া একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছি। নিজজন না হইলে কাহা দ্বারা শিক্ষা স্থাপন করিব? তোমরা আমার নিজ জন। তোমাদের কোনই দোষ নাই।'

শ্রীকৃষ্ণদাসজী কাম্যবনের সিদ্ধবাবার মুখে এইসব উপদেশ পাইয়া দোমন বনে আসিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দগ্রামে চুণ (আটা) ভিক্ষা করিতেন, তাহাই কখনও গুলিয়া খাইতেন, কখনও বা 'আঙ্গা' করিয়া খাইতেন, তাহার মধ্যে কিছু কিছু নিমপাতা দিতেন। ক্রমে ক্রমে শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিল—চক্ষু দৃষ্টিহীন হইল—আর ভিক্ষায় যাইতে পারেন না—কুণ্ডের জল পান করিয়া কয়েকদিন গেল। অবশেষে জলও আনিবার শক্তি গেল!! দুই তিন দিন জলও বন্ধ হওয়ার পরে শ্রীশ্রীরাধারাণীর হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। তিনি শ্রীললিতার করে ধরিয়া বলিলেন—'তুমি আমার নামে কলঙ্ক দিবে কি? এখনও কৃষ্ণদাসকে কৃপা করিতেছ না? এই লও প্রসাদ থালি, ইহা লইয়া শীঘ্রই তাহাকে ভোজন করাও।' তখন ললিতাজি সেই প্রসাদের থালি লইয়া দোমন বনে শ্রীকৃষ্ণদাসজির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—'এ বাবাজি! এ প্রসাদ পায়লে। মেরো মেইয়া তেরো দুখ দেখ্ কর্কে মেরো হাথমে প্রসাদ ভেজ্ দিয়া, পায়লে।' তখন বাবাজি মহারাজ সেই মৃতসঞ্জীবনী বাণীসুধা শ্রবণপটে পান করত প্রসাদের অলৌকিক সৌগন্ধ গ্রহণপূর্বক সবল হইয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ দিব্যশক্তি-সম্পন্ন হইলেন। পাত্রটি সেইস্থানে রজে মাজিয়া দিলেন। তখন সেই ব্রজবালাবেশধারী শ্রীললিতাজি বলিলেন—'রে বাবাজি! তু মাংবেকু ন যাই কেঁও?' তখন বাবাজি বলিলেন—'আঁখমে ত দেখে হি নাই, কৈছে যায়ঙ্গে?' তখন বালিকা বলিলেন—'আঁখমে দেখ্‌নেছে ত যায়ঙ্গে?' বাবাজি —'কেঁও ন যায়ঙ্গে?' বালিকা—'মেরো মাইয়া এক আজন দিয়ে। মে তেরো আখনে লাগাই দেয়ঙ্গে। ঘণ্টাভর তু আঁখ মুদ্‌কে রহনা। তব্ আঁখ আচ্ছা হই যায়েঙ্গে।' এই বলিয়া বাবাজি মহাশয়ের দক্ষিণ চক্ষুতে কি জানি এক বস্তু লাগাইয়া দিয়া বাম চক্ষু স্পর্শ করিবামাত্রই

বাবাজি মহাশয় চক্ষু উন্মীলন করিলেন কিন্তু সেই বালিকা বা থালি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু এক অলৌকিক সৌগন্ধ্য পাইতেছেন। তখন সেই অলৌকিক ঘটনার হেতু-নির্ণয়ার্থ তিনি আরো তিন দিন পড়িয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসের রাত্রিতে তন্দ্রাবেশে তিনি দেখিলেন—কোটিবিদ্যুদ্‌বিমর্দি-কান্তি এক দেবী বলিতেছেন—"তুমি কেন এত বেদনা পাইতেছ? আরও কি তোমার ভয় আছে? আমি তোমার, তুমি আমার। মদভিন্না ললিতার ললিত করে তোমার চক্ষুদান হইয়াছে। সেই সঙ্গে তুমি আমার সর্বশক্তি কি লাভ কর নাই? তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখান হইতে গোবর্দ্ধনে গিয়া মন্নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে মৎপাদপদ্ম লাভের সহজ সোপান জানাইয়া কৃতার্থ কর।" এই বলিয়া সেই দেবী অন্তর্হিত হইলেন। বাবাজি মহাশয় সাত্ত্বিক বিকারে বহুক্ষণ যাবৎ অবসন্ন হইলেন। তৎপরে আপনাকে সর্বশক্তিসমন্বিত ও কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া প্রেমসিন্ধুর ঘাত প্রতিঘাতে হেলিতে দুলিতে গোবর্দ্ধন-তটে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাসজি যখন শ্রীগোবর্দ্ধনে চাকলেশ্বরে আসিলেন, সেই সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনে বহু প্রাচীন ভজনপরায়ণ, বৈরাগ্যবান্ ও পণ্ডিত বৈষ্ণব ছিলেন। কথিত আছে—গোস্বামিগ্রন্থ সমূহ সংস্কৃতে এবং নিজেরও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার না থাকায় শ্রীকৃষ্ণদাসজির চিত্তে খেদ উপস্থিত হয়। তিনি তখন সেখানে কোনও বৃদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তখন বিষম সমস্যা দেখা দিল—অধ্যয়নে ভজন-বিঘ্ন এবং ভজনে অধ্যয়ন বিঘ্ন দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। উভয়ত্রই অন্তরায় জানিয়া একদিন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া মানসগঙ্গায় প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলেন—চিত্তের উদ্বেগে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না; শেষ রাত্রে তাঁহার ভজন-কুটীরের সম্মুখে আসিয়া যেন

কেহ তাঁহাকে ডাকিলেন। কুটীরের বাহিরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত, চিরপরিচিত, কন্থাকরঙ্গধারী শ্রীশ্রীসনাতন প্রভুপাদ এবং দিব্যরূপ-সম্পন্না শ্রীললিতাদেবী। তাহাদিগের দর্শনে ইনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তাহাদের চরণ-প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন শ্রীসনাতন প্রভু মহাস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—'দেখ কৃষ্ণদাস! বেশ ভাল আছিস্ ত? মাধুকরী মিলে ত? তা'তে পেট ভরে যায় ত?' শ্রীকৃষ্ণদাসজি সাশ্রুনেত্রে গদ্গদ্কণ্ঠে 'হাঁ, প্রভো।' বলিয়া উত্তর দিলেন। তখন শ্রীসনাতন প্রভু বলিলেন—'দেখ শাস্ত্র অনন্ত। যার যতদূর অধিকার, তার পক্ষে ততদূরই যথেষ্ট। তজ্জন্য তোকে আর মরতে হ'বে না? এরূপ কুবুদ্ধি আর করিস্ না। তোর দ্বারা আমাদের অনেক কার্য্য উদ্ধার হবে। আজ হ'তে আমার আশীর্ব্বাদে সর্বশাস্ত্র তোর স্বতঃই স্ফূর্তি হবে।' শ্রীললিতাদেবীও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'তুই যখন আমাদিগকে স্মরণ করবি, তখন আমরা তোর হৃদয়ে স্ফূর্তি পাব।' তোর দ্বারা ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট ভজনমুদ্রা প্রকাশ হবে।' দুইজনেই তাহার মস্তকে চরণ দিয়া অন্তর্ধান করিলেন। তৎপর বাবাজী মহাশয় তাহাদের বিরহে অধীর না হইয়া বরং সমুদ্রবৎ গম্ভীরই হইলেন।

প্রবাদ আছে—একবার দক্ষিণদেশীয় এক তৈলঙ্গ দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। শ্রীবৃন্দাবনে তাহার সমকক্ষ কোনও পণ্ডিত না পাইলে সকলেই তাহাকে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনে যাইতে বলিলেন। দিগ্‌বিজয়ী মথুরা হইতে প্রথমতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনে সিদ্ধবাবার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভজনের বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া প্রথমতঃ সিদ্ধবাবা তাহাকে নানাবিধ ছলবাক্যে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পণ্ডিত কিছুতেই তথা হইতে অন্যত্র যাইতে

ইচ্ছা করিলেন না এবং দুঃখের সহিত বলিলেন, 'আমি শ্রীবৃন্দাবনে বহু পণ্ডিত আছেন জানিয়া আলাপ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে সেখানে এমন একজন পণ্ডিতও নাই যিনি শুদ্ধভাবে শ্রুতি উচ্চারণ করিতে পারেন। সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'হাঁ. আপনাদের মত বেদ-পরায়ণ পণ্ডিত এদেশে বিরল। আপনি কৃপা করিয়া যদি সামবেদের একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া শুনান, তবে বড়ই কৃতার্থ হইব।' ইহা শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ী অতি সুললিত স্বরে শ্রুতিমন্ত্র পাঠ করিলেন। তখন সিদ্ধ বাবা সেই মন্ত্রের স্বরের তিন স্থলে দোষ ধরিলেন। পণ্ডিত বলিলেন—'ইহা অপেক্ষা শুদ্ধ স্বরে কেহ উচ্চারণ করিতে পারে, এরূপ কোন পণ্ডিত ভারতে আছে বলিয়া আমি জানি না। যদি আপনার সামর্থ্য থাকে, তবে আপনিই শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করত শুনান দেখি।' তখন শ্রীকৃষ্ণদাসজি শুদ্ধ স্বরে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলে দিগ্‌বিজয়ী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন—'আপনার বিদ্যা জাগতিক নহে। আপনার সঙ্গে কক্ষা করিতে পারে, জগতে কেহ নাই।' এই বলিয়া পণ্ডিত অন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

সিদ্ধ বাবা শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়াইতে গিয়া প্রতিসূত্রে নিত্যলীলা স্থাপন করিয়া ভজনমুদ্রার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেন, তাহাতে অধ্যয়নকারির অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ভজনবিষয়ক শিক্ষাও লাভ হইত। শ্রীরাধাকুণ্ডের তাৎকালীন পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ দাস বাবাজি মহাশয় তাহার এতাদৃশ অমানুষিক শক্তি দর্শন করত বলিতেন—'তোমার বিদ্যাবুদ্ধির আমি এত প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। তুমি গোঁসাইর বর-প্রভাবে নিত্যলীলা দর্শন করিয়া সব বলিতেছ, আমার কিন্তু সেই দেশে প্রবেশাধিকার নাই। আমি কেবল শাস্ত্র-বুদ্ধি লইয়া তোমার সহিত কক্ষা করিতেছি। তোমার শাস্ত্রবুদ্ধি

পরাপেক্ষী (বর-প্রাপ্ত), আর আমি নিজ-মেধা হইতে সব বলি, অতএব আমার সহিত তোমার শাস্ত্রালাপ অনুচিত।' শ্রীকৃষ্ণদাসজি যখন সময় সময় শ্রীকুণ্ডস্নানে আসিতেন, তখন ঐ শ্রীজগদানন্দ দাসজির সহিত ইষ্টগোষ্ঠী হইত। দুইজনের আশয় পৃথক্ থাকিলেও কিন্তু পরস্পর আলাপে সুখী হইতেন। শ্রীকৃষ্ণদাসজি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং রাগানুগা-ভজনে তৎকালে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার দেহত্যাগ হইলে ঐ পণ্ডিত বাবাজি দুঃখের সহিত বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের সহিত কলহ করিয়া যে আনন্দলাভ হইয়াছে, তাহা এখন আর কাহারও সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াও হয় না।'

সিদ্ধ বাবা ভজনের অনুকূল প্রায় সমস্তই গ্রন্থই সংগ্রহ করিয়া যোগ্য লোকের সহায়তায় আস্বাদন করিতেন। রাগানুগা-ভজনে অভিনিবেশ ছিল, অনেক সময়েই আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনে তাহার অসাধারণ প্রেমাবেশ লক্ষিত হইত। নিশ্চল হইয়া বসিয়া যখন শ্রবণ করিতেন, তাহাতে নয়নযুগল হইতে যে অশ্রু, নাসিকা হইতে যে শ্লেষ্মা এবং মুখ হইতে যে লালা নির্গত হইত, তাহা দুই পার্শ্ব হইতে দুইজন বৈষ্ণব মুছাইয়াও শেষ করিতে পারিতেন না।

শ্রীব্রজমণ্ডলের প্রায় সকল বৈষ্ণবই তাঁহার নিকট আসিয়া ভজন-বিষয়ক জিজ্ঞাসা করিতেন। বাবাজি মহাশয় নিজে ভজনাবিষ্ট থাকিলেও কেহ কিছু জানিতে আসিলে সযত্নে তাহাকে শিক্ষা দিতেন। এই সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ড-সমীপে ভানুখোরে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি নামে জনৈক বৈষ্ণব মহাত্মা ভজন করিতেন। একদিন তাঁহার দর্শনে সিদ্ধ বাবার ইচ্ছা হইল। নিজ অনুগত বৈষ্ণবগণকে বলিলেন—'প্রায় সকল বৈষ্ণবই ত আমাকে কৃপা করেন, ইনি কেন কখনও আসেন

না? আশঙ্কা—কোন অপরাধ ত হয় নাই? এই কৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয় কখনও মানসগঙ্গায় স্নান করিতে আসেন কি?' বৈষ্ণবগণ বলিলেন—'মাঝে মাঝে আসেন।' তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বাবা বলিয়া দিলেন—'যদি কখনও আর তাঁহার দেখা পাও, তবে অবশ্যই আমার নিকট লইয়া আসিবে।' অপর একদিন শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয় মানসগঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়া সিদ্ধ বাবার আগ্রহ জানিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। বৈষ্ণবোচিত প্রণয়-সম্ভাষণের পর সিদ্ধ বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—'মিত্র! আপনি মাঝে মাঝে মানসগঙ্গায় স্নান করিতে আসেন, কোন অপরাধ করি নাই ত?' শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয় বলিলেন—'না না, আপনার আবার অপরাধ কি? যাঁহাদের ভজন আট্‌কায়, আপনার ভজনের বিঘ্ন হইলেও তাঁহারই সাধারণতঃ আপনার নিকট আসেন। আপনার কৃপায় আমার এখনও কিছু আটকায় নাই, তাই আপনাকে উদ্বেগ দিতে আসি না।' সিদ্ধ বাবা সন্তুষ্ট হইলেন।

সিদ্ধ বাবা এই সময় শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, সংকল্পকল্পদ্রুম, পদকল্পতরু, ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলাস্মরণের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টযামিক লীলাস্মরণের উপযোগী একটী **পদ্ধতি** প্রণয়ন করত অনুগত বৈষ্ণবগণকে ভজন-শিক্ষা দিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট ভজন শিক্ষা করিতেন, প্রতি রাত্রিতে তাঁহাদের সকলকে একত্র করিয়া কে কিরূপ ভজন করিতেছেন, তাহা শুনিতেন এবং ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিতেন। একদিন জনৈক বৈষ্ণব মহাত্মা কিছু না বলিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—'আজ আমি কিছুই ভজন করিতে পারি নাই।

প্রাতে শ্রীপ্রাণেশ্বরীর দক্ষিণ হস্তে অলঙ্কার পরাইতে গিয়া শ্রীহস্তের যে শোভা মনে লাগিয়া গেল, আমি সমস্ত দিনও সেখান হইতে মন সরাইতে পারি নাই।" সিদ্ধ বাবা তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন—"তোমারই যথার্থ ভজন হইয়াছে।"

এই ভজন-পদ্ধতিই পরে 'গুটিকা' নামে প্রসিদ্ধ হয়। তাঁহার অনুগত দ্বিতীয় সিদ্ধ কৃষ্ণদাসজি এই গুটিকা বহুল পরিমাণে লিখিয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিতরণ করেন। এতদ্‌ব্যতীত ইনি **প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী, ভাবনাসার-সংগ্রহ, পদ্ধতি, সাধনামৃত-চন্দ্রিকা** প্রভৃতিও রচনা করেন। প্রথম সিদ্ধ বাবাই ইহাদের প্রচার প্রসার করিয়াছেন। তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণদাসজি (লালা বাবু) **নন্দীশ্বর-চন্দ্রিকা** রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে—সিদ্ধ বাবা মানসগঙ্গায় ডুবিয়া থাকিয়া কয়েকদিন পরে কতগুলি গ্রন্থ বুকে লইয়া ভাসিয়া উঠিতেন। জলমধ্য হইতে জলস্পর্শশূন্য গ্রন্থগুলি শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত। প্রসিদ্ধ আছে যে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ যখন গ্রন্থ লিখিতেন, তখন আবরণরহিত স্থানেও—বর্ষায় চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইলেও—তাঁহার গ্রন্থে বা শরীরে জলবিন্দু স্পর্শ হইত না !!

সিদ্ধ বাবা যাঁহাকে যাঁহাকে ভজনোপদেশ করিয়াছেন—তাঁহারাও সকলেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণদাস, মদনমোহন ঠোরের শ্রীনিত্যানন্দ দাস, ঝাড়ুমণ্ডলের শ্রীবলরাম দাস, লালা বাবু (শ্রীকৃষ্ণদাস) প্রভৃতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের প্রত্যেকের ইতিবৃত্ত স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য ও আস্বাদ্য।

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের ভজন-সিদ্ধি-সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে। [জাগতিক সিদ্ধ পুরুষ হইতে ব্রজের সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ সর্ব্বথা পৃথক্। ব্রজজনানুগত বৈষ্ণবগণের অন্তশ্চিন্তিত ভাবদেহের বৃত্তি

যখন বাহ্যদেহেও স্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়া অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তাঁহাদিগকে **ভজনসিদ্ধ** বলা হয়।]

একবার তিনি হোলিলীলা চিন্তা করিতে করিতে অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীপ্রিয়াজির আনুগত্যে থাকায় তাঁহার দেহেও আবীর, কুঙ্কুম, গুলাল, কস্তুরী, কর্পূর ও চন্দন-পঙ্ক পরিব্যাপ্ত হইল। ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্যানুসন্ধান না থাকিলেও ভজন-কুটীর হইতে বাহিরে আসিলে তত্রত্য বৈষ্ণবগণ তাঁহার দেহে ঐ সব অপ্রাকৃত দ্রব্যের দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আর একদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণ মানসগঙ্গায় জলকেলি করিয়া তীরে আসিলে শ্রীললিতা-বিশাখা তাঁহাদের বেশভূষা করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি প্রসাধন-সামগ্রী যোগাড় করিতেছিলেন—সিদ্ধ বাবাও আতরের শিশিটী হস্তে লইয়া কালাপেক্ষা করিতেছেন। দুইজনের হাস্য-পরিহাসাদি শুনিয়া সিদ্ধ বাবার দেহে স্তম্ভ হয় এবং হস্ত হইতে আতরের শিশিটী পড়িয়া গিয়া চতুর্দ্দিকে সৌরভ ছড়াইয়া দিল। স্নানার্থী সমবেত বৈষ্ণবগণ দিব্য গন্ধ পাইয়া সিদ্ধ বাবাকে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অপরাধিপ্রায় বলিলেন—"কি করি ভাই। আমি অপরাধী, সেবার অযোগ্য, প্রিয়া প্রিয়তমের সেবা করিতে গিয়া জড়তাবশতঃ তাঁহাদের সেবার দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। সেই গন্ধই তোমরা পাইতেছ !!

আর একদিন সিদ্ধ বাবা করোয়া হস্তে মানসগঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের জলকেলি দর্শন করত আবিষ্ট হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া গেলেন। সেই সময়ে তথায় অন্য কেহ ছিলেন না। এদিকে সেবকগণ তাঁহাকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও কিছু পাইলেন না। এই ভাবে সাত দিন পর তিনি আবার করোয়াহস্তে মানসগঙ্গা হইতে তীরে উঠিয়া আসিলেন। এই ব্যাপার সেবকগণ তাঁহাকে জানাইলে তিনিও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'এইমাত্র

আমি স্নান করিতে গিয়া আসিতেছি। ইহার মধ্যে কি ভাবে সাত দিন্ অতিবাহিত হইল হে? তোমরা কি ভ্রান্ত?'

সিদ্ধ বাবার নিকট যখন লালাবাবু ভেক গ্রহণ করিতে আসিলেন, তখন তিনি লালা বাবুকে বলিলেন—'তুমি মহাভোগী, অতএব একবৎসর যাবৎ গাভীকে গম খাওয়াইয়া তাহার গোবর হইতে যে গম পাওয়া যাইবে, তাহা ভোজন করিয়া থাক।' লালা বাবু সিদ্ধ বাবার এই আদেশ পালন করিয়া কৃপা লাভ কৰিয়াছিলেন।

ভরতপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ পূর্ব্বকালে জয়পুরের সেনাপতি থাকিতে দিল্লীর বাদশাহ্‌কে জয় করিতে গিয়া দুইবার পরাজিত হইয়া একবার বদরিকাশ্রমে কোনও সিদ্ধ মহাত্মার শরণ গ্রহণ করেন। সিদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন—'এখনও তোমার ভজনের কাল উপস্থিত হয় নাই। তুমি কি ভজন করিবে? তোমার অসীম রাজভোগ আছে। কোনও রাজার নিকট পরাজিত হইয়া ব্যথিত প্রাণে (ধ্রুবের ন্যায়) আমার নিকট আসিয়াছ—তাহার ফলে এবার তুমি তাহাকে জয় করিবে।' এই কথা শুনিয়া তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করিয়া দিল্লীর বাদশাহ্‌কে জয় করত সমস্ত ধন লুণ্ঠন পূর্ব্বক আনিলে জয়পুরের রাজা বলিলেন,—'মুসলমানের ধন আমি লইব না, তুমি ইহা ভোগ কর।' সেই রাজা যশোবন্ত সিংহ নিরন্তর ধর্ম্ম কার্য্যই করিতেন; বৈষ্ণবসেবা ভগবন্মন্দির-স্থাপনাদি তাঁহার ব্রত ছিল। তিনি একদিন সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজির দর্শনে আসিয়া প্রার্থনা করিলেন—'আমার কিছু সেবা অঙ্গীকার করুন।' তাহাতে সিদ্ধি বাবা বলিলেন—'আমরা ব্রজবাসিদের ঘরে মাধুকরী করিয়া থাকি, অতএব ব্রজবাসিদের সেবা করিলেই আমাদের সেবা করা হইবে।' তখন মহারাজ ব্রজবাসিদিগকে বহু ভূসম্পত্তি দান করিলেন। সেই কথা আজও ব্রজবাসিরা মনে করেন। তৎপরে

আবার তিনি সিদ্ধ বাবাকে অনুরোধ করেন—'আপনি স্বয়ং যদি কিছু অঙ্গীকার করেন, তবে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি।' তখন সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'তোমার ত অনেক রাণী আছে, তন্মধ্যে সব চেয়ে তোমার প্রিয়তমা রাণীকে নির্জনে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।' রাজা তাহাই করিলেন। দূর হইতে একটি পরদা আবরণ দিয়া রাণী লছ্‌মিনীকে সুসজ্জিত করিয়া পাঠান হইল। বাবাজি মহারাজ নির্জনে ভজনাবেশে আছেন—কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ও নূপুরের কলতান আসিতে লাগিল। অমনি সিদ্ধ বাবা বিস্ফারিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। রাণীও ১০।১৫ হাত দূরে স্তম্ভিত হইয়া স্থির ভাবে রহিলেন। এইভাবেই একটি প্রহর অতীত হইয়া গেলে পর রাণীর দাসী ধীরে ধীরে পরদা খুলিয়া দেখিল—রাণী জ্ঞান-সত্ত্বেও অজ্ঞানের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। তখন দাসী রাজাকে লইয়া গিয়া ব্যাপার দেখাইল। রাজা বাবাজি মহারাজের করুণায় ও আদেশপালন-প্রভাবে তাঁহার ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু সেই ভাবরাজ্যের জ্ঞান না থাকায় ঘোরতর সন্দেহেও পতিত হইলেন। বাবাজি মহারাজের সেই অবস্থাটি সেই দিনরাত্রি সমান ভাবেই রহিল—পরদিন তিনি অর্দ্ধবাহ্য-দশা এবং তৃতীয় দিন বাহ্য দশা লাভ করিলেন। রাজা এই তিন দিনই সেখানে রহিলেন। তখন সিদ্ধ বাবা রাজাকে ডাকাইয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—তখন রাজা তাঁহার অন্তরের ভাব পর্য্যন্ত বুঝিলেন। তিনি জানিলেন যে বাবাজি মহারাজ সামান্য ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই আত্মেশ্বরীর কঙ্কণ-কিঙ্কিণীর ধ্বনির উদ্দীপনে স্ফূর্ত্তিতে তাঁহারই দর্শন লাভ করিয়া দুই দিন আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত ছিলেন। আর রাণী লছ্‌মিনী সেই দিন হইতে পরম ভক্তিমতী হইলেন। তাহার কীর্ত্তি অদ্যাবধি ব্রজের সর্বত্র প্রচারিত আছে। রাজ্যমধ্যে তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বহু

মন্দির রহিয়াছে। তিনি একবার শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া বৈষ্ণবগণের সেবায় বহু অর্থ দান করিতে উদ্যোগ করিলে বৈষ্ণবগণ বলিলেন—'আমরা রাজান্ন গ্রহণ করিব না।' তখন রাণী অতিকাতরে কাঁদিয়া বলিলেন—'আপনাদের শ্রীচরণরেণুর নিকটে আমার ইহাই প্রার্থনা—এইবার মরিয়া যেন রাজকুলে জন্ম না হয়। যথায় জন্মিলে আপনাদের সেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, তথায় যেন জন্ম হয়।' তখন বৈষ্ণবেরা বলিলেন—'তুমি গাভীর গোবর হইতে কাণ্ডা (ঘুঁটে) প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় দ্বারা যাহা পাইবে, তাহাই আমাদের সেবার জন্য পাঠাইবে।' রাণী তাহাই করিলেন—অদ্যাবধি রাণীর প্রদত্ত সেই টাকা শ্রীকুণ্ডের বৈষ্ণবগণ মাসে মাসে পাইয়া থাকেন।

আশ্বিনী শুক্লা চতুর্থীতে ইনি অপ্রকট হইয়াছেন।

সিদ্ধ শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ

(রণবাড়ী)

পূর্ব্বনাম—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। জন্মস্থান—যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রাম। [শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মোহন্তের মতে বাঁকুড়া জেলায়]। এই মহম্মদপুর বাঙ্গালী বীর সীতারাম রাজার রাজধানী। তাঁহার পিতা গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীহরেকৃষ্ণরায়ের সেবক ছিলেন। তিনিও বাল্যাবধি ঐ সেবায় তন্ময় ছিলেন। তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হইলে তিনি একদিন শেষরাত্রে গৃহত্যাগ করেন ও পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। * শ্রীশ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীশ্রীমদন-মোহনের সেবায় কয়েকদিন থাকিয়া পরে রণবাড়ীতে ভজন করিতে থাকেন। তৎকালে রণবাড়ী ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল—তিনি

* শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ ৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ৩২১ পৃষ্ঠা।

সাধারণভাবে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ভজন করিতেন। গ্রামে মাধুকরী করিয়া নিজ প্রয়োজনমত রাখিয়া অবশিষ্ট গরুকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে কুটিরে ফিরিতেন। মাধুকরী অতিরিক্ত হওয়ার কারণ—ব্রজবাসিদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি সকলের গৃহে মাধুকরী করিতে বাধ্য ছিলেন, না গেলে তাঁহারা আক্ষেপ করিতেন।

বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অন্যান্য তীর্থাদি কিছুই দেখেন নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তাঁহার চিত্তে উদয় হইল যে তিনি একবার চারিধামে যাবতীয় তীর্থাদি দর্শন করিবেন। শ্রীপ্রিয়াজী তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন—'তুমি বৃন্দাবনে আমার চরণে আসিয়াছ, এধাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইও না; এখানে থাকিয়া ভজন কর, ইহাতেই তোমার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। তীর্থাদি-ভ্রমণের প্রয়োজন নাই।' তিনি কিন্তু শ্রীপ্রিয়াজির স্বপ্নাদেশকে স্বমনোবুদ্ধিজাত কল্পনা বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন না, তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বারকায় যাইয়া তপ্ত মুদ্রাদি ধারণ করিলেন। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ দ্বারকায় গেলে তপ্তমুদ্রা ধারণ করেন—ইহা কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের রাগানুগীয় বৈষ্ণবগণের (পরম্পরা) সদাচার-সম্মত নহে, অথচ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ব্যবস্থা রহিয়াছে। বাবাজি মহাশয় ব্রজের সদাচার উপেক্ষা করত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মতে মুদ্রাদি গ্রহণ করিলেন, তৎপর হইতে কিন্তু তাহার চিত্তে বিক্ষেপ আসিল এবং তীর্থভ্রমণে অরুচি হইয়া তিনি দ্বারকা হইতে ব্রজে চলিয়া আসিলেন। যে দিবস ব্রজে আসিলেন সেই দিন রাত্রে শ্রীরাধারাণী আবার তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন—'তুমি দ্বারকায় তপ্তমুদ্রা গ্রহণ করিয়া সত্যভামার গণভুক্ত হইয়াছ, অতএব তুমি ব্রজধামের উপযোগী নহ, দ্বারকাতেই চলিয়া যাও।' এবারে কিন্তু তাঁহার স্বপ্নটী মনঃকল্পিত বলিয়া ধারণা হইল

না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি ব্রজের সিদ্ধ বাবাজিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও শ্রীপ্রিয়াজির আদেশানুরূপ কথাই বলিলেন। [কথিত আছে গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ বাবার সহিত ইঁহারও নামসাম্যে প্রীত্যাধিক্য বশতঃ সখ্যভাব ছিল। রণবাড়ীর সিদ্ধ বাবা ইঁহার কাছে আসিলে তিনি পূর্ব্ববৎ গাঢ় আলিঙ্গন করত জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন?' তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন—'আমি দ্বারকায় গিয়াছিলাম, এই দেখুন, তপ্তমুদ্রা লাগাইয়াছি।' এই কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধনের বাবা সে স্থান হইতে একটু সরিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত বলিলেন—'অহো! আজ হইতে আপনার স্পর্শের যোগ্যতা আমার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইল। কোথায় আপনি মহারাজ-রাজেশ্বরীর সেবিকা! আর কোথায় আমি গোয়ালিনীর দাসী!!' এই কথা শুনিয়া রণবাড়ীর সিদ্ধ বাবা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া পরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।] ইহার কোন প্রতীকার আছে কিনা জিজ্ঞাসার উত্তরে বৈষ্ণবেরা বলিলেন—'শ্রীপ্রিয়াজির সাক্ষাৎ আদেশের উপর অন্য কোনও উপদেশ মনোবুদ্ধির অগোচর।' হতাশ হইয়া তিনি রণবাড়ীতে গিয়া অন্নজল ত্যাগ করিলেন, কৃত কার্য্যের অনুতাপে ও প্রিয়াজির বিরহানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রবাদ আছে—এইভাবে বাবাজি মহাশয় তিন মাস পর্যন্ত ছিলেন, তৎপরে ভিতরের অগ্নি বাহ্যদেশে ফুটিয়া উঠিল। চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিন দিনে ক্রমশঃ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইতেছিল। শ্রীশ্রীসিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের বাহন শ্রীল বিহারী দাস ব্রজবাসী বাবার মুখে শুনিয়াছি যে ঐ দিন সিদ্ধ বাবা রণবাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন—অদূরে একটি গৃহে তিনি শেষরাত্রে শ্রীবিহারী দাসজিকে ডাকিয়া বলিলেন—'বিহারী! দেখ ত—ঐ ঘরের ভিতরে কি হইতেছে?' তিনি অনুসন্ধানক্রমে জানিলেন যে রণবাড়ীর বাবার দেহ দগ্ধ হইতেছে,

ভিতর হইতে ঘরে খিল দেওয়া ছিল বলিয়া সবিশেষ জানিতে না পারিয়া সিদ্ধ বাবার নিকট ফিরিয়া সব কথা বলিলেন।-- সিদ্ধ বাবা বলিয়া উঠিলেন 'অহো! বিরহানল! বিরহানল!!' এই কথা বলিয়া তিনি বিহারী দাসজির স্কন্ধে চাপিয়া ঐ ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন কণ্ঠ পর্য্যন্ত অগ্নি আসিয়াছে, অথচ উপরে উঠিতেছে না। তিনি বিহারীজিকে একটু তুলা আনিতে আদেশ করিলেন। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে হাতড়াইয়া বিহারীজি একটু তুলা আনিয়া সিদ্ধ বাবার হাতে দিলে তিনি তাহা পাকাইয়া তিনটা পলিতা (বর্ত্তিকা) করিয়া রণবাড়ীর বাবাজি মহাশয়ের মাথায় দিলেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া সর্ব্ব দেহই ভস্মসাৎ হইল!! যখন অগ্নি তাঁহার বুক পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তখনও স্ফুট ভাবে তাঁহার মুখে নামোচ্চারণ হইতেছিল। ব্রজবাসিগণ কাতর প্রাণে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিলে তখনও তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়াছিলেন—'তোমাদের গ্রামে কখনও দুঃখ হইবে না; সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ মহামারী হইলেও তোমাদের গ্রামে কছুই হইবে না।' অদ্যাপি তাঁহার বাণীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যাইতেছে। সিদ্ধ বাবার দেহ দগ্ধ হইতেছে সংবাদ পাইয়া স্থানীয় মুসলমান দারোগা ও এক হিন্দু তহশীলদার আসিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। শুনা যায় যে মুসলমানটি সিদ্ধ বাবার সম্মুখে গেলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, অথচ সরিয়া গেলে আবার জ্বলিয়া উঠে। এই ব্যাপার দেখিয়া হিন্দু তহশীলদার প্রচুর ঘৃত আনাইয়া সিদ্ধ বাবার দেহে অর্পণ করিয়াছিল। তিনি যেভাবে বসিয়া দেহ ভস্ম করিয়াছেন এখনও সেইভাবে সমাধিটী দৃশ্য হইতেছে। সিদ্ধ বাবার দগ্ধ দেহের ভস্মরাশি শীতল হওয়ার কিছুদিন পরে তাঁহার গুরুভাই শ্রীপ্রেমদাস -বাবাজি মহাশয় আসিয়া বলিলেন—'ভাই! আপনি আমার হাতের

কাষ্ঠ ত নিলেন না? এই আমি কাষ্ঠ দিলাম।' এই বলিয়া সেই ভস্মরাশিতে কাষ্ঠ দেওয়ামাত্রই তাহা জ্বলিতে লাগিল। সিদ্ধ বাবার সমাধির নিকট আসিয়া যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহা পূর্ণ হয় বলিয়া ব্রজবাসিগণের সুদৃঢ় বিশ্বাস। এই ঘটনাটি প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

সিদ্ধ বাবা এখানকার ব্রজবাসিগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা যেন ফাল্গুনী শুক্লা একাদশী তিথি অবশ্য পালন করেন এবং হরিবাসরে জাগরণ করেন। অদ্যাপি এখানকার ব্রজবাসিগণ, এমন কি বালক বালিকারাও ঐ তিথি বিশেষভাবে পালন করেনয় তদুপলক্ষে তত্রত্য লোকগণ ভগবল্লীলা কীর্ত্তন ও অভিনয়াদি করেন। পৌষী অমাবস্যাই তাঁহার বিরহতিথি—এই উপলক্ষে তত্রত্য ব্রজবাসিরাই চাঁদা তুলিয়া চৌরাশি ক্রোশের বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া আসিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি (শ্রীধাম নবদ্বীপ) *

১২২৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীহট্টের হিঙ্গাজিয়া পরগণার ফুলতলা বাজারের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নবশাখ-জাতীয় বারুই-কুলে ইঁহার জন্ম হয়। নাম ছিল—শ্রীকেশব (কিশোর); শৈশব হইতে ইঁহার বৈষ্ণব ধর্মে স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। ত্রিশ বর্ষ কালে ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হন—সেই সময়ে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেও সিদ্ধ বাবা বিবাহিতা পত্নী গৃহে আছেন শুনিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে ইনি গৃহে

* শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক-পত্রিকার (১০।৫) ছায়া

দশ বৎসর থাকিয়া পত্নীর বিয়োগ হইলে ১২৬৫ বঙ্গাব্দে নানা তীর্থ ভ্রমণান্তে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার সময়ে শ্রীহট্টবাসী শ্রীল দীনহীন দাস বাবাজির নিকট বেশাশ্রয় করত 'শ্রীকৃষ্ণদাস' নাম গ্রহণ করেন। চৌদ্দ বৎসর শ্রীক্ষেত্রে সাধন করত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ইনি ক্রমশঃ ভ্রমরঘাট, লোটনকুঞ্জ ও সিদ্ধ শ্রীতোতারাম দাস বাবাজির ঠৌরে বাস করিয়া ২৭ বৎসর ভজন করিয়া তবে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসেন। ,পুনরায় স্বগুরু সিদ্ধ বাবার অনুমতিক্রমে ইনি শ্রীখণ্ডে গিয়া ৭ বৎসর ভজন করিয়া পরে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ভজন-কুটীরের নিকট বাস পূর্ব্বক কিছুকাল ভজন করেন। আবার সিদ্ধ বাবার আদেশে পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তথায় গিয়া স্বগুরুর অন্তর্ধান-সংবাদ পাইয়া আবার পদব্রজে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া সিদ্ধ বাবার সমাজ-সেবাদি করিয়া ভজন করিতে থাকেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ইনি গৌর-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সিদ্ধ বাবার সমাজের সম্মুখে অপ্রকট হয়েন। ইঁহার তীব্র বৈরাগ্য, উদারতা, নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতিতে সকল লোকই ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস বাবাজি

শ্রীবৃন্দাবন মদনমোহন ঠৌরের সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহারাজের ভেকের শিষ্য। দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি করযোড়ে শ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করেন—'আমি কি করিব - উপদেশ করুন।' শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহারাজ বলিলেন—'তুই ত মূর্খ। শাস্ত্রপাঠ, গ্রন্থালোচনা, রসতত্ত্বসিদ্ধান্ত—এ সকল ত পারিবি না, তা' কিছু মহৎ সেবা করিতে পারিবি?' শ্রীগুরুর বাক্য শ্রবণে অধিকতর বিনয়ে

তিনি বলিলেন—'প্রভু! আপনি আদেশ করুন, কোথায় এবং কাহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব?' সিদ্ধ বাবা বলিলেন, 'যা—তুই গল্লুজি মহারাজের সেবায় যা—তাঁহার সেবা করিলেই তোর সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে।' গল্লুজি মহারাজ নিত্যধামগত শ্রীরাধাচরণ গোস্বামীর পিতা—শ্রীরাধারমণের সেবাইতগণের মধ্যে ইনিই তৎকালে সাধনশীল অদোষদর্শী ও উদারচেতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ গিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন এবং সেই দিন হইতে কেবল তাঁহার নয়, তাঁহার পরিবারস্থ বালকবালিকা হইতে দাস দাসী, পশুপক্ষী অবধি সকলেরই সেবক হইলেন। তিনি তখন মালা স্পর্শ করিতেই পারিতেন না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দশবার মাত্র শ্রীনামস্মরণ করিতেন। সর্ব্বদাই কোন না কোন বালকবালিকা তাঁহার ক্রোড়ে থাকিত, তাহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখা যাইত। একাদিক্রমে বিশ বৎসর যাবৎ এইভাবে তিনি মহৎ সেবা করেন। গল্লুজি মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলে ইনিও মুক্তপক্ষ বিহগের ন্যায় সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া বহুলোকের অনুরোধে দুই তিন বৎসর শ্রীরাধারমণ-মন্দিরের সম্মুখস্থ রাসঘেরার নিকট গোপালমন্দিরে ছিলেন এবং মাধুকরী করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সকলে ইহাকে 'গুধড়ী বাবা' বলিয়া ডাকিতেন—পথে চলিবার সময় একখানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ৮।১০ সের ওজনে ভারী গুধ্ড়ী-প্রায় কন্থার এক কোণ বাম কক্ষে চাপিয়া আর সমস্ত অংশ পথের রজে লুটাইয়া টানিয়া লইয়া চলিতেন; উদ্দেশ্য—পথের রজেও তাঁহার পদচিহ্ন না থাকে, পশ্চাৎ হইতে বা তিনি চলিয়া গেলেও কেহ তাঁহার চরণচিহ্ন হইতে রজ না লয়।

তৎপরে তিনি গোবর্দ্ধনে গোবিন্দকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী পুছরিতে আসন গ্রহণ করেন। এ স্থানে অনেকদিন থাকিয়া পরে কাম্যবনে

ছিলেন। ইঁহার নিয়ম ছিল—বৈষ্ণব দেখিলেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ দিতেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্ট বৈষ্ণবটি দণ্ডবৎ হইতে গাত্রোত্থান না করিতেন, ততক্ষণ তিনি শয়ান ভাবেই থাকিতেন।

শ্রীকৃষ্ণরাম গোস্বামী (শ্রীপাট বোধখানা)

শ্রীল সদাশিব কবিরাজের পৌত্র শ্রীল ঠাকুর কানাই। তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীকৃষ্ণরাম গোস্বামী বোধখানায় প্রভুর সম্মুখস্থিত বকুলবৃক্ষতলে পুনশ্চরণ করিয়া সিদ্ধ হন। তৎপরে ইনি পরিব্রাজক হইয়া নানা দেশে পর্য্যটন করিতে থাকেন—তাঁহার গলদেশে শ্রীধর-নামক চক্র থাকিতেন। একদা তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে মুর্শিদাবাদে নবাব বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হন। তখন সে স্থানে নবাব হাওয়া খাইতে বেড়াইতেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণরাম তাঁহাকে দেখিয়া সেলাম না করাতে নবাব তাঁহাকে বন্দী করিয়া সেলাম না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইনি উত্তরে বলিলেন—'আমি হিন্দু ফকির, সেলাম করা আমার অভ্যাস নাই।' নবাব বলিলেন—'আমি তোমাকে দেখিব, তুমি কিরূপ ফকির।' তৎপরে কৃষ্ণরাম বন্দী অবস্থায় গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। শ্রীধরচন্দ্রের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি শ্রীধরকে বলিলেন—'শ্রীধর! আজ আমি ত যাইবই, সেই সঙ্গে তুমিও যাইবে।' তাহাতে শ্রীধর বলিলেন— 'তোর কোন ভয় নাই, তুই যা বলবি তাই হবে।' এদিকে ইনি স্নান করিতে গেলে নবাব একটা হাঁড়িতে অমেধ্য ও অন্য হাঁড়িতে ভাত রাঁধাইয়া সরা চাপা দিয়া রাখিলেন—কিন্তু এরূপভাবে সরা চাপা দিয়া রাখিলেন যে বাহির হইতে দেখিয়া তত্রত্য বস্তুর অনুমান না হয়। তিনি স্নানান্তে ওখানে আসিলে নবাব বলিলেন—'বল দেখি হিন্দু ফকির! হাঁড়ি দুইটীতে

কি আছে ? কৃষ্ণরাম বলিলেন—'নবাব সাহেব! আমাকে ঠাট্টা করিতেছেন কেন ? একটাতে শতদল পদ্ম ও অন্যটাতে যুঁইফুল আছে।' নবাব তৎক্ষণাৎ হাঁড়ির মুখের সরা উত্তোলন করিয়া শতদল পদ্ম ও যুঁইফুল দেখিয়া কৃষ্ণরামকে অলৌকিক শক্তিশালী জানিয়া তাঁহাকে দোস্ত (বন্ধু) বলেন এবং গঙ্গার ধারে থাকিবার জন্য একটী স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি সেই স্থানটি 'গোঁসাইর ঘাট'-নামে খ্যাত হইয়া আছে। নবাব তাঁহাকে ঠাকুর কানাইয়ের নামাঙ্কিত পাঞ্জা ও অনেক ভূসম্পত্তি দান করিলেন—সেই পাঞ্জা এখনও বোধখানায় আছে। শ্রীধরচক্রও অদ্যাপি শ্রীশ্রীপ্রাণবল্লভের সহিত তথায় বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণসুন্দর রায় (রায় প্রভু)

পাবনা

পাবনা জেলায় উধুনীয়া গ্রামে বারেন্দ্র কায়স্থ-বংশে রায়প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় রসিকমোহন রায়। ইনি প্রথম জীবনে কাকিনা রাজ-এষ্টেটে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, পরে কোনও ধর্মবক্তার নিকট সংসারের অনিত্যতা-সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া সংসারের প্রতি বিরাগী হন। তিনি ধনসম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত ভগবানের মনে করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্যামসুন্দর অকালে পরলোক গমন করিলে ইনি একবিন্দু চক্ষের জল ফেলেন নাই। পুত্রের শব শ্মশানে রাখিয়া আসিয়া নিজেই খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সকলে মনে করিয়াছিলেন যে একমাত্র পুত্রের শোকে হয়ত রায়প্রভু অধীর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা আসিয়া যখন তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে

দেখিলেন, তখন অবাক হইয়া গেলেন। রায়প্রভু তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মহাপ্রভু আমাকে একজন খোলবায়ান দিয়াছিলেন, এখন তিনিই তাঁহাকে লইয়া গেলেন। আমি কি করিব ?'

নদীয়া জেলার মহিষাডেরার শ্রীঅদ্বৈত-বংশোদ্ভব স্বধামগত শ্রীবৈকুণ্ঠ গোস্বামি-মহাশয়ের নিকট রায়প্রভু দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সর্বদা নির্জনে থাকিয়া ইষ্টচিন্তা ও হরিনাম করিতেন। তাঁহাকে কেহ কখনও মালা জপ করিতে দেখেন নাই—তাঁহার ভজনকুটীরে আহ্নিকের সময় বা মালা-জপের সময় কাহাকেও যাইতে দিতেন না। তাঁহার ভজনের প্রধান অঙ্গই ছিল—কীর্ত্তন। তিনি সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তন করিয়া আনন্দানুভব করিতেন।

তাড়াসের 'বিখ্যাত জমিদার রাজর্ষি বাহাদুর এই রায়প্রভুর নিকট হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করেন। রায় বাহাদুরের অনু-রোধে তাঁহার রাজধানীতে গিয়া রায়প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দেন, কিন্তু রায় বাহাদুরের মন পবিত্র না হওয়ায় একদিন রায়প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—'বনমালী! এখন যাই, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে একবার কোল দিয়া যাই।' কোলাকুলি করার পর রায় বাহাদুরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—'প্রভু! আরও কয়েকদিন এখানে থাকিয়া আমাকে ধর্ম্মোপদেশ করুন।' তাঁহার অনুরোধে আরও কয়েকদিন রায়প্রভু তথায় অবস্থান করেন।

১৩০০ সালে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন কৃষ্ণা একাদশী—রাত্রিতে ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদিগের হরিবাসরে কীর্ত্তনে আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে বলিলেন 'আর তোমাদিগকে হরিবাসরে আসিতে হইবে না। পুত্র-পরিবার লইয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর।' রায়প্রভুর এ কথায় ভক্তবৃন্দ ভাবিলেন 'প্রভু

এমন কথা বলেন কেন?' ত্রয়োদশীর দিন শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহের ভোগ হইলে ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন—রায়প্রভু বিকালবেলা শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিলেন। জগাইমাধাই-উদ্ধার-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া বলিলেন—'হায়! এবার আমার মত পাতকীর উদ্ধার হইল না!!' ভক্তবৃন্দ চলিয়া গেলেন—রাত্রিতে আহার করিয়া কিছুক্ষণ নিদ্রা গিয়া তিনি জাগরিত হইলেন এবং স্বীয় পৌত্র গৌরবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন— গৌর! ভক্তবৃন্দ সকলকে ডাক, তাঁহারা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করুক, আমার যাইবার সময় হইয়াছে।' গৌরবাবু ভক্তগণকে ডাকিয়া আনিলেন—তাঁহারা এই কথা শুনিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। রায়প্রভু একটু ক্রোধপ্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—'কাহারও দ্বারা আমার কোন উপকার হইল না!' এই বলিয়া কর জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজিউর আঙ্গিনায় তাঁহাকে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। কর জপ করিতে করিতে তাঁহার পদতল ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। সকলে ধরাধরি করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজিউর আঙ্গিনায় তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আসিল; তবুও জিহ্বা নড়িতে লাগিল—সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল; রজনী দ্বি-প্রহরের সময় বিনা মৃত্যু-যন্ত্রণায় হরিনাম জপ করিতে করিতে রায়প্রভু ধরাধাম ত্যাগ করিয়া ব্রজধাম প্রাপ্ত হইলেন।

রায়প্রভুর জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়—(১) একজন ব্রাহ্মণ শূলবেদনায় কাতর হইয়া বহু ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করেন, কোন ফলোদয় না হওয়ায় ৺বৈদ্যনাথ ধামে বাবা বৈদ্যনাথের নিকট ধন্না দেন—তিনি আদেশ করেন 'পাবনা জেলার অন্তর্গত উধুনীয়া গ্রামে কৃষ্ণসুন্দর রায় নামে একজন সাধু পুরুষ আছেন, তাহার নিকট যাও, আরোগ্যলাভ করিবে।' ব্রাহ্মণটি

আদেশানুসারে উধুনীয়ায় রায়প্রভুর হরিবাসরে আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। রায়প্রভু আদেশ করেন—হরিবাসরের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিবেন, হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবেন এবং একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিবেন।' তিনি রায়প্রভুর আদেশানুসারে কার্য করিয়া রোগমুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(২) চক্পাঙ্গাশী গ্রামের শশিভূষণ তালুকদার রায়প্রভুর সিদ্ধ-খ্যাতি শুনিয়া একদিন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হরিবাসর ঘরে গিয়া রায়প্রভুর নিকট একটি বাঁশের মোড়ার উপর উপবেশন করিলেন। রায়প্রভু ভক্তবৃন্দ সহ ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথন করিতে-ছিলেন—এমন সময় একটি ভেক লাফাইতে লাফাইতে রায়প্রভুর জলচৌকির তলে গিয়া বসিল এবং একটি আলাদ সর্প তাহার পিছন পিছন আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্প দেখিয়া সকলেই ভয়ে লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু রায়প্রভু আসনের উপর বসিয়াই সর্পের লেজ ধরিলেন এবং ভেককে বলিলেন—'তুমি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাও।' তাঁহার আদেশ শুনিয়া ভেক চলিয়া গেল। সর্পটী মড়ার মত হরিবাসরে পড়িয়া রহিল। তৎপর রায়প্রভু তাঁহার পৌত্র গৌরবাবুকে বলিলেন 'গৌর! বাড়ীর মধ্যে যাও. কিছু দুধকলা আনিয়া সর্পকে দেও, কারণ আমি উহার শিকারকে ছাড়াইয়া দিলাম। গৌরবাবু একটা পিত্তলের বাটীতে কিছু দুধ ও কলা আনিয়া দিলে রায় প্রভু আদেশ করিলেন,—'খাও, আমি তোমার আহার ছাড়াইয়া দিয়াছি।' আদেশ শ্রবণমাত্র সর্প দুধ ও কলা খাইয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল। তাহার পর ভক্ত-বৃন্দের সহিত কিছুক্ষণ কথোপকথন করিয়া সর্পের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তিনি বলিলেন—'তুমি এখনও আছ? যাও, স্বস্থানে চলিয়া যাও।' ইহা শুনিয়া সর্প আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

(৩) উধুনীয়া হাটখোলায় সহচরী নামে এক বেশ্যা ছিল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হয়, চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। একদিন সে হরিবাসরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রায়প্রভুকে তাহার দুঃখের কাহিনী বলিল। রায়প্রভু আদেশ করিলেন—'বেশ্যাবৃত্তি ও বেশ্যাপাড়া ত্যাগ কর; মুসলমানপাড়ায় একখানা ঘর করিয়া থাক। হরিবাসরের আঙ্গিনা সম্মার্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিও এবং হরিবাসরের ধূলা অঙ্গে মাখ—ভগবৎ কৃপায় ভাল হইবে।' আদেশানুসারে সে তাহাই করিয়া ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিল এবং যতকাল জীবিত ছিল, রায়প্রভুর বাড়ীর একজন চাকরাণীর মত বাহিরের সমুদয় কার্য্য করিত।

(৪) উধুনীয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় বৈকুণ্ঠ-নামে একজন ধীবরের বসতি ছিল। সে যেখানেই জাল ফেলিত, মাছ পাইত না। ক্রমে সে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল, তৎপরে তাহাকে কেহ আর ঋণ দিতেও চাহিল না, কারণ পাওয়ার আশা নাই। একদিন সে রায়প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল—'প্রভু! আমার দিন চলে না, যেখানেই জাল ফেলি মাছ পাই না।' রায়প্রভু বলিলেন—'মহাপ্রভুর ইচ্ছা নহে যে তুমি ধীবরের কাজ কর।' সে বলিল—'তবে কিরূপে সংসার চলিবে?' রায়প্রভু বলিলেন—'শ্রীহরিনাম গ্রহণ কর, মহাপ্রভুই চালাইবেন।' সে রায়প্রভুর নিকট হরিনাম গ্রহণ করিল, এবং বৈকুণ্ঠ-ভক্ত-নামে দেশে পরিচিত হইল। বৈকুণ্ঠ ভক্ত 'রাধা-গোবিন্দ' বলিয়া যে বাটীতে উপস্থিত হইত, তথায় প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা পাইত। একদিন হরিবাসরে রাজর্ষি বাহাদুর বৈকুণ্ঠ ভক্তের মুখে হরিনাম শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং রায়প্রভুর নিকট তাহার ঋণের কথা শুনিয়া তাহাকে ঋণমুক্ত করেন।

(৫) ১২৯৯ সনের কার্ত্তিক মাসে নিয়মসেবার সময় শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ মহাশয় বনওয়ারীনগরে রাজর্ষি বাহাদুরের বাড়ীতে শ্রীশ্রীবিনোদজীউর দর্শনে আসিয়া সিরাজগঞ্জনিবাসী শ্রীহরিসুন্দর

ভৌমিক ও রায়প্রভুর সাক্ষাৎকার পান। রায়প্রভু তখন শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা—'হরি হরি! কি মোর করম-গতি মন্দ!! ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ, না ভজিনু তিল আধ, না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ!!" ইত্যাদি পাঠ করিতেছিলেন এবং চোখের জলে ভাসিয়া যাইতে-ছিলেন। পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে কামিনীবাবু আবার যখন শ্রীবিনোদ দর্শনে যান, তখন শ্রীবিনোদজীউ পাকা মন্দিরে ছিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে একটি ফুরসি হুকা ও চাঁদির নল দেখিতে পাইয়া রাজর্ষি বাহাদুরকে ইহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি বলিলেন—'গত জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যার দিন বিকালে পূজারি আমাকে মন্দিরে আসামাত্রই বলিল—"শ্রীবিনোদের উত্থাপন ও ভোগাদির অন্তে শ্রীবিনোদের সামনে বসিয়া শ্রীহরিনাম করিতেছিলাম—হঠাৎ একটু তন্দ্রায় স্বপ্নে দেখি—শ্রীবিনোদজিউ বলিতেছেন—'আমাকে একটু তামাক ত দাও। ইহারা আমার তামাক বন্ধ করিয়াছে—অন্য একস্থানে যাইয়া খাইতাম, সেখানে আজ চারদিন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে।' ইহার রহস্য কি?" রাজর্ষি বাহাদুর বলিলেন—'আমি তাহাকে রহস্য বলিয়া হুকা, কল্‌কি ও নল প্রভৃতি বাহির করিয়া দেওয়াইলাম এবং তামাক আনাইয়া শ্রীবিনোদকে তামাক সাজাইয়া দেওয়াইলাম। তদবধি দুই বেলাই রাজভোগের পর তামাক ভোগ লাগিতেছে।' কামিনী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'সেই রহস্যটি কি? অন্যত্র কোথায় যাইয়া খাইতেন এবং চারিদিন পর্য্যন্ত বন্ধই বা কেন হইল?' রাজর্ষি বাহাদুর বলিলেন—'প্রাচীন কর্ত্তাদের সময় হইতেই শ্রীবিনোদকে তামাক ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমার এখানে আসার পর আমি মনে করিলাম যে মাদক দ্রব্য ভগবৎসেবায় দেওয়ার ব্যবস্থা ত শাস্ত্রে নাই, সুতরাং উচিত মনে করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। অন্যত্র কোথায় খাইতেন এবং চারিদিন বন্ধ কেন—তাহার রহস্য এই যে শ্রীরায়প্রভু তামাক

খাইতেন। তবে তাঁহার তামাক খাওয়ার রীতি একটু স্বতন্ত্র—হুকাটি হাতে আছে, ১০।১৫ মিনিট পর একটি টান দিতেন, নিজের ভজনের আবেশে আগুণ আছে কি নাই, ধুয়াঁ আছে কিনা ইত্যাদি কিছুরই অনুসন্ধান ছিল না। গত দ্বাদশীর দিবস ত্রয়োদশী পড়িলে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে তামাক বন্ধ হইয়াছে। শ্রীরায়প্রভুমহাশয় নৈষ্ঠিক লীলাবিষ্ট ভক্ত ছিলেন। শ্রীবিনোদের তামাক খাওয়ার রীতিতে তিনি দোষারোপ করিতেন না, সুতরাং তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াই তামাক খাইতেন। তাঁহার প্রাপ্তিটীও এক অপূর্ব্ব ব্যাপার!! তিনি প্রতি একাদশীতে নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কীর্ত্তন করিতেন। একাদশীর রাত্রিতে কীর্ত্তনান্তে ফলমূল-মিষ্টাদি যাহা যাহা ভোগ লাগিত তাহা তাহা ভক্তগণকে স্বহস্তে তিনি বাটিয়া দিতেন। প্রভাতের অধিক বিলম্ব না থাকায় তিনি নিত্যকৃত্য সমাধান করিয়া তাঁহার সেবিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের রাজভোগান্তে দ্বাদশীর দিন প্রসাদ পাইয়াছেন। তার পর শরীরে অসুস্থতা বোধ হওয়ায় শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদের সাম্‌নে প্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া অনুগত ভক্তগণকে ডাকাইয়া কীর্ত্তন করাইতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বে দেহত্যাগ করিলেন।

শ্রীগিরিধারী দাস বাবাজী

পূর্ব্বাশ্রমের নাম—অন্নদাপ্রসাদ রায়; পাবনা জেলায় তাড়াসে জমিদার শ্রীরাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাদের পিতা শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ রায় মহাশয় শ্রীঅন্নদা বাবুর বাল্যাবস্থাতে সপরিবারে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। তৎকালে ঈদৃশ গৃহস্থ বালক-বলিকাদের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা বৃন্দাবনে ছিল না, কাজেই তাঁহাকে প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট নির্ভর করিতে হইল। দার-পরিগ্রহ

করিলে পর ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বাড়ীর ঠাকুরসেবা, দেশের জমিদারীর তত্ত্বাবধান এবং পরিজনবর্গের প্রতিপালনের ভার ইঁহার উপর পড়ে। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ধর্ম্মপিপাসা প্রবল থাকিলেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে স্বীয় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তদীয় পরমা ভক্তি-মতী জননী তাঁহাকে শ্রীল গৌরশিরোমণি মহাশয়ের চরণে আনিয়া সমর্পণ করেন। শিরোমণি মহাশয়ের কৃপায় ইনি পরম ভক্তিমান হইয়া উঠিলেন ও তাঁহারই আশ্রমে থাকিতেন। শিরোমণি মহাশয়ের নাম দিলেন—শ্রীঅদ্বৈত দাস। তখন তাঁহার বয়স ছত্রিশ বৎসর—এ সময়ে তাঁহার পত্নী একটি কন্যা প্রসবের পর কালকবলে পতিত হন, কন্যাও কয়েকদিন পরে লোকান্তরিত হয়। তিনি আর দার-গ্রহণ করিলেন না। শ্রীশিরোমণি মহাশয়ের দেহত্যাগের পরে ১২৯৭ সালে ইনি শ্রীগোবর্দ্ধনে গোবিন্দকুণ্ডে শ্রীলকৃষ্ণদাস বাবাজির নিকট ভেকাশ্রয় করেন, নাম হইল—শ্রীগিরিধারী দাস। এখন হইতে মাধুকরী-বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছিল—সংসারের কিছুই গ্রহণ করিতেন না। ইহার কিছুদিন পরে ইনি শ্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয় করেন। ১৩০২ সনে শ্রীরাজর্ষি বাহাদুর ও তাঁহার সেবিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-জীউর সহিত তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। বৈষয়িক সম্বন্ধের প্রীতি পরমার্থে পর্য্যবসিত হইল। দুই ভাইয়ের পরস্পর স্নেহব্যবহার সকলের শিক্ষার স্থল হইল। ইঁহাদের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীতে একদিন একটি প্রশ্ন উঠিল—'আমাদের মধ্যে কাহারও কোনও দোষ দৃষ্ট হইলে, তাহা তাঁহাকে বলা উচিত কিনা?' ইহার উত্তরে শ্রীগিরিধারী দাসজি বলিলেন—'না, তাহা বলা উচিত নহে; সংশোধনের জন্যই ত বলিতে হইবে। সে দোষ তাঁহার হাতে থাকিলে, তিনি অবশ্যই সংশোধিত হইতেন। আমাদের ত অনেক ত্রুটি আছে—আমরা ইচ্ছা সত্ত্বেও

তাহা সংশোধন করিতে পারি না; সুতরাং তাহার সংশোধনের জন্য শ্রীগিরিরাজ ও শ্রীপৌর্ণমাসীর চরণে প্রার্থনা করাই উচিত।'

তিনি একটি কথা বলিতেন—দেহ রক্ষা করিতে হইলে আহার ও ঔষধ দুইই আবশ্যক, আহারটি নিত্য, ঔষধটি প্রয়োজনমত। তেমনই পরমার্থ জীবনটি রক্ষার জন্য লীলা-স্মরণাদি ভজন—নিত্য আহার এবং দোষদৃষ্টি বা অপরাধাদিদ্বারা চিত্ত-মালিন্য উপস্থিত হইলে তত্ত্বজ্ঞানটি ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য।

ইঁহার তীব্র বৈরাগ্য, মধুর বিনয় ও শ্রীভগবদ্ভজন নিপুণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিমুগ্ধ ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে 'মহাত্মা' বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাসকালে একদিন 'কৃষ্ণদাস'-নামক জনৈক মহানুভব বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার গাঢ় সখ্যতা হয়, যেহেতু ইনি শ্রীকৃষ্ণদাসের সহিত ইষ্টগোষ্ঠীতে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণদাসের বঙ্গদেশে যাইবার প্রবল ইচ্ছা শ্রীগিরিধারী দাসজির নিকট ব্যক্ত করিলে শ্রীগিরিধারী দাসজি কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনের কারণ না বুঝিয়া কৃষ্ণদাসজি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উত্তরে ইনি বলিলেন—'হায়! আমি মহাপরাধী, মহানারকী, বিষয়-বিষ্ঠার কীট, হায়! আমি কি সর্ব্বনাশ করিলাম—আমি নিবৃত্তি-নিরত ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবের ভজনের ভয়ঙ্কর বিঘ্ন উৎপাদন করিলাম! হা পতিতপাবন মহাপ্রভো! রক্ষা কর! রক্ষা কর!!' তাঁহার করুণোক্তি শ্রবণে কৃষ্ণদাসজি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন আপনি এ প্রকার কাতর হইতেছেন?' তখন ইনি বলিলেন—'মহারাজ! এই হতভাগ্যই আপনার এই ভজনবিঘ্নের কারণ। আপনার বঙ্গদেশের যাওয়ার বাসনা মহাপরাধী আমারই সঙ্গদোষে হইয়াছে।' তখন কৃষ্ণদাসজি রোদন করিয়া বলিলেন—'আপনার ন্যায় মহানুভব বৈষ্ণবের

সঙ্গ ছাড়াইয়া শ্রীরাধারাণী আমাকেই দণ্ড দিতেছেন।' গিরিধারীদাসজি তখন অনুনয় করিয়া বলিলেন—'যদি নিশ্চয়ই বঙ্গদেশে যাইতে হয়, তবে আমার একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আগামী কল্যই না গিয়া তিনটি দিন অপেক্ষা করুন। কৃষ্ণদাসজি তাহাতেই সম্মত হইলে ইনি ভজনকুটীরে আসিয়া অন্নজল ত্যাগ করত কেবল শ্রীনাম গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরাধারাণীর চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণদাসের বঙ্গদেশে যাওয়া না হয়। নিজের সুদীর্ঘ ভজন-নিয়ম সমাপন করিয়া অতিরিক্ত পচিশ হাজার নাম-গ্রহণ, ১০৮ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ এবং চারি বার শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পরিক্রমার নিয়ম গ্রহণ করিয়া উপবাসী থাকিলেন। এদিকে কৃষ্ণদাসজিও নিজ ভজনকুঠিরে গিরিধারী দাসজির নামগুণ স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইলেন। তৃতীয় রাত্রিতে কৃষ্ণদাসজি তন্দ্রার আবেশে দেখিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণদাসজির দীক্ষাগুরু বলিতেছেন—'এই মহাত্মা গিরিধারী দাস আজ তিন দিন উপবাস করিয়া শ্রীরাধারাণীর চরণে প্রার্থনা করিতেছেন'। তন্দ্রাভঙ্গে কৃষ্ণদাস ব্যাকুলহৃদয়ে ভজনকুঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন এবং কিয়দ্দুর যাইতেই গিরিধারীদাসের অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ইনি তুলসীতলায় ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া বলিতেছেন 'হে বৃন্দাদেবি! কৃষ্ণদাস যেন তোমার ধাম না ত্যাগ করে।' ইহা শুনিয়া কৃষ্ণদাসজি অধীর হইয়া মহাত্মার চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দুই বন্ধুতে মিলিয়া প্রেমক্রন্দনে শ্রীকুণ্ডতীর প্লাবিত করিলেন। বঙ্গদেশে আর কৃষ্ণদাসজি গেলেন না। উভয়ে প্রেমানন্দে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া ভজন-রসাস্বাদ করিতে লাগিলেন।

ইনি নিরন্তর ভজনাবেশে থাকিতেন। ১৩০৮ সনের পৌষী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে বেলা ২॥০ টার সময় শ্রীরাজর্ষি বাহাদুর-প্রমুখ বৈষ্ণবগণের নিকট জনৈক বৈষ্ণব জানাইলেন 'আজ বাবাজি মহাশয়

মাধুকরী করিতে বাহির হন নাই। কপাট বন্ধ রহিয়াছে, ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া যায় না'। বাবাজি মহাশয় প্রতি রাত্রিতে সন্ধ্যার পর শ্রীবিনোদজীর দর্শনে আসিতেন এবং রাজর্ষি বাহাদুরাদির সহিত ভগবল্লীলা ও সাধনভজন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন। পূর্ব্বদিন (দ্বাদশীর রাত্রিতেও) তিনি আসিয়াছিলেন—অসুস্থতার কোনই চিহ্ন জানা যায় নাই। ঐ সংবাদ পাওয়ামাত্র রাজর্ষি বাহাদুরকে জানাইয়া শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ বাবাজি মহাশয়ের কুটীরে গেলেন। তখন বহু বৈষ্ণব ও ব্রজবাসী তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। অনেক চেষ্টায় কপাট খুলিয়া দেখা গেল—গৃহ মধ্যে যে বেদির উপর বাবাজি মহাশয় সাধারণতঃ শয়ন করিতেন, তথায় তিনি ডান পার্শ্বে ডান হাতখানি মাথার নীচে দিয়া শায়িত আছেন। আর্দ্র কৌপীন বহির্ব্বাস নীচে রহিয়াছে, শুষ্ক কৌপীন বহির্ব্বাস পরিধানে আছে—গায়ে অন্য বস্ত্র নাই—চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত, মুখে অত্যন্ত উল্লাসময় হাসি ও তাহাতে ফেন। তদবস্থায় তাঁহাকে বাহিরে আনা হইল—উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনও করা হইল—রাজর্ষি বাহাদুর আসিয়া দর্শন করিলেন—জীবনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শরীর শক্ত হয় নাই—বাহিরে আনিয়া বসাইয়া কেহ ধরিয়া রহিলেন। সেই উল্লাসময় চেহারা দেখিয়া কাহারও প্রতীতি হইল না যে দেহে প্রাণ নাই! সন্ধ্যাবধি নানাবিধ চেষ্টা চলিল—কিন্তু কোনই ফল হইল না। শরীর ক্রমেই সাদা হইতে লাগিল। তখন সকলেরই মনে হইল—দাহ করাই কর্ত্তব্য। রাজর্ষি বাহাদুরও অনুমোদন করিলেন—চিতায় চাপাইয়াও কাহারও মনে হইল যে অগ্নিসন্তাপে হয়ত চেতনা হইবে। ক্রমে তাহাও ব্যর্থ হইল। চেহারায় বোধ জন্মাইল যে কোনও অপূর্ব্ব লীলাচ্ছবি নেত্রপথে উদিত হইয়াছিলেন—যাহার আনন্দানুভূতি আর হৃদয় সহ্য করিতে পারে নাই!!

শ্রীগোরাচাঁদ দাস বাবাজি মহাশয় (শ্রীরাধাকুণ্ড)*

প্রায় ৩৭।৩৮ বৎসর পূর্ব্বে ইনি শ্রীরাধাকুণ্ডে ভজন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ ছিল এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কণ্ঠস্থ ছিল। শ্রীকুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে কাঁচা ভজন-কুটীর, ছোট দরজা, তাহাতে চট ঝুলান। একদিন অপরাহ্নে নির্জ্জনে কুটীরে বসিয়া তিনি শ্রীনাম করিতেছিলেন—এমন সময় শ্রীনবদ্বীপ দাস বাবাজি বাহির হইতে 'জয় রাধে' বলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তিনি মশারির ভিতরে শুইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইনি খাটিয়া হইতে নীচে নামিলেন—তাঁহার শরীর খুব দুর্ব্বল, ক্ষীনকায়, বুকে ও পিঠে ক্যান্সারের মত ঘা রহিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ দাসজি তাঁহাকে শ্রীচরিতামৃতের 'অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন।' এই পয়ারোক্ত কৃষ্ণকে 'জ্ঞানবস্তু' কেন বলা হইল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি অর্দ্ধোন্মিলীত-নয়নে উপবিষ্ট ছিলেন—প্রশ্নটি শুনিবামাত্র ধীরে ধীরে তৎপরবর্ত্তী পয়ারসমূহ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। পূর্ব্ববৎ দুর্ব্বলতা নাই, সিংহের মতই যেন বলশালী হইয়া অত্যন্ত আবেশের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গরিমা প্রায় অর্দ্ধঘন্টা যাবৎ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার শিষ্য সেবকটি তথায় উপস্থিত হইলেন—তখন বাবাজি মহাশয়ের আবেশ ভঙ্গ হইল এবং সম্পূর্ণ অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন সেবকটি শ্রীনবদ্বীপ দাসজিকে বলিলেন—'আপনি কি করিয়াছেন?' এ কথায় তিনি অপ্রস্তুত ও ভীত হইয়া উঠিয়া আসিলেন। ভগবদাবেশে দেহস্মৃতি ভুলিয়া যায়—ইহাই বাবাজি মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা পাওয়া গেল।

---

* শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাস বাবাজি মহান্ত মহারাজের মুখাশ্রিত

সিদ্ধ শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ

(নবদ্বীপ রাণীর চড়া)

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টেপাখোলার নিকটবর্ত্তী পদ্মাতীরবর্ত্তী বাগ্‌যান-গ্রামে বৈশ্যকুলে ইনি আবির্ভূত হন। পিতৃদত্ত নাম ছিল—বংশীদাস। বাল্যকালেই দার-পরিগ্রহ করত ২৯ বর্ষ পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন—এই সময়ে শস্তের দালালি করিতেন। পত্নীবিয়োগের পর ঐ ব্যবসায় ত্যাগ করত সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবার বেষ-শিষ্য শ্রীমদ্‌ভাগবত দাস বাবাজির নিকট কৌপীন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ত্রিশ বৎসর কাল শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজন করিতেন।' *

ইনি মদনমোহন টৌরের সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবার নিকট রাগানুগা ভজন ও বৈরাগ্যাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার দৈন্য, বৈরাগ্য ও ভজন জগতে অতুলনীয়। '১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে ইনি সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবার আদেশানুসারে ব্রজ হইতে গৌড়দেশে আসেন এবং অপ্রকট কালাবধি নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থলে বাস করেন। তিনি ধামবাসি দর্শনে গৃহস্থের গৃহ হইতে শুষ্ক দ্রব্যসমূহ ভিক্ষা করিয়া স্বহস্তে ভগবানের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতেন, কখনও পথ হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ব্যবহৃত ও পথপ্রান্তে পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ডসমূহ গঙ্গাজলে ধুইয়া তাহাতে পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গঙ্গাসৈকতে নিক্ষিপ্ত শববস্ত্রাদি ধৌত করিয়া তদ্দ্বারা আচ্ছাদনের কার্য্য সাধন করিতেন। এক কথায় ইনি সর্ব্বতোভাবে পরাপেক্ষা-রহিত হইয়া অপরের পরিত্যক্ত ও

* শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সঙ্কলিত 'শ্রীগৌরকিশোরের' দ্বারা।

অপ্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারা স্বীয় ব্যবহারিক কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিতেন। কখনও ইঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্বন্ধিত নামসংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাদি থাকিত; কখনও বা গলদেশে মালা নাই, হস্তে তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্রগ্রন্থির মালা, উন্মুক্ত-কৌপীন হইয়াও থাকিতেন। কেহ কোনও দিন তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিবার সুযোগ পায় নাই। তিনি নিরম্বু একাদশী ব্রত পালন করিতেন। একাদশী ব্যতীত অন্য সময়ে কখনও বা গঙ্গামৃত্তিকা, কখনও বা গঙ্গাজলে ভিজাইয়া শুষ্ক তণ্ডুল ও লঙ্কা গ্রহণ করিতেন। শ্রীরাধারমণবাগের স্বনামধন্যা ললিতা দিদির মুখে শুনিয়াছি—'একদিন ইনি বাজার হইতে কুড়াইয়া একটি কাণা বেগুন আনিয়াছেন—বাগানবাড়ীর ঝাউতলায় বসিয়া সেই বেগুনটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া একমালা গঙ্গাজলে দিয়া একপত্র তুলসী দিলেন এবং ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া ভোগ আরতি গান করিতেছিলেন—'ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি' ইত্যাদি, গাহিতে গাহিতে বলিলেন 'না জানিয়ে পরিপাটী, না জানি রন্ধন। শুখারুখা একমুষ্টি করহ ভোজন।' এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল, সমস্ত শরীর লাল হইল—ফুলিয়া গেলেন—দরবিগলিতধারে অশ্রুপ্রবাহ ছুটিয়া মুখ বুক ভাসাইয়া দিল।' ললিতা দিদি পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া এই প্রেমের দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন—প্রায় এক ঘণ্টা পরে ভাবশান্তি হইলে তিনি আবার গাহিলেন—'ফুলের কেওয়ারী ঘর ফুলের চৌয়ারী।' ইত্যাদি ক্রমে শ্রীগৌরের শয়ন দিয়া কেবল সেই কাঁচা বেগুন প্রসাদ ও জলটুকু পাইয়া এমন মুখভঙ্গী প্রভৃতি করিতেছিলেন যেন পঞ্চামৃতাস্বাদেও লোকের এতাদৃশ সুখ হয় না। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া বহুদিন লোহার পাত্রে করিয়া মাধুকরী করিতেন—রাস্তা দিয়া 'জয় রাধে' বলিয়া উন্মত্তবৎ চলিয়া যাইতেছেন; ছেরলে

গোষ্ঠী পেছনে ছুটিতেছে ; ছেলেদের নিয়া তিনিও আনন্দ করিতেন —কৃষ্ণবর্ণ ছেলে দেখিলে তাঁহার কৃষ্ণজ্ঞান এবং গৌরবর্ণ দেখিলে গৌরজ্ঞান হইত—ছেলেরা তাঁহার সহিত রঙ্গরসে গায়ে হাত দিলে তিনি ভঙ্গীভরে বলিতেন—'দেখ. মা যশোদা ! তোর গোপাল আমাকে চিম্‌টি কাটিল অথবা দেখ মা শচী ! তোর গোরা আমাকে মুখ ভেঙ্‌চাইল' ইত্যাদি। 'হরিবোল করিয়া যাইতে যাইতে ইচ্ছামত কাহারও দ্বারে দাঁড়াইলে গৃহস্থগণ মাধুকরী আনিয়া দিতেন। মাধুকরী পূর্ণ হইলে এক বুক গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তাহা পাইয়া ভাওটি রজে মাজিয়া মাথায় পরিয়া আসিতেন। একবার কোন নূতন লোক তামাসা করিয়া তাঁহাকে মাধুকরীর পাত্রে অমেধ্য বস্তু দেওয়ায় তিনি মাধুকরী ত্যাগ করিলেন। তখন পরিত্যক্ত হাঁড়ীগুলিকে চারিপার্শ্বে রাখিয়া বসিয়া থাকিতেন—শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাজন-বোধে তাঁহার শিষ্যা শ্রীযুক্তা তারা দাসীকে একথা বলিয়া গিয়াছিলেন—'নবদ্বীপে যদি বৈষ্ণব দেখিতে হয়, তবে গঙ্গার চড়ায় গিয়া দেখ'। তদবধি তারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং বাবাও তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার তিন জন মা ছিলেন—বড মা, মেজ মা ও ছোট মা—তিনি শেষ বয়সে ইঁহাদের হাতে শুধু অন্ন প্রসাদ পাইতেন। ঈশান সাহার বাড়ীতে তারা দাসী থাকিতেন—মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ বাবা তাঁহার দর্শনে ঐ বাড়ীতে যাইতেন—একদিন একাদশীর দিন তারা কাঁঠাল পাতা কুড়াইয়া ঠাকুরের জন্য দুগ্ধ ফুটাইতে ছিলেন—বাবা এই সময়ে আসিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিলেন এবং বলিলেন—'মা ! কাল তোর এখানে পারণ হবে।' তারা বলিলেন— তোর মা কিন্তু শূলরোগী, আজকে উপবাস যাচ্ছে, কাল সকালে তুই যদি না আসিস্, তবে তোর মা মরবে। দেখিস্ যেন ভুল

না হয়।' তিনি ত 'নিশ্চয় আস্‌ব' বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন ভজনাবেশে কোথায় গিয়াছিলেন, সারাদিন আর খবর নাই—সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে প্রকাণ্ড বড় এক বোঝা কাঠ আনিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া মা মা বলিয়া চিৎকার করিতেছেন—দরজা খুলিয়া দিলে সেই কাঠ বোঝা তাহার গৃহসমীপে রাখিয়া বলিলেন—মা, জানিস্ ত তোর পাগলা ছেলে, ভুলে গিয়া তোর কাছে অপরাধ করেছি, প্রসাদ, এখনই খাইব।' এই বলিয়া শুধু অন্নপ্রসাদই পাইলেন। তারা দাসী বলিতেন—পূর্ব্বে ইঁহাকে তরকারী দিলে ইনি তরকারীর মধ্যে তেজপাতা লঙ্কা প্রভৃতি এবং লেবুর খোসাদি সবই খাইয়া ফেলিতেন—তাঁহার এইভাব দেখিয়া ইঁহারা বাছিয়া প্রসাদ দিতেন। ক্রমে ক্রমে তরকারী ছাড়িয়া মাসের মধ্যে হয়ত দুইদিন একটু দধি-মিশ্রিত অন্ন পাইতেন—শেষকালে তাহাও ত্যাগ করিয়া শুধু অন্ন পাইতেন। তরকারী দিতে গেলে তিনি বলিতেন—'দেখ মা তোর দুষ্ট ছেলে এই সব ভাল ভাল জিনিষ খেলে ইন্দ্রিয় চঞ্চল হবে, আর ভজন করতে পারবে না।'

আহ্নিকের কালে তিনি গঙ্গার রজ প্রায় ৮।১০ সের পরিমাণে নেকড়ার জড়াইয়া মাথায় রাখিয়া ভজন করিতেন। একদিন বড়াল-ঘাটের শ্রীযুক্তা রাধাদাসী মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, আপনার মাথায় ওটী কি?' তদুত্তরে তিনি হাসিয়া বলিলেন—'দেখ মা, তোর পাগলা ছেলে, কখন কোথায় গিয়ে মরে ঠিক নাই, তারই জন্য মাথায় এই নবদ্বীপের গঙ্গার রজ রাখিয়া দিই—যদি অন্য স্থানে দেহ যায়, তবে ত নবদ্বীপে গৌর গঙ্গার রজ পাইব।'

শুনা যায় তিনি নবদ্বীপের প্রতি ঠাকুরবাড়ীতে গভীর নিশীথে কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে কাঠের বোঝা ফেলিয়া আসিতেন যেন তাহা দ্বারা শ্রীশ্রীপ্রভুর ভোগ রন্ধন হয়। তিনি কোনও দিন কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না।

একবার রাণীর ধর্ম্মশালায় বাসকালে ঘরে বসিয়া তিনি অনবরত 'হা কৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন—শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীপাদ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর, শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী প্রভৃতি তাঁহার দর্শনে আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল ঐ এক বুলি 'হা কৃষ্ণচৈতন্য' শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে রসান্তর না করিতে পারিলে ত ইঁহার গলা চিরিয়া রক্ত পড়িবে। তখন তাঁহারা তিন চারি জনে মিলিয়া সমস্বরে 'নরহরির প্রাণ গৌর' ধ্বনি করিতে লাগিলেন—সিদ্ধ বাবা রসান্তরে মনোনিবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—'রঘুনন্দন! রঘুনন্দন!! এত দেরী করিয়া কি আসিতে হয়?' এই বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। আর একবার ঐ ভাবে ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া তের দিন পর্য্যন্ত সমানভাবে 'হা কৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়া অনবরত রোদন, বুকে করাঘাত কেশাকর্ষণ ইত্যাদি করিয়াছিলেন। লোকের গঞ্জনায় উত্যক্ত হইয়া তিনি দিনকয়েক গিরিশ বাবুদের পায়খানায় বাস করিয়া ভজন করিয়াছিলেন—অবশ্য ঐ পায়খানা কেহ ব্যবহার করিত না। সদা সর্ব্বদা ইষ্টলাভের জন্য ইঁহার তীব্র ব্যাকুলতা তীব্র উৎকণ্ঠা ও পিপাসাময় আর্ত্তি, দৈন্য ইত্যাদি দেখিয়া বহুলোকের মনে শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর স্মৃতি জাগিত।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের আকর্ষণে কখনও কখনও তিনি গঙ্গার ওপারে গোদ্রুমদ্বীপে যাইয়াও থাকিতেন। কথিত আছে একবার ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইঁহার নিকটে বেশাশ্রয় নেওয়ার জন্য তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে থাকেন; তখন তিনি তাঁহাকে এড়াইবার ইচ্ছায় বাজারের পার্শ্বস্থিত এক বেশ্যার ঘরের বারান্দায় গিয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তৎপরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার দেখা না পাইয়া চলিয়া গেলে ইনি ওখান হইতে বাহির হইয়া শ্রীরাধা-

রমণ বাগে গিয়া কেবল হাসিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্তা ললিতা দাসী কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তিনি হাসির কারণ বলিলেন—'আজকে কেদার বাবুকে ঠকাইয়া আসিলাম। সেই মাতাদের ঘরে বসিয়াছিলাম, কেদার বাবু লাগ না পাইয়া চলিয়া গেল।'

শীতকালে একবার শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামিপাদ ইঁহাকে একখানা কম্বল দিলেন—রাত্রিকালে কম্বল ব্যবহার করিয়া তাঁহার একটু তন্দ্রাবোধ হইল; পর দিন কম্বলখানা লইয়া গিয়া প্রভুকে বলিলেন—'আপনার কম্বলের সহিত গৌরকিশোর দাসের প্রেম হইল না; ইনি আমাকে ঘুম পাড়াইয়া সারা রাত্রি ভজন করিতে দেন নাই।'

একবার পাঠ শুনিবার ইচ্ছা হইল—গঙ্গার ধারে পাঠের ব্যবস্থা হইল—সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিকটবর্ত্তী মন্দির হইতে হঠাৎ কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া পাঠের ব্যাঘাত করিল—পাঠটা নাকি তখন খুব জমাট বান্ধিয়াছিল—সেই সময় ইষ্টবস্তুর বিরহব্যথায় বিধুর হইয়া ইনি গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিতে মনস্থ করিলে বহু বৈষ্ণব মিলিয়া বহু কাকুতি মিনতি করিয়া ইঁহাকে প্রবোধ দিয়া রাখিলেন। নামস্ফূর্ত্তি না হইলেও কখনও কখনও গঙ্গায় ডুবিতে যাইতেন, গঙ্গায় কণ্ঠমগ্ন জলে নামিয়া নামস্ফুরণ হইলে আবার উঠিয়া আসিতেন। তদীয় সেবক দীনবন্ধু দাসজির সহিত অভিমান করিয়াও সময়ে সময়ে গঙ্গায় মরিতে যাইতেন—তখন আবার শ্রীমোহনবাঁশী দাসজি প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ প্রবোধ দিয়া স্বস্থানে আনয়ন করিতেন।

একবার বড়ালঘাট-নিবাসী প্রকাশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে নোয়াখালী হইতে দুইজন ভক্ত আসিয়াছেন—একজন শ্রীল রজনীকান্ত মজুমদার—মদীয় গুরুভ্রাতা। অন্য জন সিদ্ধ বাবার কৃপার্থী হইয়া আসিয়াছেন—কিন্তু সাহস করিয়া বাবার নিকট কথা পাড়িতেও পারিতেছেন না—একদিন দুইজনে গিয়া দণ্ডবৎ করিয়া বসিলে বাবা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা

করিলেন—তাঁহারা কেন অসময়ে গিয়াছেন—তখন নূতন ভক্তটি নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'তুমি কত নদী ও কত জিলা পার হইয়া আসিয়াছ?' তদুত্তরে হিসাব করিয়া তিনি উত্তর দিলে সিদ্ধ বাবা যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই বলিলেন—'এতগুলি নদী ও জিলা পার হইয়া কি গৌরকিশোর দাসের পুট্‌কি মারিতে আসিয়াছ?' ইহাতে তাহারা অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া আসিলেন। আর একদিন সিদ্ধ বাবা ছাতা হাতে স্নান করিয়া আসিবার কালে প্রকাশ বাবুর প্রেরণায় ভক্তটি তাঁহার চরণ জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—তিনি প্রথমতঃ বহু প্রকারে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন—গালাগালি দিলেন, ছাতা দ্বারা বেশ প্রহার করিলেন—তথাপি যখন ভক্তটি উঠিলেন না, তখন তিনি বলিলেন—'দেখ। এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর শুন, আর ঘরে গিয়া এক বছর পর্য্যন্ত এই মহানাম নির্ব্বন্ধ করিয়া জপ কর, এক বছরের মধ্যে তোর ইষ্টদেব মিলিবে; যদি না মিলে, তবে আমার কাছে আসিস্‌।' এই বলিয়া তাহাকে মহানাম দান করিলেন।

একদিন সিদ্ধ বাবা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া মাধুকরী পাইয়া পাত্রটি মাথায় করিয়া শ্রীবাসাঙ্গন ঘাট দিয়া উপরে আসিতেছিলেন—এমন সময় ফাঁসিতলার ঘাটের দিক্‌ হইতে দুইজন বাবাজি একতারা বাজাইয়া সুমধুর স্বরে হরেকৃষ্ণ নাম গাহিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—'বাবা, আপনার আখড়া কোথায়?' প্রশ্ন শুনিয়াই তিনি ক্রোধবশে মাধুকরীর পাত্রটি উঠাইয়া বলিলেন—'বেটারা, নাম শুনাইতেছিলি, তাহাতে আমি আনন্দে অধীর হইয়া তোদের কি দিব ভাবিতেছিলাম—আমার আখড়া দিয়া তোদের কিরে?'

রাণীর ধর্ম্মশালায় যে পায়খানায় বসিয়া তিনি ভজন করিতেন, তাঁহার অপ্রকটের পরে জনৈক ভক্ত তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া

* বড়ালঘাটের প্রকাশচন্দ্র ঘোষের মুখে শ্রুত ঘটনা।

ভজন করিবার উদ্দেশ্যে চরণ বাহিরে রাখিয়া অঙ্গটি ভিতরে ঢুকাইয়া পড়িয়া রহিলেন। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে পায়খানার ইট-পাটকেলগুলিও যেন হরিনাম করিতেছে। বাবাজি মহারাজের হরি-নামপ্রভাবে জড় বস্তুতেও চৈতন্য সঞ্চারিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

আগরতলানিবাসী তদীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় শ্রীগুরুপ্রণালী জানিবার জন্য প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন—'শ্রীভগবানের অনন্ত রূপ, তাহা কল্পনায় জানা যায় না। শ্রীহরিনাম করিতে করিতে নামের অক্ষরগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে এবং আত্মস্বরূপও উপলব্ধি হইবে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় সেবাদিও জাগিয়া উঠিবে। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।' এই হরেন বাবু (উকিল অশ্বিনী ভট্টাচার্য্য ও অন্য একজন) নৌকামধ্যে গঙ্গাজলে বাস করিয়া কয়েকদিন যাবৎ ইঁহার নিকট দীক্ষা সম্বন্ধে নিবেদন করিলেও তিনি প্রথমতঃ উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে উহাতে গোস্বামিদেরই অধিকার—পরে তাঁহারা জেদ করিলে তিনি বলিলেন—'শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন এবং আমিও প্রভুর নিকট অনুরোধ করিব।' হঠাৎ একদিন শ্রীদীনবন্ধু দাসজিকে পাঠাইয়া তিনি ইহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন—'গতকল্য প্রভু আমাকে আদেশ করিয়াছেন—আপনাদিগকে কৃপা করিবার জন্য।' কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন—'শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাদিগকে এই দেবদুর্লভ মন্ত্র প্রদান করিলেন—উহাতে আমার কিছু নাই, সবই তিনি মালিক।' নিম্নলিখিত চিঠি দুইখানাতে স্পষ্টতঃই প্রতীতি করাইবে যে তিনি শিষ্যদের সহিতও গুরু-শিষ্যসম্পর্ক রাখিতেন না। শ্রীনামই একমাত্র আশ্রয়—ইহা তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন। লীলাস্মরণ ইত্যাদি নিষেধ করিতেন। নামাক্ষর-স্মরণ দ্বারা সমস্ত লীলা স্ফূর্ত্তি

হয় এবং নামাক্ষরের ভিতর দিয়া ভগবৎস্বরূপ ও জীবের সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। অর্চ্চনাদির প্রতি বিশেষ জোর দিতেন না।

ত্রিপুরা জেলার নবী-নগরনিবাসী সুকণ্ঠ গায়ক কাশীবাবু প্রত্যহ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে শেষ বেলায় তাঁহার দর্শনে আসিতেন। একদিন তিনি আসিলেই বাবা বলিলেন—'বাবু মহারাজ! আপনি শীঘ্রই মহাপ্রভুর বাড়ীতে চলিয়া যান। প্রাণের প্রভু আপনার কীর্ত্তন শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।' পরে দেখা গেল যে মহাপ্রভুর বাড়ীতে সত্যই সকলে কাশী বাবুর অপেক্ষায় ছিলেন।

কীর্ত্তনের কোন সুর দিয়া সময় নষ্ট করা তাঁহার আদৌ পছন্দ ছিল না। কোনও আলু-পটলের গল্প উপস্থিত হইলে উচ্চস্বরে হরিনাম করিতে বলিতেন। দুর্লভ মানবজীবন যাহাতে হেলায় খেলায় নষ্ট না হয়—তদ্বিষয়ে সকলকে হিতোপদেশ করিতেন।

যেখানে সেখানে খাওয়া ভজনের বিঘ্নকারী একথা তিনি বলিতেন। একবার হরেন বাবুরা ভজনকুটীরে প্রসাদ পাইয়াছিলেন—তাহাতে তিনি তিন দিন তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, চতুর্থ দিবসে বলিলেন—"ভজনকুটীরে যে উৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তাহা একটী কুলটা রমণীর দেয় বস্তু। বাবাজিগণ সমর্থ বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারেন—আপনারা গৃহী, তাহাতে ভজনের বিঘ্ন হইবে বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলাম।"

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার সেনকে লিখিত **সিদ্ধ বাবার পত্র**—

শ্রীরাধামদনগোপাল জয়তি

নবদ্বীপ—রাণীর ঘাট,
১৩১৮।১৬ই চৈত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবক আপনারা। আপনাদের সেবক আমি। আমার নাম আপনারা রাখিয়াছেন শ্রীগৌরকিশোর দাস। আপনাদের রাখা নামে যেন কোন কলঙ্ক হয় না; যদি কলঙ্ক হয়, তবে শ্রীগৌরমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলে বড়ই লজ্জা পাইবেন। আপনাদিগকে মহাপ্রভু যাহা দিয়াছেন, ঐ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নামের অক্ষর গুলা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামের অক্ষর গুলা, ১৬ নাম ৩২ অক্ষর আর যেই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আপনাদিগকে দিয়াছেন, ঐ নামমন্ত্রের অক্ষর গুলা বড় বড় করিয়া একখানা কাগজে লিখিয়া ঐ নামমন্ত্রের অক্ষরের দিকে নয়ন দিয়া নিরন্তর নাম ও মন্ত্র জপ করিবেন। মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কোন দিকে নয়ন না যায়। নামমন্ত্রের অক্ষর গুলার এত শক্তি আছে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের সহিত দর্শন পাইবেন ও সেবা পাইবেন; শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস-দাসীর সহিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন পাইবেন ও সেবা পাইবেন। চাকরি যদি না ছাড়িতে পারেন, তবে চাকরীর দ্বারায় যে কিছু টাকা পয়সা, ঐ টাকা দিয়া যাঁহারা হরিনাম করিতেছেন, তাঁহা দিগকে দিয়া হরিনাম করাইবেন। আপনি ছোট একখানা কালা কাপড় পরিয়া অচিনা লোকের ঘরে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ভিক্ষায় যে চাউল পাইবেন ঐ চাউল ৺ঠাকুরদের ভোগ দিয়া ঐ প্রসাদ পাইবেন। প্রথম ভোগ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে দিবেন।

ঐ ভোগ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দকে অর্পণ করিবেন এবং আপনার গুরুদেবকেও ঐ প্রসাদ অর্পণ করিবেন। তারপর ঐ প্রসাদ আপনি পাইবেন। আর শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দিবেন এবং কৃষ্ণের প্রসাদ রাধিকাকে দিবেন। রাধিকার প্রসাদ সখী মঞ্জরীদিগকে দিবেন, তারপর আপনার গুরুরূপা মঞ্জরীকে দিবেন। যখন যাহা ভোগ দিবেন, ঐ দ্রব্য দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে দিবেন, এক ভাগ শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন। ভোগের মন্ত্রবিধি আপনি যখন নবদ্বীপে আসিবেন, তখন সাক্ষাতে মুখে বলিয়া দিব। ভোগের নিয়মাদি সব বলিব। আপনি যদি গৃহী লোকের সঙ্গ করিবেন, তবে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গ করিবেন। আর যদি বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবেন, তবে ৮ জন গোস্বামীর সঙ্গ করিবেন। জয় রূপ-সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস গোস্বামী। এই ৮ জন গোস্বামী কেমন করিয়া সাধনভক্তি করিয়াছেন, ঐ দিকে দৃষ্টি করিয়া সাধনভক্তি করিবেন। বিষয়ের মধ্যে কোন সাধনভক্তির উন্নতি হইতে পারে না। যদি কখনও শ্রীধাম নবদ্বীপ আসিতে পারেন, তবে সাধনভক্তির সকল কথা বলিয়া দিব ও ভোগের নিয়ম সকল বলিব। আমার এখানে পত্র লিখিবার লোক নাই, আমি পতিত অন্ধ, আমি লিখিতে পারি না। আপনাদের আগরতলার মহারাজ তিনি প্রেমভক্তির মহারাজ, আপনারা যত আছেন আগরতলার, আপনারা সকলি প্রেমভক্তির মহারাজ, আমাকে প্রেমভক্তি দিয়া নবদ্বীপ বাস করাইবেন। বিষয়ের বাসনা কাহারও ত্যাগ হয় না। ৺মহাদেবের পদ পর্য্যন্ত বিষয় বাসনা ত্যাগ হয় না, যখন মহাদেব সোনার কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া বিল্ব-মূলে যাইয়া বসিলেন এবং শ্মশানে যাইয়া বসিলেন, তখনই আনন্দ পাইলেন। যত দিন বিষয়ের মধ্যে থাকিবেন, তত দিন বড় দুঃখ

পাইবেন। নাম ও মন্ত্র মালায় জপ করিবেন। যাহা কিছু আমি লিখিলাম তাহা আমার হৃদয়ে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আপনাকে বলিলেন ও বলিয়াছেন। আপনি মায়া-ব্রহ্মাণ্ডের সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে দেহ অর্পণ করিয়া মালাতে নিরন্তর নামমন্ত্র জপ করিবেন। তাহা হইলে মায়ায় ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-মৃত্যু দুঃখ আর পাইবেন না। এই জন্যই মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের দেহ মায়া-ব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রেমভক্তি সঙ্গে নিয়া এই জন্মেই পারিষদ দেহে যাইতে পারিবেন। আগরতলাবাসীর সেবক আমি পতিত অন্ধ শ্রীগৌরকিশোর দাস আপনারা প্রেমভক্তি দিয়া পালন করিবেন।

(২)

প্রাণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রাণ রাধাকৃষ্ণ-সেবক—

আপনি প্রেমভক্তির মহারাজ, আমার জন্য এক টাকা পাঠাইয়াছেন, আমি পাইলাম ; শক্তিসঞ্চার করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিবেন আপনার ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া যাহাতে শ্রীধাম নবদ্বীপ-বাস করিতে, হরিনাম করিতে পারি ; মহাপ্রভুর নিকটে রাধা-কৃষ্ণের নিকটে এই প্রার্থনা করিবেন।

এই বৎসরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে বড় বড় সকল পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে বড় বড় সকল পণ্ডিত গানের সময় আসিবেন, তাঁহারা অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিবেন। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি—১০ই মাঘ সন ১৩২০। পত্র লিখিবার ঠিকানা শ্রীধামনবদ্বীপ ধর্ম্মশালার উত্তর দিকে বদ্ধ গঙ্গার ধারে পতিত অন্ধ গৌরকিশোর দাস ছইএর মধ্যে থাকেন।

পুনশ্চ :—

পিতার ধন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা, রাধাকৃষ্ণের দাস-দাসীর সহিতে রাধাকৃষ্ণের সেবা। এই মায়া-ব্রহ্মাণ্ডের যত সামগ্রী দেখিতেছেন, সকলই কৃষ্ণের মায়া—সেই কৃষ্ণের মায়া দিয়া যাহাতে পিতার ধন লাভ করিতে পারেন সেই চেষ্টা করিবেন, মহাপ্রভুর চরণে এই প্রার্থনা করিবেন, রাধাকৃষ্ণের চরণে এই প্রার্থনা করিবেন। যাবার সময় মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কোন সামগ্রী সঙ্গে যাইবে না, কেবল পিতার ধনই সঙ্গে যাইবে। মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের যত সামগ্রী সব মায়ার ব্রহ্মাণ্ডেই পড়িয়া থাকিবে, হরিনাম প্রেমসেবা সঙ্গে যাইবে।

আপনি যেকালে রসুই করিতে চাল লয়ে যাইবেন, আপনাদের ঐ রাজধানীতে যাঁহারা রসুই করিতে চাল লইয়া যাইবেন, আপনারা একমুষ্টি করিয়া ভিক্ষা আমার জন্য পৃথক্ একটা হাঁড়িতে রাখিবেন। ঐ চাল মুষ্টি হাতে করিয়া প্রাণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রাণ রাধাকৃষ্ণ, প্রাণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে এই নাম করিয়া ঐ চালমুষ্টি আমার ভিক্ষার হাঁড়িতে রাখিবেন। ১৫ দিবস হইয়া গেলে ঐ চাল দ্বাদশীর দিন লোকের দ্বারা আদায় করিয়া আনিয়া কৃষ্ণের ভোগ দিয়া মহাপ্রসাদ পাইবেন।

একাদশী-ব্রত যদি নির্জ্জলা করিতে পারেন, এই জন্মেই পারিষদ দেহে যাইতে পারিবেন, নচেৎ দধি, দুগ্ধ ভোজন করিবেন। ঐ চালের মূল্য আমার জন্য পাঠাইয়া দিবেন।

এক্ষণে যিনি রাজা হয়েছেন তানার নাম কি আমি জানি না, তিনি প্রেমভক্তি রাধাকৃষ্ণ মহারাজার পুত্র, তাঁহাকে আমি এক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া ডাকিব। তানার যে-সব ঠাকরুণ আছেন, সেই ঠাকরুণদিগকে আমি প্রেমময়ী রাধারাণী বলিয়া ডাকিব।

ঐ যে রকম করিয়া ভিক্ষা আপনার নিকট লিখিলাম, ঐ রকম

করে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ভাণ্ডার হতে একমুষ্টি করিয়া চাল লয়ে আমার ভিক্ষার হাঁড়িতে রাখিবেন। প্রেমময়ী রাধারাণীরাও একমুষ্টি করিয় হাতে করিয়া ঐ নাম করিয়া আমার ভিক্ষার হাঁড়িতে রাখিবেন। তিনিও ঐ চাল দ্বাদশীর দিন ঠাকুরের ভোগ দিয়া মহাপ্রসাদ পাইবেন। তৃণ হইতে নীচ হইয়া হরিনাম করিবেন। হরিনামের নিকট মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই চাহিবেন না। কেবল হরিনাম প্রেমসেবাই চাহিবেন। মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের যা' চাহিবেন, তাহাতেই মায়ার বন্ধনে পড়ে যাবেন। ইহা রাজধানীতে যত লোক আছেন সকলের শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। ইতি—

১৩২২ বঙ্গাব্দে ৩০শে কার্ত্তিক উত্থানৈকাদশীর দিন ইনি শ্রীনবদ্বীপ ধামে রজঃলাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরকিশোর শিরোমণি মহাশয়

(কাটোয়া, বৃন্দাবন)

কাটোয়া মহকুমার অধীন কুতুগ্রাম থানার অন্তর্গত দেবী ফুল্লরার পীঠস্থানের নিকটবর্ত্তী গুড়পাড়াগ্রামে * আনুমানিক ১২২০-২৫ সালের মধ্যে শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিদ্যানিধির পৌত্ররূপে শ্রীগৌর শিরোমণি মহাশয়ের জন্ম হয়। বিদ্যানিধি ফুলিয়ার মুখুটী নৈকষ্য কুলীন। ইঁহার তিন পুত্র—রামকৃষ্ণ (তপস্বী ঠাকুর), ধনকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ। ধনকৃষ্ণের ছয় পুত্র ও এক কন্যা—গৌরচন্দ্র (শিরোমণি), ঈশ্বর, নবদ্বীপ, হরিশ্চন্দ্র (চূড়ামণি), গিরিশ ও উমেশ এবং পারিজাত দেবী। ইনি প্রায় বিংশবর্ষযাবৎ বিশেষ লেখাপড়া শিখেন নাই; যাত্রা,

* শ্রীশিরোমণি মহাশয়ের ভাগিনীর পুত্র শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় বলেন যে ঐ গ্রামের নাম—**চিন্তাহাটী।**

কবির পালা ইত্যাদি শুনিয়া আনন্দ করিতেন। তাঁহার গ্রামবাসী একদিন তাঁহার ঈদৃশ ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—গৌর! তুমি বিদ্যানিধির কুলে কালি দিলে?' এই কথা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়া সেইক্ষণ হইতে সকল কু অভ্যাস ত্যাগ করত লেখাপড়ায় মনোযোগী হইলেন। প্রথমতঃ তৈপুরে কোনও পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন, পরে কাটোয়ায় এয়োপুর-নিবাসী পঞ্চানন তর্করত্নের টোলে পড়েন। তৎপরে কাটোয়ায় গৌরাঙ্গপাড়ার সখীচরণ দাস পণ্ডিত বাবাজির নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলায় গুস্‌করা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ওরগ্রামে চট্টোপাধ্যায়-বংশে ইঁহার বিবাহ হয়। স্ত্রীর নাম—রামদাসী। রামদাসীর দেড় বৎসর কালে পিতৃবিয়োগ হয়—তাঁহার মাতা সহমরণে যাইবার সংকল্প জানাইলে আত্মীয়-স্বজন প্রথমতঃ নিষেধমুখে বলিয়াছিলেন যে খুব কষ্ট হইবে। রামদাসীর মাতা কিন্তু নিজের একটি অঙ্গুলি ঘৃতে ডুবাইয়া জ্বলন্ত প্রদীপে দগ্ধ করত দেখাইলেন যে তাহাতে তাঁহার কোনই কষ্ট হয় নাই। তিনি তখন পতির জ্বলন্ত চিতা সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া সহাস্যমুখে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন—অদ্যাবধি সেই স্থানকে 'সতীডাঙ্গা' বলে। রামদাসীর মা চিতারোহণের কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মেয়েটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে চিতাহাটী-নিবাসী ধনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র গৌরচন্দ্রের সঙ্গে যেন বিবাহ দেওয়া হয়। সতীর বাক্যানুসারে গৌরচন্দ্রের সহিত রামদাসীর বিবাহ হইয়াছিল। রামদাসী পতিব্রতা ও আদর্শ রমণী ছিলেন। স্বামীর ভজন-সাধনে তিনি সহায়তা করিতেন। ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে রাসবল্লভ ভক্তিভূষণ ও বৈষ্ণবচরণ ভাগবতভূষণই প্রসিদ্ধ।

তিনি শাক্ত-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের মহাসারবত্তা বিচার করত নদীয়া জেলায় ফরিদপুর গ্রামে শ্রীল বিনোদী-

লাল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা লাভ করেন। তদবধি তাঁহার গৃহে বৈষ্ণবসেবা হইত এবং বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-গ্রহণে তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ছিল। ইহা সামাজিক বিরুদ্ধ বলিয়া তদানীন্তন ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাকে ভয় দেখাইলেও তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া প্রকাশ্যভাবেই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাইতেন। বৈষ্ণবাধরামৃতে তাঁহার পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না। বৈষ্ণবাধরামৃত সংগ্রহ করিয়া কিছু গৃহে রাখিতেন এবং প্রতিদিন অন্নপ্রসাদাদি পাইবার পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁহার বৈষ্ণবসেবার এইরূপ নিয়ম ছিল। তাঁহার পত্নীও পরমা ভক্তিমতী ছিলেন—বৈষ্ণবসেবা ও তদুচ্ছিষ্টে তাঁহারও নিষ্ঠা ছিল। শিরোমণি মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা ছিল—তিনি স্বর্ণকারকে পয়সা দিবেন না—এইজন্য রামদাসীর হাতে দুগাছি শাঁখা ব্যতীত আর কোন অলঙ্কার ছিল না। নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণ বাড়ীতে আসিলেই রামদাসী তাঁহাদের চরণ ধৌত করিতেন—নূতন বৈষ্ণবগণ পরিচয় না জানিয়া তাঁহাকে পরিচারিকা-বোধে উপেক্ষা না করিলেও অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকারই করিতেন না। ভোজনের সময় আবার তিনিই পরিবেশন করিতেছেন দেখিয়া নবীন বৈষ্ণবগণ যথার্থ পরিচয় পাইতেন।

একবার ইনি বহু ছাত্র সঙ্গে কাটোয়ায় গঙ্গাস্নানে আসিয়া ঘটনাচক্রে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাট্যমন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অপরাহ্ণকালে শ্রীল গোপীবল্লভ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার নিত্যকৃত্য ভজনাদি শেষ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন—এত বেলায় আহ্নিক শেষ হইল জানিয়া শিরোমণি মহাশয় অবাক্ হইয়া দেখিলেন যে ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন শেষ করত আটটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ, তুলসী-পরিক্রমা ও মন্দির-পরিক্রমাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতেছেন—সর্ব্বকার্য্য সমাধান্তে তিনি শিরোমণি মহাশয়কে ব্রাহ্মণবোধে প্রণাম করিয়া পরস্পর

আলাপে আপ্যায়িত হইলেন। শ্রীগোপীবল্লভ ঠাকুর মহাশয় প্রত্যহ অপরাহ্নকালে প্রসাদ পাইতেন। পরে নাট্যমন্দিরে শ্রীল বেণীমাধব ঠাকুর ও শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি মালিকাহস্তে নাম জপ করিতে করিতে আসিলেন এবং রাত্রিতে ইষ্টগোষ্ঠী, নামকীর্ত্তনাদি দেখিয়া শুনিয়া গৌরচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া গেলেন। ভক্তি-সম্বন্ধে যদিও তৎকালে তাঁহার বিবিধ মতদ্বৈত ছিল, তাহা কিন্তু ঠাকুর মহাশয়গণের সঙ্গপ্রভাবে একদিনেই অস্তগত হইল। গৃহে ফিরিয়া তিনি ছাত্রগণের সাহায্যে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলির অন্বেষণ করত সংগ্রহ করিয়া রীতিমত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন—এই গ্রন্থরাজির ভাব-ভাষায়, পাণ্ডিত্যে, অলঙ্কারে এবং মধুর ছন্দোবিন্যাসে তিনি সর্ব্বত্র মধুময় দেখিতে লাগিলেন এবং পুনরায় ঠাকুর মহাশয়গণের বিশেষ সঙ্গলাভের আশায় কাটোয়ায় গ্রন্থপত্রাদি ও ছাত্রগণকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য ভক্তির বাজার দেখিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে তিনি মাতিয়া গেলেন। এখন হইতে ইনি অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি ত্যাগ করত শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুযায়ী গ্রন্থাবলীর চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন।

কাটোয়ায় অবস্থানকালে ইনি অরুণোদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া প্রভাতী স্মরণ কীর্ত্তন ও গঙ্গাস্নান করিয়া সংখ্যানাম জপ, মন্ত্রস্মরণ, লীলাচিন্তন ইত্যাদিতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। তৎপরে তিনি বৈষ্ণবদিগের মূত্রত্যাগস্থান পরিষ্কার করত গঙ্গাস্নানের পথ ঝাঁট দিতেন। তৎপরে গঙ্গাস্নান, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন, পরিক্রমাদি করত সমাগত বৈষ্ণবগণ ও গোস্বামীগণকে দণ্ডবৎ করিতেন এবং উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত হইতে এক কণিকা বৈষ্ণবাধরামৃত তুলিয়া খাইতেন। তৎপরে চারি মুষ্টি আতপ চাউল ও দুই একটী সিদ্ধ মাত্র একটু সৈন্ধব লবণ-যোগে তৈল বা ঘৃতের সম্বন্ধশূণ্য করিয়া শ্রীগিরি-

ধারীর ভোগ দিয়া সেই প্রসাদই পাইতেন। কেহ কিছু বলিলে তিনি বলিতেন—'আমার ইহা ছাড়া কিছুই সহ্য হয় না।' উচ্ছিষ্ট-গর্ত্ত হইতে সংগৃহীত কণিকা লইয়াই তিনি সেবায়েত গোস্বামিগণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। তাঁহার জনৈক বয়স্য 'খেপা ঠাকুর' লেখা পড়া না জানিলেও শিরোমণি মহাশয়ের প্রিয় ছিলেন। তিনি সরল ও বিদূষক ছিলেন. শিরোমণির পত্রবাহক দূতের কার্য্য করিতেন—তাঁহাকে সময় সময় অভিভাবকরূপে ভৎর্সনাও করিতেন—সকলকে বলিতেন—'শিরোমণি আমারই ছাত্র।' খেপা ঠাকুর বসিয়া থাকিলে শিরোমণি মহাশয় হাসিতে হাসিতে ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিতেন। সটীক অষ্টাদশসাহস্রী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল—বিদ্যাদানকালে কখনও তিনি পুঁথি খুলিতেন না। প্রতিদিনই যে কোনও বিষয় বর্ণনা করিয়া অন্তে শ্রীগৌরাঙ্গে পর্যবসান ও সমন্বয় দেখাইয়া পাঠপূর্ণ করিতেন।

এই সময় একবার শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে বহু ব্রজবাসী বৈষ্ণব আসিয়াছেন ; সেইদিনকার সেবার পালা ছিল—শ্রীবেণীমাধব ঠাকুরের। তিনি বৈষ্ণবসেবার অনুরোধে মহানন্দে গৃহের যাবতীয় তৈজসপত্রাদি পূর্ব্বেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এদিন বৈষ্ণব-সমাগম দেখিয়া গৃহিণীকে ভালভাবে ভোগরাগের ব্যবস্থা করিতে বলিলে তিনি উত্তর করিলেন যে গৃহে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তখন ঠাকুর মহাশয় দরজা ও জানালার কবাট খুলিয়া মাথায় বহিয়া দোকানে বিক্রয় করিতে যাইতেছেন—শিরোমণি মহাশয় তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবসেবায় প্রীতি দেখিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। বৈষ্ণবগণের সন্তর্পণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বৈষ্ণবসেবাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

কাটোয়াতে শ্রীশিরোমণি মহাশয়দের বড় প্রসিদ্ধ গোষ্ঠী ছিল। ঢাকা উথলিনিবাসী শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামিপ্রভু

গৃহত্যাগপূর্ব্বক উদাসীন বেশে বাহির হইয়া কাটোয়ায় আসেন। তাঁহার অনুসন্ধানক্রমে তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'জগদ্বন্ধু' প্রভুও গৃহত্যাগ পূর্ব্বক কাটোয়ায় আসিয়া অনুজের সহিত মিলিত হন এবং দুই ভাই শ্রীকিশোর দাস বাবাজির নিকট বেশাশ্রয় করিয়া কাটোয়ায় ভজন করিতেন। শ্রীবেণীমাধব ঠাকুর মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা ছিলেন—ইঁহারা সকলে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। বড় প্রভুর অনুরোধে শিরোমণি মহাশয় একবার প্রত্যহ তিন ঘণ্টা পাঠ করিয়া পঁয়ত্রিশ দিনে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের শ্রীগৌরপক্ষে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া বড় প্রভু বলিলেন—'ছয় গোঁসাইর পূর্ণ কৃপা পাইয়াছ—ধন্য হইলাম।'

এক সময়ে বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী বাত্তোগ্রামে বাড়ুয্যেদের বাড়ীতে ইনি সদলবলে একমাসের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন —গ্রামে পৌঁছিতে বেলা দুইটা বাজে, উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে সে গ্রামে বিষ্ণুমন্দির বা শালগ্রামসেবা নাই। তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণ জমিদারকে ডাকাইয়া বলিলেন 'যে গ্রামে বিষ্ণুর অর্চ্চনা নাই, সে গ্রামে তিনি জলগ্রহণও করিবেন না।' অভুক্ত অবস্থায় বহু বৈষ্ণব গ্রাম ত্যাগ করিলে গ্রামের অমঙ্গল ভাবিয়া সকলেই শিরোমণি মহাশয়কে নানাপ্রকারে বুঝাইলেও তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা এক পত্র ও অশ্বারোহী লোক পাঠাইয়া দশমাইল দূরবর্ত্তী জনৈক জ্ঞাতিগৃহ হইতে জমিদার শালগ্রাম আনাইয়া সেবা করাইলে তখন তিনি সেই গ্রামে অবস্থান করত বিষ্ণুপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কোন সময়ে শিরোমণি মহাশয়ের বৈষ্ণবতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার কাগ্রামের তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের নিমন্ত্রণ দিয়া শিরোমণি মহাশয়কে ঐ গ্রামে লইয়া যান। কয়েকদিন ভাগবত পাঠের পরে দুর্বৃত্তগণ বিষ্ণুমন্দিরের নিকটবর্ত্তী তদীয়

ভাগবতপাঠের স্থানে কালীপূজা করিয়া পশুবলি দেওয়ার আয়োজন করিল। শিরোমণি মহাশয় গভীর রাত্রে এই সংবাদ পাইয়া বিব্রত হইয়া শ্রীগৌরগোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন। দেবীর পূজান্তে পশু-বলি দিতে গিয়া উহারা যতবার চেষ্টা করিল, প্রত্যেক বারেই পশুকে দুইবার আঘাত করিতে হইল। ইহাতে উহারা ভীত হইয়া দেবীর শরণ নিলে দেবী স্বপ্নাদেশে পূজারিকে জানাইলেন 'তোমরা বিষ্ণু-ভক্তের অপমান করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের সর্ব্বনাশ করিব।' স্বপ্নাদেশ শুনিয়া তখন ঐ দুর্বৃত্তগণ শিরোমণি মহাশয়ের চরণে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন—'আগে গঙ্গাস্নান করিয়া এস, হরিনাম কর, তবে তোমাদের ক্ষমা, নচেৎ নয়। তৎক্ষণাৎ সকলে গঙ্গাস্নান করত হরিনাম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইলেন।

এই সময়ে এতদ্দেশে স্বস্বমর্যাদা লইয়া গোস্বামিগণ ও বৈষ্ণবগণে মতদ্বৈত হইয়া বহুদিন বাদবিবাদ চলিতেছিল।' পরে সাব্যস্ত হইল যে শিরোমণি মহাশয় মীমাংসা করিলে উভয় পক্ষই মানিয়া চলিবেন। শিরোমণি মহাশয় আদ্যোপান্ত ঘটনা জানিয়া বলিলেন—"আমি আপনাদের পুত্র; পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতার কলহস্থানে উপস্থিত হওয়া সমীচীন নহে। তাৎপর্য্য এই যে দাম্পত্যপ্রণয়ে মধ্যে মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ আসিয়া উহাকে গাঢ়তর করে।" এই কথা শুনিয়া সকলের চিত্তে সম্বন্ধ জাগিলে উভয় পক্ষই প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিয়া বিবাদ মিটাইয়া লইলেন।

শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত সদ্গুরুসঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত আছে —"শিরোমণি মহাশয় দেশে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন—ছয় দর্শনে, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। একদিন দেশে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শুনতে যান। বহু গণ্য-মান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠক ব্রাহ্মণ

শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠের পূর্ব্বে শ্রীগৌরবন্দনা পড়িতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম আছে, কিন্তু শিরোমণি মহাশয় উহা শুনেই আগুন হয়ে উঠলেন। পাঠক ব্রাহ্মণকে ডেকে বল্লেন—'একি মহাশয়—একি ভাগবত পাঠ হচ্ছে? আপনি ভাগবত পাঠ করতে বসেছেন, সম্মুখে ভাগবত খোলা রয়েছে, ওদিকে দৃষ্টি করে আপনি গৌরচন্দ্রিকা পাঠ করছেন কেন? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে বসে, সম্মুখে শালগ্রাম রেখে, ভাগবত পড়বেন বলে এ সব মিথ্যা বচনের আবৃত্তি?' ভক্ত ব্রাহ্মণ করযোড়ে বললেন—'প্রভো! ভাগবতই আমি পাঠ করছি। এই সকল ভাগবতে আছে, আমি অসত্য বাক্য উচ্চারণ করি নাই।' শিরোমণি মহাশয় তখন আসন হতে লাফায়ে উঠিলেন—পাঠকের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—'মশায়! অনর্পিতচরীং ভাগবতের কোথায় আছে? একবার দেখান দেখি।' ব্রাহ্মণ অমনি প্রতি দুই লাইনের ভিতরের ফাঁক দেখায়ে বললেন—'এই সাদা স্থানে দৃষ্টি করে দেখুন।' শিরোমণি বললেন—'কোথায়? এতো সাদা স্থান দেখাচ্ছেন।' ব্রাহ্মণ বললেন—'আপনার দৃষ্টি শক্তি নাই, কি প্রকারে দেখবেন? চোখ দুটি একটু পরিষ্কার করে নিন, পরে দেখতে পাবেন।' শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন—'শালগ্রাম সম্মুখে রেখে, ভাগবত স্পর্শ করে এতগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যে আপনি অনায়াসে মিথ্যা কথা বলছেন?' ব্রাহ্মণ তখন খুব তেজের সহিত বললেন—'আপনি চুপ করুন। এই ব্রাহ্মণ-সভায় শালগ্রাম সাক্ষী করে, ভাগবত স্পর্শ করে আমি যথার্থই বলছি—ভাগবতের প্রতি দুই লাইনের মধ্যে গৌরবন্দনা লেখা রয়েছে, আমি দেখ্তে পাচ্ছি। আপনি সিদ্ধ কোনও মহাত্মার নিকট গিয়ে দীক্ষা নিয়ে আসুন, পরে আমি যে সব নিয়ম বলে দেব, ঠিক সেইমত এক সপ্তাহ কাল চলুন, অষ্টম দিবসে এখানে আসবেন, তখন ভাগবতের ফাঁকে ফাঁকে গৌরচন্দ্রিকা যদি পরিষ্কার

দেখাতে না পারি, আমার জিব্ কেটে দেব, সকলের সমক্ষে আমি এই শপথ করছি।' শিরোমণি মহাশয় মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন—তখনই তিনি গিয়ে সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজির নিকটে দীক্ষা নিলেন, পরে পাঠক ঠাকুরের কাছে এসে তাঁহার নিয়ম-প্রণালী গ্রহণ করলেন। সাত দিন ঠিক সেই মত চলে ব্রাহ্মণের নিকট পুনরায় এসে বললেন—'মশায়। এখন আপনার সেই গৌরবন্দনাগুলি ভাগবতে দেখাবেন ত?' পাঠক মহাশয় অমনি ভাগবত খুলে বললেন—'আচ্ছা, এবারে এসে দৃষ্টি করুন।' তখন গৌর শিরোমণি মহাশয় ভাগবতের শ্লোকের প্রত্যেক দু'লাইনের ভিতরে দৃষ্টি করা মাত্র দেখ্তে পেলেন—উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে গৌরবন্দনা পরিষ্কার লেখা রয়েছে। তখন তিনি মাটীতে পড়ে গড়াতে লাগলেন—কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়লেন। অমনি সমস্ত ছেড়ে শ্রীবৃন্দাবনে পদব্রজে যাত্রা করলেন। সেই থেকে ইনি এখানে আছেন—এ অবস্থার লোক শ্রীবৃন্দাবনে আর নাই। ইনিই যথার্থ বৈষ্ণব।"

শ্রীশিরোমণি মহাশয় যখন সপরিবারে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন (অবশ্য পূর্ব্বেও যাতায়াত ছিল), তখন পাবনার দোগাছি-গ্রামের জনৈক ভক্ত তদীয় কেশীঘাটস্থ এক বাড়ীতে তৎ-সেবিত শ্রীগিরিরাজের সেবা করিয়া বাস করিতে ইঁহাকে অনুরোধ করিলেন। শিরোমণি মহাশয় যাহাতে ঐ গিরিরাজের প্রসাদ পান—তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিয়া ঐ ভক্তটি তাঁহার প্রতিশ্রুতি লন এবং সেবা নির্ব্বাহের জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করেন।

কাটোয়ায় অবস্থানকালে ইনি কথকতা করিলেও শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কথকতা করেন নাই—ব্রজবাসী বৈষ্ণবদিগকে ইনি অপরাহ্ন-কালে শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইতেন। একদিন চতুর্থস্কন্ধ দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গ পড়াইতে থাকিলে ছাত্ররা প্রশ্ন করিল—'সতীর দেহ ভস্মীভূত হইলেও

সেই দেহ লইয়া মহাদেব কি প্রকারে নৃত্য করিয়াছেন?' শিরোমণি মহাশয় কিভাবে উত্তর দিবেন—চিন্তা করিতেছিলেন। কথিত আছে এমন সময় পার্শ্বে উপবিষ্ট জনৈক বৈষ্ণব [ইনি প্রত্যহ পার্শ্বে বসিয়া পাঠ শুনিতেন এবং শেষ হইলে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেন—কেহই তাঁহার পরিচয় জানেন না] ছাত্রদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'আপনারা তাহা দেখিতে চান না শুনিতে চান?' ছাত্ররা বলিল—'দেখতে পেলে কে শুন্‌তে চায়?' 'তবে, দেখুন' বলিয়া সেই বৈষ্ণবটি উত্তর দিকে মুখ ফিরাইয়া যোগাসনে বসিয়া 'জয় গৌরাঙ্গ' বলিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে যোগাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার দেহকে ভস্মীভূত করিল। শিরোমণি মহাশয় 'হা কি সর্ব্বনাশ হইল?' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ছাত্ররা যমুনার জল ঢালিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইলেন। শিরোমণি মহাশয়ও সেইদিন হইতে শ্রীভাগবতের অধ্যাপনা ত্যাগ করত কঠোর ভজনে ব্রতী হইলেন।

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে বহু খ্যাতনামা মহাত্মা বাস করিতেছিলেন। শৃঙ্গারবটে শ্রীল ব্রহ্মানন্দ গোস্বামিপাদ, শ্রীল নৃসিংহানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত-বংশ্য শ্রীল নীলমণি গোস্বামিপাদ, শ্রীল হরচন্দ্র গোস্বামিপাদ, রাজসাহী তালন্দের জমিদার শ্রীযুক্ত হারাধন মৈত্র, পাবনা তাড়াসের জমিদার গঙ্গাপ্রসাদ রায় (সপরিবারে), শ্রীমদনমোহন-মন্দিরের কামদার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া হাজরা মহাশয়, প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীগৌরদাস ও ৺প্রাণবন্ধু নন্দী প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন—ইঁহারা সকলেই শিরোমণি মহাশয়কে বিশেষ সম্মান করিতেন। একবার শ্রীল ব্রহ্মানন্দ প্রভু তাঁহার গোবিন্দঘাটের বাড়ীতে প্রসাদ পাইবার জন্য শিরোমণি মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুপাদ

উত্তম আসন দিয়া চাঁদির বাসনে অন্নাদি বিবিধ উপকরণসহ তাঁহাকে প্রসাদ পাইতে দিলেন। শিরোমণি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া তথায় বসিলেন না, পাতা ও দোনাতে প্রসাদ দিতে অনুরোধ করিয়া শ্রীপ্রভুপাদকেই উত্তম আসনে বসিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শ্রীপ্রভুপাদ তাঁহার মর্য্যাদা জানিতেন, সেই সব উল্লেখ করত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আগ্রহ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—'প্রভুপাদ যদি সামাজিক সম্বন্ধ ধরিয়া আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, তবে ত আমি আপনার এখানে প্রসাদ পাইলে আমার জাতি যাইবে !! আপনি প্রভু, আমি দাস—এই সম্বন্ধই আমাদের আদরণীয়।' এই বলিয়া প্রভুপাদকেই উত্তম আসনে বসাইয়া নিজে পাতাদোনায় বসিলেন এবং প্রসাদ পাইয়া স্বহস্তে পাতাদোনা ফেলাইয়া দিলেন। [ইহা কিন্তু ভেক-নেওয়ার পূর্ব্বকালবর্ত্তী ঘটনা]

কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করার পর ইনি মরণাপন্ন ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন ; জীবনের আশা নাই মনে ভাবিয়া শ্রীমদনমোহন ঠৌরের সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহারাজের নিকট বেশাশ্রয় করিলেন—দেহের অসুস্থতা নিবন্ধন বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় দেহ সুস্থ হইলে কয়েকদিন পরে ইনি জেঠাগুরু সিদ্ধ বলরাম দাস বাবাজি মহাশয়কে দর্শন করিতে ঝাড়ুমণ্ডলে গেলেন। তিনি বাড়ীতে থাকিলেও ভেকাশ্রিত বৈষ্ণবগণের ন্যায় বেশধারণপূর্ব্বক কান্থা গলায় দিতেন। ঐ অবস্থায় শ্রীবলরাম দাস বাবাজি মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলে সিদ্ধ বাবা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'কে শিরোমণি ? তুমি কেন কাঁথা গলায় দিয়াছ ? এখনও শাখানাড়া ভাত না খাইলে তোমার পেট ভরে না। শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদের কাঁথা গলায় দিবার তোমার কি অধিকার আছে ?' শ্রীশিরোমণি মহাশয় দৈন্যের মূর্ত্তি ছিলেন—তিনি কাঁদিয়া বাবাজি

মহাশয়ের কৃপা প্রার্থনা করিলেন এবং কিছুদিন পরে মদনমোহন ঠৌরে তাঁহার গুরুদেবের নিকট পৃথক্‌ভাবে থাকিয়া ভজন করিলেন। যে ভক্তের বাড়ীতে বাস করিয়া শ্রীগিরিরাজের প্রসাদ পাইবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—সেই বাড়ী হইতেই প্রসাদ নেওয়াইতেন। সেই প্রসাদও আবার এইরূপ—ঠাকুরের যে ডাল ভোগ হইত, তাহা ঝাড়িয়া যে খুদ বাহির হইত, তাহাই জলে সিদ্ধ করিয়া একটু লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়া পৃথক্ ভোগ হইত। সেই জল আর কিছু অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন—অন্য কোন প্রসাদ নহে।

ভক্তির মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা তিনি উত্তমরূপে জানিতেন। আচার্য্য সন্তানগণের বয়োবৃদ্ধদিগকে যেমনভাবে মর্য্যাদা দিতেন, ঠিক তেমন ভাবেই দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকেও ভক্তি করিতেন। শ্রীমদনমোহন ঠৌরে বাস করা কালে প্রতিদিন পাঠকদ্বারা পাঠের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। একদিন পাঠের সময় তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সকলেই মনে করিলেন—কোন বিশিষ্ট আচার্য্য সন্তান বোধ হয় আসিয়াছেন, কিন্তু কেহই নাই—সেই সময়ে অদ্বৈত-বংশ্য শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামীপাদের একটি বালিকা কন্যাকে কোলে লইয়া তাঁহার জনৈক শিষ্য প্রাঙ্গণের কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রোতৃগণের মধ্যে কেহ অনুমান করিলেন যে ঐ জন্যই শিরোমণি মহাশয় দাঁড়াইয়াছিলেন। কন্যাটিসমেত সেই ভক্তকে বসাইলে শিরোমণিও উপবেশন করিলেন।

* একদিন শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপাদের শিষ্য শ্রীধর শিরোমণি মহাশয়কে দর্শন করিতে তাঁহার কুঞ্জে যাইয়া দেখিলেন—তিনি

---

* সদ্‌গুরুসঙ্গ (দ্বিতীয়) হইতে উদ্ধৃত।

নিদ্রিত আছেন, সুতরাং সেই অবস্থায়ই তাঁহাকে দেখিয়া চরণের দিকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থাকিয়া নমস্কার করিলেন। শিরোমণি মহাশয় নিদ্রিত থাকিলেও তাঁহার চরণ দুইটী তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া গেল—শ্রীধর আবার চরণের দিকে যাইয়া নমস্কার করিলেন—উঠিয়া দেখিলেন যে শিরোমণি মহাশয়ের চরণদুটি আবার অন্যদিকে গিয়াছে। শ্রীধর পুনরায় চরণের দিকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পড়িলেন, এবারও শ্রীধর উঠিয়া দেখিলেন যে চরণদুটি আর সেখানে নাই। নিদ্রতাবস্থায়ই শিরোমণি মহাশয়ের চরণদুটি সরিয়া গিয়াছে। তিন বারই এই প্রকার ঘটনা দেখিয়া শ্রীধর অবাক্ হইয়া চলিয়া আসিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া কাহারও নমস্কার করিবার সাধ্য নাই—দূরে থাকিয়াও তাঁহার জ্ঞাতসারে কেহ তাঁহাকে অগ্রে নমস্কার করিতে পারে নাই। অবিচারে সকলকে তিনি সাষ্টাঙ্গ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। রাস্তায় তাঁহার সহিত চলা একা মহামুস্কিল ব্যাপার—তিনি চলিতে চলিতে রাস্তার দুই দিকে বিড়াল, বানর, গরু, স্ত্রীলোক পুরুষ এবং বিগ্রহাদি সকলকেই একভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে অগ্রসর হন। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত স্ত্রীলোক ও পুরুষ ইঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। ঠাকুর বলিলেন—'তৃণাদপি' শ্লোকের যথার্থ দৃষ্টান্ত দেখতে হ'লে শিরোমণি মহাশয়কে গিয়ে দেখ।

প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়াই সর্ব্বপ্রথমে তিনি মেথরাণীকে মা বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক প্রণাম করিতেন। একদিন শিষ্যগণের প্রশ্নে তিনি এ সম্বন্ধে বলিলেন—'তিনি যে আমার মা—শিশুকাল হইতে আমি তাঁহার নিকট ঋণী—শিশুকাল হইতেই ইনি আমার মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া আসিতেছেন—এখনও করিতেছেন। তিনি মাতৃরূপে এখন পর্য্যন্ত যে ভাবে দয়া করিতেছেন, তাহা মনে করিলে আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া যায়। তাই তাঁহাকে প্রণাম করি।'

শ্রীবৃন্দাবনে দেশ-বিদেশ হইতে আগত শ্রীগোবিন্দ-দর্শনার্থী যাত্রী-গণকে দেখিলে তিনি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতেন। তিনি এ বিষয়ে পৃষ্ট হইয়া জনৈক শিষ্যকে বলেন—"ওরে এই সকল মহাভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী যাত্রীদিগের মর্ম্ম তুই কি করিয়া বুঝিবি? তোরা শ্রীধামে বাস করিস্, শ্রীযমুনায় স্নান করিস, তোদের ভাবভক্তিসূত্রে গাঁঠ পড়িয়া গিয়াছে। এই শ্রীবৃন্দাবনযাত্রীদের বাড়ী বহু দূরে—শ্রীহট্টে, ঢাকায়, মুলতানে বা মাদ্রাজে। ইহারা গোবিন্দভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শন সংকল্প করত কত কষ্ট স্বীকার করিয়া গোবিন্দ-দর্শনে আসিয়াছে। ওরে এমন সুন্দর সাধুসঙ্গ আর কোথায় পাবি? এমন গোবিন্দ-বিভাবিত দেহ-মন-প্রাণই বা কোথায় পাবি? গোবিন্দ-দর্শনে এত উৎকণ্ঠা, এত শ্রীবৃন্দাবন-প্রীতিই বা কাহার আছে? তাই আমি ভক্তিভরে জনে জনে ইহাদের প্রণাম করি আর ভাবি—ইহাদের মত আমার মন প্রাণ ও দেহ কবে গোবিন্দ-ভাবে বিভাবিত হইবে?"

১৭৮৩ কি ৮৪ শকাব্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথ বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামি-পাদের অষ্টম অধস্তন শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন—শ্রীগৌরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া তিনি তত্রত্য শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবায়েত স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীসখালাল গোপীলাল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের প্রেরণায় ইনি শিরোমণি মহাশয়ের নিকট তত্ত্ব জানিতে গেলেন—আচার্য্য-সন্তান-বুদ্ধিতে শিরোমণি মহাশয় ইহাকে পনর দিন যাবৎ সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক আলাপ করিলেন—কিন্তু প্রভুপাদ শ্রীগৌরতত্ত্ব না বুঝিয়া প্রাণের অদম্য পিপাসার অপূর্ত্তিতে ষোড়শ দিবসে স্বচরণ প্রসারণ করত শিরোমণি মহাশয়কে বলিলেন—"তোমাকে গুরুবুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তোমার নিকট আসিতেছি—কিন্তু

আচার্য্যসন্তান-বুদ্ধিতে তুমি আমাকে দণ্ডবৎ ভক্তি কর—আচ্ছা যদি তোমার তৃপ্তি হয়, এই চরণে যত পার দণ্ডবৎ কর—আমি না হয় নরকে যাইব, তবু শ্রীগৌর-কথা শুনাও।” পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের মুখে এতাদৃশ প্রৌঢ়োক্তি শ্রবণে শিরোমণি মহাশয়ের অদ্ভুত প্রেম-বিকার হয়—প্রভুপাদকে আলিঙ্গন করত তিনি তাঁহার মস্তকটি অশ্রুধারা অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি প্রভুপাদ শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিলেন। *

কোথাও পাঠ কীর্ত্তন হইলে শ্রীঅদ্বৈতদাস (অন্নদাপ্রসাদ রায়) প্রভৃতি শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে যাইতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল—রাস্তার ধারে প্রত্যেক মন্দিরে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবেন। তাহাতে পাঠকীর্ত্তনে পৌঁছাইতে অনেক দেরী হইত। তিনি সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণকে শিক্ষাচ্ছলে বলিতেন—‘তাড়াতাড়ি গিয়া সকলের আগে বসিতে কার গায়ে পা লাগিয়া কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা অপেক্ষা নিরপরাধে সকলের পশ্চাতে বসিয়া যাহা শুনিতে পাওয়া যায়—তাহাই ভাল।’

একবার হেতমপুরের রাণী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছেন, শ্রীশিরোমণি মহাশয়ের মুখে ভাগবত-শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া পাঠান্তে তাঁহাকে নূতন বস্ত্রসহ নারিকেল ফলাদি ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাঠাইয়া দেন—শিরোমণি মহাশয় তাহা প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বর্জ্জন করেন। শিরোমণি মহাশয় একথা শুনিয়া দুঃখিত ও দোষের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই গর্হিত কার্য্যের জন্য শাস্তি প্রার্থনা করিলেন। তখন বৈষ্ণবগণ আদেশ করিলেন যে তিনি এক বৎসর কাল শ্রীবৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠিত প্রতি শ্রীমন্দিরে বিনা আহ্বানে ভাগবত পাঠ করিবেন। শ্রীবৃন্দাবনে তখন তিন সহস্রের উপর মন্দির—একদিন বহুসংখ্যক মন্দিরে পাঠ ভিন্ন শাস্তির

* শ্রীশ্রীশিরোমণি গোস্বামিপ্রভুপাদের শ্রীমুখ-শ্রুত।

আদেশ পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয় না। বৈষ্ণবচূড়ামণি কিন্তু এই কঠোর আদেশও পূর্ণ ভাবেই পালন করিয়াছিলেন।

ভেক-গ্রহণের পরে শিরোমণি মহাশয়ের প্রতি জনসাধারণের যেরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল, তাঁহার শ্রীগুরুদেব সিদ্ধ নিত্যানন্দ বাবার প্রতি ততোধিক বৃদ্ধি পাইল। বহু বহু বৈষ্ণব ও ভক্ত তাঁহার নিকট ভজন শিখিতে আসিলেন—তাহাতে সিদ্ধ বাবার ভজনে অনেক উদ্বেগ বাড়িয়া গেল। এই ব্যাপারে শিরোমণি মহাশয় তাঁহার পার্শ্বের কুটীরেই বাস করিয়া আগন্তুক বৈষ্ণব ও ভক্তগণের সমাধান করিতে লাগিলেন। কাহারও কোন প্রশ্ন থাকিলে নিজেই তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেন—তথাপি কাহারও সিদ্ধ বাবার দর্শনের আগ্রহ থাকিলে তিনি তাঁহাকে বলিতেন—'সাড়ে চারিটার সময় পাঠ আরম্ভ হইলে তিনি বাহিরে আসিবেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিবেন—এখন দর্শন করিলে তাঁহাকে উদ্বেগ দেওয়া হইবে।' এইভাবে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে গিয়া তাঁহার উদ্বেগ বাড়িল বলিয়া কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। তিনি অনুগত জনদিগকে উপদেশ করিতেন—'আমাদিগকে নহবৎখানার কবুতর হইয়া ভজন করিতে হইবে অর্থাৎ নহবৎখানায় সর্ব্বদা বাজনা শুনিয়াও কবুতর যেমন উড়িয়া যায় না, তদ্রূপ ভক্ত ও বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর প্রেরিত—এই মনে করিয়া আদরের সহিত তাঁহাদের সমাধান করিয়াই সর্ব্বদা ভজন করিতে হইবে। সময় বৃথা না যায় এবং কাহারও বাজে কথা বলিবার অবকাশ না আসে—তজ্জন্য বিকালের বড় পাঠের পূর্ব্বেও কিছু পাঠকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান রাখিতেন। এই সময়ে শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য শ্রীপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশিরোমণি মহাশয়ের পত্নী প্রতিদিন মদনমোহনঠৌরে পাঠ শ্রবণ

করিতে আসিতেন। তদীয় পুত্রগণ এখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহারাও আসিতেন—তাঁহাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে শিরোমণি মহাশয় কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া যথাযথ উত্তর দিতেন। শিরোমণি মহাশয়ের পত্নী ও পুত্রগণের পাঠের সময়ে আগমনাদি ঠৌরের বৈষ্ণবগণ অনুমোদন করিতেন না—এজন্য তাঁহারা তাঁহাকে দুই একবার কটাক্ষোক্তিও করিয়াছেন—শিরোমণি কিন্তু কোনই উত্তর দিতেন না। ঠৌরে একবার যখন আলোচনা চলিতেছিল, শ্রীপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু তাহা শুনিয়া বাসায় গিয়া অনুতপ্ত হইতেছিলেন যে এমন মহাত্মার এতাদৃশ ব্যবহারকে তাঁহার কেন ত্রুটি বলিয়া মনে হইতেছে—ইহার রহস্য না বুঝা পর্য্যন্ত তিনি আহার করিবেন না বলিয়া সেই রাত্রি ও পরদিন অনাহারে কাটাইলেন। অন্যান্য দিন যেমন শিরোমণি মহাশয়কে দর্শন করিতে যাইতেন, সেদিন তাহাও করিলেন না। সায়ংকালে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল—'শিরোমণি মহাশয় ত যোগ্য ব্যবহারই করিয়াছেন—ইনি আমার স্ত্রী, এরা আমার পুত্র, ইহাদের এখানে আসা উচিত নহে ইত্যাদি মনে রাখিলে তাহাদের সহিত বৈষয়িক সম্বন্ধ শিথিল না হইয়া আরও গাঢ়ই হইত। অন্যান্য স্ত্রীগণের প্রতি তাঁহার যেমন ব্যবহার তাঁহার পত্নী বা পুত্রদের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার ব্যতীত কোনও বৈশিষ্ট্য ত দেখা যায় না, সুতরাং এটি তাঁহার দোষ নয়, গুণই।' এ ভাবনায় তাঁহার মনে উল্লাস আসিল এবং তখনই শিরোমণি মহাশয়ের দর্শনে আসিলেন। প্রভুপাদ কেন যথাসময়ে আসেন নাই—একথার উত্তরে প্রভুপাদ আদ্যোপান্ত সর্ব্ব কথা বলিলেন। তখন শিরোমণি বলিলেন—'উনি আমার গুরুভগ্নী হন (শিরোমণি মহাশয় ও তৎপত্নী একই গুরুর শিষ্য), উনি শ্রীভগবৎকথা শুনিতে অত্যন্ত সুখী হন, সুতরাং উঁহাকে আসিতে আমি কি করিয়া নিষেধ করিব?'

এই সময়ে স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ রায় মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন লাভ করিলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গৃহীতদার শ্রীল অন্নদাপ্রসাদ রায় মহাশয় একদিন তাঁহার জননীকে নিবেদন করিলেন—'মা, আমি আগামী কল্য প্রাতে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইব।' মা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন বাবা! আমার হিন্দুধর্ম্মে বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মে ত কোনই অভাব নাই।' অন্নদা বাবু—'সবই ত অভাব, যত যত আচার্য্য আছেন, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কোন সদুত্তর দিতে পারে না।' মা—'আচ্ছা বাবা! তুমি কাল খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইও না; আমি তোমাকে এক স্থানে লইয়া যাইব, সেখানেও যদি তোমার প্রাণে কোন অভাব থাকে, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা, করিও।' অন্নদা বাবু সম্মত হইলেন—পর দিন প্রাতে মা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শিরোমণি মহাশয়ের চরণে সমর্পণ করিলেন এবং সব কথাই বলিলেন। শিরোমণির সুমধুর যুক্তিযুক্ত কথা ও সুকোমল ব্যবহারে অন্নদা বাবু মুগ্ধ হইলেন এবং প্রত্যহ তাঁহার নিকট আসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব আসিতে লাগিল, শিরোমণি মহাশয় তাঁহার নাম রাখিলেন—'শ্রীঅদ্বৈত দাস।' তিনি ক্রমশঃই অধিকতর সময় শিরোমণির সঙ্গে কাটাইতে লাগিলেন। একটি কন্যা জন্মিবার কিছুদিন পরে অন্নদা বাবুর স্ত্রীবিয়োগ হইল—তখন তাঁহার বয়স ৩৭।৩৮ বৎসর। বাড়ীতে শ্রীরাধামদনগোপালের সেবা আছেন—স্নেহময়ী জননী প্রভৃতি আছেন—ইঁহাদের সকলের সেবা অন্নদা বাবুকেই দেখিতে হয়। তিনি আর তখন রাত্রিতে বাড়ীতে আসিতেন না—শিরোমণির নিকট ঠৌরেই থাকিতেন। প্রাতে ৮।৯টার সময় গৃহে আসিতেন, স্নানাদি নিত্যকৃত্য ও সেবা পর্য্যবেক্ষণাদি করিয়া মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ পাওয়ার পর পুনরায় ঠৌরে আসিতেন—একখানা ছোট কাপড় পরিতেন—দেখিতে প্রায় বহির্ব্বাসের মতই বোধ হইত।

এই সময়ে মুঙ্গের জামালপুর হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য-নামক জনৈক যুবক আসিয়া শিরোমণি মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে 'শ্রীহরিচরণ দাস' নাম দিলেন—নিজে ভেক নিয়াছেন এবং ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া স্বয়ং দীক্ষা না দিয়া স্বজ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাসবল্লভ ভক্তিভূষণের দ্বারা দীক্ষা দেওয়াইলেন। শ্রীহরিচরণ দাসজি ভেক গ্রহণের জন্য খুব ব্যস্ত হইলেন—একে ত যুবক, তাহাতে পরম সুন্দর ও ব্রাহ্মণ-সন্তান, এজন্য কেহই তাঁহাকে ভেক দিতে সম্মত হইলেন না। একদিন নিজেই যমুনায় স্নান করিয়া তিনি বেশপরিবর্ত্তন করিয়া আসিলেন—ঠৌরের অনেকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তোমাকে ভেক দিয়াছেন?' তিনি বলিলেন—'কেহ ত দিলেন না, আমি নিজেই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছি।' তিনি ডোরের গ্রন্থি বাম দিকে দিয়াছিলেন—কোনও বৈষ্ণব তাহা দেখিয়া বলিলেন—'বাম দিকের গাঁঠ, আমাদিগের ত্যক্ত কোন উপসম্প্রদায়ের রীতি'—এই বলিয়া ডান দিকে গাঁঠ দিতে বলিলেন। শ্রীহরিচরণ দাসজি তাহাই করিলেন।

শিরোমণির বেশাশ্রয়ের কিছুদিন পরেই পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহাশয় সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবার নিকট দীক্ষিত হইলেন। সিদ্ধ বাবা তাঁহাকে উপদেশ করিলেন—'শিরোমণি তোমার গুরুভ্রাতা হইলেও তুমি তাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিবে।' পণ্ডিত বাবা যতদিন সমর্থ ছিলেন, শিরোমণির বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং অসমর্থ হইলে অনুগত বৈষ্ণব দ্বারা প্রসাদ নেওয়াইতেন। শ্রীহরিচরণ দাসজি পণ্ডিত বাবাজির নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায়ের পত্নীবিয়োগের কিছুদিন পরেই শিরোমণির কনিষ্ঠ পুত্রেরও স্ত্রীবিয়োগ হইল। শিরোমণি অন্নদা বাবুকে বলিলেন

—'অদ্বৈতদাস! আর যেন বিবাহ করিও না।' কনিষ্ঠ পুত্রকে কিন্তু বলিলেন—'তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।' শ্রীহরিচরণ দাসজি শিরোমণি মহাশয়ের প্রতি প্রচুর গুরুবুদ্ধি রাখিলেও নাতি-ঠাকুর-দাদা-সম্বন্ধে তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, 'এ আপনার কেমন ব্যবহার বুঝিতেছি না? শ্রীঅদ্বৈত দাস জমিদারের ছেলে, তাহাতে বাড়ীতে ঠাকুরসেবা আছে অথচ পুত্র নাই, তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন, অথচ নিজের পুত্রটির বিবাহে অনুমোদনই করিলেন।' শিরোমণি বলিলেন—'হরিচরণ দাস! তুমি বুঝিতে পার নাই—এই জীবটি (অদ্বৈতদাস) কৃতার্থ হওয়ার জন্য আমার একান্ত শরণ লইয়াছে—আর এই বৈষ্ণবচরণ আমি নিষেধ করিলেও বিবাহই করিবে, সে কেবল তাহার বাধ্য রক্ষা করিয়া আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছে—সুতরাং আমার নিষেধ করাতে লাভ কি?'

যত প্রকারে সম্ভব হয়, তিনি তত প্রকারে বৈষ্ণবসেবায় যত্ন করিতেন। বাহির হইতে তাঁহার নিকট যে সব মহাপ্রসাদ আসিত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই ধরিয়া রাখিতেন—কোনও বৈষ্ণবের প্রয়োজন হইলে তিনি দিয়া দিতেন। প্রসাদের পাত্র (কুল্লা) গুলি ধুইয়া ঘরের এক কোণে রাখিতেন। কোন সময় শ্রীহরিচরণ দাসজি সেবা-মানসে ঘরে আসিয়া বলিলেন—'এই কুল্লাগুলি ঘরে রাখিয়াছেন কেন? এর জন্য ইঁদুর ও সাপ ঘরে আসিবে, আজ্ঞা করেন ত এগুলি ফেলিয়া দিই।' শিরোমণি বলিলেন—'এখন থাকুক,' কতক্ষণ পরে জনৈক বাবাজির কাপড় বানর লইয়া গিয়াছে, বাবাজি মহাশয় হরি-চরণ দাসজিকে কাপড়টি বানর হইতে ছাড়াইয়া দিতে বলিলেন। তিনি লাঠি লইয়া বানর তাড়া করিলে বানরটি কাপড় লইয়া সরিয়া পড়িল। বাবাজি মহাশয় বলিলেন—'এরূপ করিলে হইবে না, শিরোমণির ঘর হইতে দুইটি কুল্লাতে অল্প অল্প প্রসাদ দিয়া এখানে নিয়া আস।'

হরিচরণ দাসজি তাহাই করিলে বানর কাপড় ফেলিয়া প্রসাদের কুল্লার দিকে ছুটিল। হরিচরণ দাসজি তখন বুঝিলেন কেন শিরোমণি মহাশয় ঘরে কুল্লা রাখিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ আছে কিনা—এ বিষয়ে দুইটি মত প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এক পক্ষ বলেন—মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ নাই, অপর পক্ষ বলেন—এই ব্যবস্থা কেবল শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধে। শিরোমণি মহাশয় কিন্তু মহাপ্রসাদে ভেদবুদ্ধি রাখিতেন না। পাবনা ও মৈমনসিংহ অঞ্চলে কৈবর্ত্ত-জাতি-স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণগণ পান করেন না। আবার কলিকাতা, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণগণ তত্রত্য কৈবর্ত্তদের (মাহিষ্যগণের) স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন। পাবনা জেলার রজনীদাস নামক জনৈক কৈবর্ত্ত শ্রীপাদ ৺রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন এবং শিরোমণির অনুগত হইলেন। শিরোমণির কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিলে ইনিই তাঁহাকে প্রসাদ আনিয়া দিতেন। ইনি একেত গৃহস্থ, তাহাতে আবার দেশে 'জল-অচল' জাতি—এজন্য বৈষ্ণবগণ শিরোমণিকে দোষারোপ করিতেন। শিরোমণি তাহাতে কিন্তু কর্ণপাতও করিতেন না। একবার রাজর্ষি বাহাদুরের সঙ্গে জনৈক বিশিষ্ট শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান বঙ্গদেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া এখানেই আসিবেন জানিয়া তিনি তাঁহাদের জন্য অন্য মন্দির হইতে কিছু মহাপ্রসাদ আনাইয়া রাখিলেন। তাঁহারা আসামাত্রই, তাঁহাদের স্নানাদি না হইলেও শিরোমণি স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে অন্নপ্রসাদ পাওয়াইলেন। তৎপরে তিনি দৈন্যোক্তি করত কিছু পরিহাস-বাক্য বলিলেন—"শ্রীসীতানাথের সন্তানদের যেস্থানে ভোজন হয়, এ কুকুর সেখানে যায় না; আজ কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়া সেই রীতিটি লঙ্ঘন করিলাম।"

[শ্রীশিরোমণি মহাশয়ের কাটোয়ার গোষ্ঠীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায়েত শ্রীবেণীমাধব ঠাকুর ছিলেন। কোনও সময়ে তাঁহার পত্নী শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা ত্যাগ করত শ্রীজগন্নাথ দর্শনে অনুমতি দিতে তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও পত্নীর আগ্রহে তিনি মত করিলেন। পত্নী ফিরিয়া আসিয়া দেশাচারানুসারে গ্রামের বাহিরে কোন জলাশয়ের নিকট আসিয়া বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের কাঁচি প্রসাদ একজন পুরাজাতীয় (নীচ জল-অচল জাতি) লোকের হাতে দিয়া পত্নীর নিকট পাঠাইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—'পত্নী যদি প্রসাদ-বাহকের জাতিবিচার না করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণ করে, তবেই তাহা দ্বারা পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাকার্য্য চলিবে, আর যদি গ্রহণ না করে, তবে তিনি জাতি ঘুচাইয়া আসিয়াছেন বলিয়া আর মহাপ্রভুর রন্ধনাদিসেবায় নিয়োগ করা হইবে না।' সুচতুরা পত্নী স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়া জলাশয়ে স্নানান্তে সেই প্রসাদ ভোজন করত সেই চাকরের সঙ্গে বাড়ীতে আসিলেন। বলা বাহুল্য যে শ্রীল বেণীমাধব ঠাকুর পত্নীর মহাপ্রসাদ-নিষ্ঠায় অত্যন্ত প্রীত হইলেন।]

তাড়াসের প্রধান জমিদার শ্রীল বনমালী রায় শ্রীযুক্ত অন্নদা বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। ভৎকালে ঐ বংশের শ্রেষ্ঠ জমিদার স্বর্গীয় বনওয়ারী রায় মহাশয় বনমালী রায়কে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বনওয়ারী বাবু জীবিত থাকিতে অন্নদা বাবু বা তাঁহার পিতা দেশে গেলেও বনমালী বাবুর সহিত দেখা করিতেন না। অন্নদাবাবু যখন শিরোমণি মহাশয়ের কৃপালাভ করেন, তখন বনমালী বাবু জনৈক ব্রাহ্মসঙ্গে পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অন্নদা বাবু শিরোমণি মহাশয়ের আশ্রয় পাইয়া ভ্রাতাকেও উদ্ধার করিয়া পুনরায় ভক্তিপথে আনিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। অন্নদা বাবুর সহিত পত্রব্যবহারে

বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার আগ্রহে ও স্বীয় উৎকণ্ঠায় ১২৯৫ সনে আশ্বিনমাসে বনমালী বাবু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া অন্নদা বাবুর বাড়ীতেই সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন এবং এই সময়ে শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

১৩০৪ সনে বনমালী বাবু শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুর কৃপায় ভক্তিপথ ধরিলেন এবং স্বকুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজীউকে প্রাণকোটি নির্মঞ্ছনীয় জ্ঞানে সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণভজনে বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে উপদেশ করিলেন—"শ্রীবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ হয় না। বৈষ্ণবগণকে উত্তম খাদ্য বা বস্ত্র দান করার নামই বৈষ্ণবসেবা নয়, বরং অনেক সময় তাহাতে তাঁহাদের অনর্থ উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের অভীষ্ট—হরিকথা; শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীগোস্বামিগণের গ্রন্থের অনুশীলন খুব বিরল, কাজেই বৈষ্ণবগণের সেই সব কথা শুনিবার সৌভাগ্য সব সময় ঘটে না। তাঁহাদের সেই অভাব দূর করার জন্য তুমি ঐ সমস্ত ভক্তিগ্রন্থের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিয়া পাঠক প্রস্তুত করাও এবং যে সকল বৃদ্ধ, অন্ধ, রুগ্ন বা যে কোন কারণে মাধুকরী করিয়া সাধন-ভজন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগকে ঔষধ পথ্য বা অন্যান্য প্রকারে সাহায্য করিয়া সেবা কর, তাহাতেই তোমার অচিরাৎ প্রেমলাভ হইবে।" বনমালী বাবু তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য একটি বিদ্যালয় ও বৈষ্ণবগণের জন্য একটি চিকিৎসালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তৎকালে এ বিষয়ে সরকারী আনুকূল্য বা উৎসাহ ছিল না বলিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন নাই। এজন্য তিনি বহু টাকার সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। সংপ্রতি শ্রীবৃন্দাবনে যে 'ভক্তি-বিদ্যালয়' স্থাপিত হইয়াছে—তাহা রাজর্ষি বাহাদুর,

শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভু এবং শিরোমণি মহাশয়ের আজ্ঞা ও উৎসাহের ফল-স্বরূপই বলা যায়।

তিনি হাত না ধুইয়া কখনও কোন প্রসাদ বা আমানিয়াতে (ভোগের উপকরণে) হাত দিতেন না, হাত-পা ধোয়ার স্থানে কখনও প্রসাদী হাত ধুইতেন না, গা-মোছা গামছা কখনও পায়ে ঠেকাইতেন না। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও কোমল-হৃদয় ছিলেন। কেহ কোন প্রাকৃত সুখদুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি উপেক্ষা করিতেন না। কোন স্ত্রীলোক হয়ত পুত্রবিয়োগ-দুঃখে তাঁহার নিকট কাঁদিতেছে, তাহাতে তাঁহার লীলাবিশেষের উদ্দীপনায় তিনিও কাঁদিতেছেন। দুঃখিনী তাঁহার সহানুভূতি পাইয়া হৃদয়ের বেদনার লাঘব করিতেছে। যাঁহারা জাতভাব হইয়াছেন, বাহ্য জগতের প্রতি ঘটনাই তাঁহাদের অন্তরে ভাবের সহায়ক উদ্দীপন হয়—শিরোমণি মহাশয় একবার পাঠকীর্ত্তন শুনিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময়ে কোন নর্ত্তকী বাই নাচ-গান করিয়া ফিরিতেছিল—শিরোমণি মহাশয় তাহার দর্শনেই এমন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন যে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

তাঁহার ব্যবহারও বড় সরল ও মধুর ছিল। কাহারও সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে হইলে তাহা এমন মধুর ভাবেই করিতেন যে তাহাতে সকলেরই সন্তোষ হইত। (১) একবার কতিপয় ভদ্রলোক কোনও গণ্যমান্য প্রভুসন্তানের ব্যবহার-সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেছিলেন—শিরোমণি রাস্তায় যাইতে যাইতে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়াই কাছে গেলেন। শিরোমণিকে দেখিয়া তাঁহারা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিলে তিনি বলিলেন,—'আপনারা কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, বলুন।' ঠিক এমন সময়ে সেই প্রভু সন্তানও (যিনি সমালোচনার বিষয় ছিলেন) দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন।

শিরোমণি তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক আসনে বসাইয়া আবার সমালোচনার বিষয় জানিতে চাহিলেন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া একজন সাহস করিয়া বলিলেন—'দেখুন এঁরা প্রভু-সন্তান, এঁদের আচরণ সাধারণের অনুকরণীয়, এদের আচরণ কি এরূপ ঘৃণিত হওয়া উচিত?' এই বলিয়া সেই প্রভুসন্তান যে অতি নীচজাতিকে শিষ্য করিয়াছেন, সেই বিষয়টির উল্লেখ করিলেন। শিরোমণি সব ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন—'দেখুন, এঁরা হচ্ছেন আচার্য্য, জগতের জীবকে উদ্ধার করাই এঁদের কাজ, সকলের উপর এঁদের করুণা, এঁরা কি কাউকে বাদ দিতে পারেন? এঁরা যে পতিতপাবন। আর এক কথা—এটাকে ভজন-চাতুরীও বলা যেতে পারে, কারণ লোকচক্ষে নিন্দনীয় কাজ করলে নিন্দার কথা লোক-পরম্পরায় রটে যাবে, সকলেই এঁদের নিন্দা করবে, কেউ কাছে ঘেস্‌বে না; সুতরাং এঁরা সকলের নিন্দা বরণ করে নিয়ে বেশ নির্জনে ভজনসাধন করবার সুযোগ পাবেন—তাই বলছিলাম এটা এঁদের ভজন-চাতুরীও বলা যেতে পারে।' শিরোমণির সিদ্ধান্ত শুনিয়া সমালোচকগণও সন্তুষ্ট হইলেন এবং সমালোচ্য প্রভুও সব বুঝিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইলেন। (২) শিরোমণি মহাশয় তাঁহার কুঞ্জে মাঝে মাঝে বৈষ্ণব-গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। একবার বৈষ্ণবগণ প্রসাদ পাইতে আসিয়াছেন—নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণের মধ্যে একজনকে তাঁহারা নিজেদের পংক্তিতে বসাইতে কুণ্ঠীত হইলেন, কারণ ঐ বৈষ্ণব কোনও ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছেন। শিরোমণি ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া সমাগত বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—'দেখুন, ইনি হয়ত একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার জন্য আপনারা এতটা শাসন করিতেছেন। আর আমি জীবনে কত অন্যায় করিয়াছি' এই বলিয়া তাঁহার জীবনে যাহা কিছু অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন,

সবই অকপটে বৈষ্ণবদের নিকট স্বীকার করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বৈষ্ণব গণ আর কোন গোলমাল না করিয়া ভোজন করিলেন। যিনি ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনিও সাবধান হইয়া গেলেন।

* জনৈক বৈষ্ণব তাঁহার নিকটে ভক্তিলাভ-বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তদুত্তরে তিনি কিছু ভক্তির ব্যাখ্যান কবিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। নয়নে অশ্রুধারা, গদগদ কণ্ঠ, শরীর পুলকপূর্ণ হইল। (অনেক সম্বরণের পরে) এইমাত্র বলিলেন—'বাবা, যে ভক্তি প্রার্থনা করে, সেই চতুর। আমাদের যতদিন না ভক্তি হয়, ততদিন আমাদের পুনরাবৃত্তি হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয়-ব্যতীত ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। এই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গই হইয়াছেন প্রেমদাতা। তাঁর চরণাশ্রয় কর, ভক্তির অভাব থাকিবে না।'

১২৯৭ সনের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে যাইতেছেন—তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্য অন্নদাবাবু, বনমালী বাবু প্রভৃতি শিরোমণি মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মথুরা ষ্টেসন পর্য্যন্ত গেলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুপাদকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া শিরোমণি মহাশয় প্লাটফরমের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অন্নদা বাবুরা অনেক সন্তর্পণে তাঁহাকে চেতন করাইলেন বটে, কিন্তু বৃন্দাবনে ফিরিয়াই শিরোমণি মহাশয়ের জ্বর হইল। চতুর্থ কি পঞ্চম দিবসে পৌষী কৃষ্ণা তৃতীয়াতে শিরোমণি মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন লাভ করিলেন। প্রভুপাদ শান্তিপুরে যাইয়াই এই সংবাদ পাইলেন এবং অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

শ্রীনবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজি মহাশয় যে দিন দেহরক্ষা করিলেন, ঠিক সেই রাত্রিতেই শিরোমণি মহাশয় স্বপ্নে দেখিলেন যে সিদ্ধবাবা বলিতেছেন—'শিরোমণি! আমি এলাম রে! যখন

* সজ্জনতোষণীতে 'ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবত্ব'-শীর্ষক প্রবন্ধের ছায়া।

শিরোমণি মহাশয় জানিলেন যে বাবাজি মহাশয় ঐ সময়ই দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতেই সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজের একটি আসন স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে কাটোয়ার 'বড়প্রভু' দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার সমাধিও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ বাবার আসনের পার্শ্বে স্থাপিত হয়। শিরোমণি মহাশয়ের দেহত্যাগে তাঁহার আত্মীয়-গণ তাঁহার সমাধিও বড়প্রভুর সমাধির পার্শ্বেই স্থাপন করিয়াছেন। অদ্যাবধি তাহা বর্ত্তমান আছে এবং রীতিমত ভোগাদি সেবা হইয়া থাকে।

সিদ্ধ শ্রীগৌরচরণ দাস বাবাজি মহারাজ

(দাউজি, কুঞ্জরা)

যশোহর জেলায় তালখড়ি গ্রামে শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর বংশে ইঁহার জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তিনি শ্রীশ্রীলোকনাথ প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গুণগরিমার শ্রবণে অতি অনুরাগে গৃহত্যাগ করত শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীশ্রীসিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবার আশ্রয় করেন।* এ স্থানে তিনি দীর্ঘদিন বাস করার পরে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন লালসা হইলে তিনি সিদ্ধ বাবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন—তখন সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'যা, তবে ওদের মাথায় পড়লে আর আস্‌তে পার্‌বি না।' তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া চৌরাশি ক্রোশ দর্শন করিলেন এবং গোকুল মহাবনের দাউজিতে আসিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা মনে মনে ভাবিলেন—'রাত্রি প্রভাত হইলেই ত আমি ব্রজের সীমা পার হইয়া যাইব।' এই কথা ভাবিয়া তিনি অঙ্গনে শুইলেন—রাত্রিকালে দাউজি তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ! তোকে আমার বড় ভাল লাগে, তুই ঐ গোফায় থাকিয়া

* মতান্তরে ইনি কালনার সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজি মহারাজের আশ্রিত।

ভজন কর। এখানেই তোর সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।' দাউজির কথায় তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—'না, আমার সিদ্ধ বাবার আজ্ঞা-ক্রমে আমি শ্রীগৌরদেশেই যাইব। এ স্থানে কিছুতেই থাকিব না।' এইরূপে কতক্ষণ কথাকাটাকাটির পর তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া ঝোলা কাঁধে লইয়া বাহির হইয়া পথপানে ছুটিলেন, মনে মনে ভাবিতেছেন—'এবার আমি ব্রজের সীমা অতিক্রম করিলাম'; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই তিনি দেখিলেন যে বলদেব-কুণ্ডের চতুর্দ্দিকেই তিনি সারা রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তখন তিনি সিদ্ধ বাবার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীবলদেব নির্দ্দিষ্ট গোফায় গেলেন এবং নির্ব্বন্ধ করিয়া একাসনে বসিয়া 'রামকৃষ্ণ' নাম জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি সখ্যরসের উপাসক ছিলেন এবং শ্রীদামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ও শ্রীরাধারাণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া অভিমান রাখিতেন। এক গাছি খুব লম্বা মালাই সঙ্গে রাখিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেন। একভাবে ঐ গোফায় তিনি বিশ বৎসর ছিলেন—অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করত কোমর ধুইয়া গোফায় ঢুকিয়া ভজনে বসিতেন, আর অপরাহ্ন হইলে পুনরায় শৌচে গিয়া কোমর ধুইয়া কিছুক্ষণ গ্রন্থালোচনা করত সন্ধ্যাবেলা মাধুকরীতে যাইতেন—কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ বা কোথাও গমন করিতেন না। তাঁহার প্রবলানুরাগে শ্রীদাউজি প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে মাখন মিছরী খাওয়াইয়াছিলেন। কথিত আছে—এই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে সাহাজাতীয় জনৈক ভক্ত তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তির আশায় এক বৎসরকাল তাঁহার গোফাদ্বারে বসিয়া থাকেন—তিনি মাধুকরী যাইতে একবার ইঁহাকে দেখেন, কিন্তু বাক্যালাপ করিতেন না। এক বৎসর পরে তিনি বিকাল বেলা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা তুমি কে এবং কি চাও?' তিনি সংক্ষেপে স্বপরিচয় দিয়া কৃপাপ্রার্থী হইলেন। তাঁহার কক্ষদেশে

একখানি প্রাচীন পুঁথি ছিল—সিদ্ধ বাবা তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে উহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। তাঁহাকে গোফায় ঢুকিতে অনুমতি দিয়া ভিতরে বসাইয়া ইনি একবৎসরকাল তাঁহার মুখে শ্রীচরিতামৃত শ্রবণ করেন। বলা বাহুল্য যে ইতিমধ্যে তাঁহার দীক্ষা ও বেশাশ্রয় দিয়া নাম রাখিলেন—**দয়াল দাস**। ইনিই তাঁহার প্রথম শিষ্য। শ্রীচরিতামৃত-শ্রবণকালে তাঁহার এত প্রেমাশ্রু নির্গত হইত যে তাঁহার উড়নি ও পরিধেয় বহির্বাস আর্দ্র হইত। এই সময়ে তিনি পূর্ব্বের জপিত নাম 'রামকৃষ্ণ' ছাড়িয়া 'শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥' এই নামই জপ করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠশ্রবণ হইতে তিনি শ্রীগৌরপ্রেমে তন্ময় হইয়া গেলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের আবেশ ছাড়িয়া এক্ষণে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-ভজনই সার করিলেন। এক বৎসর পরে শ্রীদয়াল দাসজি তাঁহার চরণে পড়িয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করিতে স্বাভিলাষ জ্ঞাপন করিলে তিনি নিষেধ করিতে পারিলেন না, যেহেতু তিনি সিদ্ধ বাবার আদেশ পালন করিতে পারেন নাই। দয়াল দাসজি ওখান হইতে চলিয়া আসিলে সিদ্ধ বাবা উন্মত্তবৎ হইলেন—এক্ষণে 'দয়াল' 'দয়াল' বলিয়া তিনি বনে বনে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইত যে দয়াল দাস আর কেহই নহেন, সাক্ষাৎ মহাপ্রভুই ছলনা করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন—তিনি পূর্ব্বে গৌরবিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন—এক্ষণে গৌরই দয়ালরূপে আসিয়া তাঁহাকে গৌরভক্তি দান করিয়াছেন। ছয় বৎসর পরে তিনি যখন কুঞ্জরা গ্রামে আসেন, তখন তত্রত্য ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ওখানে বাস করিতে কুটীর করিয়া দিলে তিনি তাহাতে বহুদিন ছিলেন। এ সময়ে তাঁহার বহু শিষ্য সেবক হইয়াছিলেন—তন্মধ্যে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহাশয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে তিনি ধীরসমীরের

নিকটবর্ত্তী দুলাল সাহার ঘেরায় থাকিতেন। শেষকালে মণিপুরী কুঞ্জে স্বশিষ্য রায় সাহেব কৈলাস দাসের (বেশাশ্রয়ের নাম—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দাসজির) সহিত একত্র বাস করিতেন—এস্থানেই তিনি অপ্রকট হইয়াছেন।

কথিত আছে যে তিনি সখ্যরসের আবেশে একবার শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে যাইয়া চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দকে দেখাইয়া প্রণাম করিতে বলেন---ইহাতে তত্রত্য পূজারিগণ ইঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া প্রাঙ্গণ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলে ইনি বাহিরে আসিয়া অভিমানভরে বলিতেছিলেন—'তোর নিজলোকদ্বারা আমাকে বাহির করিয়া দিলে কি হইবে? এক্ষণই ত তুই বাহিরে আসিবি! আমার চরণধূলি না নিলে তোকে আজ খেলিতেই দিব না।' সখ্যরসের পোষক কীর্ত্তন শুনিতেই তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিতেন—জনৈক কীর্ত্তনীয়া গোষ্ঠলীলায় রসাভাস করিলে ইনি চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

যে সময়ে রাজর্ষি বাহাদুর শ্রীকুণ্ডে ছিলেন, তখন একবার ইনি কৃপাপরবশ হইয়া তথায় গিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি বাহাদুরের গোষ্ঠীতে শ্রীরাধামাধবের প্রীতির কথাও বলিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কিন্তু বলিয়া লইয়াছিলেন—'এই কথা আমাকে বলিতে নাই, তথাপি বলিতেছি।' তিনি তখন শ্রীরাধামাধবের প্রেমের যে বর্ণনা করেন, তাহা অতি অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব। ইনি নিদ্রিতাবস্থায়ও শ্রীনাম অতিস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

বাবাজি মহাশয় অতি প্রাচীন হইয়াই শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরদাস বাবাজি (নন্দগ্রাম)

বঙ্গাব্দ প্রায় ১৩০০ সালে শ্রীনন্দগ্রামে পাবন-সরোবরের তীরে শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের ভজন-কুটীরে শ্রীগৌরদাস বাবাজি ভজন করিতেন। তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইনি প্রত্যহ প্রেমসরোবরের নিকট গাজিপুর হইতে ফুল আনিয়া মালা রচনা করিয়া শ্রীলালাজির সেবা করিতেন। ঐ ফুলসেবা দ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকৃপালাভ করেন। পূর্ব্বে ৫।৬ বৎসর ফুল সেবা করিবার পর ইঁহার মনে অভিমান হইল—'এতদিন পর্য্যন্ত শ্রীলালাজির ফুল সেবা করিলেও তিনি ত আর আমাকে দয়া করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একটু কঠিন-চিত্ত হন। শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর চিত্ত কিন্তু করুণাদ্বারাই গঠিত। আমি এতদিন শ্রীজির ফুলসেবা করিলে নিশ্চয়ই তিনি দয়া করিতেন। আজই আমি বর্ষাণে যাইব। এখানে আর থাকিব না'। বৈকালে কাঁথা ইত্যাদি পিঠে বাঁধিয়া সন্ধ্যার একটু আগে ইনি নন্দগ্রামের এক মাইল দক্ষিণে মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। গরুর পাল গ্রামে আসিতেছে—এমন সময় একটি কৃষ্ণকায় সুন্দর বালক বাবাজিকে বলিতেছেন—'বাবাজি, তু কাঁহা যায়?' বাবাজি—'লালা, হাম বর্ষাণমে যায়েঙ্গে।' বালক—'না বাবাজি! তু লেট্‌কে যা।' বাবাজি—'না লালা, মেঁ ছে বরষ নন্দগ্রামমে রহকর কুছ্ ত নেহি মিলে!' বালক—'নেই বাবাজি! তু মান যা, তু মৎ যায়া করে।' বাবাজি—'হাম্ নেহি রহেঙ্গে। তু রাস্তা ছোড় দে।' বালক কিন্তু দুই হাত পসারিয়া বাবাজির পথরোধ করিয়াছেন। যে দিকে বাবাজি যান, সেই দিকেই দুই হাত পরিসর করিয়া বালক পথরোধ করিলেন। তখন বাবাজি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'ছোড়া! তু কাঁহে এৎনা উদাম করে?' তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। তখন বালক বলিলেন—

'বাবাজি! তব্ হামারা ফুলসেবা কোন্ করে গা।' যেই এই কথা বলা, তখন বাবাজি বলিলেন—ছোড়া, তু কোন্ রে?' আর সে বালকও নাই, গরু-বাছুরও নাই। বাবাজি ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ! এমন করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিলে? হায়! কিছুতেই আমি তোমাকে চিনিলাম না, তোমার কথাও বুঝিলাম না! হে দীনবৎসল! আমি নরাধম, আমাকে দয়া কর।' এইভাবে সে রাত্রি নন্দগ্রামে আসিয়া সারারাত্রি তিনি কাঁদিয়াই কাটাইলেন। পূজারির প্রতি আদেশ হইল—'দেখিস্, গৌরদাস যেন আমার ফুলসেবা না ছাড়ে।'

[শ্রীসুধন্যমিত্রের 'আমার ব্রজবাসের এক অধ্যায়']

শ্রীগৌরাঙ্গদাস বাবাজি (শ্রীবৃন্দাবন)*

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের সমাজের নিকট এই বৃদ্ধ বৈষ্ণব-মহাশয় বাস করিতেন। এত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে সমাজের পার্শ্বের সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিতে তাঁহার আধ ঘণ্টা সময় লাগিত। ইনি নিত্য মাধুকরী করিয়া শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাজের ভোগ লাগাইতে যাইতেন। আজন্ম তিনি বিষয়-বিরাগী ছিলেন—একদিন জনৈক রাজা দর্শনে আসিয়া তাঁহার অসাক্ষাতে শয্যার নীচে সামান্য অর্থ রাখিয়া চলিয়া গেল। বাবাজি মহাশয়ের রাত্রিতে আর নিদ্রা নাই, সারারাত্রি ছটফট্ করিয়া কাটাইয়া পরদিন সকালে তত্রত্য বৈষ্ণবগণকে বলিলেন—'আমার বিছানায় বোধ হয় ছারপোকা হইয়াছে, কিম্বা কোনও পোকা উঠিয়াছিল, তারই জন্য কাল রাত্রে আদৌ নিদ্রা হয় নাই'। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জনৈক বৈষ্ণব তাঁহার বিছানায় হাত দিয়াই ঐ অর্থ পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—'বাবা,

* উপর মন্দিরের শ্রীঅভয়চরণ দাস বাবাজি মহারাজের মুখে শ্রুত কাহিনী।

আপনার বিছানায় টাকা ছিল।' শুনিয়াই ত তিনি বলিলেন—'শীঘ্র সমাজের ভোগ লাগাইয়া বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ বাটিয়া দাও।'

তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তির কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে শ্রীমদনমোহনের কামদারকে ডাকাইয়া বলিলেন—তোমার যাহা নেওয়ার আছে তাহা এক্ষণই নিয়া যাও।' তিনি বলিলেন—'বাবা। আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনার কুটরীতে এমন কোনও দ্রব্য নাই, যাহা শ্রীমদনমোহনের ভাণ্ডারে উঠিবে।' তৎপরে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। একটু পরেই তত্রত্য শ্রীসনাতন দাস বাবাজিকে তিনি বলিয়া উঠিলেন—'সনাতন! তোমার কি চক্ষু নাই? ঐ যে মহাপ্রভু এসেছেন, তাঁকে বসতে আসন দাও, আসন দাও।' এই কথা বলিতে বলিতেই সকলেই দেখিলেন যে ঘরটি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয়ও ফুটিয়া বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে !! জয় গৌর !!

শ্রীসিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজ

১১৭৫ সালে ময়মনসিংহ জেলায় ভাদরা গ্রামে বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষ-বংশে জন্ম হয়। পিতামহ—গোবিন্দনাথ ঘোষ রায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং 'শ্রীগোবিন্দরায়' নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্রত্য গোস্বামিদের হস্তে ১২৫ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করত সেবা সমর্পণ করিয়াছেন। গোবিন্দের দুই পুত্র—বৈদ্যনাথ ও গৌরনাথ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুরশিদাবাদের নবাব সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—গৌরনাথও তৎপিতার দেহত্যাগ হইলে আটিয়া পরগণার মুসলমান জমিদারের অধীনে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। বৈদ্যনাথ ঘোষের এক-মাত্র পুত্র—**জগবন্ধু**। অল্পবয়সে জগবন্ধুর মাতা ও পিতা পরলোক গমন করিলে নিঃসন্তান গৌরনাথ ইঁহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন-করেন। সাতবর্ষ বয়সে দারুণ বিসূচিকায় যখন ইনি মুমূর্ষু হইয়া

ছিলেন, তখন গৌরনাথ ইঁহাকে শ্রীমদনগোপালের চরণামৃত পান করাইয়া ব্যাধিমুক্ত করিলেন। কথিত আছে, তদবধি ইনিও পরম শক্তিমান হইলেন। প্রসাদে তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্বাস—জলখাবারের পয়সা দিয়া বাতাসা কিনিয়া হরিলুট দিতেন—অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিতেন না—কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব ভাববিকার দেখা যাইত। ইনি দ্বাদশ বর্ষকালে একজন মুন্সীর নিকটে বাঙ্গালা ও পারস্থ ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী-পাঠে ও কীর্ত্তনে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব বংশে জাত বলিয়া জগবন্ধু বাল্যকালেও নির্ভয়ে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের পোষকতা করিতেন।

ঘোষ রায় মহাশয়দের গৃহে সমাগত জনৈক বৈষ্ণব অভ্যাগতের মুখে জগবন্ধু শ্রীগৌরতত্ত্ব শুনিয়া অবধি প্রতিদিন ভক্তিভরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিতেন। সংসারে প্রবল বৈরাগ্য দেখিয়া পিতৃব্য গৌরনাথ বিবাহের ব্যবস্থা করিলে ইনি রাত্রিযোগে গৃহত্যাগ করত শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া বেশাশ্রয় করিয়া **চৈতন্যদাস** নামে অভিহিত হন। বলা বাহুল্য যে গৌরনাথ ইহাকে গৃহে লইতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। গৌরনাথ যখন বুঝিলেন যে চৈতন্যদাস আর গৃহে ফিরিবেই না, তখন সেবা শুশ্রূষাদি করিবার জন্য চৈতন্যদাসের বালবিধবা বৈমাতৃক ভগিনী **প্যারী** ও তাহার ননদী **সখী** মাতাকে নবদ্বীপে পাঠাইলেন। তাঁহারা পৃথক্‌ভাবে ভজনকুটীর করিয়া থাকিতেন, মাধুকরী দ্বারা জীবন যাপন করিতেন এবং সময় মত বাবাজি মহাশয়ের সেবা করিতেন। কথিত আছে—এই দুইটি ভক্তিমতী নারী উঁহার নিকট গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে মধুর ভাবে গৌরভজন শিখাইয়াছিলেন। ইহাদের নিয়ম ছিল—প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীগৌর-মন্দিরে বসিয়া লক্ষ নাম জপ করিতেন, তৎপরে বাবাজি মহাশয়ের নিকট গিয়া ভজনশিক্ষা ও তাঁহার সেবা

করিতেন। ভিক্ষালব্ধ মাধুকরীর অংশ বাবাজি মহাশয়কে দিতেন। এতদ্ব্যতীত ইনি কৃষ্ণদাস বাবাজিকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন। সিদ্ধ-বাবার অন্তর্ধানের পর এই মহাপুরুষ বহুদিন তাঁহার সমাধিস্থানে বসিয়া গৌরভজন করিয়া অতিবৃদ্ধ বয়সে অপ্রকট হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদাসের পূর্ণ নদীয়ানাগরীভাব ছিল—স্ত্রীলোকের মত বেশভূষা করিতেন, গৌরবর্ণা নদীয়া বালিকা দেখিলেই তাঁহার সহিত গৌরনাগরের কথা ও আদর করিয়া বহু সম্মান দান করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ-সন্তানগণকে দেখিয়া ইনি ঘোমটা টানিয়া দিতেন ও তাঁহাদের সহিত মুখ তুলিয়া কথা বলিতেন না। প্রাতে গৌরের মঙ্গল আরতি দেখিয়া ইনি শ্রীমন্নরহরি-কৃত শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক * সুস্বরে পাঠ করিতেন। তৎপরে গৌরের বদনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করত গাহিতেন—

"বঁধু! কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হইয়ো তুমি॥
বঁধু, তোমার চরণে আমার পরাণে লাগল প্রেমের ফাঁসি।
মনপ্রাণ দিয়া সব সমর্পিয়া নিচয়ে হইনু দাসী॥"

শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীখণ্ডে দুই তিন বার গিয়াছিলেন॥ সরকার ঠাকুরের গোষ্ঠীর সহিত ইহার যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। 'নরহরির প্রাণ গৌর' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়ার' প্রাণ গৌর, লইয়া তথায় প্রচুরতম রঙ্গ ও আনন্দ হইত। শ্রীখণ্ডবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাকে তিনি শ্রদ্ধা সহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। একদিন সিদ্ধ বাবা তত্রত্য শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেছেন—জরাগ্রস্ত হইলেও হঠাৎ বলপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করত দ্বার রুদ্ধ করিলেন। যিনি তাঁহার গতিরোধ করিতেছিলেন—তিনি যেন তাঁহাকে মহাবলবান্ অনুভব

* গোপীনাং কুচ-কুঙ্কুমেন নিচিতমিত্যাদি............

করিলেন। শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইলে সেবাইতগণ বহির্দ্বারে একত্র হইলেন, তন্মধ্যে পূজ্যপাদ সর্ব্বানন্দঠাকুর মহাশয়ও ছিলেন। প্রায় দুই তিন দণ্ড তিনি মন্দিরমধ্যে কি করিলেন, কেহই জানিতে পারিল না, অথচ যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার দেহটি জ্যোতির্ম্ময়, সহাস্যবদনে প্রেমমধুর দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান; দ্বার খুলিলেই সর্ব্বানন্দঠাকুর তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন এবং সিদ্ধ বাবাও তাঁহার মস্তকে চরণস্পর্শ দিয়া হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের আজ আনন্দ আর ধরে না !!

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবদ্বেষী বলিয়া কথিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে শ্রীগৌরমূর্ত্তিকে ছয়মাস যাবৎ মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল। সিদ্ধ বাবার সময়ে রাজা গিরিশচন্দ্রও শ্রীগৌরকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নবদ্বীপে পণ্ডিতগণের এক বিরাট সভা আহ্বান করত বিচারার্থী হইলেন। পোড়ামাতলায় এই অধিবেশন হয়।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন অবতারের সপক্ষে ও ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। দুই দিন ধরিয়া বিচার চলিল—রাশি রাশি গ্রন্থ সভাস্থলে আনীত হইল—কিন্তু পণ্ডিতে পণ্ডিতে ঘোরতর কলহ লাগিল, অথচ মূল কথার মীমাংসা হইল না দেখিয়া ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন গিরিশচন্দ্রের অনুমতিক্রমে সিদ্ধবাবাকে সভাস্থলে আনয়ন করেন। রাজা গিরিশচন্দ্র তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব তেজোময় বপু, সহাস্য বদন ও বৈষ্ণবজনোচিত বেশভূষাদি দেখিয়া সগণে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার সম্বন্ধে প্রমাণ কি?', সিদ্ধ বাবা শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ করত বলিলেন—'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে আমারও পূর্ব্বে আপনার মত সন্দেহ ছিল। তিনি ঈশ্বর কি ভক্ত, পূর্ণ কি অংশ—এ বিষয়ে

ঘোর সন্দেহ ছিল। আজি আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে অবতার, 'তাহা আজই আমার বিশ্বাস হইল এবং এ বিশ্বাসের মূলও আপনিই। প্রাচীন শাস্ত্রে আছে—শ্রীভগবান্ ভূতলে অবতার গ্রহণ করিলে তৎকালীয় এবং তদ্দেশীয় নৃপতি তাঁহার বিদ্বেষী হন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের বিদ্বেষী ছিলেন রাবণরাজা আর দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষ্টা ছিলেন কংসরাজা। কলিযুগে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে এই নবদ্বীপে অবতার গ্রহণ করেন, নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তদ্বংশীয় আপনি শ্রীগৌরবিদ্বেষী হইয়া তাঁহার অবতারের পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রমাণ দিতেছেন। আপনি আজ আমাকে বড়ই আনন্দ দান করিলেন, অতএব আপনাকে এবং সভাস্থ সকলকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি।' রাজা হাস্যমুখে সিদ্ধ বাবার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করত সভাভঙ্গ করিলেন এবং পণ্ডিতগণ ও সভাস্থ সকল লোক বাবাজি মহাশয়ের জয়ধ্বনি করত স্বস্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মন্দিরের একটি নির্জ্জন কুটীরে সিদ্ধ বাবা থাকিতেন। সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে গৃহমধ্যে ভজন করিয়া কাটাইতেন —নামজপাদি তাঁহার ভজনের অঙ্গ হইলেও তিনি গভীর নিশিতে নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত রসকথা কহিতেন। রসিক ভক্তগণ সেই সব নির্জ্জনে সংলাপশ্রবণে পরমানন্দ পাইতেন। এই সময়ে শ্রীধামে 'ভীম' নামে এক দুষ্টপ্রকৃতি ভীষণ লোক ছিল—সে জাতিতে গন্ধবণিক্, বড় বৈষ্ণবদ্বেষী। একদিন রাত্রিতে শ্রীমন্দিরের প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক সে বাবাজি মহাশয়ের কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐ সব রস-কথা শুনিয়া মনে করিলেন—বাবাজি মহাশয় কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গ করিতেছেন—এই ভাবিয়া সে পদাঘাতে দ্বার ভঙ্গ করিয়া দেখিল কুটীরমধ্যে জ্যোতিঃপূর্ণ বাবাজি মহারাজ ধ্যানমগ্ন; চতুর্দ্দিক আলোকিত,

কুটীরমধ্য হইতে অপূর্ব্ব পুষ্পগন্ধ প্রসৃত হইতেছে। দেখিয়া ভীম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাপনোদনে আবার দেখিল পূর্ব্ববৎ শ্রীমন্দির দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, আর কোন শব্দ নাই। সে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল এবং কয়েকদিন আত্মগ্লানি ভোগ করিয়া পরে বাবাজি মহাশয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। বাবাজি মহাশয় তাহাকে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া বলিলেন—"ভীম! আজ হইতে তুমি গৌরদাস হইলে। তুমি হরিনাম কর ও বৈষ্ণবসেবা কর।" সেইদিন হইতে পাষণ্ড ভীম বৈষ্ণব হইল।

একদিন সিদ্ধবাবা গঙ্গাস্নান করত তীরে উঠিয়া কৌপীন পরিতে-ছেন—এমন সময় প্রবল বায়ুভরে সিদ্ধবাবার কৌপীনখণ্ড তাড়িত হইয়া উড়িতে লাগিল—সাবধানে কৌপীন সংযত করিতেও কিছু সময় কাটিল। গঙ্গাঘাটে বহু কুলবালা স্নান করিতেছিলেন—তাঁহারা সিদ্ধ বাবার প্রভাবাদি জানিতেন সুতরাং লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। এই সময়ে সেই ঘাটে চারিচাড়ানিবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জগদীশ মৈত্র উপস্থিত ছিল—সে বৈষ্ণবদ্বেষী ও উগ্রপ্রকৃতি ছিল। ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধভরে সিদ্ধ বাবাকে বলিলেন—"নদীয়ার লম্পট বাবাজির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে! তুমি কুলবধূগণ-সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া কি করিতেছ? শীঘ্রই এস্থান হইতে দূর হও, নচেৎ 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়!' হইবে।" বাবাজি মহাশয় লজ্জিত হইয়া বিনয় করিলেও মৈত্র অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল—'এই লম্পট বেটা নিজ অপরাধ স্বীকার না করিয়া বায়ুর দোষ দিতেছে।' এই বলিয়া সিদ্ধ বাবাকে এক চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে সেখান হইতে দূর হইতে বলিল। গঙ্গাঘাটের নরনারী 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। বাবা সহাস্যবদনে নির্ব্বিকার চিত্তে প্রহারকারী ব্রাহ্মণকে করযোড়ে বলিলেন—'প্রভু! আমি অপরাধের অনুরূপ শাস্তি পাইয়া পরম শিক্ষা লাভ করিলাম। আপনি আমার

গুরু। এরূপ কার্য্য আর কখনও করিব না। এই ঘটনার তিন দিন পরেই জগদীশের জরবিকার উপস্থিত হইল—আর কেবল 'বাবাজি মহাশয়! ক্ষমা করুন, আমি অপরাধী—এইরূপ প্রলাপ বকিতে লাগিল। মৈত্র দেখিতেছে যে তাহার শিয়রে সেই সিদ্ধ বাবা দাঁড়াইয়া তখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন—মৈত্র পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার আত্মীয়গণ সিদ্ধ বাবার নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাবাজি মহাশয় শ্রীগৌরের চরণতুলসী দিয়া বলিলেন 'এই পরমৌষধি সেবন করাইলে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে।' ব্রাহ্মণ সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া সেই অবধি বৈষ্ণবদ্বেষ ত্যাগ করিল ও শ্রীগৌরচরণে আত্মসমর্পণ করিল। সিদ্ধ বাবা শ্রীগৌরাঙ্গকে 'জীববল্লভ' এই নূতন নামে ডাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীবল্লভ আর শ্রীগৌর জীববল্লভ। নবদ্বীপে গানের সময় একদল কীর্ত্তনীয়া মাথুরবিষয়ক গৌরচন্দ্র গাহিতে আরম্ভ করিয়া পদ ধরিল—'নদীয়া ছাড়িয়া গেলা গৌরসুন্দর।' সিদ্ধ বাবা স্থির থাকিতে না পারিয়া ক্রোধাবেশে যষ্টি লইয়া কীর্ত্তনগায়কের সম্মুখে গিয়া বলিলেন—'ঐ ত জীবের জীবন নবদ্বীপচন্দ্র বিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; পুনরায় যদি ঐ কথা বল, তোমাকে মারিয়া দূর করিয়া দিব।' মহাপ্রভুর মন্দিরে তখন মহাগোলযোগ, কীর্ত্তনীয়ার গান বন্ধ হইল; অন্য পালা আরম্ভ হইল। তদবধি বহুদিন যাবৎ মহাপ্রভুর মন্দিরে মাথুরলীলা গান হয় নাই।

একদিন সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবা শ্রীমন্দিরাঙ্গনে সম্মার্জনীহস্তে ঝাড়ু করিতেছেন, এমন সময় কালনার সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজি মহাশয় শ্রীগৌরদর্শনাশে প্রাঙ্গণে আসিলেন। শ্রীচৈতন্যদাস জানিতেন যে শ্রীভগবান্ দাসও গৌরপ্রেমিক। তাঁহার মনে হইল যে বুঝি তাঁহার প্রাণবল্লভকে ভুলাইয়া কালনায় লইয়া যাইবার জন্য শ্রীভগবান্ দাস

আসিয়াছেন—এই কথা ভাবিতেই তিনি সম্মার্জনী হস্তে ছুটিয়া আসিয়া ভগবান্ বাবাজিকে বলিলেন—'তুই আমার প্রাণবল্লভকে ভুলাইয়া কালনায় লইয়া যাইতে বুঝি এসেছিস্। শীঘ্র বাড়ীর বাহির হও, নতুবা এই ঝাঁটা মারিয়া বাড়ীর বাহির করিব !!' সিদ্ধ চৈতন্যদাসজির এই ব্যবহারে জনতা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও কিন্তু স্থির গম্ভীরভাবে সিদ্ধ ভগবান্ দাসজি বলিলেন—'সতীন্! তুমি এত রাগ করিতেছ কেন? আমি তোমার প্রাণবল্লভকে নদীয়া ছাড়া করিতে চাহি না, তবে তিনি তোমাকে লুকাইয়া কোন কোন দিন কালনায় যান! তুমি দিদি সাবধানে তাঁহার চালচলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিও।' এই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদাস রাগে ও অভিমানে প্রাণবল্লভের শ্রীবদনের প্রতি প্রণয়রোষ-কষায়িত নয়নে চাহিয়া বিস্তর রোষোক্তিবর্ষণ পূর্ব্বক অভিমানিনীভাবে নিজ কুটীরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং ভূমিশয্যায় শয়ন করত আপন মনে তাঁহার প্রাণবল্লভকে কত বলিলেন। অভিমানের ক্রন্দনরোল উঠিয়া সকলের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পরে দ্বার খুলিয়া সিদ্ধ ভগবান্ দাসজীকে অভ্যন্তরে নিয়া আবার দ্বাররোধ করিলেন। তারপরে দুই জনের অপূর্ব্ব মিলন, পরস্পর হাতধরাধরি করিয়া শ্রীগৌরসম্মুখে নৃত্যগীতাদি চলিতে লাগিল।

সিদ্ধ ভগবান্ দাসজি একবার শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার পথে ইঁহাকেও সঙ্গে লইবেন ভাবিয়া শ্রীনবদ্বীপে আসেন। তিন দিন সাধ্যসাধনায় পর উভয়ে একত্র যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। যাত্রার দিন কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীচৈতন্য দাস মন্দিরের দ্বারে আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—লোক-সংঘট্ট হইল; বহুক্ষণ হরিনাম শুনাইয়া বাবার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে শ্রীভগবান্ দাসজি বলিলেন—'কাজ নাই তোমার শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া—নবদ্বীপই তোমার বৃন্দাবন।' শ্রীচৈতন্য দাসের আর বৃন্দাবন যাওয়া হইল না।

শ্রীঅদ্বৈত-জন্মোৎসবে শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে ও শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ-মন্দিরে এই দুই দিন ব্যতীত সিদ্ধ বাবা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদই পাইতেন। একদা একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করত তাঁহার কুটীরে সিদ্ধ বাবাজিকে লইয়া প্রসাদ পাওয়াইলেন। মহাপ্রভুর প্রসাদ দিতে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় সেবাইত গোস্বামিগণ সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেন প্রসাদ পাইলেন না। তদুত্তরে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'আজ আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সে আমার কামভাব উদ্দীপনা হইয়াছে!!' এ কথায় একজন প্রাচীন গোস্বামী বলিলেন—'আপনি নিশ্চয়ই পাপান্ন ভক্ষণ করিয়াছেন।' অনুসন্ধানেও জানা গেল যে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ বৈষ্ণবটী স্ত্রীসঙ্গী। সিদ্ধ বাবাকে সকলে প্রবোধ দিয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ পাইতে বলিলেন। সিদ্ধ বাবা তখন করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন—'প্রাণনাথ, পতিত-পাবন! তুমি আমাকে দয়া কর! আমার প্রাণ গেল! আর আমি এমন কাজ করিব না। এই তোমার সম্মুখে নাকে কানে খত দিলাম—এই বলিয়া তিনি প্রাঙ্গণে পড়িয়া দশ হাত নাকে খত দিলেন।

একবার গ্রহণের কালে সিদ্ধ বাবা শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিতেছিলেন—চারিপার্শ্বে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিও পুরশ্চরণে মগ্ন রহিয়াছেন—সিদ্ধ বাবা আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া কেবল 'গৌরাঙ্গ-নাগরী হব'—এই এই মন্ত্রই জপ করিতেছিলেন—তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই কি মন্ত্র জপ করিতেছেন বাবাজি মহাশয়?' বাবাজি বলিলেন—'তোমরা তোমাদের মত জপ কর, আমি আমার মত জপ করিতেছি। যার যেমন ভাবনা, তার তেমনই সিদ্ধি হবে।'

শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজের ভেকের গুরুর নাম অনিশ্চিত,

কেহ বলেন তাঁহার নাম ছিল—শ্যামানন্দ (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ ১।৩৫ পৃঃ)। নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে (রামতনু মুখোপাধ্যায়) ভাগবত ভূষণ * তাঁহার কার্য্যকলাপ ও আকৃতি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলাগড়ে জীড় নৃসিংহের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করান। সেই হইতে ইহার ভজন আরম্ভ হয়। † নিষ্কিঞ্চন ভাব, স্বাভাবিক বিনয় ও ভক্তি-ভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। বিড়াল, কুকুরকেও তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও তিনি ছেঁড়া কাঁথা, নারিকেলের মালা এবং একটি রজের করোয়া ব্যতীত অন্য কিছুই ব্যবহার করিতেন না। নিজেকে তিনি গৌর-নাগরী বলিয়া অভিমান করিতেন এবং সেই আবেশে নারীবেশ ধারণ করত শ্রীগৌরের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং বাহ্য-বেশ হইলে নাগরীবেশ ত্যাগ করিতেন। তাৎকালিক সেবাকার্য্য তাঁহারই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। মধ্যাহ্নে তাঁহার নিয়ম ছিল—কোন অতিথি অভ্যাগত আসিয়াছে কিনা দেখিয়া পরে প্রসাদ পাইতেন। কোন অতিথি না পাইলে দ্বারের নিকটে যে কুকুর দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহাকেই আদর করিয়া ডাকিয়া ভিতরে নিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক উত্তম ধৌত কদলীপত্রে প্রসাদ গ্রহণ করাইতেন ও পরে নিজে গ্রহণ করিতেন।

---

* ইহার বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

† [শ্রীল গৌরশিরোমণি মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় হইতে সংগৃহীত] শ্রীল বাবাজি মহাশয় এক মুচিকে চেলা করেন—তাঁহার গুরুদত্ত নাম—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ দাস। সে গঙ্গাতীরে থাকিয়া ভজন করিত। এজন্য নবদ্বীপের গোস্বামিগণ তাঁহাকে সমাজে আটক করেন এবং ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া দেন। এই ঘটনায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বপ্নাদেশে গোস্বামিগণকে জানাইলেন যে বাবাজি সিদ্ধভক্ত—তাঁহার পক্ষে মুচি চেলা করা দোষাবহ নহে। এই প্রত্যাদেশের ফলে গোস্বামিগণ বাবাজিকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে থাকেন, এবং 'সিদ্ধ বাবাজি' বলিয়া তাঁহারও নাম প্রচার হয়।

শ্রীনবদ্বীপ-বাসকালে নবদ্বীপবাসী ভুবন বিদ্যারত্ন, ব্রজ বিদ্যারত্ন, অজিত ন্যায়রত্ন, দীননাথ চূড়ামণি ও পূর্ব্বস্থলীবাসী রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার বিনয় ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন।

কথিত আছে যে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—'কিসে ভক্তি হয়?'' তদুত্তরে বাবাজি মহাশয় বলেন—'দুটি পয়সায় ভক্তিলাভ হয়।' শুনিয়া শিশির বাবু বলিলেন—'সে কি কথা? দু'পয়সায় ভক্তি লাভ হয়! আপনি আমাকে উপহাস করিলেন!' বাবাজি বলিলেন—'হরে কৃষ্ণ! উপহাস করি নাই, ঠিকই বলিয়াছি। দু'টি পয়সা দিয়া বটতলার ছাপা শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা কিনে কিছুকাল পড়ুন, তাহা হইলেই ভক্তিলাভ হইবে।'

ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভুও তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া বাবাজি মহারাজ কোন উত্তর না দিয়া একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, মস্তকের শিখাটিও খাড়া হইল। অস্ফুটস্বরে গভীর হুঙ্কার-সহকারে তিনি বলিলেন—'কি বল্লে গোঁসাই? তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়? তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়?' এই বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া তিন ঘণ্টা রহিলেন। এ সময়ে তাঁহার দেহে অশ্রু, কম্প পুলকাদি, আশ্চর্য্য ভাবভূষণ দেখিয়া গোস্বামিপ্রভু অবাক্ হইয়া গেলেন। সমাধি-ভঙ্গের পর বাবাজি সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলে—'প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গাল হইতে পারি। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ত ভক্তির নামগন্ধও নাই। এখন আপনি যেভাবেই চলুন না কেন—আপনার তিলক ও কণ্ঠে মালা আমি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি। ভক্তি ত আপনারই ভাণ্ডারের জিনিষ। আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি ভক্তির

অভাব আছে?' বলা বাহুল্য—এই ভবিষ্যৎ বাণী শ্রীগোস্বামিপ্রভুর জীবনে উত্তরকালে অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল।

তিনি সর্ব্বদাই 'গোরা গোরা' জপ করিতেন। লক্ষ গোরা নাম-লিখিত একখানি পুঁথির তিনি নিত্য পূজা করিতেন।* দিবসের অধিকাংশ সময়ই আবিষ্ট থাকিতেন—কদাচিৎ এক ঘণ্টা নিদ্রা হইত, নিদ্রাকালেও শ্বাস-প্রশ্বাসে গোরা গোরা ধ্বনি হইত। শ্রীখণ্ডে অবস্থান-কালে ইনি ভাবাবেশে রন্ধনশালায় গিয়া দেখিলেন যে অন্ন ফুটিতেছে, অপর দিকে শিলায় পিষ্ট হরিদ্রা রহিয়াছে—ফুটন্ত অন্নে ঐ বাটা হলুদটুকু ছাড়িয়া দিয়া তিনি গৌরবর্ণ দেখিয়া অধীর হইয়া গেলেন। একদিন এক নাপিত তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে করিতে হাই তুলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তুড়ি দিয়া 'গৌর, গৌর' বলিলেন। বাবাজি মহাশয় গৌর-নাম শুনিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বাহ্যাবেশ হারাইলেন।

শ্রীল গৌরশিরোমণি মহাশয়ের † আমলে তিনি মাঝে মাঝে কাটোয়ায় আসিয়াও থাকিতেন। কাটোয়ার অনতিদূরে গঙ্গার সহিত যেস্থানে অজয় নদীর সঙ্গম, তাহাকে 'তেমোহনি' বলে। শুনা যায়—একদিন শ্রীল বাবাজি মহাশয় তেমোহনির ধারে শৌচে গিয়াছিলেন। হঠাৎ অজয়ে বান আসিয়াছে—অজয়ের জল সাধারণতঃই লাল—বর্ষাকালে ত কথাই নাই—তীরবেগে অজয়ের জল দুকুল ছাপাইয়া গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। অতিবৃদ্ধ সিদ্ধ বাবা তখন কোন ভাবের আবেশে সেই মহাতরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। তীরস্থিত সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং ভাবিলেন যে বৃদ্ধ বাবাজির আর

---

* এই পুঁথিখানির কিয়দংশ শ্রীখণ্ডে শ্রীশ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রীজির গৃহে এবং দুই এক পত্র বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ মন্দিরে সংরক্ষিত আছে।

† শ্রীশিরোমণি মহাশয় সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজের শিষ্য ছিলেন।

রক্ষা নাই—অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে তিনি অক্ষত শরীরে নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিলেন।

শেষ জীবনে গৌরে তাঁহার এত প্রগাঢ় আবেশ হইয়াছিল যে কদাচিৎ বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইত। এই অবস্থায় একদিন তিনি নাগরিকবেশে তাঁহার প্রাণেশ্বর গৌরাঙ্গপ্রভুর বামে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘোমটার ভিতর দিয়া আড় নয়নে গৌরাঙ্গের মুখচন্দ্রের সুধা পান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মত্ততা আসিয়া পড়িল—লজ্জা সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল; তিনি তাঁহার প্রাণের কথা—

'আমার ভজন হ'ল সারা, আমার পুজন হ'ল সারা।
নদের চাঁদের * কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা॥'

গাহিতে গাহিতে তাঁহার প্রাণেশ্বরের নয়নে নয়ন রাখিয়া (৩৯২ গৌরাব্দে অগ্রহায়ণী পূর্ণিমায়) অন্তর্ধান করিলেন। শ্রীগৌর-প্রাঙ্গণে তাঁহার অস্থি-সমাধি বর্ত্তমান। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয় বহুদিন ঐ সমাধির সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীচোঁয়াধারী বাবাজি মহারাজ (একচক্রা গর্ভবাস)

ইঁহার জীবনী-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শেষ জীবনে ইনি শ্রীধাম একচক্রা গর্ভবাসে অবস্থান করত ভজন করিতেন। বাঁশের একটি চোঁয়া জলপাত্ররূপে ব্যবহার করিতেন বলিয়া তিনি ঐ দেশে 'চোঁয়াধারী বাবাজি' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

রাজসাহী জেলার কোনও অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে ইনি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন।† ইঁহাকে দেখিয়া ইঁহার বয়স-নিরূপণ হইত না।

---

* শ্রীগৌরাঙ্গের—পাঠান্তর।

† শ্রীগৌরাঙ্গসেবকে (৩।৬) ৩৩৮ পৃষ্ঠায়—ইনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-বংশীয়, পূর্ব্ব-নিবাস—শান্তিপুরে।

কয়েকজন ভক্তের নিকট ইনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভাগিনেয়ের বিবাহে তিনি বরযাত্রী হইয়াছিলেন—ইহা হইতে ধারণা হয় যে তিনি অত্যধিক বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

এই মহাত্যাগী পুরুষ টাকা পয়সা স্পর্শ করিতেন না—ধাতুপাত্রও ব্যবহার করিতেন না। কখনও কাহার বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য যাইতেন না বা কাহাকেও কিছু চাহিতেন না—যাহা আপনা আপনি উপস্থিত হইত, তাহাই একপাকে রান্না করিয়া স্বসেব্য শ্রীশ্রীগিরিধারীজিউর ভোগ দিয়া তিনি প্রসাদ পাইতেন। সেবাপূজাদি অতি সংক্ষেপে; ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নানাদি ক্রিয়া সমাধা হইত। যে ঘাটে স্ত্রীলোক স্নান করে, তিনি সে ঘাটের জল স্পর্শ করিতেন না। অঘাটা হইতে সেই চোঙ্গা (বংশপাত্র) দিয়া জল আনিতেন। তিনি স্বভাব-গম্ভীর অথচ বালকের ন্যায় সরল, উদার ও হাস্যময় ছিলেন। তাঁহার আশ্রমে আগত অতিথিকেও তিনি মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতেন—প্রদত্ত প্রসাদের আস্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব পদার্থ জীবনে ভুলিবেন না। জতুগৃহ-দাহের পর পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে পলাইয়া আসিয়া যে ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং যে স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তত্রত্য বকাসুরকে বধ করেন—সেই ব্রাহ্মণের বাস্তু-ভিটাটি তিনি উদ্ধার করিয়া উহাকে **'পাণ্ডবতলা'** নাম দেন এবং এস্থানে তিনি দিবাভাগে এবং তাঁহার আশ্রমকুটিরে রাত্রিকালে থাকিয়া ভজন করিতেন। তিনি রাত্রিতেও নিদ্রা যাইতেন না—সমগ্র রাত্রিই ভজনে কাটাইতেন। পাণ্ডবতলায় একটী প্রাচীন নিম্ববৃক্ষের তলে যে শ্রীগিরিধারীমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, তাহাই তিনি অতিপ্রেমে সেবা করিতেন এবং নিত্য বৈকালে ঐ গিরিধারীকে ঝুলনে রাখিয়া ঝুলাইতেন। কখনও কাহারও বাড়ীতে তিনি যাইতেন

না, বরং বলিতেন যে গৃহস্থরা ভজন না করিয়া মৃত এবং তাহারা নিরন্তর শ্মশানে বাস করে। ১৩২০ বঙ্গাব্দে ৩রা আষাঢ় শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে তিনি অপ্রকট হন। তাঁহার আশ্রমে তদীয় সমাধি দেওয়া হইয়াছে।

(পণ্ডিত) শ্রীজগদানন্দ দাস বাবাজি মহাশয়
(শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী)

ইনি সম্ভবতঃ ফরিদপুর জেলায় কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮।১৯ বৎসর বয়সে ঐ জেলার রামদিয়া গ্রামের আখড়ায় মোহান্ত শ্রীভগবান্ দাস বাবাজি মহাশয়ের নিকট ভেক গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ইনি কোথায় অধ্যয়ন করেন—জানা যায় নাই। তবে তৎকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত কেহই ছিলেন না। যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চাতে অধিক সুখ পান, ভজনশীল বৈষ্ণবগণের অপেক্ষা তাঁহাদের রীতিনীতি একটু পৃথক্ হয়। কাম্যবনের সিদ্ধ শ্রীজয়কৃষ্ণ বাবা, গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা এবং সূর্য্যকুণ্ডের সিদ্ধ শ্রীমধুসূদন বাবা প্রভৃতির সঙ্গে ইঁহার হৃদ্যতা থাকিলেও তাঁহাদের ভাবে ইঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ বাবার সঙ্গে অনেক সময়ে পরমার্থ-চর্চ্চায় ইঁহার প্রেম-কলহ হইত। সিদ্ধ বাবার দেহত্যাগের পরে একবার ইনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—'শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয়ের সঙ্গে কলহ করিয়া যে সুখ পাইয়াছি, এখন কাহারও সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াও সেই সুখ পাই না'।

ইনি খুব সদাচারনিষ্ঠ ছিলেন—দিবসে একবার মলত্যাগ, একবার প্রস্রাব ও একবার স্বপাকভোজন করিতেন। একবার গৌড়মণ্ডল হইতে জনৈক আচার্য্যসন্তান তাঁহার নিকট হরিকথা শুনিতে আসিয়া-

ছিলেন—সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সারা রাত্রি উভয়ের হরিকথা হইত—এই সময়ে কেহই নিদ্রা যাইতেন না।

কোনও সময় কাটোয়ার বড় প্রভু ঢাকার উথলী-নিবাসী শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান ব্রজে আসিয়া এই পণ্ডিত বাবাজি মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি সেবিকাও ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের সমাজ-সংলগ্ন একটি কুটীরে বাবাজি মহাশয় থাকিতেন—তিনি এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ আগ্রহ করিলেও প্রভু কাহারও কুটীরে প্রবেশ করিলেন না—বাহিরেই বসিলেন এবং পণ্ডিত বাবাজিকে বলিলেন—'উপাস্য শ্রীকৃষ্ণই, তবে আমি অজিতেন্দ্রিয় —আপনাদের কুটীরে যাওয়ার যোগ্য নহি।' তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং দৈন্য বিনয় দেখিয়া পণ্ডিত বাবাজি বলিলেন—'যে কেহ ইহার আচরণের অনুকরণ করিবেন, তাঁহারও সর্ব্বনাশ হইবে; যে কেহ ইঁহাকে কটাক্ষ করিবেন, তাহারও সর্ব্বনাশ হইবে।'

শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করার পূর্ব্বে ইনি কিছুদিন সূর্য্যকুণ্ডেও ছিলেন; শ্রীকুণ্ড হইতে সূর্য্যকুণ্ড ৩।৪ মাইল উত্তরে—তথায় প্রায়ই যাতায়াত ছিল। শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে ইনি একবার গ্রীষ্মকালীন জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে সূর্যকুণ্ড-দর্শনার্থে বাহির হইলেন। একাকী চলিয়াছেন—পথও ভুলেন নাই, অথচ তিনি ভোরের বেলা সূর্য্যকুণ্ডে পৌঁছিলেন—তখন তত্রত্য বৈষ্ণবগণ জাগিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিতেছেন। সূর্য্য-কুণ্ডের সিদ্ধ বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখন ত ভোর হইয়াছে, এই সময় আপনি কোথা হইতে আসিলেন?' 'ভোর হইয়াছে'—শুনিয়াই ইনি চমকিত হইয়া রহিলেন—'এই ত আমি সন্ধ্যাকালে বাহির হইয়াছি!' তখন দুইজনেই বসিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের কমলের ন্যায় সঙ্কোচ ও বিকাশ-বিষয়ে বিস্ময়ের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এই পণ্ডিত বাবাজির নিকট অনেকেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবিষ্কৃত গরাণহাটী কীর্ত্তনের তাৎকালিক অদ্বিতীয় গায়ক ও শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অধ্যাপক শ্রীঅদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজি মহাশয়ও ইঁহারই ছাত্র। [তাঁহার মুখাশ্রিত ইতিবৃত্তই এস্থলে সঙ্কলিত হইল]।

সিদ্ধ শ্রীজগদীশ বাবাজি মহাশয় (কালীয়দহ)

বর্দ্ধমানে কোনও কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্ম—উত্তরকালে বড় ডাক্তার হন। কালনাতেই চিকিৎসার প্রসার ছিল। পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়দের মধ্যে বর্দ্ধমানে উকিল ছিলেন। ইনি গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার সুপুরুষ ছিলেন। সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজি মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সিদ্ধ বাবা তাঁহার নিকটে সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীহরিনাম করিতে ও সাধারণ ভক্তি যাজন করিতে উপদেশ করিতেন। শ্রীজগদীশ বাবা তাঁহার স্বাভাবিক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—লীলাকথাদ্বারা নহে বলিয়াই মনে হয়। সিদ্ধ বাবার শেষ অবস্থার একদিন শ্রীজগদীশ বাবাকে ডাকিয়া বলেন 'এই নাম কয়েকটা লিখিয়া নে, পরে কাজ দিবে।' জগদীশ বাবা ঐ নাম কয়েকটীতে নিজের শ্রীগুরুপ্রণালীই পাইলেন। শ্রীজগদীশ দাসজি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীমদনমোহনের পুরাতন মন্দিরে বহুদিন বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজি মহাশয়ের কৃপাতেই গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ও সৎসঙ্গ দ্বারা নিজাভীষ্ট ভজন বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তিনি মাধুকরী দ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিতেন। একবার এই সময়ে তিনি বর্ষাণে গিয়াছিলেন—সেস্থানে তখন সিদ্ধ নিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহারাজের চেলা শ্রীজগদানন্দ দাস বাবাজি মহাশয় এবং শ্রীমাধবদাস বাবাজি মহারাজ বাস করিতেন। শ্রীজগদীশ

বাবার তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীজগদানন্দজি মহাশয়ের মনে হইল যে উনি যোগ্যপাত্র, বর্ষাণে থাকিয়া ভজন করিলেই ভাল। এই স্থির করিয়া তিনি শ্রীমাধব দাসজিকে বলিলেন—"তুমি শ্রীজগদীশ বাবাজিকে বল এতদিন ত শ্রীবৃন্দাবনে ভজন করিলেন, এক্ষণে ব্রজের গ্রামে থাকিয়া ভজন করুন।" শ্রীমাধব দাসজি তাঁহার শিষ্যাদি হইতেও বয়ঃকনিষ্ঠ, তিনি বলিলেন—"ইনি প্রাচীন মহানুভব বৈষ্ণব—ইঁহাকে আমি কি করিয়া এ কথা বলিব?" শ্রীজগদানন্দজির পুনঃ পুনঃ প্রেরণায় শ্রীমাধব দাসজি বলিলেন—"এই বাবাজি মহাশয় আপনাকে বল্ছেন—এতদিন ত বৃন্দাবনে বাস করিয়া ভজন করিলেন, এখন কিছুদিন ব্রজের গ্রামে ভজন করুন।" শ্রীজগদীশ বাবা তদুত্তরে বলিলেন—'না বাবা, আমাদের সে অধিকার নাই; আবার কোন উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে বৃন্দাবনেই ত যেতে হবে, তার চেয়ে আগেই সেখানে গিয়ে পড়ে থাকি।' শ্রীজগদানন্দ দাসজিকে একথা অবশ্যই ভাল লাগে নাই। তবে কিছুদিন পরে শ্রীজগদানন্দ দাসজি অতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া বৃন্দাবনে গেলেন; তখন আর মাধুকরী করিবার শক্তি ছিল না। শ্রীমাধব দাসজি দুইটি অন্ন রান্না করিয়া ভোগ দিতেন—শেষকালে অতি উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে দেহরক্ষা করিলেন।

অতঃপর শ্রীজগদীশ বাবা কালীদহে আসিয়া একটি ছোট কুটিরে বাস করিতে লাগিলেন। যদিও মাধুকরী করিতেন, তথাপি তিনি লবণ ত্যাগ করিলেন। ক্ষৌরের জন্য নাপিতের কাছে যাতায়াত বিড়ম্বনা মনে করিয়া একখানি কাঁচি নিজে রাখিতেন এবং তদ্দ্বারা নিজেই দাঁড়ি চুল কাটিয়া ফেলিতেন। তিনি স্বভাবতঃই বৈষ্ণবের দাঁড়ি চুল বৃদ্ধি দেখিতে পারিতেন না।

মাধুকরী করিতে প্রায় প্রতিদিনই তিনি শৃঙ্গারবটে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ

প্রভুর গদিতে আসিতেন। তৎকালে শ্রীপ্রেমানন্দ গোস্বামিপাদ ঐ গদির অধিপতি ছিলেন। তিনি বাবাজি মহাশয়কে প্রীতি করিতেন, বাবাজি মহাশয়ও তাঁহাকে প্রীতি এবং ভক্তি করিতেন। একদিন তিনি মাধুকরীতে আসিয়াছেন, মুখে উল্লাস নাই, মলিন। প্রভুপাদ দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ মুখে উল্লাস নাই কেন?' বাবাজি মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'সব ত আপনাদেরই হাতে, আজ ভাগ্য মন্দ।' প্রভুপাদ ব্যাপার বুঝিলেন। সেই সময়ে শ্রীযমুনা শৃঙ্গারবট ঘেষিয়া প্রবাহিত হইতেন—পরিক্রমার যাত্রিগণকেও শ্রীমহাপ্রভুর প্রাঙ্গণ হইয়াই পরিক্রমা করিতে হইত। প্রভুপাদ ব্যাকুলভাবেই বাবাজিকে বলিলেন—'মাধুকরী ঝোলা রাখিয়া এই স্থানে আপনি গড়াগড়ি দিন।' শ্রীবাবাজি মহাশয় তাহাই করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে ভজনোল্লাস হইল। যে স্থানে তিনি গড়াগড়ি দিলেন, সেই স্থানের উপর দিয়া পরিক্রমার সকল মহাত্মাকেই যাইতে হইত। তাহার প্রায় ১৫।২০ বৎসর পরে প্রভুপাদ অপ্রকট হইলেন; তাঁহার (প্রভুপাদের) শিষ্য শ্রীমাধবদাস বাবাজিকেও তিনি বিশেষ প্রীতি করিতেন। শ্রীমাধব দাসজিও প্রায় প্রতিদিন তাঁহার নিকট যাইতেন—তখন শ্রীমাধব দাসজি কেশিঘাটে শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোস্বামিজির 'সমাজবাড়ী'-নামক ঠৌরে বাস করিতেন। একদিন সকালে শ্রীজগদীশ বাবা মলিন মুখে শ্রীমাধব দাসজির নিকট আসিলেন। ইনি তাঁহাকে আসন দিয়া বসাইয়া অসময়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় পূর্ব্বে যে প্রভুপাদ তাঁহাকে রজে গড়াগড়ি দেওয়াইছিলেন, সেই ঘটনাটী তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন—'প্রভুপাদ ত আমার ভাগ্যে প্রকট নাই, তুমি আমাকে তাঁহার সমাধি-মন্দিরে লইয়া চল।' শ্রীমাধব দাসজি তাহাকে সঙ্গে লইয়া শৃঙ্গারবটে প্রভুপাদগণের সমাধি-বাটীতে আসিলেন। সিদ্ধ বাবা সমাধি দর্শন করত

সে স্থানে গড়াগড়ি দিতেই শ্রীপ্রভুপাদের কৃপায় মনে প্রাণে ভজনোল্লাস পাইলেন।

শ্রীজগদীশ বাবা অপরাধ-সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। 'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।' এই কথাটি তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কেহ তাঁহার নিকট যাইয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া উল্লাসের সহিত বিদায় হইলেই তাঁহার মনে আনন্দ হইত। আর যদি কাঁহারও ভাবান্তর বুঝিতেন, তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া মনে কোন দুঃখ পাইয়াছেন কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া লইতেন। একবার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অকস্মাৎ দেশ হইতে আসিলেন। বাবা যথাযোগ্য আদর স্নেহাদি করিলেন—ভ্রাতার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন—'বেশ ভালই হইল, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে, এসো দুই ভাই একত্র থাকিয়া ভজন করি।' ভাই চলিয়া যাওয়ার পরে বাবাজি মহাশয়ের মনে হইল—সে দুঃখ পাইয়াছে, আমি তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কিছু বলি নাই, ভজন করিতে বলিলাম। তাহাতে তাহার মনে উল্লাস ত দেখি নাই—তাহাতে নিশ্চয়ই সে দুঃখ পাইয়াছে। ভ্রাতা কোন্ বাড়ীতে উঠিয়াছে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই যে যাইয়া দেখা করিবেন। কথাচ্ছলে সে বলিয়াছিল যে পরশ্ব চলিয়া যাইবে। সেই কথানুসারে তিনি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে গাড়ী যাওয়ার সময়ে রেইলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। কয়েকদিন এরূপ করাতেও ভ্রাতার দর্শন পাইলেন না—তখন বর্দ্ধমানে তাঁহার পরিচিত জনৈক উকিলের নিকট পত্র দিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা যদি তাঁহার ব্যবহারে কোনও ব্যথা পাইয়া থাকেন, 'তাহা তিনি ক্ষমা করিলেন'—এ সংবাদটি যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। উকিলবাবু তাঁহাকে জানাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা দুঃখিত হন নাই এবং তাঁহার ভজন ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কায়

আর দেখা করিতে যান নাই। তখন হইতে বাবাজি মহাশয় এই নিয়ম করিলেন যে কেহ দেখা করিতে আসিলে তাহার বাসার ঠিকানাটি সর্ব্বাগ্রে জানিয়া লইতেন।

কাহারও প্রতি দোষ-দৃষ্টি অপরাধের বীজ, সুতরাং বাবাজি মহাশয় তদ্বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। কোথাও পাঠ-কীর্ত্তন শুনিতে গেলে পাঠক, গায়ক বা কোন শ্রোতার প্রতি দোষদৃষ্টি আসিলে অপরাধে নিজের সর্ব্বনাশ হইবে—এই আশঙ্কায় তিনি কোথাও যাইতেন না। ভজনাবেশে আগন্তুক লোকদের সঙ্গে কথা বলিতে অনেকেরই উৎসাহ থাকে না, ইনি কিন্তু তদ্রূপ ছিলেন না। মহাপ্রভু তাহাকে বাবাজি মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তরাদি বা উপদেশাদি দিয়া তাহার সেবা করাই নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। নিজ গৃহে বসিয়াও কোন গ্রন্থপাঠ করাইতেন না, কেন না তিনি মনে করিতেন যে পাঠের সময় যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাস্য লইয়া আসিয়া পাঠের অনুরোধে জিজ্ঞাসা করিতে না পারে, তবে মহা অন্যায় হইবে। তাই বলিয়া সেখানে কোন বাজে কথা হইত না, গোষ্ঠীতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকরাই থাকিতেন এবং ভক্তি-সিদ্ধান্তের কথাই প্রায়শঃ হইত।

তিনি বলিতেন যে তাঁহার শ্রীগুরুদেব সিদ্ধবাবা রাগানুগা ভক্তিটী প্রচার করেন নাই, তাঁহা দ্বারা তখন প্রকাশ করাইতেছেন। রাগানুগা-ভজন বিষয়েই ইনি উপদেশ করিতেন—'হাতের লেখা পাকা করিতে হইলে যেমন কোন পাকা লেখার উপর 'মকস' (লেখার উপর হাত ঘুরাণ) করিতে হয়, তেমনি লীলাস্মরণ করিতে হইলেও যাঁহারা ভজনে পরিপক্ক হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণের স্রোতানুসারে স্মরণ করিলে ভাল। স্মরণ কণ্ঠস্থ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। গ্রন্থ একখানি কাছে রাখিতে হইবে, স্মরণ আটকাইলে দেখিয়া লইতে

হয়, মন চলিলেই গ্রন্থ বন্ধ করিতে হয়। গ্রন্থ পাঠ করার নাম 'স্মরণ' নহে।

একদিন কোন যাত্রী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কয়দিন থাকিবেন?' উত্তর হইল—'তিন দিন'। বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে উপদেশ করিলেন–'ব্রজের একটি পিপীলিকা কিম্বা মশকের নিকটও যেন অপরাধ না হয়।' যাঁহারা ভজন করিবেন, তাহাদের পক্ষে উৎসবাদি কার্যে লিপ্ত হওয়া তাঁহার অনভিপ্রেত। তাঁহার শ্রীগুরুদেবের বার্ষিক দিবসে এক সের মালপোয়া আনাইয়া ভোগ দিয়া রাখিতেন। বিকালে বা রাত্রিতে যে কেহ তাঁহার নিকট আসিতেন, সকলকে একটু করিয়া প্রসাদ দিতেন।

তিনি বৃদ্ধ হইলে মুখে দাঁত ছিল না—শ্রীমাধব দাসজি নরম নরম উত্তম খাদ্য কোথাও পাইলে তাঁহাকে আনিয়া দিতেন। একদিন বাবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি প্রায়ই আমার জন্য এ সব খাবার কেন আন? কি তোমার অভিপ্রায়?' শ্রীমাধব দাসজি বলিলেন—'আমার কোনই অভিপ্রায় নাই, ভাল নরম খাবার দেখিলে আপনার কথা মনে হয়, তাই নিয়ে আসি।' তাঁহার আশঙ্কা ছিল—বিশুদ্ধ প্রীতি হইতেই শ্রীমাধব দাসজি তাঁহাকে খাবার দেন, না অন্য কোন উদ্দেশ্য?

সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজি মহারাজের তিরোভাব-উৎসবে একবার বৈষ্ণবসেবা করাইবার জন্য শ্রীজগদীশ বাবার ইচ্ছা হইল। কিনু-বাবু নামক জনৈক ধনী ভক্ত এই কথা শুনিয়া ৭০৲ টাকা দিয়া বৈষ্ণবসেবা করাইতে বলিলেন। জগদীশ বাবা স্বয়ংই বাজারে গিয়া ২০৲ টাকার গুড় খরিদ করিয়া নিজ ভজনকুটীরে আসিলেন। ইচ্ছা—মালপোয়ার মহোৎসব দিবেন। ভজনকুটীরের মধ্যে গুড়ের থলিয়া-গুলি রাখিয়া তিনি কূপের নিকট পদ ধৌত করিতে গেলেন।

কুটিরের দ্বারে শিকল তুলিতে ভুল হইল; ইত্যবসরে একদল বানর কুটীরে প্রবেশ করিয়া থলিয়াগুলি ছিঁড়িয়া পরমানন্দে গুড়ের মহোৎসব করিতে লাগিল। জগদীশ বাবাও পরমানন্দে এই বানরের মহোৎসবে গুড়ভোজন-লীলা দূর হইতে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে প্রেমধ্বনি করিতে লাগিলেন। বানরগণ মহানন্দে গুড় ভোজন শেষ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল। বাবাও সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত বিদায় দিয়া যথারীতি সন্ধ্যাকালে ভজনে বসিলেন। সন্ধ্যায় ভক্ত-সমাগম হইল—কিন্নু বাবু মহোৎসবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'অনেক বৈষ্ণবের সেবা হইয়াছে আপনার কৃপায়।' কিন্তু ইতস্ততঃ কোনও চিহ্ন না দেখিয়া এক কণিকা প্রসাদের জন্য জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধ বাবা এক মুখ হাসিয়া বলিলেন—'কুড়ি টাকার গুড় আনিয়াছিলাম—এই কুটিরেই ছিল—ব্রজবাসী শ্রীবানর-বৈষ্ণবগণ মিলিয়া সেই গুড়ের মহোৎসব করিয়া গিয়াছেন। ঐ দেখুন—থলিয়াগুলি পড়িয়া রহিয়াছে—উহা হইতে প্রসাদ গ্রহণ করুন। আর যে ২০৲ আছে, তাহা এই লউন। পুনরায় ইহা দ্বারা আপনিই বৈষ্ণবসেবা করাইবেন।' এই বলিয়া কিন্নু বাবুকে টাকা ফেরত দিলেন।

আর একদিন বাসনা জাগিল—শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী কালীয়দহে একটি প্রকাণ্ড দহ অর্থাৎ দীর্ঘিকা করাইয়া প্রাচীন দহের স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে হইবে। মনে উদয় হওয়া মাত্র তিনি রাজর্ষি বাহাদুরের ম্যানেজার ভক্তবর কামিনীকুমার ঘোষের নিকট ব্যক্ত করিলেন। কামিনীবাবুর দ্বারা কথাটি শ্রীবৃন্দাবনে ধনি-সমাজে প্রচারিত হইল। পরদিন লালা বাবুর বংশীয় জনৈক বিধবা রমণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ৭৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিলেন—হেতমপুরের রাজা ২৫ হাজারের প্রতিশ্রুতি করিলেন—রাজর্ষি বাহাদুর বাকী টাকার ভার নিলেন। জগদীশ

বাবার সহিত পরামর্শ করিয়া এষ্টিমেট্ করা হইল—ভাল ভাল পাথর দিয়া এই সুবৃহৎ দীর্ঘিকা সুন্দর ভাবে বাঁধান হইবে।

সেদিন রাত্রিতে সিদ্ধবাবার ভজন হইল না, কেবলমাত্র ঐ প্রস্তাবিত বিষয়ের চিন্তাতেই সারারাত্রি কাটাইলেন। তাহার ভজন নষ্ট হইল বলিয়া মনে এতাদৃশ ক্ষোভ হইল যে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে এক বনে চলিয়া গেলেন। ৪।৫ দিন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না—পরে হঠাৎ একদিন স্বয়ং আসিয়া ভজনকুটীরে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে তিনি নির্জন ভজনে বনে ছিলেন। দীর্ঘিকা খননের জন্য অনুমতি চাহিলে তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—'আমার বাসনা আমার দেহত্যাগের পর যদি কেহ ইচ্ছা করেন, পূর্ণ করিবেন। এই বাসনার তাড়নে আমার ভজন নষ্ট হইয়াছে। যদি কার্য্যারম্ভ হয়, তবে আমার সকলি সমূলে যাইবে। আমার মরণই তখন পরম মঙ্গল হইবে—অতএব তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি, এ বিষয়ে কোনও কথা আমাকে কখনও বলিও না।'

গোষ্ঠীতে তিনি মাঝে মাঝে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং প্রথমেই নিজের যাহা উত্তর বলিয়া দিতেন। এ বিষয়ে তিনি বলিতেন—'তোমরা কে কি বলিবে; আবার আমি তাহার বাদ প্রতিবাদ করিব, তাই আগে আমি বলিয়া দিতেছি, এক্ষণে তোমাদের যার যা মনে হয়, বল।' পরে আলোচনা হইত। একদিন রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'সর্ব্বত্যাগী জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস? শ্রীবৃন্দাবন ভূমি যাঁহা নিত্য লীলা রাস॥' এই ত শাস্ত্রবাক্য তুমি ত সর্ব্বত্যাগ কর নাই, তুমি কেন এখানে আছ?' বাবার প্রশ্ন শুনিয়া রাজর্ষি বাহাদুরের মাথা ঘুরিয়া গেল। কতক্ষণ পরে তিনিই বলিলেন—'যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ব্রজে বাস ও ভজন করিতে-

ছেন—তাঁহাদের সেবার জন্যই তোমাকে আনিয়াছে।' বলা বাহুল্য, রাজর্ষি বাহাদুর এই সময় প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া ব্রজবাসিগণের সেবা করাইতেন।

কোন সময় এক যাত্রী ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি করিলে আমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে, তাহার উপদেশ করুন।' তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখানে বাস করিতে পারিবে?' উত্তর হইল, 'না বাবা, আমার সে সঙ্গতি নাই।' তিনি বলিলেন—'তবে দুই আনা খরচ করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা কিনিয়া লইয়া যাও, তাহা সর্ব্বদা পাঠ কর এবং তদনুযায়ী যাজন কর, তাহাতে তোমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে।' ভক্তটি মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন—চিঠি পত্রাদি লিখিতে বাবার বিরক্তি থাকিলেও ভক্ত দুঃখ পাইবে মনে করিয়া তিনি উত্তর দিতেন এবং আর যেন পত্র না লিখেন, তাহাও জানাইয়া দিতেন। পরে ভক্ত আবার লিখিলেন—'বাবাজি মহাশয়! আপনাকে অনেক বিরক্ত করিতেছি, আর বিরক্ত করিব না, কি করিলে আমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে, তাহা সংক্ষেপে উপদেশ করুন।' তিনি উত্তরে লিখিলেন—'তোমার প্রাণে প্রেম-ভক্তি ব্যতীত যখন আর কোন কিছু চাই থাকিবে না, তখনই তুমি প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিবে।' ভক্তটি তার পরে আর পত্র দেন নাই।

তিনি বলিতেন—"যে ঠাকুর জগতে অবতীর্ণ হইয়া নামপ্রেম প্রচার করিলেন, তিনি করুণা করিয়া বলিলেন—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' সুতরাং তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শ্লোকের মর্ম্মানুযায়ী আচরণ করিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তোমার প্রেমলাভ হইবে না। যে পরিমাণে

এই শ্লোকের অভিপ্রায় যাজন করিতে সমর্থ হইবে, সেই পরিমাণে শ্রীপ্রেমভক্তিরও নিকটবর্ত্তী হইবে। যে দিন পূর্ণ যাজন হইবে, সেই দিন নিশ্চয়ই প্রেমলাভ করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকাররূপ মহা-কৃপালাভেও সমর্থ হইবে।" প্রায় সকলকেই বলিতেন—

'আপনাতে হীন জ্ঞান, অযোগ্যতা-বুদ্ধি।
ইহাতেই প্রেম, ইহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি॥'

কেহ কাহারও নিন্দা বা ত্রুটির কথা বলিলে কিরূপে সমাধান করিতে হইবে, তাহা তাঁহার শ্রীগুরুদেব সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজি মহাশয়ের কথা দ্বারা তিনি শিক্ষা দিতেন। একদিন তাঁহার কোন ভক্ত সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়কে বলিলেন—'অমুক ভক্ত আপনার এখানে আসিয়া ত অনেক কথাই বলে, কিন্তু এখনও মাছ ছাড়িতে পারে নাই!!' সিদ্ধ বাবা তাহাকে বলিলেন—'তুমিও ত কোন দিন মাছ খাইয়াছ?' ভক্ত—'আজ্ঞে হাঁ, এখন খাই না।' সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'এমনি সেও কোন দিন মাছ ছাড়িবে।' ইহাতে সিদ্ধ বাবা ঐ ভক্তের কথার অনুমোদনও করিলেন না, অথচ তাহাকে শিখাইয়া দিলেন—'নিজে যে দোষে দোষী ছিল, সেই দোষে অন্যকে দোষী বলা ঠিক নহে; জীবের ক্রমেই উন্নতি হয়, কাহারও দোষ দেখিতে নাই।'

বঙ্গাব্দ ১৩২২ সনের আষাঢ়ী শুক্লা ষষ্ঠীতে শ্রীজগদীশ বাবা প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে কালীদহে অন্তর্হিত হয়েন।

সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ

শ্রীবৃন্দাবনীয় শৃঙ্গারবটের [বাঁকুড়া জিলার পুরুণিয়া পাটের] শ্রীজগদানন্দ গোস্বামির শিষ্য এবং গোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবার ভেকের চেলা। [শ্রীল বিহারী দাস ব্রজবাসী বাবা বলিয়াছেন যে ইনি সূর্য্যকুণ্ডবাসী সিদ্ধ মধুসূদন দাস বাবার ভেকের চেলা]। একাদিক্রমে

তিন দিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। এই সিদ্ধ বাবা রাত্রেও শয়ন করিতেন না—সমস্ত রাত্রি বসিয়া শ্রীনাম করিতেন; ভোর পর্য্যন্ত তাঁহার নিত্যকৃত্য সব শেষ হইয়া যাইত। প্রাতে দধি চিঁড়া প্রসাদ পাইতেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীবিহারী দাস ব্রজবাসী মহাশয় তাঁহাকে ঝোড়ায় চাপাইয়া স্কন্ধে বহন করত তাঁহার ইচ্ছামত স্থানে লইয়া যাইতেন। একবার কোথাও যাইতেছেন —এমন সময় এক ভক্ত তাঁহাকে একটী টাকা দিলেন—উহা বিহারী দাসকে তুলিয়া লইতে বলিলেন। ২।৩ মাইল চলিয়া যাওয়ার পর বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে পূর্ব্ব স্থানে ফিরাইয়া লইতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি কুটীরে ফিরিয়া যে ভক্ত টাকা দিয়াছিলেন তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—'বাবা! তোমার টাকাটা ফিরাইয়া লইয়া যাও। শুনি—তোমার অনেক টাকা আছে; আমি একটা টাকার কামড় সহ্য করিতে পারিলাম না, তুমি এত টাকার কামড় কিরূপে সহ্য কর?' এই বলিয়া টাকাটি ফেরং দেওয়াইলেন। অহো! যাঁহারা ধ্রুবানুস্মৃতি লইয়া ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁহারা পার্থিব বস্তুর যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কল্প বিকল্প মনে আসিলেও সহ্য করিতে পারেন না।

সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবার শিষ্য ছিলেন—(১) বিহারী দাস বাবাজি, (২) ভাগবত দাস বাবাজি, (৩) গৌরহরি দাস বাবাজি, (৪) রামহরি দাস বাবাজি, (৫) রামদাস বাবাজি, (৬) বর্ষাণ-বাসী নিত্যানন্দ দাস বাবাজি, (৭) কদম-খণ্ডীবাসী হরেকৃষ্ণ দাস বাবাজি।

শ্রীবিহারীদাস ব্রজবাসীর উদ্যোগে সূর্য্যকুণ্ড-বাসিগণ মিলিয়া সিদ্ধ বাবার থাকিবার জন্য একটি পাকা ঘর ও একটি মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'দেখ বিহারী! এই মন্দিরে ঠাকুর বসাইতে হইবে। তুমি ঠাকুর লইয়া আস।' বিহারী দাসজি

ঠাকুর আনিবার জন্য কাটোয়া হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী সোনারুদ্দি গ্রামে এক তাঁতি জমিদারের নিকট গমন করেন। তিনি দাঁইহাট হইতে ঠাকুর আনিয়া বিহারী দাসের হাতে দিলেন। ইনি একটি নৌকায় করিয়া ঠাকুর লইয়া কলিকাতা হাটখোলার শ্রীনাথ রায়ের নিকট গমন করেন—রায় মহাশয় ৫০০৲ দিলেন, ক্রমে লাহাবাবুরা ১৫০০৲, কুমারটুলীর হরিদাস বাবু ২০০০৲ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আরো ১০০৲ ভিক্ষা পাইয়া বিহারী বাবা সূর্য্যকুণ্ডে সিদ্ধ বাবার নিকট ঠাকুর সহ পৌছিলেন। নূতন মন্দিরে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ স্থাপিত হইলে সকলে সোনার মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। উৎসব-উপলক্ষে সূর্যকুণ্ডের ও রাধাকুণ্ডের বৈষ্ণব ভোজন করাইতে ৩০০০৲ টাকা খরচ হইল। সোনার ঠাকুর মনে করত চুরি করিবার মানসে একদিন একদল ডাকাত সিদ্ধ বাবার কাছে যায়, সিদ্ধ বাবা বলেন 'বাবা, আমার নিকট ত কিছুই নাই, ঐ ঠাকুর-ঘরে যাও' তাহারা ঠাকুর ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং তত্রত্য যাবতীয় দ্রব্য ও ঠাকুরকে একটি কম্বলে বাঁধিয়া বাহির হইবার সময়ে চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া ডাকাত ও ঠাকুর উভয়েই ঘরের ভিতর পড়িয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছিল দেখিয়া ডাকাতগণ ঠাকুর ফেলিয়া অন্যান্য দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে। সিদ্ধ বাবা তখন বলেন—'এই ঠাকুর বৃন্দাবনে কাহাকেও দিয়া আস।' তখন বিহারী দাসজি ঐ ঠাকুর লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া মালদহ জিলার গয়েসপুরের মা গোঁসাইকে দুই হাজার টাকা ও ঠাকুর দিলেন—ঐ ঠাকুর এক্ষণে গোপালবাগের ধোপাপাড়ার 'সোনার গৌর'-নামে বিখ্যাত। আবার কিছুদিন পরে সিদ্ধ বাবা বলেন—'বিহারী! ঠাকুর না হইলে ত থাকা যায় না। যেখান থেকে পার, ঠাকুর লইয়া এস।' তখন বিহারী দাসজি রাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী মুখরা গ্রামে মণিপুরী বৈষ্ণব

দিনু বাবাজির এক মূর্ত্তি ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু—যাহা গরু খাইবার ভূঁসির ভিতরে লুক্কায়িত ছিলেন, তাহা লইয়া বৃন্দাবনে আসেন এবং দিনু বাবাজিকে বলিয়া উঁহার অঙ্গরাগাদি করিয়া যাবতীয় সেবাদ্রব্য লইয়া সূর্য্যকুণ্ডে আসেন। এবার দশ বৎসর এই বিগ্রহের সেবা করিয়া একদিন সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'বিহারী, এই ঠাকুর বৃন্দাবনে কাহাকেও দিয়া এস, আমি নবদ্বীপে যাইব। এ দেহটা যেন গৌরের পাদপদ্মে পড়ে। তখন বিহারী দাসজি ঐ ঠাকুর লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া গায়েসপুরের মা গোঁসাই হইতে ২৫৲ ভিক্ষা পাইয়া ঠাকুর ও ঐ টাকা গোপাল-গুরু মঠের অধিকারী শ্রীনরোত্তম দাসজীকে দিয়াছিলেন। ঐ সেবা বর্ত্তমানে নিধুবন গলিতে বিদ্যমান।

সূর্য্যকুণ্ড হইতে সিদ্ধ বাবাকে কাঁধে লইয়া বিহারী দাসজি মথুরা জংসন ষ্টেশনে আসিয়া বিনা টিকিটে নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় কেহ কিছু বলে নাই—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী মেমারি ষ্টেসনে নামিবার পর জনৈক সাহেব ইঁহার হাত ধরিয়া ফটক পার করিয়া দিল। তত্রত্য নেপাল বাবুর আখড়ায় গিয়া সিদ্ধ বাবা বিশ্রাম করত তথা হইতে গরুর গাড়ী করিয়া অম্বিকা কালনায় সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজির নিকট গমন করেন। সিদ্ধ ভগবান্ বাবা ইঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—'অহো! আমার বন্ধু আসিয়াছেন! বিষ্ণুদাস তুমি ইঁহাদের সেবার যোগাড় কর।' এই বলিয়া দুই বন্ধুতে আলিঙ্গন করত গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। বেলা দশটা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত ইঁহারা পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। বিষ্ণুদাসজি তাহা দেখিয়া বিহারী-দাসজিকে বলিলেন—'ভাই, যদি কোনও উপায় থাকে ত দেখ।' বিহারীদাস বলিলেন—'আজ তিন দিন আহার নাই, এদিকে ত এগারটা বাজে।' এই বলিয়া তিনি সিদ্ধ বাবাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া তাঁহার বুকে হাতে মালিস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ

পরে সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'বিহারি! তুই কিছু খাইয়াছিস্?' তিনি বলিলেন—'আজ্ঞে, আপনারা কেহ খাইলেন না, আমি কেমন করিয়া খাইব? রাত্রি ত এগারটা বাজিয়াছে!!' সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'দূর হ বেটা, এই ত সন্ধ্যা হইয়াছে।' তখন সকলে উঠিয়া প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন। সে স্থানে ১০।১১ দিন থাকিয়া সিদ্ধ বাবা নবদ্বীপে যাইবার কালে সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবা বলিলেন—'বিষ্ণু-দাস! ঐ বাঁশের চোঙ্গার ভিতরে কি আছে দেখ।' তিনি তাহার ভিতর হইতে আঠার টাকার রেজকী বাহির করিলেন। [ঐ সব ঠাকুরের প্রণামী বাঁশের চোঙ্গায় ধরা ছিল।] তখন ভগবান্ দাসজি বলিলেন—'বন্ধু নবদ্বীপে যাইবেন, উহাকে দে।' বিহারী দাসজি ঐ টাকা লইয়া একটি গরুর গাড়ী করিয়া রওনা হইলেন। রাস্তায় বিহারী দাসজি সিদ্ধ বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'নবদ্বীপে যাইয়া কোথায় উঠিবেন? বড় আখড়ায়?' তিনি বলিলেন—'না, না; কোন আখড়ায় যাইব না।' তখন বিহারী দাসজি বর্ত্তমান ভজনকুটীর যে স্থানে আছে, সেই স্থলে একটি বৃক্ষতলে রহিলেন। পরে মাধব দত্তের নিকট হইতে বিহারী দাসজি ৪০৲ চল্লিশ টাকায় দশ কাঠা জমি খরিদ করিয়াছিলেন। ঐ জমিটী একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত ছিল—বিহারী বাবা সিদ্ধ বাবার শয়ন দিয়া রাত্রিবেলা ছাড়ি গঙ্গা হইতে মাটি তুলিয়া উহাকে উচ্চ করেন। কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আসিলে উভয়ে মিলিয়া মহেশগঞ্জের নফর পাল চৌধুরীর নিকট ভিক্ষা করিয়া দুই খানি চালা ঘর করেন। আবার কিছুদিন পরে সিদ্ধ বাবার ইঙ্গিতে রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর তিন খানি ছোট ঘর ও চারিধারে প্রাচীর করিয়া দিলেন। কাইগাঁর বৃদ্ধা মনমোহিনী দাসী একটি কুয়া খোঁড়াইয়া দেন। সিদ্ধ বাবা এ স্থানে ৩২ বৎসর বাস করিয়া ১৪৭ বৎসর বয়ঃকালে নিত্যালীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সিদ্ধ বাবা চাতুর্ম্মাস্ত করিতেন—প্রথম মাসে সন্ধ্যার পরে চারিটী পাকা কলা, দ্বিতীয় মাসে পাকা পেয়ারা, তৃতীয় মাসে কিছু ঘোল ও চতুর্থ মাসে লবণশূন্য মোচা-সিদ্ধ খাইয়া থাকিতেন। একবার তিনি মন্ত্র-পুরশ্চরণ করিবার জন্য হৃষীকেশে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিয়ম—ভোর তিনটায় উঠিয়া স্নান করিয়া দরজা বন্ধ করত মৌন-ভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জপ, সন্ধ্যার পরে হবিষ্যান্ন। প্রথমে পুত্রবতী ব্রজমায়ীর নিকট হইতে নূতন কার্পাস তুলা দ্বারা সূতা প্রস্তুত করত চক্রযুক্ত মালাকে ঐ সূতায় গ্রন্থি দিবে, পরে গোমুখী ঝোলার ভিতর রাখিতে হইবে। স্নানান্তে জপে বসিবে; অধোবায়ু ত্যাগ হইলে, প্রস্রাব ও বাহ্য হইলে স্নান করিতে হইবে—এই ভাবে নিয়ম মত জপ করিতে হয়। সিদ্ধ বাবা এই ভাবে দুই মাস করিবার পর একদিন হঠাৎ কথা বলিয়া ফেলিলেন—"বিহারি, দেখ দেখ—কত ফল আসিয়াছে!!" ইহাতে ব্রত ভঙ্গ হয়। পরে পুনরায় আরম্ভ করিয়া তিন মাসে তিনি সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার কথা—শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরাঙ্গের এই দেহেই দর্শনপ্রাপ্তি করিতে হইলে এই ভাবে পুরশ্চরণ করিতে হইবে।

একদিন কালা বাবুর কুঞ্জে মোচা ভাঙ্গী বেলা তিনটার সময় রুটি মাগিতে আসিয়াছে; সিদ্ধ বাবা তাহাকে বলিলেন—'আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, একখানা রুটি দাও।' সে বলিল—'বাবা, আমি ভাঙ্গী, এ কথা বলিতে নাই।' সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'না বাবা, আমাকে দিতেই হইবে।' তাঁহার একান্ত জেদ দেখিয়া ভাঙ্গী তাঁহাকে রুটি দিলে তিনি তাহা খাইতে লাগিলেন। তাহাতে বৃন্দাবনে খুব গোলযোগ চলিল। সকলেই বলিল—'সিদ্ধ বাবার একি কাজ?' তখন বিহারী দাসজি বলিলেন—'বাবা আমি এই মাত্র আপনাকে রসুই করিয়া খাওয়াইলাম, আপনি আবার উহার নিকট হইতে রুটি

চাহিয়া খাইলেন কেন?' সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'আজ আমার জন্ম সার্থক হইল!!' বিহারী দাসজি বলিলেন—'ব্রজে আপনার রুটি বন্ধ হইবে।' তিনি বলিলেন—'আচ্ছা দেখা যাক্ কি হয়।' সিদ্ধ বাবার রুটি খাওয়ার কথা শুনিয়া বৃন্দাবনের শ্রীল নীলমণি গোস্বামী, গৌর সিং সুন্দর রায়, শ্রীগৌর শিরোমণি এবং শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভৃতি সিদ্ধ বাবার নিকট আসিলেন। সিদ্ধ বাবা বলিলেন! 'বাহিরে আসন দাও।' আসন দিলে তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধ বাবাই বলিলেন—'আপনারা কি বলিতে আসিয়াছেন? বলুন না, চুপ করিয়া রহিলেন কেন?' তখন তাঁহারা বলিলেন—'বাবা, আপনি এই চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মুকুটমণি, আপনি এরূপ করিলেন কেন? ইহাতে কত লোক কত কথা বলিতেছেন, তাহাতে আমাদের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিতেছে।' সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'উহারা কে জানেন? দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ৮৮ হাজার মুনিকে বলিলেন—'তোমরা গিয়া ব্রজে যার তার ঘরে জন্ম গ্রহণ কর, আমিও শীঘ্র যাইতেছি।' সেই মুনিগণই ব্রজে ইতর কুলে জন্মিয়াছেন, আমি কাহাকেও ভাঙ্গী দেখি না—উঁহারা সেই মুনিগণই। আপনারা ব্রজে বাস করিতেছেন কেন? রজ পাইবেন বলিয়া? উঁহারা দিবারাত্র রজের সেবা করিতেছেন, উঁহারা রজ পাইবেন না ত কি আপনারা খাট পালঙ্কে শুইয়া রজ পাইবেন?" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

একবার খদির বনের নিকটবর্ত্তী পেসাই কদম খণ্ডীতে গিয়া সিদ্ধ বাবা আসন করিলেন। গ্রাম বহু দূরে, একটি মাত্র কাঁচা কুণ্ড আছে—দিনের বেলাও লোক যাতায়াত নাই। বিহারী দাসজী ও সিদ্ধ বাবা সেই স্থানে দশমী ও একাদশী উপবাসী রহিলেন—বিহারীজি বলিলেন—'বাবা, এমন জায়গায় আসিলেন যে খাবার

কিছু মিলে না।' সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'তার জন্য এত ব্যস্ত কেন? সব এখানেই আসিয়া যাইবে। তুই রাত্রে একটু করতালের আওয়াজ দে দেখি।' বিহারী দাসজি তাহাই করিলে দ্বাদশীর প্রাতঃকালে একজন ব্রজবাসী আসিয়া জানিলেন ইঁহারা তিন দিন পর্য্যন্ত ওখানে বসিয়া কুণ্ডের জল মাত্র পান করিয়া আছেন। ব্রজবাসী কিছুক্ষণ পরে সকল দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। তার পর দিন হইতে বহু জিনিষ আসিতে লাগিল—এমন কি দুই তিন মণ দুধের পায়সও হইতে লাগিল।

আর একবার নবদ্বীপে খুব বর্ষা লাগিল—ভিক্ষায় কেহই বাহির হইতে পারিল না। সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'আজ কি হবে?' বিহারী দাসজি বলিলেন—'আমি কিছুই জানি না।' কিছুক্ষণ পরে চারি জন ছাতা মাথায় দিয়া কুড়ি সের চিড়া, দধি, সন্দেশ ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল।

একদিন বিহারী দাসজি রসুই করিতেছিলেন। সিদ্ধ বাবা রামহরি দাসজিকে বলিলেন—'তুমি জলটল তুলিয়া বিহারীকে যোগাড় দাও।' তিনি গায়ে চাদর দিয়া মালা করিতে বসিলেন। তখন বিহারী দাসজি বলিলেন—'তুমি ভেক লইয়া সিদ্ধ হইয়া গেলে নাকি। একটু জল দিলে না?' রামহরি দাসজি বলিলেন—'চুপ, চুপ বাবা ঘুমাইতেছেন।' সিদ্ধ বাবা এই কথা শুনিয়া চুল্লী হইতে জ্বলন্ত কাঠ লইয়া রামহরি দাসজির পেটে ধরিয়া বলিলেন—"তোমরা কি বৃন্দাবনে ঘুমাইতে আসিয়াছ? বেটা, তুমি একটু যোগাড় দিতে পারিলে না? আবার বলিতেছ 'চুপ চুপ'?"

একবার নবদ্বীপে শ্রীনাথ রায়, গোপীমোহন রায়, জানকীনাথ রায় প্রভৃতি ভাগ্যকুলের জমিদার বাবুরা সিদ্ধ বাবার নিকটে আসিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'এখানে সিদ্ধ বাবা কোথায় থাকেন?'

তিনি বলিলেন—'এখানে সিদ্ধ বাবা কে আছেন, তাহা ত জানি না। তোমরা যেমন মানুষ, আমিও সেইরূপ।' তাঁহারা বলিলেন—'না, না, আপনিই সিদ্ধ বাবা, আমাদিগকে কিছু সিদ্ধাই দেখান।' তিনি বলিলেন—'বাবা আমি ত সিদ্ধাই টিদ্ধাই কিছু জানি না'; এই বলিয়া একটি লাঠি লইয়া মাটীতে ৭।৮টি ঘা মারিলেন। তাহা দেখিয়া বাবুরা বলিলেন—'ভাই চল, বাবাজি আমাদের প্রতি রাগিয়াছেন।' তিনি বলিলেন—'না, না, তোমাদের উপর রাগিব কেন? রাধাকুণ্ডে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজন-কুটীরের তুলসী গাছটীকে ছাগল খাইতেছিল, তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম।' তাঁহারা তাহা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ২০৲ টাকা দিয়া রিপ্লাই পেইড্ টেলিগ্রাম করিলেন—উত্তর আসিল যে শ্রীলোকনাথ গোস্বামির কুঞ্জে একটি ছাগল আসিয়া তুলসী গাছটিকে একেবারে মুড়াইয়া খাইয়াছে এবং উঠানে তাহার গায়ের লোম পড়িয়া রহিয়াছে। এই কথা জানিয়া তাঁহারা যোড় হাতে ক্ষমা চাহিয়া চলিয়া গেলেন। তখন সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'উহারা কলির জীব, কিছু না দেখিলে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে চায় না। সেইজন্য একটু সিদ্ধাই দেখাইলাম। না হইলে বেটারা অপরাধে মরিত।'

আর একবার সমগ্র নবদ্বীপ বন্যায় ডুবিয়া গেল। বিহারী দাসজিকে লইয়া সিদ্ধ বাবা সেই আশ্রমেই রহিলেন। বড়াল ঘাট হইতে শ্রীগৌরহরি দাসজি খিচুঁড়ি রাঁধিয়া প্রত্যহ কলার ভেলায় চাপিয়া ওখানে দিয়া আসিতেন। কয়েকদিন পরে আর তিনিও যাইতে পারিলেন না। এদিকে বিহারী দাসজির জ্বর বিকার হইল। অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে চলিল। মহাপ্রভুর মন্দিরের প্যারী-মোহন গোস্বামিজি কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিয়া ডাক্তার আনাইলেন—ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া বলিল যে অবস্থা খুবই খারাপ, বোধ হয়

সেই রাত্রেই শেষ হইবে। পরে লালাবাবুর বাড়ীর জনৈক কবিরাজও তাহাই বলিলেন। তখন সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'আচ্ছা, এবার আমিই ইহার চিকিৎসা করিব।' এই বলিয়া শ্রীগিরিধারীর একটি চরণ তুলসী আনিয়া উহার মুখে একটি কাঠিদ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং নিজে মালা লইয়া উহার মাথার নিকট বসিয়া বলিলেন—'আচ্ছা, আমি এই ত বসিলাম। কার সাধ্য ইহাকে নেয়, আমি কি ভজন করি নাই?' এই বলিয়া মালা করিতে বসিলেন। তাহার আধ ঘণ্টা পরে বিহারী দাসজি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। তখন সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'কিরে তুই আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবি? নে উঠ, আজ ২২ দিন আমি মুখ নাই পর্য্যন্ত ধুই নাই। তুই উঠিয়া রসুই কর।' তখন বিহারী দাসজি বলিলেন—'বাবা, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।' এই কথা শুনিয়া সিদ্ধ বাবা সুজি ও চিনি দিয়া একটু মোহনভোগ করিয়া আনিয়া দিলে বিহারীজি তাহা খাইলেন। তখন সিদ্ধ বাবা বলিলেন,—'যা, এইবার স্নান কর, রসুই করিয়া ঠাকুরের ভোগ দে। আমি ২২ দিন মুখে জল দেই নাই'। তখন বিহারী দাসজি উঠিয়া সিদ্ধ বাবার মুখ ধুইয়া দিলেন এবং নিজেও স্নান করিয়া সিদ্ধ বাবাকে স্নান করাইলেন। তিনি বলিতেন—'দেখ, তোর হাতে খাইলে আমার ভজন-স্ফূর্ত্তি হয়, সেইজন্য আর কাহারো হাতে খাইতে ইচ্ছা হয় না।'

পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার উপায়-সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—'মহাদেব দুই বার গস্ত (হাটে ক্রয়) করিতে বাহির হন। সেই সময়ে বসিয়া নাম করিলে আর পরমায়ু হরণ করিতে পারেন না—একবার সন্ধ্যা হইতে রাত্র দশটা পর্য্যন্ত আবার ভোর তিনটা হইতে সকাল পর্য্যন্ত নাম করিবে। যতই অসুবিধা হউক না কেন এ সময়ে ঘুমাইবে না। আর **ভজন সিদ্ধ করিবার উপায়**—এক

নিয়মে নাম করা। যে নিয়ম করিবে, তাহা পূর্ণ করিয়া ঘুমাইবে ; তাহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, যাউক—তথাপি নিয়ম যেন ভগ্ন না হয়। এইরূপে কোমর বাঁধিয়া নাম করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। প্রথমে কষ্ট, কিন্তু শেষে চির আরাম—শ্রীগৌরের পাদপদ্ম-প্রাপ্তি।

একবার নবদ্বীপে থাকিতে বিহারী দাসজির মুখে শ্রীচরিতামৃত শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিহারী! তুই বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিস্?' বিহারী বাবা নিষেধ করিলেও তিনি বলিলেন—'আচ্ছা, একখানা শ্রীচরিতামৃত কিনিয়া আন্।' বাজার হইতে গ্রন্থ নীত হইলে তিনি বলিলেন—'এবার পড় দেখি।' বিহারীজি ত কিছুই জানেন না, সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'আচ্ছা, গ্রন্থের দিকে তাকাইয়া থাক।' কিছুক্ষণ পরে বিহারীজি অক্ষর-পরিচয় করিলেন—তৎপরে যুক্ত অক্ষর শিখিলেন—তৎপরে সমগ্রভাবেই পড়িতে পারিলেন। এই ভাবেই তিনি সিদ্ধ বাবার কৃপায় খোল বাজনাও শিখিয়াছিলেন।

এই সিদ্ধ বাবা মহা অনুরাগী হইলেও লোকশিক্ষার জন্য বিধি মার্গও যাজন করিতেন। কথিত আছে—ইনি প্রত্যহ হাজার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন উঠিতে বসিতেও কষ্ট হইত, তখন পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিয়াছেন। প্রত্যহ শ্রীগিরিধারীকে স্বহস্তে তুলসী প্রদান করিতেন—যখন বার্দ্ধক্যহেতু চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, তখনও জনৈক সেবক চোখের পাতা তুলিয়া ধরিলে তিনি স্বহস্তে তুলসী সমর্পণ করিয়াছেন। কালনার সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজির সহিত ইঁহার গাঢ় প্রণয় ছিল—সময় সময় ইনি কালনার শ্রীনামব্রহ্মের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন।

একবার ভজন-কুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া একটি নগরকীর্ত্তন চলিয়াছে। নাম শ্রবণ করিয়া সিদ্ধ বাবা বিহারীজির সহায়তায় পথমধ্যে আসিয়া শ্রীনামকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন ; তৎপরে

সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যাবেশে চলিতে লাগিলেন। ঐ পথটিতে তখন খোয়া (ভগ্ন ইষ্টক খণ্ড) ফেলা হইয়াছিল। সিদ্ধ বাবা একটি করিয়া গানের পদ শুনিতেছেন আর দুই তিন হাত উচ্চ করিয়া লম্ফ দিয়া একেবারে ধপাস্ করিয়া সেই খোয়ার উপরে উত্তান ভাবে পড়িতেছেন—কখনও সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেছেন—কখনও বা অর্দ্ধবাহ্য দশায় অব্যক্ত কি বলিতেছেন—মুখে ফেন ঝরিতেছে—নয়নে গলদশ্রুধারা—এভাবে ভজন-কুটীর হইতে রাণীর ঘাটের বটতলা পর্য্যন্ত আসিতে সংকীর্ত্তনদলের ছয় সাত ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ভক্ত বৃন্দের তাৎকালীন উন্মাদনা, আনন্দাবেশ, এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি দেহ-দৈহিক-শূন্যতাদি যাঁহারা দেখিয়াছেন—তাঁহারাই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন।

ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়িয়ালের স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীহরি-মোহন শিরোমণি গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী শ্রীসখালাল গোপীলাল গোস্বামীপ্রভু এবং শ্রীগৌরশিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি হইতে শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করত নবদ্বীপে সিদ্ধ বাবার কাছে আসিলেন, তিনি শ্রীপ্রভুপাদের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আমূল ঘটনা বলিয়া উপদেশ করিলেন—'রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া' শ্রীকৃষ্ণ কথা দ্বারা শ্রীগৌরতত্ত্ব চাপিয়া রাখিবে। তাহাতে প্রভুপাদ প্রৌঢ়ি করিয়া বলিলেন—'আমি গৌরতত্ত্ব প্রচার করিতে আসিয়াছি, তাহাই করিব।' ইহাতে সিদ্ধ বাবা অতি সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করত বলিলেন—'হাঁ, তুমিই পারিবে।' পরদিন দশটায় সগণ শিরোমণি প্রভু সিদ্ধ বাবার আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বসিয়া 'ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইত্যাদি পদ গাহিতে থাকিলে সিদ্ধ বাবার বেলা চারিটা পর্য্যন্ত ভাব-সমাধি হইয়াছিল।

সিদ্ধ বাবার সহিত তদীয় গুরুপুত্র শ্রীব্রহ্মানন্দ গোস্বামী প্রভুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। শ্রীবাবাজি মহারাজের নিয়ম ছিল যে শ্রীনবদ্বীপ-

বৃন্দাবন-যাতায়াতে তাঁহার শ্রীগুরুপাট পুরুণিয়া হইয়া যাইতেন। শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রভুও কখনও পুরুণিয়ায় কখনও বা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন—ভক্তগণের অনুরোধে কখনও বাহিরেও যাইতেন। তিনি যখন পুরুণিয়ায় থাকিতেন, শ্রীবাবাজি মহারাজ তখন দীর্ঘদিন ধরিয়া শ্রীপাদের সঙ্গানুরোধে পুরুণিয়ায় থাকিতেন। সিদ্ধ বাবা যদিও বার্দ্ধক্য বশতঃ পিণ্ডাকার হইয়াছিলেন, শ্রীনামকীর্ত্তন উপস্থিত হইলেই তিনি অতি দীর্ঘাকার হইয়া এমন উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন যে তাঁহাকে ধরিবার কাহারও সামর্থ্য থাকিত না। একদিন রাত্রিতে শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রভু গান ধরিলেন—'ধনী রঙ্গিণী ভোর, ধনী রঙ্গিণী ভোর। ভুলল গরবে শ্যাম-বঁধু করি কোর॥' এই দুই চরণ আস্বাদন করিতেই প্রভুপাদের সমস্ত রাত্রি শেষ হইয়া গেল!! সিদ্ধ বাবা শ্রীনবদ্বীপ-রজঃ লাভ করিলে শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রভু তাঁহার উৎসব করিয়াছিলেন এবং তৎপরে তাঁহার পত্নী মাতা গোস্বামিনীও জীবৎকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ বাবার উৎসবে সবিশেষ সহায়তা করিতেন।

শ্রীবাবাজি মহাশয় একবার পুরুণিয়াতে প্রসাদ পাইতেছেন—মাতা গোস্বামিনী পরিবেশন করিতেছেন। প্রসাদ পাওয়া পূর্ণ হইলেও পুনঃ পুনঃ প্রসাদ পরিবেশন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীবাবাজি মহাশয়ের মনে শঙ্কা হইল—ইঁহারা আমাদ্বারা প্রসাদের অবশেষ রাখাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই মনে করিয়া ইনি পত্রস্থ প্রসাদ নিঃশেষ হওয়া মাত্র কদলক-পত্রখানিও খাইয়া স্থান পরিষ্কার করিলেন। তাহাতে মাতা গোস্বামিনী এবং অন্যান্য সকলেই তাঁহার শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিলেন এবং অতঃপর তিনি নিষেধ করিলে তাঁহার কষ্ট হইবে মনে করিয়া আর অতিরিক্ত পরিবেশন করিতেন না।

সিদ্ধ বাবা শেষ সময়ে ব্রজ ছাড়িয়া নবদ্বীপে যাইতেছেন—তাঁহার

ছয়মাস ব্রজে ও ছয়মাস নবদ্বীপে বাস নিয়ম ছিল—অতিবৃদ্ধ হইয়াছেন —চোখের পাতা হাতে তুলিয়া ধরিলে তবে শ্রীগিরিধারীকে তুলসী দিতে পারিতেন—হাঁটুতে কাপড় জড়াইয়া নিয়মিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। তিনি শ্রীকুণ্ড ছাড়িয়া যাইবেন জানিয়া ব্রজের বিভিন্ন স্থান হইতে পণ্ডিত, বাবাজি, বৈষ্ণব প্রভৃতি [শ্রীনীলমণি প্রভু, শ্রীরাধিকানাথ প্রভু প্রভৃতি] তাঁহার দর্শনে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —'বাবাজি মহাশয়! আপনি এই অতিবৃদ্ধাবস্থায় ব্রজ ছাড়িয়া যাবেন কেন?' এই কথা শুনিয়াই তিনি আবিষ্ট হইলেন -শরীর ফুলিয়া গেল ও বলিতে লাগিলেন—"তোমরা ব্রজে থাক, আমি নবদ্বীপেই যাব, কারণ আমার মত মহা অপরাধীর স্থান নবদ্বীপে—নিতাই গৌরাঙ্গ দয়াল অবতার—তাঁরা অপরাধের বিচার করেন না ইত্যাদি"।*

জনৈক ভক্ত বাঙ্গালা দেশ হইতে দিনকতক আগে বৃন্দাবনে আসিয়া সিদ্ধ বাবাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবাজি মহাশয়! শ্রীকৃষ্ণলীলাটি ত কিছু কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শ্রীগৌর-লীলাটি ত কিছু বুঝিতে পারি না!!' সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'এ কি এতই সহজ? আগে ব্রজের একটা কিছু হও, তবে শ্রীগৌরলীলা বুঝতে চেষ্টা করিবে।' বস্তুতঃ শ্রীগৌরলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলারই চরম পরিণতি !!

শ্রীবিহারী দাস বাবার মুখে শুনিয়াছি- একবার কালাবাবুর কুঞ্জ হইতে সিদ্ধ বাবা তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে তখনই শ্রীনবদ্বীপ যাত্রা করিতে হইবে। ঝোড়ায় চাপাইয়া তাঁহাকে যখন শ্রীবিহারী দাসজি স্কন্ধে তুলিতেছেন, তখন মনে হইল যেন একটি মহাভারী পাথর; কিন্তু স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া একটি গামছার ন্যায় পাতলা বোধ হইতে লাগিলেন। সেইবার দিবারাত্র চলিয়া বিহারী বাবা নয় দিনে

* শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজির মুখাশ্রিত প্রসঙ্গ।

নবদ্বীপে আসেন। ভাগলপুরের বনমধ্য দিয়া আসিতে রাত্রে বিহারী বাবা দেখিতেছেন যে পথের উপরে ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া আছে—তাহাদের চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। ব্যাপার দেখিয়া বিহারী বাবা পশ্চাদ্দিকে চলিতে লাগিলেন—ঝোড়ার মধ্য হইতে সিদ্ধ বাবা গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'কিরে বিহারী কি হইল?' বিহারী বাবা বলিলেন—'রাস্তায় বাঘ শুইয়া আছে!' সিদ্ধ বাবা তাঁহাতে তর্জন করিয়া বলিলেন—'ওরে ওরা বাঘ নয়, মহাপ্রভুর পার্ষদ, তোদের দেখ্‌তে এসেছে।' বলা বাহুল্য—দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রগুলি পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিহারী বাবার হাতে একটি নারিকেলের মালা এবং স্কন্ধে সিদ্ধ বাবা—তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই সঙ্গে ছিল না। চলিতে চলিতে রাস্তায় কোথাও ছোলা ভাজা, কোথাও চুণ (আটা বা ময়দা), কোথাও চাউল, কোথাও একটু জল ঐ মালায় লইয়া একটি ডেলা পাকাইয়া একটু সিদ্ধ বাবার মুখে দিতেন, পরে অধরামৃত নিজে পাইয়া বিহারী দাসজি পথ চলিতেন।

সিদ্ধ বাবা নবদ্বীপ আসিয়া বিহারী দাসজিকে বলিলেন—'যেন কোন আখড়ায় নিমন্ত্রণ খাইতে যাস্ না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন?' উত্তরে সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'আরে দোষীর সঙ্গ, তার সঙ্গ, তার সঙ্গ করিতে নাই। [স্ত্রীসঙ্গকে সিদ্ধ বাবা 'দোষীর সঙ্গ' বলিতেন]। দেখ যে রাজার রাজ্যে বাস করা যায়, তাঁর কিছু গুণ গাইতে হয়। দ্বাপরে ছিল—শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য; আর এখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রাজ্য। এখন তাঁরই গুণ গাইতে হবে। দেখ্—পুরুষের নিকট ভিক্ষা করিতে গেলে ভিখারী কিছুই পায় না; আর স্ত্রীলোকের নিকট গেলে সে একমুষ্টি চাউল পায়। স্ত্রীলোক—আমার বৃষভানু-নন্দিনী আর বৃষভানু-নন্দিনীই আমার মহাপ্রভু। তাঁর নিকট গেলে একমুষ্টি প্রেম পাওয়া যাইবে। আমরা শ্রীকৃষ্ণের ধার ধারি না—

বৃন্দাবনে থাকিলে আমরা বৃষভানু-নন্দিনীর জয় দিব। যাঁহারা ভজন-চতুর হইবেন, তাঁহারাই নবদ্বীপে বাস করিবেন, কারণ ঐখানে অপরাধের বিচার আছে, ঐখানে ক্ষমা নাই। আর আমার নদেও অপরাধ নাই। দেখ না তুই পয়সার হাঁড়ির জন্য মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিলেন। নবদ্বীপে নিমাই কিন্তু ঘরের যাবতীয় হাঁড়ী কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া চাউল দাইল কত লোকসান করিলেন, তথাপি শচী মা কিছুই বলিলেন না। সেইরূপ দ্বাপর যুগের মহামন্ত্রেও অপরাধের বিচার আছে, আর আমার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মহামন্ত্রে কোনই বিচার নাই। **মহাপ্রভুর মহামন্ত্র** যথা—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥"

সিদ্ধ বাবা অপ্রকটের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে বলিলেন—'বিহারী, তুই ত আমার অনেক সেবা করিলি, আমি তোর কিছুই করিতে পারিলাম না। তা যাক্, তোকে আজ ৪।৫ গাড়ী টাকা দিব।' বিহারী দাসজি মনে মনে ভাবিলেন—'যাঁর সম্বল একটি মাত্র ভাঙ্গা করোয়া, তিনি কিনা চার গাড়ী টাকা দিবেন!!' সিদ্ধ বাবাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন করিয়া চার গাড়ী টাকা দিবেন?' সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'আরে মহাপ্রভু ত আমায় দর্শন দিতে আসিবেন। তাঁহাকে একটু ইঙ্গিত করিলেই তিনি পাঠাইয়া দিবেন।' আবার বলিলেন—তুই টাকা চা'স্, না আমায় চা'স্?' বিহারীজি বলিলেন—'আমি আপনাকে চাই।' এই কথা শুনিয়া সিদ্ধ বাবা খুসী হইয়া বলিলেন—'বেশ বেশ, আমায় লইলে আর পয়সা পাবি না। আর তোর কখনও অভাব থাকিবে না। তুই কলিযুগের এক শত বৎসর পরমায়ু পাবি। সদা সর্ব্বদা নাম করিবি, যেন নাম ভুলিস্ না। কলি তোর কিছুই করিতে পারবে না।' এই কথা বলিয়া তিনি ৪।৫ দিন পরেই

অন্তর্ধান করিলেন। * বিহারী দাসজি উদ্যোগ করিয়া মহামহোৎসব করিয়াছিলেন এবং নয় বৎসর নবদ্বীপে ভজন-কুটিরে সমাধি-সেবায় যত্নপর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান।

সিদ্ধ বাবা নবদ্বীপে ভজন-কুটীতে যে কেলিকদম্বতলে বসিয়া ভজন করিতেন, তাঁহার অন্তর্ধানের পরে সেই বৃক্ষটিও ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে এবং এক একটি করিয়া বল্কল খসিলে তাহার গাত্রে অস্পষ্টাক্ষরে 'হরে কৃষ্ণ' নাম বাহির হইয়াছিল।

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ (বর্ষাণা)

ইনি বর্দ্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন; যুবা বয়সেই গৃহত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজে আসিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনে বর্ষাণে ভানুকুণ্ডতীরে এক কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। নিজে মাধুকরী দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অসুস্থ বৈষ্ণবগণের প্রয়োজনে আসিতে পারে ভাবিয়া ইনি মুষ্টিযোগ ঔষধাদি, শুক্তাপাতা, আদা, পুরাতন তেঁতুল, গুড় এবং চাউল ইত্যাদি শিষ্যাদি দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া রাখিতেন। প্রয়োজন হইলে রান্না করিয়া কোনও বৈষ্ণবকে প্রসাদও দিতেন। একবার ব্রজে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় মাধুকরীতে অসুবিধা হইয়াছিল। বাবাজি মহাশয় দেখিলেন—ব্রজবাসীদেরই কষ্ট, তাহার উপর তাহাদিগকে পীড়ন না করিয়া স্থানান্তরে যাওয়াই সমচীন। এই স্থির করিয়া তিনি ভাণ্ডাকুণ্ডা (আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি) লইয়া গ্রামের বাহির হইতেছেন—এমন সময়ে সম্মুখেই এক কিশোরী ব্রজবালিকা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'জগন্নাথ দাস! কাঁহা যাতা হ্যায়?' উত্তর—'আর যাও বহু?' বালিকা—'কেঁও?' বাবাজি—'পেট্‌মে তো কুছ্ দেনে পড়েগা, আব্

* ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদে সিদ্ধ বাবা অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন।

তো তেরে হিঁয়া মাধুকরীকো টোটা হ্যায়।' বালিকা—'কেঁও, তেরো লিয়ে ক্যা টোটা? হামারি ঘরমে গিয়া থা? তেরা মাধুকরীতো আড়েমে ধরা হুয়া হ্যায়। যা লে আ যাকে। কহুঁ মৎ যানা।' বাবাজি মহাশয়ের অন্যত্র যাইতে ত ইচ্ছা ছিল না, দায়ে পড়িয়া যাইতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন—বালিকা বলিতেছে, দেখি তো সত্য সত্যই মাধুকরী ধরা আছে কিনা? তখন ডাণ্ডাকুণ্ডা ঘরে রাখিয়া তিনি শ্রীনাম গ্রহণ করত সেই ব্রজবাসীর ঘরে গেলেন। ব্রজবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, আব্ মাধুকরীকো ক্যা বকত হ্যায়?' বাবাজি—'তোমারা লালীনে কহী মেরে লিয়ে মাধুকরী আড়েমে ধরা হুয়া হ্যায়। বর্ষাণের সিদ্ধ ব্রজবাসী তখনই কিছু মনে করিয়া ঘরে গিয়া ব্রজমায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'জগন্নাথ দাসকো লিয়ে রোটী রাখা হুয়া হ্যায়?' ব্রজমায়ী—'কাঁহা?' ব্রজবাসী—'আড়েমে'। তথায় রুটি দেখিয়া দুই জনই স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের কন্যা তখন শ্বশুর-বাড়ীতে ছিলেন—এ কথা ব্রজবাসী তখন বাবাজি মহাশয়ের নিকট প্রকাশ না করিয়া রুটি দিয়া বলিলেন—'বাবা, নিত্য হিয়াঁছে রোটি লে যানা।' বাবাজি মহাশয় প্রত্যহ আসিয়া রুটি নিতেন। তাঁহার ভেকের শিষ্য শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসজি ইঁহার দেহরক্ষার পরেও সেখান হইতে রুটি নিতেন। এই ব্রজবাসী বানিয়া এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধর 'বনখণ্ডি' নামে সুবিখ্যাত—বর্ষাণের মধ্যে ইঁহারাই অবস্থাপন্ন ও ধনাঢ্য।

কোন সময়ে বাবাজি মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্দ্ধমান হইতে ইঁহাকে দর্শন করিতে বর্ষাণে আসেন। বাবাজি মহাশয় অভ্যর্থনা করত ব্রজবাসীর ঘরের মোটা রুটী ভাইকে দিলেন ও নিজে খাইতে লাগিলেন। তখন ছোট ভাই বলিলেন—'দাদা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগের কথা মনে পড়ে? দেখ ত এগুলি কাণ্ডার মত কি খাচ্ছ?' বাবাজি

মহাশয় বলিলেন—'ভাই! আমি এক ঘণ্টার ফকির, তেইশ ঘণ্টার বাদশাহ।'

সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ (কাম্যবন)

বর্ত্তমানে ব্রজমণ্ডলে বিষয়-বিরক্ত বৈষ্ণবগণ এবং গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে যে রাগানুগাভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, অনুসন্ধান করিলে তাহার প্রবাহ কাম্যবনের সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয়ের সমীপ হইতে আসিয়াছে। তিনি কোথায় এ জাতীয় কৃপালাভ করিলেন, তাহা অজ্ঞাত। তৎকালে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীজগদানন্দ দাস পণ্ডিত বাবাজি (শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম) মহাশয় বিশেষ প্রভাবশীল ছিলেন। শ্রীজগদানন্দ দাসজির ভেকের গুরু ফরিদপুর জেলার রামদিয়া গ্রামের মহান্ত শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজি মহাশয়ের সহিত কাম্যবনের সিদ্ধ বাবার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। মহান্তজি কাম্যবনে আসিয়া সিদ্ধ বাবার নিকট কিছুদিন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রিয়তা হইয়াছিল যে পরস্পর বিদায়ের প্রস্তাব হইলে দুইজনেই মূর্চ্ছিত হইতেন। একমাস পরে মহান্তজি অতিকষ্টে কাম্যবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। [এই ঘটনাটি শ্রীজগদানন্দ দাসজির অধ্যয়নের ছাত্র, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অদ্বিতীয় অধ্যাপক ও গরাণহাটি কীর্ত্তনগানের গায়ক এবং শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজি মহাশয়ের মুখে শুনিয়া শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ, বি, এ, মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন।]

পরম্পরায় জানা যায় যে সিদ্ধ বাবা শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর পরিবার ছিলেন। যৎকালে ইনি কাম্যবনে বিচেল্লীবাস-নামক স্থানে ভজন করিতেছিলেন, সে সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য ঢাকার শ্রীলক্ষ্মীকান্ত প্রভুর পুত্র শ্রীনবকিশোর গোস্বামিজি শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন বিগ্রহ যুগল সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রজধাম-দর্শনে আসিয়া সিদ্ধ বাবার ভজন-কুটীরে

কিছু দিনের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন। কতিপয় দিবস গত হইল, ঐ প্রভুপাদ গমনোদ্যত হইলে শ্রীরাধামদনমোহন স্বপ্নে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন—'আমি তোমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে এই বাবাজি মহাশয়ের সেবা গ্রহণ করিব; আমি আর এ স্থান হইতে যাইব না।' শ্রীপ্রভুপাদ স্বপ্নাদেশ পাইয়া প্রস্থান করিলেন, তদবধি বাবাজি মহাশয় শ্রীমদনমোহনের সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীজগদানন্দ দাসজি বলিতেন—'সিদ্ধ বাবার শ্রীকৃষ্ণচরণে যথার্থ রতি হইয়াছিল।' শ্রীভগবৎকথাদি-শ্রবণে সিদ্ধ বাবা এরূপ প্রেমাবিষ্ট হইতেন যে তাঁহার মস্তকের শিখাটিও ঊর্দ্ধমুখী হইত। প্রসিদ্ধি আছে যে ইনি ভজনের সময়ে প্রেমাবেগে কখনও হুঙ্কার করায় ভজন-কুটিরের ছাদ ফাটিয়া গিয়াছিল—অদ্যাবধি তাহা দৃষ্ট হয়। ইনি কখনও নিদ্রা যাইতেন না—দিবারাত্র শ্রীহরিনাম করিতেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেও পারিতেন, আবার অনাহারেও বহুদিন কাটাইতে সমর্থ ছিলেন। শ্রীমদনমোহনের প্রসাদি দ্রব্য পাইয়া ভজন করিতেন। প্রচুরতর আহারে বা অনাহারে তাঁহার কখনও অলসতা হইত না।

শ্রীগোবর্দ্ধনের সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি এবং সূর্য্যকুণ্ডের সিদ্ধ মধুসূদন দাস বাবাজি মহাশয়ও ইঁহারই অনুগত ছিলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবালাভের পর অল্পবয়স্ক এক বাবাজি ইঁহার নিকট আসেন এবং শ্রীবিগ্রহসেবায় সহায়তা করেন। বিনীত ব্যবহারে, ভগবৎসেবা-প্রবণতায় এবং সর্ব্বোপরি সিদ্ধ বাবার পরিচর্য্যায় কনিষ্ঠ বাবাজি অতি অল্প দিনের মধ্যে সিদ্ধ বাবার কৃপালাভ করিলেন। সিদ্ধ বাবা স্নেহাতিরেকে ইঁহাকে রাগানুগা ভজন শিক্ষা দিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার শ্রীগুরুপ্রণালী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। কনিষ্ঠ বাবাজি বলিলেন—'শ্রীগুরুপ্রণালী কি আমি জানি না এবং

শ্রীগুরুদেবের নিকট তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করি নাই।' সিদ্ধ বাবা শ্রীগুরুপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে বুঝাইয়া বলিলেন—'সিদ্ধ গুরুবর্গের অনুগত হইয়া তাঁহাদের কৃপা-দত্ত সিদ্ধগোপীরূপা মঞ্জরীর দেহে সেবা করার নাম—রাগানুগা ভজন। এই ভজন ব্যতীত শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই, তজ্জন্য তোমাকে একবার দেশে যাইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীগুরুপ্রণালী আনিতে হইবে; আমি তোমাকে রাগানুগা ভজনে প্রবৃত্ত করিব।' কনিষ্ঠ বাবাজি রাগানুগা ভজনের নাম শুনিয়া যদিও তাহাতে লুব্ধ হইলেন, তথাপি সিদ্ধ বাবার স্নিগ্ধ ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে শ্রীমদন-মোহনের সেবা ও বিশেষত, সিদ্ধ বাবাকে ছাড়িয়া দেশে যাইতে হইবে মনে করিতেই কাঁদিয়া অধীর হইলেন। সিদ্ধ বাবা তখন তাঁহাকে শান্ত ও সুস্থ করিলেন এবং লীলামাধুর্য্য ও রাগানুগা ভজন-মাধুর্য্য বারংবার শ্রবণ করাইয়া তাঁহাকে শ্রীগুরুপ্রণালী আনিবার জন্য শ্রীগৌরমণ্ডলে যাইবার জন্য সম্মতও করিলেন। তখন মথুরায় রেইল লাইন হয় নাই, বাঙ্গালার যাত্রীদিগকে হাতরাস্ যাইয়া গাড়ীতে উঠিতে হইত। একদিন প্রাতে সিদ্ধ বাবা কনিষ্ঠ বাবাজিকে অতিকষ্টে বিদায় করাইলেন। কনিষ্ঠ বাবাজি কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথ চলিতেছেন। হাতরাসে রাত্রিতে গাড়ীতে উঠিতে হইত—তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন যে গাড়ীতে উঠিলেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে; তজ্জন্য অতি কাতরে শ্রীশ্রীরাধারাণী ও শ্রীবৃন্দাদেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া করিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন যেন গাড়ীতে উঠার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। অহো! শ্রীরাধারাণী তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন, তাঁহাকে গাড়ীতে উঠিতে হইল না—গাড়ী চলিয়া গেল—বাবাজি মহাশয়ও ফিরিয়া আসিতেই সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে শ্রীবৃন্দাদেবী রাত্রিতে স্বপ্নে সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়কে ধম্‌কাইতেছেন—"তুই কেন উহাকে বাহিরে

পাঠাইলি? তাহার গুরুপ্রণালী ত তোর ঠাকুরের সিংহাসনেই রহিয়াছে!!' শ্রীসিদ্ধ বাবা চমকিয়া উঠিয়া শ্রীবৃন্দাজির দর্শন না পাইলেও কাঁদিয়া মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। প্রত্যুষে স্নানান্তে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই শ্রীমদনমোহনের সিংহাসনে শ্রীগুরুপ্রণালী পাইয়া বক্ষে ধারণ করত শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দজির মন্দিরে গিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীকে দর্শন করত অনেক কাঁদিলেন এবং ঐ কনিষ্ঠ বাবাজিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সিদ্ধ বাবা ভজন কুটীরে আসিয়া দৈনন্দিন সেবাকার্য্য করিতে করিতে বারংবার পথপানে তাকাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কনিষ্ঠ বাবাজি ক্ষুধা তৃষ্ণায়, পথশ্রমে ও সিদ্ধ বাবার আজ্ঞা লঙ্ঘনজনিত ভয়ে অতিকাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সিদ্ধ বাবার চরণে পতিত হইলেন। সিদ্ধ বাবার যে আনন্দোল্লাস হইল, তাহা অনুভববেদ্য, বর্ণনীয় নহে। তিনি কনিষ্ঠ বাবাজিকে বক্ষে ধরিয়া নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন এবং কি প্রকারে ফিরিয়া আসিলে?' কনিষ্ঠ বাবাজি আদ্যোপান্ত সব কথা নিবেদন করত ভয়ে ভয়ে আজ্ঞা লঙ্ঘন-জনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সিদ্ধ বাবা উদ্বিগ্নতাহেতু সারাদিন প্রসাদ পান নাই—এক্ষণে দুইজনে বসিয়া প্রসাদ পাইলেন এবং সিদ্ধ বাবা বিশ্রামকালে শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপা-বৈভব বৃত্তান্ত আমূল বলিলেন। এই ঘটনা হইতেই ব্রজে তাঁহার 'সিদ্ধ নাম প্রচারিত হয়।

* সিদ্ধ বাবা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আনুগত্যে বৈরাগ্যবিদ্যায় ও ভজনে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তিনি কখনও বিষয়ী বা রাজদর্শন করিতেন না। 'চীরাণি কিং পথি ন সন্তি'—ইত্যাদি শ্লোকটির ভাব ইঁহার জীবনে মূর্তিমন্ত হইয়া দেখা দিয়াছিল। ব্রজমণ্ডল-ভ্রমণকালে

* ইতঃপর পূজ্যপাদ শ্রীকৃপাসিন্ধু বাবাজি মাহশয়ের মুখাশ্রিত।

ইনি শ্রীবৃন্দাদেবীর আজ্ঞাতেই কাম্যবনে বিমলাকুণ্ডের তীরে ভজন-স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তখন কাম্যবন ভরতপুরের রাজার অধীন ছিল। সিদ্ধ বাবার প্রভাব শ্রবণ করিয়া রাজা অনেক যত্নেও দেখা না পাইয়া একদিন ছদ্মবেশে দীনহীন ভাবে তাঁহার ভজনকুটীরের দ্বারে বসিয়া রহিলেন। তখন কিন্তু সিদ্ধ বাবা ভিক্ষাটনে গ্রামে গিয়াছেন। গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অর্দ্ধপথ আসিয়া তিনি পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া চীৎকার করত গ্রামবাসিগণকে বলিতে লাগিলেন—"ভাইগণ! আমার পর্ণকুটীরে আগুণ লাগিয়াছে!! তোমরা শীঘ্র গিয়া নিবাইয়া আস, তবে আমি যাব।" বাবাজি মহাশয় গ্রামে বসিয়া রহিলেন। গ্রামবাসিরা দৌড়িয়া গিয়া কুটীরে আসিয়া দেখেন যে রাজাই ছদ্মবেশে কুটীরদ্বারে বসিয়া আছেন। বিস্ময় ও সম্ভ্রমে অভিভূত হইয়া তাঁহারা রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ! রাজহঠ থেকে যোগিহঠ অতি বিষম।' তাঁহারা সমস্ত ঘটনা রাজাকে বুঝাইয়া দিলে রাজা ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর বাবাজি মহাশয় ভজনকুটীরে আসিয়া গোবরজলে স্থানটি পবিত্র করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। ভরতপুরের রাজা বৈষ্ণব-সেবী ছিলেন, কাজেই এই ব্যাপারে তিনি অপমান বোধ করেন নাই, বরং ইহাতে তাঁহার দৈন্য ও নির্ব্বেদের উদয় হইয়াছিল। পরোক্ষে আবার তিনি সিদ্ধ বাবার কৃপাও লাভ করিলেন!!

কিছুদিন পরে তথাকার গোপবালকগণ বাবাজি মহাশয়কে বিরক্ত করাতে তিনি তথা হইতে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক জানিয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে একটি কুটীর বাঁধিয়া দিলেন। তিনি সেই কুটীরে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ ভজন করিতেন—সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার বাহির হইয়া বিমলা কুণ্ডে স্নান করিতেন এবং মাধুকরীর জন্য গ্রামে যাইতেন। একদিন মধ্যাহ্নে অন্তরঙ্গ সেবার লীলাবিপর্য্যয়ে অভীষ্টদেবের বিরহে তিনি

উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন—এমন সময়ে বিমলাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গো ও গোপবালক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপবালকগণ বাহির হইতে চিৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বাবাজি! হামলোগ্ প্যাসী হুঁ, জল পিয়াও।" বাবাজি মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই গোয়ারিয়া (গো-রক্ষক) বালকের উৎপাতে বিরক্ত ছিলেন—তজ্জন্য তিনি উহাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়া কুটীরের ভিতরে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। গোপবালকগণ কিন্তু বিবিধ উৎপাত করিতে করিতে বলিলেন—'বাঙ্গালী বাবাজি! তু ক্যা ভজন করতে হো, মে সব জানতে হুঁ। দয়াহীন মন্ত কষাইকী বরাবর হ্যায়। বাবাজি! কুটীয়াছে নিকাল, জল পিয়াও, হামলোগ্ বহুত প্যাসী হু।" এইবার বাবাজি মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া যষ্টি-হস্তে কুটীর হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন—অসংখ্য অত্যদ্ভুত গো ও গোপবালকগণ। তাঁহাদিগের দর্শনেই বাবাজি মহারাজের ক্রোধ শান্তি হইল এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'লালা! তুম লোগ্ কাঁহাসে আঈ, কাঁহা রইতে হো?' নন্দ-গাঁওমে রহতে হুঁ।' বাবাজি—'তেরে নাম ক্যা হ্যায়?' বালক—'মেরো নাম কানাইয়া হ্যায়।' বাবাজি অন্য একটি বালকের প্রতি দৃষ্টি করত—'উন্‌কো নাম ক্যা হ্যায়?' বালক—'বলদাউ হ্যায়।' তৎপর বালক বলিলেন—'দেখ বাবাজি! পহিলা জল পিয়া দেনা, পাছে বাত্ কর না।' তখন বাবাজি মহারাজ স্নেহপরবশ হইয়া করোয়ার জল পিয়াইয়া দিলেন। তখন বালকগণ বলিলেন—'দেখ বাবাজি! হাম্ লোগ্ নিত্যি বহুত দূরসে আতে হুঁ, প্যাসী চলি যাতী হুঁ। তু কুছ জল রাখ্‌না ঔর বালভোগ রাখ্ না।' বাবাজি বলিলেন—'হিঁয়া নিত্যি আয়কে উপাধি নেহি করনা।' এই বলিয়া বাবাজি মহাশয় কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।' কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এতাদৃশ পরম অদ্ভুত গোপশিশু ও গো

ত আর দেখি নাই ; গোপ-বালকের গালিও কত মধুর ! এই গো ও শিশু কখনও জাগতিক হইতে পারে না।' এরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আসিয়া দেখিলেন সেই গো বা গোপবালকগণ নাই—অন্তর্ধান হইয়াছে। তখন সিদ্ধ বাবা দুঃখে অত্যন্ত কাতর ও অধীর হইয়া নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অনুতপ্ত হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদানে বলিলেন—'তু উঠ্, শোক মৎ কর, কাল মে তেরো পাশ আউঙ্গা।" ইহার পর বাবাজি মহাশয়ের আবেশ ভঙ্গ হইল এবং তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। তৎপরদিন এক বৃদ্ধা ব্রজবাসী শ্রীগোপালমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া বলিলেন —'বাবাজি ! হাম্‌সে এই গোপালজিকা সেবা নেহি হোতা হায়। তু এই গোপালজীকো সেবা কর্।' বাবাজি—'হাম কৈছে সেবা করেঙ্গে; সেবাকো চীজ্ হামারে কাঁহাসে মিলেগা ?' বৃদ্ধা—হাম্ নিত্যি সেবাকো চীজ, তোকো লে আই দেয়েঙ্গে।' শ্রীগোপালের মাধুরী দেখিয়া বাবাজি মহাশয় মুগ্ধ হইলেন এবং তৎপর সেবা করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রে স্বপ্নে তিনি জানিলেন যে ঐ বৃদ্ধা স্বয়ং শ্রীবৃন্দাজী।

চৈত্রী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে সিদ্ধ বাবা অপ্রকট হন। প্রাপ্তির সময় তিনি—"মেরে আঙ্গিয়া কাঁহা ? মেরে লেহেঙ্গা কাঁহা ? মেরে ফাঁরিয়া কাঁহা ? অর্থাৎ আমার কাঁচুলি কোথায় ? আমার ঘাঘরী কোথায় ? আমার ওড়্না কোথায় ?" ইত্যাদি অভিসারিকা-ভাবের স্বাভিলাষ সূচনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তোতা রামদাস বাবাজি (সিদ্ধ) :—

নবদ্বীপের বৈষ্ণব-চূড়ামণি। ইনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া শুনা যায়, নাম ছিল—রামদাস মিশ্র। ন্যায় পড়িবার জন্য তিনি নবদ্বীপে আসেন, কিন্তু পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বেই প্রবল-বৈরাগ্য ভরে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীশ্রীগোপীনাথজিউর মন্দিরের দক্ষিণে যে 'ঠৌরে' আছে, উহা ইহারই ভজন-স্থান। বহুদিন ভজন করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নে তাঁহাকে নবদ্বীপে আসিয়া স্বীয় সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আদেশ দেন। সে সময়ে মহাপ্রভুর সেবার মহা বিশৃঙ্খলা ছিল। গোস্বামিগণের দারিদ্র্যবশতঃ কোনও নির্দ্দিষ্ট মন্দির ছিল না। শ্রীবিগ্রহ পালানুসারে সেবকদের গৃহে নীত হইয়া সেবিত হইতেন। এমন কি সময়ে সময়ে নবদ্বীপের পাষণ্ডী ও রাজপুরুষগণের ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে লুক্কায়িত রাখা হইত। এরূপ অবস্থায় রামদাস নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গার নিকটবর্ত্তী দশ-অশ্বত্থতলায় আসন গ্রহণ করেন। ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা, উদাসীন বেশ ও সাত্বিক বিকারাদি দেখিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া নবদ্বীপবাসিরা আমোদার্থে পীড়ন করিতে থাকেন, কিন্তু তিনি অম্লানচিত্তে সকল পীড়ন সহ্য করিতেন। একদিন কৌতুহল-পরবশ হইয়া তিনি জনৈক পীড়নকারিকে ন্যায়শাস্ত্র-সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করেন। সে ব্যক্তি তাহার উত্তর দিতে না পারায় স্বীয় অধ্যাপকের নিকট জানাইলে অধ্যাপক তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করেন। কথিত আছে—একদিন প্রত্যুষে গঙ্গা জলে বসিয়া দুইজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করেন। রামদাস সেস্থলে তখন উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক পক্ষ প্রতিপক্ষ করিতে করিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন—বাবাজি মহাশয় সন্ধ্যা সময়ে আসিয়া

তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মীমাংসা করিয়া দিলে উভয়েরই পরম আনন্দ হয় এবং চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন যে জনৈক কন্থা-করঙ্গধারী বাবাজি মীমাংসা করিয়াছেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষের কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে।

শ্রীরামদাস একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন—তখন কোন দুষ্টলোক তাঁহার গলায় জুতার মালা পরাইয়া দেয়। ঘটনাক্রমে তৎকালে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সেই স্থান দিয়া নৌকাযোগে যাইতেছিলেন—তিনি বৈষ্ণবের অপমান দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে কে অপমান করিয়াছে জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু ধ্যানমগ্ন নির্ব্বিকার রামদাস কোনই উত্তর দিলেন না—গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঘাটে নৌকা রাখিয়া নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এই অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ও বৃত্তান্ত শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং এই অপরাধের জন্য তিনিই দোষী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই সময়ে রামদাসের সহিত শাস্ত্রালাপে তাঁহার ষড়্দর্শনে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে 'তোতা' উপাধি দেন। এখন হইতে তিনি 'তোতা রামদাস' নামে অভিহিত হইলেন। তিনি শ্রীগিরিধারীর সেবা করিতেন—ঐ বিগ্রহ তাঁহার সহিত বৃক্ষতলেই থাকিতেন। মহারাজ তাঁহার সহিত কয়েকবার শাস্ত্রালাপ করিয়া ঠাকুরের আশ্রমের জন্য ঐ বৃক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী ছয় বিঘা জমি নিষ্কর দান করেন। ঐ জমির উপর যে বাড়ীনির্ম্মিত হয়, তাহাই **'বড় আখড়া'** নামে প্রসিদ্ধ। উহা এখনও তোতা রামদাসের শিষ্য-পরম্পরা ভোগ দখল করিতেছেন।

বলা বাহুল্য—ইঁহারই প্রযত্নে ও আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বর্ত্তমান অঙ্গনের জমি ও পুরাতন মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং শ্রীবিগ্রহও মালঞ্চপাড়া হইতে বর্ত্তমান স্থানে বিজয় করেন—নিত্যসেবার ব্যবস্থাদিও হইতে থাকে।

শ্রীসিদ্ধ তোতা রামদাস বাবাজির তিরোভাব তিথি—পৌষী শুক্লা দশমী।

১২০২ বঙ্গাব্দে রাজ সরকার হইতে লিখিত একখানা দলিল :—*

'তরফ নবদ্বীপের নায়েব প্রতি আগে নিজ নবদ্বীপের শ্রীতোতা রামদাস বৈরাগি জাহের করিনা গ্রাম মজন্দারে কাঠা কতক জমীতে আখড়া করিয়া শ্রীশ্রী৺সেবা অনেক দিবসাবধি করিতেছে। ইমসন জরিব করিয়া তাহার খাজনা তলব করিতেছ, অতএব লিখি এইস্থানে খাজনা তলব না করিয়া পশ্চাত তজবিজ করিবা। ইতি সন ১২০২ সাল ১৫ই শ্রাবণ।'

শ্রীদয়াল দাস বাবাজি মহাশয় (শ্রীবৃন্দাবন)

ইহার বৈরাগ্য ব্রজে ত প্রসিদ্ধই ছিল—শ্রীগৌড়মণ্ডলেও ইহার ভজনাবেশের কথা প্রচার হইয়াছিল। শীতকালে একদিন যমুনায় একটি ঘাটের উপর ছন্নিতে কাঁথায় মুখ ঢাকা দিয়া প্রায় তিনটার সময় বসিলেন আর পরদিন বেলা দুইটার পরে উঠিলেন। এমন নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতেন যে তাঁহাকে একটি স্থাণুবৎ দেখাইত। সম্বল ছিল—এক কাঁথা, ব্রজের করোয়া ও কৌপীনবহির্বাস। অনেক সময় ব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াইতেন। কোথায় জন্মস্থান, কত বয়স হইয়াছিল—তাহা দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না। কখনও মৌনী থাকিতেন।

শ্রীঅন্নদা বাবু (শিরোমণি মহাশয়ের অনুগত অদ্বৈত দাস) ভেক নিয়া 'শ্রীগিরিধারী দাস' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন গোবর্দ্ধন গোবিন্দকুণ্ডে বাস করিয়া ভজন করিতেছিলেন, তখন একদিন

* নবদ্বীপ-মহিমা ৪০৬ পৃষ্ঠা।

তাঁহাকে লইয়া ইনি ব্রজের গ্রাম দর্শন করাইতে চলিলেন। পরদিন প্রাতে কোনও কুণ্ডে স্নান করার সময় শ্রীগিরিধারী দাসজি কোমরে আবদ্ধ (অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের জন্য) বন্ধনটি (truss) খুলিয়া স্নান করিয়া উঠিলেন। শ্রীদয়াল দাস বাবাজি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওটা কি?' শ্রীগিরিধারী দাসজি তাহার পরিচয়াদি ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলে তিনি বলিলেন—'ওটা জলে ফেলে দাও, আর দরকার হবে না।' বলা বাহুল্য—তাঁহার আদেশ পালন করিয়া শ্রীগিরিধারী দাসজি শেষ পর্য্যন্ত আর ঐ রোগের অস্তিত্ব বুঝিলেন না। শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত উঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল— তাঁহার পরিবারের সকলকেই ইনি ভালবাসিতেন এবং এরূপভাবে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইতেও দুই এক জনকে মুক্ত করিয়াছেন।

ইনি রাজর্ষি বাহাদুর হইতে মাঝে মাঝে কিছু অর্থ চাহিয়া নিতেন। তদ্দ্বারা কোনও ব্রজবাসী বা ব্রজমায়ীকে অন্ন বস্ত্রাদির সাহায্য করিতেন—কখনও নিজ ব্যবহারের জন্য কিছুই খরচ করিতে দেখা যায় নাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ হাতে আসিলে তাহা রাজর্ষি বাহাদুরের পত্নীর নিকট গচ্ছিত রাখিতেন—এইরূপ তাঁহার নিকট তিন শত টাকা জমা হইল। একদিন সমস্ত টাকা চাহিয়া লইয়া তিনি যমুনার ধারে বসিয়া একটি একটি করিয়া সব টাকা যমুনার জলে ছুড়িয়া ফেলিলেন।

শেষ জীবনে ইনি কালীদহে সিদ্ধ শ্রীজগদীশ বাবার কুটীরের পশ্চাদ্‌ভাগে একটি কুটীরে বাস করিতেন। তখন শ্রীল প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহাশয় নিজ হস্তে তাঁহার সেবাদি করিতেন। দৃষ্টি-হীন হইলেও ইনি চুট্‌কি (চাউল ও আটা) ভিক্ষা করিতেন। যেখানে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, সেখানে নিজে উচ্চৈঃস্বরে তিনি "হরেকৃষ্ণ' বলিতেন, গৃহস্থ যদি তদপেক্ষা অধিক উচ্চকণ্ঠে নাম করিয়া তাঁহার

অভ্যর্থনা করিতেন, তবে তাঁহার নিকট ভিক্ষা লইতেন, নচেৎ অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। দেহত্যাগের সময় ইনি নিজ কুটীরে না থাকিয়া জনৈক ব্রজবাসীর গৃহে আসীন হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয় লোক-সংঘট্ট ভয়েই নিজ কুটীর ত্যাগ করত ব্রজবাসীর গৃহে গিয়াছিলেন।

শ্রীতুর্লভদাস বাবাজি (শ্রীগোবিন্দকুণ্ড)

শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে যখন শ্রীল মনোহর দাস পণ্ডিত বাবাজি বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন কুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীতুর্লভদাস বাবাজি ভজন করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে মহামারী প্লেগের সময় একদিন দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রতাপে এই বাবাজি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন—হাতে নামের মালা, সংখ্যাজপ করিতেছেন। সহসা তাঁহার সম্মুখে ধূম্রবর্ণ একটি প্রকাণ্ড ভীষণ মূর্ত্তি উপস্থিত হইল। উহা তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বাবাজি মহাশয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে? এখানে কেন আসিয়াছেন?' ছায়ামূর্ত্তি উত্তর দিল—'আমি কালদূত, আপনাকে গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।' বাবাজি প্রশান্ত বদনে বলিলেন—'বেশ গ্রহণ করুন, আমি প্রস্তুত।' ছায়ামূর্ত্তি—'আপনি নাম ত্যাগ করুন, নইলে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না'; বাবাজি—'নামত্যাগ করিতে পারি না, আপনি আমাকে এই ভাবেই গ্রহণ করুন।' ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্ধান হইল। শ্রীল মনোহর দাস বাবা বাহির হইলে ঐ তুর্লভদাসজি আসিয়া ঐ বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন এবং ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমহারাজজি বলিলেন—'এই সময়ে আপনার মৃত্যুযোগ ছিল, কিন্তু ভজনের প্রভাবে আপনার আয়ু বৃদ্ধি হইয়া গেল।'

* 'আমার গুরুদেব' গ্রন্থের সঙ্কলন।

শ্রীধর্ম্মদাস বাবাজি মহাশয় (কাম্যবন) *

কাম্যবনের সিদ্ধ বাবার ইনি নাতিচেলা। পূর্ব্বাশ্রমে উৎকলবাসী ছিলেন—লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না। ইনি শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই পয়ারটি সর্ব্বক্ষণই বলিতেন—'অনিন্দুক হইয়া যে সকৃৎ কৃষ্ণ বোলে। সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে।' তাঁহার মুখে কাহারও কোন প্রকার নিন্দা ছিল না। সিদ্ধ বাবার সেবিত শ্রীশ্রীরাধামদন গোপালজিউর সেবা ইনিই করিতেন। সেবার বিশেষ পরিপাটি না থাকিলেও সদাচার-সম্বন্ধে ইহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল—বৃদ্ধ বয়সেও শীত কালেও মূত্রত্যাগ করিলেও বিমলা কুণ্ডে নামিয়া কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া আসিতেন। ঠাকুরের মঙ্গল আরতি বারমাসই হইত—ইনি জগমোহনে থাকিতেন। শ্রীমাধবদাস বাবাজি বা অন্য কোনও বৈষ্ণব জগমোহনে শয়ান থাকিলে কাহাকেও ঘড়ি বাজাইতে ডাকিতেন না, আরতি সারিয়া নিজেই ঘড়ি বাজাইতেন। ভিক্ষাদ্বারাই সেবা-নির্ব্বাহ হইত; ভিক্ষার পদ্ধতিও একটু স্বতন্ত্র ছিল; সেবার কোন উপকরণ না থাকিলে কোন দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া এবং দোকান-দারের মুখের দিকে না তাকাইয়া কেবল এই মাত্র বলিতেন—'ঠাকুরের অমুক জিনিষ ত হ্যায় নেহি।' দোকানদারেরাও তৎক্ষণাৎ সেই জিনিষ দিয়া দিত। ব্রজবাসিগণ বিমলা কুণ্ডে স্নান করিতে আসি-তেন—ইনি তাঁহাদের জন্য দন্তকাষ্ঠ বা দাঁতন রাখিতেন—স্নানের পর তিলক করিবার জন্য তিলক রাখিতেন এবং শ্রীহরিনাম করিবার জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত জপের মালাও রাখিয়া দিতেন। শীতের দিনে আগুণ করিয়া রাখিতেন—এই ভাবে সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে

* শ্রীবৃন্দাবনে গোপাল ছড়িদারের ঠৌরবাসী শ্রীশ্রীমাধবদাস বাবাজি মহাশয়ের মুখে শ্রুত ঘটনা।

আপ্যায়িত করিতেন। কেহ ইচ্ছা করিয়া শাক, তরকারি কিছু দিলে ত উত্তম, নচেৎ বন হইতে শাক কুড়াইয়া শাক এবং রুটি দ্বারা শ্রীমদনগোপালের ভোগ লাগাইতেন। আটা ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে গুড় দিয়া ছোট ছোট নাড়ু প্রস্তুত করিয়া তিনি তদ্দ্বারাই গোপালের প্রাতঃ ও উত্থাপন-ভোগাদি সমাধা করিতেন। অভ্যাগত বৈষ্ণবদের ওখানে সর্ব্বদাই যাতায়াত হইত। বাবাজি মহাশয় কাহাকেও নিষেধ বা অনাদর করিতেন না। কোনও বৈষ্ণব উপস্থিত না থাকিলেও ইনি রুটী ও শাক প্রচুর পরিমাণে ভোগ দিতেন এবং তদ্দ্বারাই আগত অতিথি বৈষ্ণবগণের প্রায়ই সমাধান হইত। প্রয়োজন-পক্ষে রুটির পরিমাণ কম থাকিলে, যাহা প্রস্তুত আছে তাহা সকলকে সমান ভাগে বণ্টন করিতেন—কাহারও অভাব থাকিলে নিজেই মাধুকরী আনিয়া সমাধান করিতেন। শ্রীমাধবদাসজি ইহার বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও আহ্নিককৃত্যাদির পরে বৈষ্ণবীয়-রীত্যনুসারে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলে দুঃখ পাইবেন মনে করিয়া ইনি তাঁহার নিকটে গিয়া আপ্যায়িত বাক্যে বলিতেন—'শাক রুটী অনেক ভোগ দিয়াছি, আজ এখানেই খাও।' শ্রীমাধবদাসজি প্রতিদিনই মাধুকরীতে যাইতেন—শ্রীধর্ম্মদাসজির বৈকালিক আহারের কিছু না থাকিলে তিনি শ্রীমাধবদাসজিকে মাধুকরীতে যাওয়ার কালে বলিতেন—'আজ বৈকালিক আহারের কিছু নাই।' শ্রীমাধবদাসজি সেই দিন অধিক মাধুকরী আনিয়া দুইজনে একত্র বসিয়াই মাধুকরী পাইতেন।

কোন সময় ঐ স্থানে জনৈক বাবাজি আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবদাসজি জানিলেন যে নবাগত বাবাজি পেঁয়াজ খাইতেন। শ্রীমাধবদাসজির বয়স তখন অল্প—তাঁহার মনে হইল যে উনি হয় পেঁয়াজ ছাড়ুন, না হয় স্থানান্তরে যান—এই উদ্দেশ্যে বাবাজি মহাশয়কে কিছু উপদেশ করিলেন—শ্রীধর্ম্মদাসজি পরোক্ষে

বসিয়া তাহা শুনিলেন এবং শ্রীমাধবদাসজিকে বলিলেন—'এ স্থান ত আমাদের নয়, সিদ্ধবাবাজি মহাশয়ের। এখানে অতিথি অভ্যাগত যে কেহ আসেন, তাহাদের সেবা করাই আমাদের ধর্ম্ম ; কোন উপদেশ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

একবার কোন বৈষ্ণব ওখানে দেহত্যাগ করিলে তাহার ত্যক্ত বস্ত্রাদি শ্রীধর্ম্মদাসজি তত্রত্য নিয়মানুসারে রাজদ্বারে না জানাইয়া নিজেই অন্য বৈষ্ণবকে দিয়াছিলেন। রাজ-আইনানুসারে বাবাজি মহাশয়কে কাছারীতে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে উনি সরল ভাবে সত্য কথা বলিয়া দিলেন। তাহাতে তাহার কিছু দিনের জন্য কারাদণ্ড হইল। এই ঘটনাটি শ্রীমাধবদাসজি ঐ স্থানে যাওয়ার অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল—বাবাজি মহাশয় কিন্তু অক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'আমি যমপুরী দেখিয়া আসিয়াছি !!' জেলে তাঁহার কোনও প্রকার খাটুনি ছিল না, আটা ডাল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য রাজবাড়ী হইতে দিত, অন্য কোন কয়েদী ব্রাহ্মণ আসিয়া ডাল রুটী করিয়া দিত—অন্য জাতীয় কয়েদীরা অন্যান্য পরিচর্য্যা করিত।

শ্রীধর্ম্মদাস বাবাজি মহাশয় ১২৯৭ কি ৯৮ সালে প্রায় একশত বর্ষ বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীনন্দকিশোর দাস (গোস্বামীপাদ)

(শ্রীশৃঙ্গারবট, শ্রীবৃন্দাবন)

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সপ্তম অধস্তন—শ্রীমন্ নন্দকিশোর গোস্বামী (নামান্তর পরমানন্দ)। শ্রীমদ্ বীরচন্দ্র প্রভু শ্রীপাট খড়দহে বাস করেন। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপীবল্লভের প্রথম পুত্র শ্রীহরিদেব লতায় বাস করেন এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ মালদহের অন্তর্গত

গয়েশপুরে বাস করেন। উত্তরকালে শ্রীহরিদেবের বংশধরগণ লতার গাদি হইতে বাঁকুড়া জেলায় পুরুণিয়া পাটে আসেন। শ্রীহরিদেবের প্রপৌত্র শ্রীরসিকানন্দ প্রভু পুরুণিয়ায় বাস করিতেন—ইঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপরমানন্দ বা শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী। [শ্রীরসকলিকা গ্রন্থের শেষভাগে বংশধারা দ্রষ্টব্য।] পরমানন্দ শৈশব হইতেই বিষয়-বিরক্ত ছিলেন, বিবাহ না করিয়াই ইনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া যুগলকিশোরের কেলিস্থলী দর্শন করত পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং স্বপরিচয় গোপন পূর্ব্বক তদানীন্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গগনের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ভজনশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রন্থাধ্যয়ন শেষ হইতে না হইতেই কিন্তু পুরুণিলা পাটের জনৈক বৈষ্ণব তাঁহার সন্ধানে আসিয়া শ্রীচক্রবর্ত্তিমহাশয়ের নিকট শ্রীপাদের গৃহত্যাগে জননীর নিদারুণ দুঃখদৈন্যাদি নিবেদন করত তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিতে অনুমতি দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ গুরুদক্ষিণারূপে শ্রীপাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও জননীর অনুরোধে বিবাহ করিতে আজ্ঞা দিয়া শ্রীনন্দকিশোরকে গৃহে পাঠাইলেন। ইনি পুরুণিয়া আসিয়া বিবাহ করেন এবং একটি পুত্র হইলেই পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজে বাস করত **শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত** ও **শ্রীশ্রীরসকলিকা** প্রণয়ন করেন।

ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ইনি তাৎকালীন বাদশাহার সাহায্যে ছাড়-পত্র লইয়া বঙ্গদেশ হইতে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আনয়ন করেন। তত্রত্য বাদশাহী সনদ হইতে ১৮১৫ সম্বৎ পাওয়া যায়—ইহাতে মনে হয় যে শ্রীপাদ নন্দকিশোর সপ্তদশ শক-শতাব্দীর শেষভাগেও প্রকট ছিলেন। ইহার অলৌকিক প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া যোধপুরের রাজা ও বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি ইঁহাকে বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন—অদ্যাবধি তদীয় বংশধরগণ উহা ভোগদখল করিতেছেন।

শ্রীপাদ যখন শৃঙ্গারবটে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের বিশাল সেবা চালাইতে ছিলেন—তখন ভোঁধু-নামে এক ব্রজবালক তাঁহার গোরক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। ভোঁধু প্রত্যহ বাল্যভোগ প্রসাদ পাইয়া গোসমূহ লইয়া যমুনাপারে মাঠে বা ভাণ্ডীর বনে যাইতেন। সগণ রাখালরাজ শ্রীনন্দনন্দনের সহিত ভোঁধুর মিত্রতা হয় এবং গোপালগণ ভোঁধুর নিকট রন্ধনের সামগ্রী যাচ্ঞা করেন। শ্রীগোস্বামিজির ভাণ্ডার হইতে প্রত্যহ খাদ্য সামগ্রী যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রচুরতর খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা হইল এবং ভোঁধুও তাহা বহিয়া নিয়া তাহাদের আনন্দ ভোজনের সহায়ক হইলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া শ্রীপাদ ভোঁধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সগণ শ্রীনন্দনন্দনই ঐসব সামগ্রীদ্বারা 'দালবাটি' প্রস্তুত করিয়া ভোজন করত খেলা করেন। শ্রীপাদ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভোঁধুদ্বারা সন্নিহিত গোপাষ্টমী উৎসব-উপলক্ষে সকল গোপালের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন—কিন্তু গোস্বামী-গৃহে যাইতে রাখালরাজ অসম্মত হইলে ভোঁধু প্রণয়াভিমান-বশতঃ নিজের গরু পৃথক্ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণবলদেব অনেক সাধ্য সাধনার পর স্বীকার করিলেন যে গোঁসাইজি যদি স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া খাদ্যসামগ্রী নিতে পারেন, তবেই তাঁহারা ভোজন করিবেন। তৎপরদিন শ্রীমন্ নন্দকিশোর প্রচুর দ্রব্য মস্তকে বহন করিয়া ভাণ্ডীরবনে গিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ক্রীড়াবিনোদ দর্শন করত কৃতার্থ হইলেন; ক্ষণকাল পরে তাঁহারা অন্তর্হিত হইলে ইনি যখন বিরহ-মূর্চ্ছায় ভূ-শায়িত ছিলেন, তখন আদেশ হইল—'অধীর না হইয়া গৃহে যাও এবং মদীয় লীলাস্থলীর বর্ণনা কর।' এই প্রত্যাদেশের ফলেই ইনি উত্তরকালে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

———

শ্রীনন্দগ্রামের সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়

যখন কাম্যবনে সিদ্ধ শ্রীজয়কৃষ্ণদাস বাবাজি এবং কোশীতে সিদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবা ভজন করিতেন, তখন শ্রীনন্দগ্রামের প্রান্তবর্তী পৌর্ণমাসী-কুণ্ডতীরে এক সিদ্ধ বাবাজিও ভজননিষ্ঠ ছিলেন। ইনি বৃক্ষতলেই বাস করিতেন। নিকটে কুটীর থাকিলেও তিনি তাহাতে বাস করিতেন না। শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা তাঁহার সেব্য ছিলেন। শ্রীগিরি-রাজকে বস্ত্রে বাঁধিয়া সর্ব্বদাই কণ্ঠে রাখিতেন—মলমূত্রত্যাগের সময়ও তাঁহাকে কণ্ঠ হইতে নামাইতেন না, স্নানের সময়ও কণ্ঠে রাখিয়াই স্নান করিতেন। ভজনাবেশে কখনও কখনও তিনি দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অন্তর্দ্দশাবিষ্ট থাকিতেন—কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকিত না; এই সময়ের মধ্যে মলমূত্রত্যাগ, স্নান পান বা আহারাদি কিছুই করিতেন না। যখন বাহ্যজ্ঞান হইত, তখনই স্নানাদি করিয়া শ্রীগিরিরাজের সেবা ও আহ্নিকাদি করিতেন। নিকটের কুটীরে তদনুগত যে সকল বৈষ্ণব থাকিতেন, তাঁহারাই পাকাদি করিতেন এবং বাবাজি মহাশয় তাহা শ্রীগিরিরাজের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতেন। আহার্যসামগ্রী কোথা হইতে কে সংগ্রহ করিত, তাহা কেহই জানিতে পারিত না। বৈষ্ণবগণের জন্য সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে রুটি প্রভৃতি ধরা থাকিত এবং যত বৈষ্ণবই তথায় যান না কেন, তদ্দ্বারাই তাঁহাদের আহার সমাধান হইত। কাহাকেও কোন স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হইত না। *

---

* গায়ক ও পণ্ডিত শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজি মহারাজের মুখাশ্রিত।

শ্রীনন্দগ্রামের জনৈক বাবাজি মহারাজ ও কুকুর-প্রসঙ্গ*

বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীনন্দীশ্বরের নিকটবর্ত্তী যশোদাকুণ্ডের পার্শ্বদেশে অবস্থান করত একমূর্ত্তি নিষ্কিঞ্চন মহাত্মা ভজন করিতেন। তাঁহার নামটি অজ্ঞাত। দিনান্তে একবার গোফা হইতে বহির্গত হইয়া শৌচাদিকৃত্য করিয়া সন্ধ্যাসময়ে তিনি মাধুকরী-উপলক্ষে গ্রামে যাইতেন এবং যাহা পাইতেন, তাহাই উদরসাৎ করিয়া ভজনানন্দে কালাতিপাত করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নন্দগ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। একবার গোবর্দ্ধন হইতে জনৈক বাবাজি আসিয়া তাঁহাকে শ্রীনামযজ্ঞোপলক্ষে শ্রীচাক্‌লেশ্বরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; তিনি প্রথমতঃ আসন ছাড়িতে কিছুতেই স্বীকার করিলেন না, পরে বিশেষ পীড়াপীড়িতে অগত্যা সম্মত হইয়া যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন। দুই রাত্রি নন্দগ্রামে অনুপস্থিত থাকিয়া তিনি তৃতীয় দিন অপরাহ্নে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যাকালে মাধুকরী করিয়া আসিলেন। অন্ধকার রাত্রি—মাধুকরী প্রসাদ পাইয়া তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় কে যেন তাঁহাকে করুণ কণ্ঠে বলিলেন—'ও বাবাজি মহাশয়! গত দুই দিন আমার আহার হয় নাই।' বাবাজি মহাশয় চমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে?' তখন আবার উত্তর হইল—'আপনি প্রত্যহ যে কুকুরটীকে এক টুকরা মাধুকরী দিতেন, আমি সেই কুকুর।' বাবাজি মহাশয় বিস্ময়-সহকারে এবং অপ্রাকৃত ধামের অদ্ভুতত্ব অনুভবে কাতরস্বরে বলিলেন—'আপনি কৃপা করিয়া স্বরূপের পরিচয় দিন।' তখন সেই কুকুরটি বলিলেন—'বাবা, আমি অতি দুর্ভাগা জীব, পূর্ব্ব জন্মে আমি এই নন্দীশ্বরে মন্দিরের পূজারী ছিলাম। একদিন

---

* পরম ভাগবত পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীযুক্ত রামদাস ববাজি-মহোদয়ের শ্রীমুখাশ্রিত কাহিনী।

একটি বড় লাড্ডু ভোগের জন্য আসিয়াছিল, আমি লোভ-বশবর্ত্তী হইয়া তাহা ভোগ না দিয়াই উদরসাৎ করিয়াছিলাম ; সেই অপরাধে আমি ভূত হইয়াছি। আপনি নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। আপনার হাতে মাধুকরী খাইয়া যদি আমার ঊর্দ্ধগতি হয়, তারই জন্য অনেকদিন যাবৎ আপনার প্রদত্ত মাধুকরীর লোভে এখানে আসিতেছি।' কাহিনী শুনিয়া বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে পুনরায় কাতরে ও বিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে যাই হউক, আপনি ত অপ্রাকৃত ধামের ভূত, আপনি নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের দর্শন পান, লীলাদি প্রত্যক্ষ করেন।' উত্তর হইল—'হাঁ বাবা দর্শন ত পাই, লীলাদিও প্রত্যক্ষ করি—কিন্তু আপনারা যেভাবে আস্বাদন করেন, আমার এই দেহে সেইরূপ আস্বাদনের যোগ্যতা নাই।' বাবাজি মহাশয় অতিকাতরে আবার বলিলেন—'তবে আমাকে একবার দেখাইতে পারেন কি?' উত্তর হইল—'না, আমার সে অধিকারও নাই।' প্রশ্ন হইল—'তবে কি প্রকারে দর্শন পাওয়া যায়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন কি?' উত্তর হইল—'হাঁ, তাহা পারি। দেখুন, আগামী কল্য ফেরত গোষ্ঠের সময় যশোদাকুণ্ডের প্রান্তে বসিয়া থাকিবেন, ধেনুগণের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী গোয়ারিয়া-(রাখাল)-গণের সর্ব্বশেষের বালকটিই শ্রীকৃষ্ণ।' এই বলিয়া সেই কুকুর-রূপী ভূত অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে সেই বাবাজি মহাশয় শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার সময় আর কাটে না!! আগামী কল্যের ফেরত গোষ্ঠ পর্য্যন্ত সময়টি যেন সুদীর্ঘতম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল!! তিনি কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন প্রলাপ, কখন নৃত্য করিয়া অধীর হইলেন। অতিকষ্টে সেই দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হইতে না হইতে যশোদাকুণ্ডের প্রান্তবর্ত্তী এক ঝোপের মধ্যে গিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু সেস্থানেও সুস্থির হইতে পারিতে-

ছেন না। একবার ভাবিতেছেন—'আমি কি শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইবার উপযুক্ত? এ অসম্ভব ধারণা!' এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া রজে গড়াগড়ি দিতেছেন। ক্ষণকাল পরে আবার মনে হইল—'শ্রীকৃষ্ণ যে করুণাসমুদ্র, অবশ্যই এই দীনহীন দুর্ভাগ্যকে কৃপা করিবেনই।' এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছেন—সময় আর যাইতেছে না, দ্বিপ্রহর আর হয় না!! এই ভাবে হাসা কান্না নাচা গাওয়া করিতে করিতে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঝুলিয়া পড়িলেন—ফেরত গোষ্ঠের সময় নিকটবর্ত্তী হইল—অদূরে গোধূলি-রঞ্জিত আকাশ দেখা গেল। বাবাজি মহাশয় এবার অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করত বনমধ্যে লুকায়িত হইয়া বসিয়া পড়িলেন—ধীরে ধীরে গো মহিষ মেষাদি আসিতে লাগিল—একটি দুইটি করিয়া রাখালগণও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া স্বস্বযূথকে তাড়াইয়া নিতে লাগিলেন। অহো! সর্ব্বশেষে জনৈক রাখাল আসিলেন—কৃষ্ণবর্ণ, শরীরটি বহুস্থলে বক্র, সকলের শেষে খঞ্জ গতিতে তিনি হস্তে (পাচন)-দণ্ড ধরিয়া নন্দগ্রামে চলিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে ইনিই সেই রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মনে করিয়া বাবাজি মহাশয় দ্রুত পদবিক্ষেপে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া দুইটি চরণে জড়াইয়া ধরিলেন। বালকটি বলিলেন—'রে বাবা, মে—বাণিয়াকা লালা হুঁ, মেরা কসুর হোগা, তু মেরা পৈর ছোড়্ দে, মাইয়া মারে গা—বাবা দেখ্, তু মেরা ঘর চল্, দহি দেগা, মিছরী দেগা, মাধুকরী দেগা, অউর যো চাহিয়ে লে লও, মেরা পৈর্ ছোড়্ দে'। বাবাজি মহাশয় তাঁহার কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া দৈন্যবিনয় করত কেবল বলিতে লাগিলেন—'হে প্রিয়তম! একবার দর্শন দিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। হে কৃষ্ণ! আর ছল চাতুরী না করিয়া আমাকে তোমার অভয় চরণারবৃন্দে স্থান দাও।' বলা বাহুল্য—প্রকৃত রাখালগণ

স্বস্বগৃহে বহুপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন—ইঁহারা দুইজন—ভক্ত ও ভক্তবৎস্য ঠাকুরটি সেই সন্ধ্যা হইতে অর্দ্ধরাত্রি যাবৎ সেই কুণ্ডপার্শ্বে থাকিয়া কথাকাটাকাটি করিতে লাগিলেন। বাবাজি মহাশয় যখন কিছুতেই চরণ ছাড়িলেন না এবং স্তোভবাক্যেও ভুলিলেন না, তখন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বলিলেন—"আচ্ছা, বাবা, আমার স্বরূপ দেখ।' এই বলিয়া তাঁহাকে ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী রূপে দর্শন দিলেন। বাবাজি মহাশয় বলিলেন—'আমি ত একাকী তোমারই ধ্যান ধারণা করি না; আমি যে যুগলোপাসক; অতএব হে কৃপাময়! একবার সপরিকর দর্শন দিয়া আমাকে প্রাণে বাঁচাও।' তখন অপরূপ বৃন্দাবনে অপরূপ যুগলকিশোরের অপরূপ সখীগণ সমভিব্যাহারে অপরূপ প্রকাশ হইলেন। বাবাজি মহাশয়ও নয়ন মন সার্থক করিয়া সেই রূপমাধুরীতে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার চিরদিনের পোষিত বাঞ্ছার পরিপূর্ত্তি হইল—তিনি মহানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া দিনকয়েক পরেই দেহসঙ্গোপন করিলেন।

শ্রীপাদ নবকিশোর গোস্বামী ও শ্রীপাদ লোচনানন্দ গোস্বামী (ঢাকা)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশাবতংস শ্রীলক্ষ্মীকান্ত গোস্বামীপ্রভুর নয়টী সন্তান ছিলেন। প্রত্যেকটি সন্তানই রত্নসদৃশ—প্রথম পুত্র শ্রীকৃষ্ণকিশোর পিতারই মন্ত্রশিষ্য; শ্রীনবকিশোর প্রভু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিষ্য এবং শ্রীলোচনানন্দ প্রভু শ্রীনবকিশোর প্রভুর শিষ্য ছিলেন। শ্রীনবকিশোর ও শ্রীলোচনানন্দ দুই ভাই পরস্পর গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হইলেও তাঁহারা একদেহ একাত্মা ছিলেন। উভয়েই ষড়্‌দর্শনাচার্য্য-পণ্ডিত এবং বৈরাগ্যবান্ ও ভজনানুরাগী ছিলেন। আকুমার অবস্থায় দুই ভাই সংসার ত্যাগ করত ভজনাভিলাষে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন—

পূজাপ্রতিষ্ঠার ভয়ে নিজ পরিচয় গোপন করিয়া ইহারা হাড়ীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের শরণাগত হইলেন। সিদ্ধ বাবা ইঁহাদের তেজ, রূপ, গুণ, বিদ্যা, অনুরাগ ও বৈরাগ্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের বাক্যে অবিশ্বাস না করিয়া নীচকুলেও মহদাবির্ভাব হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে ভজনমুদ্রা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সিদ্ধ বাবা তখন অতিবৃদ্ধ হইয়াছিলেন—তিনি তাঁহাদিগকে নিজ-সেবায় অঙ্গীকার করিলেন। উভয়েই অতি যত্নে ও অনুরাগে সিদ্ধ বাবার মলমূত্রাদি পরিষ্কার, উচ্ছিষ্টাদি-লেপন প্রভৃতি সেবা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু দিন সেবার পর তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে সিদ্ধ বাবার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সিদ্ধ বাবা শ্রীনবকিশোর ও শ্রীলোচনানন্দের প্রকৃত পরিচয় জানিলেন—ক্রোধে তাঁহার নয়ন ও বদন আরক্তিম হইল—সেই সময় তাঁহারা দুই ভাই স্নানার্থে মানসগঙ্গায় গিয়াছিলেন। কৃত্য সমাপন করিয়া তাঁহারা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিদ্ধ বাবার নিকটে উপবিষ্ট দেখিলেন ও শ্রীসিদ্ধ বাবার অরুণ নয়ন দেখিয়া সব ব্যাপার বুঝিয়া ভীত হইয়া সিদ্ধ বাবার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সিদ্ধ বাবা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'ভজনমুদ্রাদি তোমাদেরই ধন, তোমাদেরই পাইবার অধিকার, তবে ইহাতে এত প্রবঞ্চনা কেন ?' তাঁহারা বলিলেন—'প্রভো ! আমরা জন্মে জন্মে প্রভুর নিকট অপরাধী, এই জন্য উচ্চ কুলে আমাদের জন্ম হইয়াছে। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি শূকরী-বিষ্ঠাই আমাদের জীবিকা, অকিঞ্চনা-ভজন-সাধনে আমাদের অধিকার নাই। যে দুর্লভ বস্তু অনায়াসে পাওয়া যায় না, অথচ মহৎসেবা বিনা তাহা সুদুর্লভ, তাহারই অভাবে পড়িয়া আমরা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আপনি পরম বৈষ্ণব ও কৃপালু। অপরাধের যাহা দণ্ড

হয়, করুন।' ইহাতে সিদ্ধ বাবা অন্তরে প্রসন্ন হইলেও বাহ্যতঃ ক্রোধাভাস দেখাইয়া বলিলেন—'তোমাদের এই দণ্ড—তোমরা স্বহস্তে নিজ চরণ ধুইয়া সেই চরণামৃত আমার অগ্রে ধর।' মহাপুরুষের ক্রোধ শান্তির জন্য অগত্যা তাঁহাদিগকে তাহাই করিতে হইয়াছিল। সিদ্ধ বাবা চরণামৃত পাইয়া প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—'কৃষ্ণ অত্যন্ত কৃপালু, তোমাদের মত মহতের সঙ্গ আমাকে জুটাইয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা আর বঞ্চনা করিও না—তোমাদের যে দৈন্যভক্তি হইয়াছে, তাহার লেশও আমার নাই। তোমরা এখানে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া ভজনমুদ্রা আলোচনা করিলে আমিও ধন্য হইব।' তখন তাঁহারা বলিলেন—'প্রভো! আমাদিগকে এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা চলিবে না।' তখন তাঁহারা তিন ভাই তথা হইতে বিদায় লইয়া কাম্যবনের পশ্চিমদিকে পশুপ-নামক নির্জন গ্রামে [যে স্থানে বৈষ্ণবদের যাতায়াত নাই] বাস করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। সময় সময় কাম্যবনের সিদ্ধ শ্রীজয়কৃষ্ণ দাস বাবার নিকট তাঁহারা আসিতেন। প্রবাদ আছে যে তাঁহাদের নিত্যসেবিত বিগ্রহ কাম্যবনের সিদ্ধ বাবার নিকট থাকিলেন। পশুপবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেহরক্ষা করেন।

কিছুদিন পরে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে তাঁহাদের বংশের কেহই অবশেষ নাই এবং ঢাকায় ঠাকুরসেবার ব্যতিক্রম হইতেছে। ঠাকুরসেবা-সমাধানের জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া আবার ঢাকায় যাইতে হইয়াছিল। ঢাকায় গিয়া ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পাইলেন—'চট্টগ্রাম জেলায় হাটহাজারী থানার অন্তর্গত ফরদাবাজ গ্রামে একজন নাথবংশীয় ভক্ত জমিদার আছে—তাহাদের বংশ শীঘ্রই লোপ পাইবে—সেখানে আমাকে শীঘ্রই লইয়া চল—তাহার জমিদারীর আয় দ্বারা আমার সেবা নির্ব্বাহ হইবে।' এই আদেশ পাইয়া উভয়ে

ঠাকুর লইয়া ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম গেলেন—প্রথমতঃ সেই গ্রামে যাইয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ ভক্তপ্রবর কার্ত্তিক অধিকারীর বাড়ীতে উপস্থিত হন। সেই কবিরাজ উক্ত জমিদার-পরিবারের বিশ্বস্ত চিকিৎসক ছিলেন—তাঁহাদের সকল কথা কবিরাজ মহাশয় জমিদারকে জানাইলে ঐ জমিদার নিরুদ্বেগে ও নির্ভয়ে তাঁহার যাবতীয় ভূসম্পত্তি ঠাকুরের নামে লিখিয়া দিলেন এবং ঠাকুরসেবার সুব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল।

একদিন কার্ত্তিক অধিকারীর গৃহে বহু ভক্ত সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন—শ্রীপাদ লোচনানন্দ প্রভু কীর্ত্তনাবেশে হঠাৎ দ্রুতবেগে কোথায় যে বাহির হইয়া গেলেন—তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন বিরাম হইলে সকলে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া কোনই খোঁজ পাইলেন না। পরদিন হতাশ হইয়া শ্রীযুক্ত অধিকারী মহাশয় তাঁহার অনুসন্ধান করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীনীলাচল ও শ্রীবৃন্দাবনে লোক পাঠাইলেন। তিন দিন পরে অধিকারী মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানায় অন্যান্য লোকসহ বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলেন যে অনতিদূরে একটি আবর্জনাময় গর্ত্তের ধারে কতগুলি গরু বিস্ফারিত নেত্রে গর্ত্তের ভিতরে দেখিতেছে—কখনও আঘ্রাণ লইতেছে, কতকগুলি গরু আবার উর্দ্ধপুচ্ছে নৃত্য করিতেছে। সকলেই উৎসুকচিত্তে কারণান্বেষণে ছুটিলেন—তাঁহারা দেখিলেন সেই আবর্জনাময় গর্ত্তের মধ্যে শ্রীপাদ লোচনানন্দ প্রভু অধঃশিরে পতিত রহিয়াছেন—সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত—কেবল চরণমাত্র উর্দ্ধদিকে কর্দ্দমের বাহিরে রহিয়াছে। পূর্ব্বরাত্রে প্রায় পাঁচশত ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট কদলীপত্র সেই গর্ত্তে ফেলা হইয়াছে—উহাতে তাঁহার চরণ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া গিয়াছিল—গোগুলি সেই উচ্ছিষ্ট কদলীপত্র ভক্ষণার্থ গর্ত্তে গিয়াছিল—কদলীপত্র ভক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার চরণ অনাবৃত হইয়াছে—গোগণ তাঁহার

চরণ আঘ্রাণ করিতেছে, চাটিতেছে আবার উপরে আসিয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে নৃত্য করিতেছে!! প্রভুকে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া সর্বাঙ্গ ধৌত করিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু তাদৃশ মহাপুরুষ সেই শোচ্যদেশে তিন দিন পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন বলিয়া তাঁহারা দুঃখ করিতে লাগিলেন। অধিকারী মহাশয় কিন্তু প্রতিভাশালী বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন—প্রভুকে তিনি উত্তমরূপে পরীক্ষা করত বলিলেন—'না, ইঁহার প্রাণবায়ু দেহে নিরোধ হইয়াছে মাত্র, তিন দিন পর্য্যন্ত মৃতদেহ অবিকৃত ও এতাদৃশ কান্তিশীল থাকিতে পারে না। তোমরা সকলে পুনরায় কীর্ত্তন কর।' তখন সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে প্রভু হঠাৎ লম্ফ দিয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্য দশা হইলে সকলে তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না।'

চট্টগ্রাম জেলায় সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথে শিবচতুর্দশী উপলক্ষে পনর দিন যাবত মেলা হয়। ঐ সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী ও বহু সাধুর সমাগম হয়। একবার ঐ সময় শ্রীলোচনানন্দ প্রভুপাদ কয়েকজন ভক্তসঙ্গে ঐ স্থানে গিয়াছিলেন। অর্দ্ধরাত্রে শ্রীশম্ভুনাথ শিবের দর্শন হইয়া থাকে—সেই সময় তিনি ভক্তগণকে লইয়া ব্যাসকুণ্ড ও কালভৈরবের মন্দিরের নিকট গেলে সকলে দেখিল যে কালভৈরবের মন্দির হইতে এক যোগীশ্বর বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার শরীর প্রায় পাঁচ হাত দীর্ঘ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ভীষণকায়, গলে কঙ্কালমালা, সর্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, পিঙ্গলবর্ণ জটা আপাদলম্বিত, নেত্রদ্বয় উল্কাবৎ জাজ্বল্যমান এবং কপালে ত্রিপুণ্ড্র তিলক। অদৃষ্টপূর্ব এই মূর্ত্তি দেখিয়া উপস্থিত সকলে ভয়ে বিহ্বল

হইল—সকলের অগ্রে শ্রীলোচনানন্দ প্রভু ছিলেন। মূর্ত্তিটী প্রভুর অগ্রদেশে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া দৈন্যভরে বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আমি এখানকার দেবতা, নাম—কালভৈরব, মনুষ্যের পাপগ্রহণ করিয়া আমিও পাপগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি—আপনি এখানে আসিবেন বলিয়া আমি অপেক্ষা করিয়া আছি—কৃপাপূর্ব্বক আমার নিস্তারের উপায় উপদেশ করুন।" প্রভু তখন কালভৈরবকে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র উপদেশ করিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া সঙ্গীয় ভক্তগণের ভয় দূর হইল। তৎপরে সেই যোগীশ্বর প্রভুর চরণে একটি স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্বর্ণস্পর্শ হইল দেখিয়া প্রভু সচেলে স্নানান্তে শ্রীশম্ভুনাথ-দর্শনে গেলেন।

ঐ অধিকারী মহাশয়ের বাড়ী হইতে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে একটি নদী ছিল। রাত্রিশেষে প্রভু সেই নদীতে নিত্যকৃত্যাদি করিতে যাইতেন এবং ফিরিবার সময় ঠাকুরসেবার জন্য জল আনিতেন। একবার ঐ গ্রামে ভয়ানক বিসূচিকা রোগ হইয়া বহুলোক মরিতেছিল—অধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে তখনও কিছু হয় নাই। স্নানান্তে প্রভু যখন জল লইয়া ফিরিতেছিলেন, তখন অতিকুৎসিত-বেশা, অতিদুর্গন্ধময়ী এক বৃদ্ধা আসিয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। প্রভু ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'তুই কে রে? আমি বৃদ্ধলোক, নদী হইতে ঠাকুরের জন্য জল আনিতেছিলাম, তুই আমাকে স্পর্শ করিয়া জল নষ্ট করিলি?' ঐ বৃদ্ধা ভীত হইয়া বলিল—'প্রভো! আমি একে মহাপাপী, জীবহিংসাই আমার ধর্ম্ম, তাহাতে আবার আপনার চরণে মহা অপরাধ করিয়া ফেলিলাম!! আমার গতি কি হইবে?' প্রভু তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'আমি বিসূচিকা দেবী।' প্রভু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহাকে কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলেন। তখন দেবী বলিলেন—

'প্রভো! আপনি আমার গুরু। আমি কিছু গুরুদক্ষিণা দিতে চাই।' প্রভু বলিলেন—'ভাল কথা, এই কয়েকদিন লোকের অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত; অতএব তুমি এই গ্রাম হইতে এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাও। এই গ্রামে কখনও আসিও না। ইহাই তোমার গুরুদক্ষিণা।' প্রভু পুনঃ নদীতে গিয়া স্নান করিয়া জল আনিলেন। বাড়ীতে ফিরিতে সেই দিন বিলম্ব হইল দেখিয়া অধিকারী মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু সকল ঘটনা জানাইলেন এবং বলিলেন—'এখন হইতে তোমাদের গ্রামে আর কোন ভয় নাই।' বাস্তবিক তন্মুহূর্ত্ত হইতেই ঐ গ্রামে মুমূর্ষু যত রোগী ছিল, সকলেই আরোগ্য লাভ করিল। অদ্যাবধি সেই গ্রামে বিসূচিকা হয় না—এমন কি গ্রামান্তরের কোন রোগী সেই গ্রামে আসিলে আরোগ্য লাভ করে।

তৎপর ঐ প্রভুদ্বয় শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দর্শন করিতে গমন করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের পাণ্ডুবিজয়ের সময় তাঁহারা দর্শন করিতে করিতে বড় প্রভু অপ্রকট হইলেন। ছোট প্রভু তখন বড় প্রভুর অবস্থাদর্শনে তাঁহার চরণ-তলে বসিয়া বলিলেন—'প্রভো! মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া চিরদিনের সেবককে কি ছাড়িয়া যাইবেন?' এই বলিয়া তিনিও তাঁহার অনুগামী হইলেন। এই ঘটনা দেখিয়া ক্ষেত্রবাসী সকলেই বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে লইয়া গিয়া সমাধি প্রদান করেন। অদ্যাবধি তাঁহাদের সেই ঠাকুরকে তত্রত্য নাথের ব্রাহ্মণগণ সেবা করিতেছেন।

শ্রীনরোত্তম দাস অধিকারী

সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহারাজের শিষ্য। ইনি শ্রীক্ষেত্রের শ্রীরাধাকান্ত মঠের অধিকারী ছিলেন। সিদ্ধ বাবার দর্শন করিয়াই ইনি তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া ভজনশিক্ষা করেন এবং তদবধি ব্রজেই বাস করেন। বুদ্ধিতে ও ব্যবহারে ইনি অতিশয় নিপুণ ছিলেন বলিয়া সমগ্র ব্রজমণ্ডলের নেতা বা মহান্ত-পদে বৃত হন। চৌরাশি ক্রোশের মহান্ত ভাদাবলীর শ্রীগোপাল দাস বাবাজি মহাশয় তাঁহার শিষ্যস্বরূপ ছিলেন।

সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহাশয় (ব্রহ্মকুণ্ড)

গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের দ্বিতীয় শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ দাসজি শ্রীলগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি প্রভুর পরিবার ছিলেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অধিক বয়সে সিদ্ধ বাবার শ্রীচরণাশ্রয় করেন। ইনি শ্রীমদনমোহন ঠৌরে থাকিয়া ভজন করিতেন, অদ্যাপি সেখানে তাঁহার আসন বিরাজমান। বহু বৈষ্ণব ইঁহার নিকট ভজন শিক্ষা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দাস পণ্ডিত বাবাজি মহারাজ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীগৌর শিরোমণি মহাশয় কেশিঘাটে তাঁহার নিজ বাড়ীতে থাকিয়া ভজন করিতেন। একবার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শিরোমণি মহাশয় দেহ থাকিবে না আশঙ্কায় সিদ্ধ বাবা নিত্যানন্দ দাসজির নিকট বেশাশ্রয় করেন। শরীর স্বচ্ছন্দ না হওয়ায় ইনি বাড়ীতেই থাকিতেন। কোনও সময়ে শ্রীশিরোমণি মহাশয় কান্থা গলে দিয়া শ্রীবলরাম দাস বাবাজি মহাশয়কে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে শাসন করিয়া বলিলেন—'কে শিরোমণি?

তুমি কেন কাঁথা গলায় দিয়াছ? শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের কাঁথা, তুমি তাহার অপমান করিলে? এখনও শাঁখানাড়া ভাত না খাইলে তোমার পেট ভরে না, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের কাঁথা গলায় দিবার তোমার কি অধিকার আছে?' ইহা শ্রবণ করিয়া শিরোমণি মহাশয় স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিয়া দৈন্যভরে কাঁদিতে লাগিলেন। তার পরে তিনি শ্রীমদনমোহনের ঠৌরে সিদ্ধ বাবার নিকটস্থ এক কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে শ্রীবলরাম দাস বাবাজি মহাশয় স্বগুরু সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবার উৎসব করিতেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের সকল বৈষ্ণবকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কিন্তু শিরোমণি মহাশয়কে ভেক দিয়াছেন বলিয়া গুরুভাই শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সায়ংকালে শ্রীনিত্যানন্দ বাবা একখানি ডুলিতে বসিয়া শ্রীশিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি শিষ্যবর্গসহ উৎসবের স্থানে ঝাড়ুমণ্ডলের দরজায় উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য বৈষ্ণবগণ সত্বর গিয়া শ্রীবলরাম দাস বাবাকে সংবাদ প্রদান করিলে তিনি নিজেই বাহির হইয়া আসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বাবা তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং শ্রীবলরাম বাবা তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বলিলেন—'ভাই! তোমারই জয় হইল! আমি পরাজিত হইলাম। তবে ভিতরে চল।' শ্রীনিত্যানন্দ বাবা সদৈন্যে বলিলেন—'আমার সেই অধিকার নাই, এইখানেই এক কণিকা অধরামৃত পাইত ভাল হয়।' শ্রীবলরাম বাবা সশিষ্য তাঁহাকে আদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং যথাযোগ্য সম্বর্ধনা করিলেন।

ইনি রাগানুগীয় সিদ্ধগণের মধ্যে অদ্বিতীয়! সম্পূর্ণ শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। আকুমার বৈরাগ্য ছিল, 'মনোগতি-রবিছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ' এই শাস্ত্রবাক্য-তাৎপর্য তাঁহাতেই প্রত্যক্ষ হইত। তিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তিতে প্রায় একই অবস্থাতে

থাকিতেন। চেতন-কালে তিনি গম্ভীর ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত; আহার বিহার বা শৌচাদি-কৃত্যের জন্য সেবকগণ অনুরোধ করিলে তখন তিনি সমাধি হইতে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিতেন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি হাস্য, রোদন ও প্রলাপাদি করিতেন, তখন লোকে মনে করিত যে তিনি জাগরিতই আছেন। চেতনাবস্থায় যেমন মনোভাব গোপন রাখিয়া গম্ভীর থাকিতেন, নিদ্রাকালে কিন্তু তাহা গোপন থাকিত না, বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাহাতে সেবকগণই তাঁহার জাগরণ বা নিদ্রা বুঝিতে পারিতেন।

'যাঁহাকে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।'—শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য-মর্ম এই মহাপুরুষে সকলেই প্রত্যক্ষ করিত। যে কোন সাধক শাস্ত্র বা ভজন-সম্বন্ধীয় সন্দিগ্ধ বিষয় লইয়া তাঁহার নিকট বসিলেই সন্দিগ্ধস্থলের সমাধানগুলি হৃদয়ে আপনা হইতেই স্ফুরিত হইত। তিনি সর্ব্বদাই ভজনাবিষ্ট থাকিতেন বলিয়া কোনও প্রশ্ন শুনার বা উত্তর দেওয়ার অবকাশ থাকিত না। ইঁহার এতাদৃশ অলৌকিক প্রভাব ব্রজের বহু পণ্ডিত ও ভজনানন্দী বৈষ্ণব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এই শক্তিটী তদীয় শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত বাবাজি মহাশয়েও সঞ্চারিত হইয়াছিল। *

"তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকটি সিদ্ধ বাবার আচরণে যথার্থতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে কোনও ব্যক্তি—এমন কি তাঁহার শিষ্যগণও কেহ তাঁহার নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ করিবার পূর্ব্বে তিনিই প্রথমে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করিয়া বসিতেন। কেহ কেহ দৈন্যবাক্যাদি বলিলে তিনি রোদন করিতেন—এজন্য ভয়ে কেহ তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না। কখনও কোন শিষ্য আসিয়া 'আমি আপনার শিষ্য, দাস;

* এ বিষয়ে পণ্ডিত বাবাজির জীবনী দ্রষ্টব্য।

আপনি আমার নিকট এইরূপ আচরণ করেন?' এইরূপ বলিলে তিনি তদুত্তরে বলিতেন—

'হইয়াছেন, হইবেন প্রভুর যত দাস।
সভার চরণ বন্দো দন্তে করি ঘাস॥'

তাৎপর্য্য এই যে 'হইয়াছেন'-শব্দে এই জগতে যত বৈষ্ণব, তাঁহারা সকলেই গুরুস্থানীয় এবং 'হইবেন'-শব্দে যাঁহারা ভবিষ্যতে বৈষ্ণব হইবেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে গুরুস্থানীয়, অতএব ইহাতে শিষ্যগণকেও বাদ দেওয়া চলে না। তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে যদি কেহ কখন অবসরমত বলিতেন—'বাবা, আপনার শিষ্যের প্রতি আপনি এতাদৃশ আচরণ করাতে উনি দুঃখ পাইয়া চলিয়া গেলেন। উনি আপনার শিষ্য, উঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা কি উচিত?' ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি ভীত হইয়া বলিলেন—'তবে আমি কি করিব বাবা? তুমি উপদেশ কর। আমি দেখিতেছি—উনি মহাভাগবত, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া উঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন—উনি দুঃখ পাইলে আমার অপরাধ হইবে। তাহা হইলে আমি আর ঐরূপ করিব না।' পুনরায় কিন্তু ঐ শিষ্য সম্মুখে আসিলে তিনি পূর্ব্বকথা ভুলিয়া আবার দণ্ডবৎ করিতেন। তখন শ্রীশিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি শিষ্যগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন—"দেখ ভাই। মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়াও কাহারও চরণ ধরিতেন, কাহারও বা বস্ত্রাদি বহন করিতেন এবং নিজেকে 'গোপীভর্ত্তুর্দাসানুদাসঃ' বলিয়া অভিমান করিতেন। নিত্যসিদ্ধ শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভুও 'তৃণাদপি সুনীচ' ব্যবহার করিতেন। কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—'পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ' ইত্যাদি। ইঁহাদের আচরণে তৃণাদপি সুনীচ ভাব সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়; কাজেই তাঁহাদের অনুগত শিষ্য-পরম্পরায় বাবাজি মহাশয়ের স্বচরিত্রে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের যাজন আমাদের

মনোবুদ্ধির অগোচর। অতএব তাঁহার এই সব আচরণ আমাদের শিক্ষারই বিষয়, তিনি নিজে আচরণ করিয়া না শিখাইলে আমরা কোথা হইতে শিখিব? তিনি গুরু হইয়াও আমাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেন, আমরা শিষ্য হইয়া তাঁহার প্রতি কিরূপ দৈন্য আচরণ করিতে হইবে, তাহা তোমরা নিজেই বুঝিয়া লও ইত্যাদি……।"

ইঁহার শিষ্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রধান—শ্রীগৌরশিরোমণি মহারাজ, শ্রীব্রজকিশোর দাস বাবাজি, শ্রীনৃসিংহ দাসজি, শ্রীরামকৃষ্ণ দাস পণ্ডিত বাবাজি এবং শ্রীনরোত্তম দাস অধিকারী। শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ রাণীচরে সিদ্ধ শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজও ইঁহার সাধক চেলা ছিলেন। ইঁহাদের প্রসঙ্গ ভিন্ন ভাবে আলোচ্য।

শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহাশয় (গোবর্দ্ধন)

ইনি শ্রীবৃন্দাবনে নিজ গুরুর আস্তানে থাকিয়া শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়িয়া শ্রীশ্রীরাধারমণ-সেবায়েত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী-পাদের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার শ্রীগুরু-দেবের বয়স তখন এক শত বৎসরেরও অধিক ছিল, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার ঠাকুর সেবা ছিল—শ্রীনিত্যানন্দ দাসজি সেই সেবা করিতেন, রসুই করিয়া ভোগ লাগাইয়া শ্রীগুরু-দেবকে ভোজন করাইতেন। শ্রীগুরুদেবের অন্যান্য সেবা করিবার জন্য দুইজন শিষ্যা ছিল। সেই দুইজনই যুবতী আর এই শ্রীনিত্যানন্দ দাসজিও যুবক—বাবাজি মহারাজ ত অন্ধ। একটি আস্তানের মধ্যে অন্য আর কেহই নাই—'কিরূপে বৈরাগ্য রক্ষা হইবে'—ভাবিয়া শ্রীনিত্যানন্দ দাসজি বহু মহতের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা বলেন—'তোমার গুরুদেব মহাপুরুষ, তিনি স্ত্রীলোকের হাতে জল

খান না। তুমি গেলে তাঁহার জল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। গুরু-সেবাই তোমাকে রক্ষা করিবে।' তখন শ্রীনিত্যানন্দ দাসজির বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। এইভাবে কত দিন থাকিতে থাকিতে তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ বিকারগ্রস্ত হইল। একদিন অতিবিকারগ্রস্ত হইয়া সেই স্ত্রীলোকের গৃহের দিকে যাইতে যাইতে ফিরিয়া বাহির হইয়া একেবারে গোবর্দ্ধনের প্রান্তভাগে পুছরিতে বনমধ্যে একটি গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া রহিলেন। তিন দিনের পর মধ্যরাত্রে কেহ আসিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"কেন মরিতেছিস্? নামসংকীর্ত্তন কর গিয়ে।' এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে নিত্যানন্দ দাসজির শরীরে নূতন বল হইল। উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি তথা হইতে মানসগঙ্গার তটে আসিয়া একটি জীর্ণ কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যে তথায় এক মূর্ত্তি বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'তোমার বাবাজি মহারাজ আমাকে পাঠাইয়াছেন। তুমি যে দিন চলিয়া আইস, তারপর দিন প্রাতঃকালে বঙ্গদেশ হইতে দুইটি ব্রাহ্মণ-সন্তান আগমন করত তাঁহার নিকট ভেক লইয়া তাঁহার সেবা করিতেছে। তোমাকে অন্ধকারের মধ্যেই লইয়া যাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন—তুমি চল।' এই কথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ দাসজি বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—'আমি যে চলিয়া আসিয়াছি এবং যাহা করিয়াছি, করিতেছি—তাহা ত কেহই জানে না; তবে শ্রীগুরুদেব সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, তাঁহারই কৃপাতে আমার এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার এবং শ্রীগিরিরাজের কৃপায় নাম-সংকীর্ত্তন স্ফূর্ত্তি হইল।' তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের নিকট চলিলেন। বৃদ্ধ বাবাজি তাঁহার পরিচিত ভজনানন্দী বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণকে আহ্বান করিয়া সেইদিন একটি মহোৎসব করিলেন। উৎসবান্তে সেই বৈষ্ণবগণকে বসাইয়া নিত্যানন্দ-

দাসকে ডাকিয়া তিনি প্রত্যেকের চরণে দণ্ডবৎ করাইলেন আর প্রত্যেক মহাত্মার হস্ত ধরিয়া নিত্যানন্দ দাসের মাথায় দিয়া বলিতে লাগিলেন—'আপনারা সকলে নিত্যানন্দ দাসকে এমন কৃপা করুন যাহাতে সে একান্ত ভজন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণারবিন্দ লাভ করিতে পারে।' তারপর তিনি নিত্যানন্দ দাসকে বলিলেন—'যাও তুমি গিরিরাজের তটে গিয়া একান্ত ভাবে ভজন কর। তৎপরে তিনি গিরিরাজের তটে আসিয়া নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। পূজ্যপাদ শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজি মহাশয় একদিন পরিক্রমায় আসিয়া সখীথরাতলার পুলের উপর বসিয়া সেই নামসঙ্কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে বিমুগ্ধ হইয়া সেই ধ্বনির অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং ৫০০,৬০০ হাত দূরে গিয়াই শুনিলেন একজন অতিজীর্ণ কুটীরে প্রেমাবেশে নামকীর্ত্তন করিতেছেন। ৫।৭ দিন যাবৎ তাঁহার নিকটবর্ত্তী কুটীরে বাস করিয়া তিনি দেখিলেন যে সর্ব্বদাই শ্রীনিত্যানন্দ দাসজি নাম-কীর্ত্তন করেন; কখন স্নান করেন, মাধুকরী করেন, শৌচে যান—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

এইরূপে আবিষ্টচিত্তে নামসঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল; অন্তরে লীলাস্ফূর্ত্তি হইতেছিল, এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে জনৈক বাবাজি তাঁহাকে বলিলেন 'তোমার বাবাজি অদ্য মধ্যরাত্রে অপ্রকট হইবেন। তোমাকে দেখিবার জন্য তিনি ডাকিয়াছেন।' তখন তিনি মনে করিলেন—'উহা মায়ার খেলা, এতাদৃশ আনন্দ ভঙ্গ করিবার জন্য মায়া বা কলি আমার পিছনে লাগিয়াছে।' এই ভাবিয়া তিনি গেলেন না। ঠিক সেইদিন মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ তাঁহার মুখে নাম বন্ধ হইয়া গেল এবং হৃদয়ও অন্ধকার হইল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া গুরুর নিকটে ছুটিলেন এবং গিয়া দেখিলেন যে সত্যই বাবাজি মহাশয় অপ্রকট হইয়াছেন। তখন তিনি বাতুলের ন্যায় নানাস্থানে

ভ্রমণ করিয়া অনেক মহাত্মার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"গুরু কৃষ্ণ তোমার সহায় ছিল, কিন্তু বৈষ্ণব আশ্রয় কর নাই। আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" এই 'আশ্রয়'-শব্দে বৈষ্ণবাশ্রয়। এখন তুমি কোন নির্জন স্থানে বসিয়া গুরু-আরাধনা করিয়া নামসংকীর্ত্তনের চেষ্টা কর। গুরুর একটি আসন করিয়া তাহাতে গুরুদেবের অধিষ্ঠান চিন্তাপূর্ব্বক পরিক্রমা দণ্ডবৎ, প্রার্থনা করিয়া নামের চেষ্টা কর।" শ্রীনিত্যানন্দ দাসজি এক বৎসরকাল এইরূপ আচরণ করিলেন— বৎসর-পূর্ণ দিবসে সেই আসনে গুরুদেবের আবির্ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় চরণযুগলে মস্তক অর্পণ করিলে গুরুদেবের নেত্র হইতে শোকাশ্রুধার পতিত হইতে লাগিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে 'হা বৎস! তখন আসিলে না, এখন আমি আর কি করিব?' এই বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। তদবধি তিনি মৌন থাকিয়া সমস্ত দিনে এক লক্ষ নাম করিতেন— রাত্রিতে মাত্র দুই ঘণ্টা কাল শয়ন করিতেন—নামাক্ষরগুলি সুস্পষ্ট সুমধুর ও দীর্ঘস্বরে উচ্চারিত হইত। শেষ পাঁচ বৎসর তিনি গোবর্দ্ধনস্থ গোবিন্দ কুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন—অপ্রকটের এক বৎসর আগে তিনি। শ্রীলঅদ্বৈত দাস বাবাজি মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"আমার প্রতি শ্রীগুরুদেবের স্ফূর্ত্তিতে এই আদেশ হইতেছে—তোর দুঃখ আর এক বৎসর আছে।" সেই বৎসরই কার্ত্তিক মাসে নিয়মসেবার পূর্ব্বে তিনি শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজি মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মানসগঙ্গার তটে আসিলেন এবং রাসপূর্ণিমায় অপ্রকট হইলেন।

———

শ্রীনৃসিংহ দাস বাবাজি মহাশয়

সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহারাজের প্রসিদ্ধ শিষ্যগণের অন্যতম। ইনি তৈলঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, ষড়্‌দর্শনের আচার্য ও পণ্ডিত ছিলেন। সামবেদ-গানে ও বীণাবাদনে সুনিপুণ ছিলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল—গন্ধর্বের মত। একদিন শ্রীগোবিন্দজি তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন—'তোমার মুখে সামবেদগান শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজির শিষ্যত্ব গ্রহণ কর।' স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীনৃসিংহ দাসজি সর্ব্বত্যাগ করত শ্রীবৃন্দাবনে আসেন এবং ঐ সিদ্ধ বাবাজির নিকট দীক্ষা ও ভেক গ্রহণ করেন। শ্রীগোবিন্দজীউ জয়পুরে আছেন শুনিয়া তিনি জয়পুরে গেলেন। তাহার বীণাবাদন ও সামবেদ গান শুনিয়া মুগ্ধ জয়পুরাধিপতি শ্রীরামসিংহজী ও শ্রীগোবিন্দের সেবক শ্রীকিশোরী মোহন গোস্বামী তাঁহাকে অত্যাগ্রহ করিয়া জয়পুরে বাস করান। এজন্য শ্রীবৃন্দাবনে তাহার বিশেষ পরিচয় নাই। ইহারই নিকট পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজি বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবার পরিচয় শুনিয়া তাহার চরণে আত্মোৎসর্গ করেন।

শ্রীপিসী মা গোস্বামিনী ও শ্রীগোপেশ্বর গোস্বামী

(শ্রীবৃন্দাবন)

* বীরভূম জেলার অন্তর্গত গোড়াডাঙ্গা পারুলিয়া ও কালীপুর কড্যা গ্রামের মধ্যস্থলের উপবনে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া একটি গাভী প্রতিদিন দুগ্ধ দান করিত। ক্ষেপা গোয়ালা এই ব্যাপার

---

* শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীপ্রভু-সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীনিতাইগৌর শ্রীবিগ্রহ লীলাকাহিনীর" ছায়া।

দেখিয়া ঐ স্থানটি খুঁড়িয়া একখানি পুরাণ কাষ্ঠ সিংহাসনোপরি দারুময় শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীধর শালগ্রামের শৈল বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপীঠের নিম্নদেশে 'দাস মুরারীগুপ্ত' নাম খোদিত ছিল। এই বিগ্রহচতুষ্টয় ঐ স্থান হইতে সিউড়িতে আনীত হইয়া মহাসমারোহে সেবিত হইতে থাকেন—সে আজ দুই শত বৎসরের অধিক কালের কথা।

কিছুদিন পরে উৎকলবাসী জনৈক বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীবলরাম দাস বাবাজি তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে সিউড়িতে আসিয়া ঐ মন্দিরে অতিথি হইয়াছিলেন। বিগ্রহের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে তিনি আকৃষ্ট হইলেন শ্রীপ্রভুর স্বপ্নাদেশে তীর্থাটন ত্যাগ করত শ্রীবিগ্রহের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময়ে নদীয়া জেলার উলাগ্রামের মুখোপাধ্যায়-বংশীয় কুলবধু চন্দ্রশশী দেবী জমিদারীর কার্য্যোপলক্ষে সিউড়িতে আসিয়া শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন বাটীতে অবস্থানকালে শ্রীগৌর-নিতাই তাহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করত তাহার স্বহস্ত-পাচিত দ্রব্য ভোজনের ইচ্ছা জানাইলেন। সে সময় শ্রীবিগ্রহ অঙ্গরাগে বসিয়াছিলেন—সুতরাং মোহন্ত শ্রীবলরাম দাসের উপদেশানুসারে তিনি বিষ্ণুদীক্ষিত হইয়া যথাকালে ভোগরন্ধন করত শ্রীবিগ্রহের সেবা করিলেন। চন্দ্রশশী গৃহে ফিরিতে উদ্যোগ করিলে শ্রীগৌর নিতাই দুই ভাই আবদার করিয়া বলিলেন—'মা! তুই যাস্‌নে, তুই গেলে আমাদের কে খেতে দিবে? তুই আমাদের মা, মা তোকে যেতে দিব না' স্বপ্নাবস্থায় তিনি দেখিলেন যে এই কথা বলিয়াই বালক দুইটি তাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিলেন এবং তিনিও টানাটানি করিতে লাগিলেন—ইত্যবসরে বস্ত্রের অঞ্চল খানিকটা ছিঁড়িয়াও গেল। নিদ্রোত্থিত হইয়া তিনি বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন সত্যই তাহার বস্ত্র-প্রান্ত ছিন্ন হইয়াছে। মোহন্ত মহারাজকে সকল কথা নিবেদন করিলে

তিনি প্রাতঃকালে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে শ্রীবিগ্রহ-দ্বয়ের হস্তে সেই ছিন্নাঞ্চলটি বিদ্যমান! চন্দ্রশশীর আর দেশে যাওয়া হইল না। তদবধি সিউড়ীতেই থাকিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার বহু কলঙ্ক রটিল—অপবাদ অসহ্য হইলে তিনি শ্রীগৌরনিতাইয়ের নিকট জানাইলে তাঁহারা আদেশ করিলেন 'মা! আমাদিগকে লইয়া তুই বৃন্দাবনে চল।' মোহন্ত বাবাজি ও চন্দ্রশশী শ্রীবিগ্রহদ্বয় সহ শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বনখণ্ডি মহল্লায় লুইবাজারে একটি নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে আশ্রয় লইলেন।

ঐ শ্রীমন্দিরে নদীয়া জেলার 'ভক্তা' ও 'মেনকা' নাম্নী দুইজন ভক্তিমতী বৈষ্ণব মহিলা বাস করিতেন—ভক্তা পিসীমা ও মেনকা ভাইঝি। বনখণ্ডি মহল্লার সকলে এই ভক্তিমতী ভক্তাকে পিসীমা বলিয়া ডাকিতেন। চন্দ্রশশী তাঁহার সহিত ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহার সাহচর্যে শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে লাগিলেন। এইজন্য সকলে তাঁহাকেও পিসীমা গোস্বামিনী বলিয়া ডাকিত এবং শ্রীবিগ্রহকে 'পিসীমার গৌর নিতাই' বলিয়া অভিহিত করিত। সেবাধিকারিণী এই পিসীমার বাৎসল্যপ্রেমে দুই ভাই গৌর নিতাই আবদ্ধ হইলেন। পিসীমা স্বহস্তে যাবতীয় সেবা সম্পাদন করিতেন—তিন বার যমুনায় স্নান করিতেন। একবার স্ত্রীজাতিসুলভ মাসিক স্বধর্মের কাল উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া তিনি গৌরনিতাইয়ের ভোগ রাঁধিতে রাঁধিতে বিষন্নচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিলেন। গৌরনিতাই তাঁহাকে তন্দ্রাবেশে বলিলেন—'মা! আমরা তোমার প্রতিপাল্য সন্তান; সাধারণ জননী এরূপ অবস্থায় যাহা করেন, তুমিও তাহাই করিবে। যাও উঠ, স্নান করিয়া আমাদের খেতে দাও। ইহার পর আর তোমার স্ত্রীধর্ম লক্ষিত হইবে না।' তিনি স্নান করিয়া ভোগ দিলেন এবং তদবধি আর মাসিকধর্ম লক্ষিত হয় নাই।

সেরপুর বগুড়ানিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলা ঝুলনোৎসবে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বনখণ্ডী মহল্লায় বাসা লইয়াছেন—বর্ষাকাল, একটু একটু বৃষ্টি হইতেছে—শ্রীমন্দিরের দালানে বসিয়া পিসীমা বাম হস্তে পাখা টানিতেছেন এবং মালা জপ করিতেছেন। অপরাহ্নকালে পিসীমার একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছে—এমন সময় তিনি দেখিলেন গৌরনিতাই ভিজিতে ভিজিতে আঙ্গিনায় নামিয়া কোথাও যাইতেছেন। পিসীমা বলিলেন—'ওরে তোরা এ দারুণ বৃষ্টিতে যাস্ কোথা? জলে ভিজে তোদের সর্দ্দি লাগবে।' কিন্তু চঞ্চল গতিতে 'কোথায় যাচ্ছি, দেখবি এখন' বলিয়া দুই ভাই চিড়িয়া কুঞ্জে গিয়া সেরপুরের সেই মহিলাকে বলিলেন—'এখানে ঘুমুতে এসেছ? উঠ'—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কে গো?' উত্তর—'আমাদের নাম নিতাইগৌর, আমরা বনখণ্ডির পিসীমার ছেলে।' প্রশ্ন—'তোমরা এখানে কেন?' উত্তর—'দেখ, আমাদের পায়ে কাদা, ঠাণ্ডা লাগছে, তুই আমাদের খড়ম দে।' স্ত্রীলোকটি শশব্যস্তে উঠিয়া দশজন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া পিসীমার ছেলে দুইটিকে স্বপ্নদৃষ্টবৎ দেখিলেন এবং দুই জোড়া রূপার খড়ম করিয়া দিলেন। আর একবার ইঁহারা এইভাবে নূপুর চাহিয়া লইয়াছিলেন। একবার তাঁহারা শ্রীমন্দিরের সেবাইত জনৈক বৈষ্ণবকে সকল অলঙ্কার দিয়া পিসীমার জিজ্ঞাসায় বলিয়াছিলেন—'মা! বৈষ্ণবটি বড় দরিদ্র, আমাদের দুই ভাইকে অনেক রাবড়ী খাওয়াইয়াছে। অলঙ্কারগুলি আমরা তাঁহাকে দিয়াছি—তুই উহাকে কিছু বলিস্ না।' একবার পিসীমাকে স্বপ্নাদেশ দিয়া দুই ভাই চৌরাশি ক্রোশ ব্রজপরিক্রমা করিয়াছিলেন। পিসীমার সঙ্গে ছিল দুইজন বৈষ্ণব—মথুরা দাস ও কৃষ্ণদাস। পাল্কীতে চড়িয়া দুই ভাই সমগ্র ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া মথুরায় আসিতেছিলেন—পাল্কী লাল কাপড়ে ঢাকা ছিল—তাহাতে কয়েকজন ইংরাজ সৈনিক

জোর করিয়া ঠাকুর দেখিতে গেলে বিদ্যুৎসদৃশ একটি বিষম তেজ আসিয়া তাহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিলে তাহারা ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল।

পিসীমা অতিবৃদ্ধাবস্থায় স্বহস্তে সেবা না করিয়া যোগ্যপাত্র শ্রীলগোপীশ্বর গোস্বামীপ্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন শীতকালে গোস্বামীজী গৌরনিতাইকে উষ্ণজলে স্নান না করাইয়া ঠাণ্ডাজলে স্নান করাইয়াছিলেন—ইহাতে গৌরনিতাইর সর্দি লাগে—পিসীমা উপরে বসিয়া দৃষ্টিশক্তিরহিত হইলেও বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সর্ব্বস্বধন গৌরনিতাইর জ্বর হইয়াছে—অতিকষ্টে নীচে নামিয়া গোপীশ্বর প্রভুকে বলিলেন—"তুই কি করিয়াছিস্? দেখ দেখি এই শীতে ঠাণ্ডাজলে স্নান করিয়া আমার বাছাদের সর্দি লাগিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি গোস্বামিজির প্রত্যয়ার্থ গৌরনিতাইএর নাসিকায় বসনাঞ্চল দিয়া কহিলেন—'বাবা! নাক ঝাড়ত।' তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নাসিকা দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হইয়াছিল।

শ্রীগোপীশ্বর প্রভুর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি পরম গৌরভক্ত, তিনিও পিসীমার বর্ত্তমানে সেবাকার্য্যে আনুকুল্য করিতেন। একদিন ভোগের সময় কৃষ্ণদাস মন্দিরদ্বারে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন—এমন সময় তিনি ধ্যানে দেখিলেন যে তাহার পূর্ব্বাশ্রম বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে ভুবিমুড়া গ্রামে হারাণ ও মধু সাঁওতালের বাড়ীতে যে ক্যাঁদফলের গাছ আছে, তাহাতে উঠিয়া সাঁওতালদের কন্যা ফল পাড়িতেছে আর গৌর নিতাই বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ফল চাহিয়া খাইতেছেন। এই অবসরে নিকটস্থ অন্যগ্রামের আর দুইটি সাঁওতাল কন্যাও প্রভুদ্বয়কে ফলের লোভ দেখাইয়া নিজ গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান গীতি গাহিতেছে ও নৃত্য করিতেছে। সে গানটি এইরূপ—

তুরা কি মোদের বাড়ী যাবি রে। তুরা কি মোদের পাড়া যাবি রে।
পাকা পাকা ক্যাঁদ দিব তোলায় বসি খাবিরে॥ ইত্যাদি

কৃষ্ণদাসজি তন্ময় হইয়া এই গানটি গাহিতেছেন এবং তদ্ভাবোপযোগী পত্রপুষ্পে প্রভুদ্বয়ের শৃঙ্গার করিতেছেন—এমন সময় শ্রীগোপীশ্বর প্রভু আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া সব ব্যাপার বুঝিলেন এবং বিষ্ণুপুরে চিঠি দিয়া জানিলেন যে ঠিক ঐ দিন ঐ গ্রামে সাঁওতালদিগের উৎসবে গৌরনিতাইকে লইয়া ঐরূপ অবিকল লীলা হইয়াছিল।

শ্রীমন্দিরদ্বারে দশবাতির একটি আলোর ঝাড় নিত্য জলিত, ইহাতে তৈল খরচ বেশী হয় ভাবিয়া গোপীশ্বর প্রভু সন্ধ্যার পরেই কোজাগর পূর্ণিমায় একবার আলোকটি নিবাইয়া বাহিরে গিয়াছিলেন। পিসী মা শ্রীমন্দিরের দালানে বসিয়া নাম করিতেছিলেন। ঘরের ভিতরে আড়াই হাত দীর্ঘ একটি পাঁচ সের ওজনের পিত্তলনির্ম্মিত দীপদানের উপরে ঘৃতের দীপ জলিতেছিল। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে কোজাগরে শ্রীমন্দিরের বারান্দায় যে গৌরনিতাইয়ের বিলাস হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—এই রাগে গৃহমধ্যস্থিত দীপদানটাকে সজোরে ছুড়িয়া গৃহের এক কোণে ফেলিয়া দেওয়া হইল আর গৃহ অন্ধকার হইল। পিসী মা গোপীশ্বর প্রভুকে ডাকাইয়া বলিলেন—'তুই আজ গৌরনিতাইকে বারান্দায় আনিস্‌নি, আর দশবাতির আলোটিও নিবাইয়া দিয়াছিস্, তাই আজ রাগ করে দীপদান ছুড়িয়া ফেলিয়া অন্ধকারে বসিয়া আছে। এমন কাজ আর কখনও করিস্ না।'

বসন্তরোগে এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া গোপীশ্বর প্রভু কতবার যে ইঁহাদের কৃপায় বিনা ঔষধে রোগমুক্ত হইয়াছেন—তাহা বলা যায় না। এই পিসী মা গোস্বামিনী সাধনসিদ্ধা নারীরত্ন ছিলেন। তাঁহার গৌরভক্তি অতুলনীয় ছিল। শচীমাতার কৃপায় তিনি বাৎসল্যরসের অধিকারিণী হইয়াছিলেন একশত ছয় বৎসর বয়ঃক্রমে ইতি শ্রীগৌরনিতাইর বারান্দায় বসিয়া শ্রীগৌরনাম জপ

করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই গোপীশ্বর প্রভুকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে ঐ দিনই তিনি দেহ ছাড়িবেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-বংশাবতংস শ্রীগোপীশ্বরও বৃহদ্ব্রতী, বিরক্ত-চূড়ামণি ছিলেন। তিনি ভারতের সকল তীর্থই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন—কঠোর সাধনায় জীবন অতিবাহিত করত নিতাইগৌরের প্রেমে পড়িয়া সেবায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি একবার কৃপা করিয়া এই জীবাধম সঙ্কলয়িতাকে বলিয়াছিলেন যে পিসীমার সেবা সমর্পণকালে শ্রীনিতাই-গৌর ছোট মূর্ত্তি ছিলেন—তিনি পিসীমাকে বলিলেন, 'আমি এত ছোট মূর্ত্তির সেবায় প্রীতি পাই না।' পিসী মা অমনি মন্দিরে গিয়া দুই ভাইর চিবুক ধরিয়া টানিতেই শ্রীবিগ্রহদ্বয় বড় হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছেন। পিসীমার অপ্রকটের বহুদিন পরে সেবা করিতে করিতে অভিমানভরে তিনি মনে করিলেন—'এদের সেবা করে কোনই লাভ নাই, ভজন করলে এতদিনে কিছু হ'ত—এই চিন্তা করিয়া তিনি একজন সেবাইত নিযুক্ত করিয়া ভজন করিবার অভিপ্রায়ে কুসুম সরোবরে চলিয়া গেলেন। গ্রীষ্মকাল—অনবরত 'লু' বহিতেছে—তৃতীয় দিন রাত্রিবেলা তিনি গরমে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ঐ সরোবরের তীরবর্ত্তী একটি বকুলতলায় বসিয়া নাম করিতে-ছিলেন—রাত্রি তখন নিশার্দ্ধ অতীত হইয়াছে—চারিদিক নীরব নিঝুম—এমন সময় দেখিলেন,যে সরোবরের মধ্যদেশে একটি নয়নরসায়ন আলোক জ্বলিতেছে—আলোটি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সরোররের তীরে উঠিয়া সিঁড়ি দিয়া সেই বকুলতলায় আসিয়া দাঁড়াইল—শ্রীনিতাইগৌর-মূর্ত্তিতে তখন অতি সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন—'দাদা! আজ তিন দিন আমাদের খাওয়া হয় না, চল।' গোপীশ্বর প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া গোবর্দ্ধনে আসিয়া কোনও বৈষ্ণব মহাত্মার কুটীর-দ্বারে আসিবামাত্রই তিনিও

দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিয়া প্রভুকে দেখিয়া আনন্দে বলিলেন —'আরে গোপীশ্বর! এসেছ, ভালই হয়েছে, প্রভুরা স্বপ্নে বল্লেন যে আজ তিন দিন তাঁদের আহার নাই। তা' ভাই, শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া সেবা-কর।' এই কথা শুনিয়া গোপীশ্বর প্রভুর আবার বাম্য উপস্থিত—তিনি বলিলেন 'বটে! আপনাকেও আবার জালাতন করিয়াছে—না আর বৃন্দাবন যাব না—গ্রামেই থাকিয়া ভজন করিব।' তিনি অনেক সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ পাওয়াইয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করাইলেন। দতিহা পর্য্যন্ত আসিতেই তাঁহার সন্ধ্যা হইল—এদিকে ঘনঘটা সাজিয়া দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া রাস্তা মাঠ ঘাট ভাসাইয়া দিল। তিনি দতিহার কোনও ব্রজবাসীর গৃহে আশ্রয় লইয়া ভাবিলেন যে ভালই হইল, এত জলে ঝড়ে আর বৃন্দাবনে গিয়া কাজ নাই; কিন্তু ভোর হইতে না হইতেই একজন গাড়োয়ান স্বপ্নাদেশ পাইয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলে তিনি অগত্যা গাড়ীতে উঠিয়া বৃন্দাবনে পৌছিলেন। প্রথম দেউড়ি পার হইয়া ভীষণ দুর্গন্ধ পাইয়া সেবককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এত দুর্গন্ধ কিসের রে।' সেবক বলিল—'তা'ত কিছুই জানি না, আজ তিন দিন মন্দিরেও যাইতে পারিতেছি না।' তখন তিনি ধুলাপায়েই মন্দিরে ঢুকিয়া সিংহাসনে উঠিয়া দেখেন যে মশারির উপরে একটি মরা ইন্দুর পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষ্কার করিয়া যথারীতি সেবার ব্যবস্থা করিয়া তদবধি আজীবন গৌরনিতাইর চরণসেবাই সার করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজ (কালীদহ)

বর্দ্ধমান জেলারকাল্‌নার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার জন্ম হয়। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত ছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত কাল্‌নার শ্রীসিদ্ধ ভগবান্ দাস বাজাজি মহাশয়ের আশ্রয়ে ছিলেন; পরবর্ত্তীকালে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে কালীয়দহে বাস করিয়া ভজন করিতেন। ইনি সিদ্ধ জগদীশ বাবাজি মহারাজের ও শ্রীল দয়াল দাস বাবাজি মহারাজেরও শেষ জীবনে যেরূপভাবে সেবা করিয়াছেন, তাহা কষ্টসাধ্য হইলেও শিক্ষণীয়। ইঁহাদের সময়োচিত আহার্য্যপ্রদান, করচরণাদি-সম্বাহন, মলমূত্রাদি-পরিষ্কার এবং সময়ে প্রসঙ্গরূপা সেবাও ইনি করিয়াছেন। নিজে বিশেষ বিদ্বান্ না হইলেও তিনি প্রাণের সরল আবেগে শ্রীহরিনাম ও রাগানুগা ভজন করিতে যেরূপ আকুতির সহিত উপদেশ করিতেন, তাহা আপামর সর্ব্বসাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করিত। রাগানুগা ভজনের কথা সকলে বলাও সঙ্গত মনে করেন না—আবার বলিবার শক্তিও সকলের নাই—ইনি কিন্তু সকলকেই শ্রীগুরু-প্রণালী ও শ্রীগুরুরূপা সখীর অনুগত ভজন, এমন কি ঘ্রহোলীলা পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে উপদেশ দিতেন। পাত্রাপাত্র স্ত্রীপুরুষাদি কিছুরই বিচার না করিয়া ইনি সকলকেই সমানভাবে আদর করিতেন এবং যাহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইত, তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ ও জল প্রদান করিতেন। বহু হিন্দুস্থানী লোক তাঁহার অনুগত ছিল। প্রায় শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিয়া ইনি সিদ্ধ জগদীশ বাবার পার্শ্ববর্ত্তী কুটীরে বাস করিয়া ভজন করিতেন। দেহরক্ষার পরে ঐ ভজন-কুটীরের সম্মুখেই তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রেমানন্দ গোস্বামিপ্রভুপাদ (শৃঙ্গারবট, শ্রীবৃন্দাবন)

কোশীর সিদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজি মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে শৃঙ্গারবটের শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ গোস্বামি-প্রভুপাদের যে তিন পুত্র জন্মে, ইনি তাঁহাদের দ্বিতীয়। বিবাহের পর দুইটি কন্যা রাখিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনৃসিংহানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবন লাভ করিলেন। শ্রীপ্রেমানন্দ প্রভু তাঁহার নিকট দীক্ষিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিয়োগে ইনিই সংসারের কর্ত্তা হইলেন। অল্প বয়সে প্রচুর অর্থ ও বিপুল সম্মান পাইয়া তিনি কিছু উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন। সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি সমস্তই উড়াইয়া দিলেন—যখন হাত একেবারেই শূন্য হইয়াছে, তখন শ্রীশ্রীমদনমোহনের পুরাতন মন্দিরস্থ জনৈক মহাত্মা বৈষ্ণব একান্তে তাঁহাকে পাইয়া প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—'প্রভো! এইরূপে আর কতদিন চলিবে? আপনারা ত শ্রীমন্মহাপ্রভুরই প্রেরিত এবং তাঁহারই সেবক শ্রীনিতাইচাঁদের বংশধর। জগতে যে কল্যাণের জন্য আপনা-দিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহা কবে করিবেন?' শ্রীপ্রভুপাদ বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং তন্মুহূর্ত্ত হইতেই ব্যয়-সঙ্কোচ ও বৈরাগ্যাচরণ করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বে প্রভুপাদের একটি দুই বৎসরের কন্যা দেহত্যাগ করেন। শ্রীবাবাজি মহাশয়ের কৃপালাভের পর আর অভ্যন্তরে শয়ন করিতেন না, বহির্বাটিতে বৈঠকখানায় থাকিতেন। ব্রজবাসিদের ন্যায় লেঙ্গুটি ও তদুপরি দুইভাজকরা একখানি ধুতি বহির্ব্বাসের মত করিয়া তিনি পরিতেন—শীতকালে একখানি সাধারণ কম্বল এবং গ্রীষ্মকালে কোথাও যাইতে হইলে একখানা মোটা চাদর ব্যবহার করিতেন। বাহিরের নূতন কেহ আসিলে সহসা বুঝিত না যে ইনি প্রভু-সন্তান এবং সংসারের অধিপতি। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শৃঙ্গারবটের শিষ্য ও তত্রত্য পরিচারক বলিয়া পরিচয়

দিতেন। তিনি সকলকেই প্রণাম করিতেন। কোনও বিশিষ্ট লোক আসিয়া 'প্রভু কোথায়?' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ইনি প্রভুপাদ শ্রীব্রহ্মানন্দ গোস্বামি-মহাশয়কে দেখাইয়া দিতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীকে সর্ব্বথা গুরুপত্নী জ্ঞান করত 'বড় মা' বলিয়াই তিনি সম্বোধন করিতেন —সংসারের অর্থাদি তাঁহার ঘরেই থাকিত—সিন্ধুকাদি খুলিবার প্রয়োজন হইলে ইনি নিজের বহির্বাসখানি খুলিয়া লম্বা করিয়া পাতিয়া তদুপরি হাঁটুভর দিয়া যাইতেন। শ্রীগুরুপত্নীর এতই আজ্ঞাধীন ছিলেন যে জলপান করিতে আরম্ভ করিলেও শ্রীগুরুপত্নীর নিষেধ হইলে তাহাতেও বিরত থাকিতেন। দৈনিক আহার সাধারণ পাতায় এবং মৃৎপাত্রে জলপান হইত। শ্রীগুরুপত্নী নিকটে খাদ্যসামগ্রী লইয়া প্রভুর ইচ্ছামত পরিবেশন করিতেন, যাহাতে পাত্রে কিছুমাত্র অবশেষ না থাকে। ভোজন শেষ হইলে ভোজনপাত্র ও মৃন্ময় জলপাত্র একহস্তে তুলিয়া লইয়া অপর হস্তে স্থান উপস্কার করত বাহিরে যাইতেন। শিষ্যেরাও তাঁহার উচ্ছিষ্ট বা পদধূলি গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীমাধব দাস বাবাজি মহাশয় একদিন দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"সকলেই শ্রীগুরুদেবের চরণামৃত ও অধরামৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হন; আমরা চরণধূলি-কণিকাও পাই না।" সন্ধ্যার পরে প্রভু ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছিলেন—শিষ্যের কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তর দিলেন—"মাধব দাস! আমি ত পণ্ডিত নই, লেখাপড়া জানি না। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের (২৯।১৬) একটি শ্লোক শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি। 'প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্ব-চাণ্ডালগোখরম্।' বাবা! তুমি ইহার মধ্যে কোথায় বাদ পড়?"

প্রভুপাদ দৈন্যভক্তির মূর্ত্তি ছিলেন। বৈষ্ণবমাত্রেই তাঁহার অগাধ প্রীতি ছিল। কোথাও কোনও বৈষ্ণব পীড়িত হইয়াছেন শুনিলে তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে, তৎসমস্ত সঙ্গে লইয়া

তাঁহার নিকট যাইতেন, প্রয়োজনবোধে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন এবং অর্থাদিরও যথাযথভাবে সমাবেশ করিয়া দিতেন। কোন বৈষ্ণব ধামলাভ করিলে তাঁহার সৎকার ও উৎসবাদির যথাযোগ্য সহায়তা করিতেন। বাহিরের কোন বৈষ্ণব-জমায়েত আসিলে কোন শিষ্যদ্বারা একবার তাঁহাদের সংখ্যা জানিয়া লইতেন, পরে একবার নিজেও দেখিতেন; তৎপর তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ভোজনযোগ্য পক্কান্ন সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন—নিজের কোনও পরিচয় দিতেন না। কখনও বা কোন শিষ্যের আগ্রহে ও ব্যয়ে জমায়েতের সাধুগণকে নিমন্ত্রণ করত শিঙ্গারবটে আনিয়া ভোজন করাইতেন। অনেক ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ ও বাণিয়া প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য ছিলেন—শ্রীমন্দিরের মর্যাদানুসারে কোন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণকে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেন না; তাঁহাদের দ্বারা পাচিত কাঁচি (অন্নাদি) প্রসাদও পাইতেন না—অথচ হিন্দুস্থানী সাধুগণ মধ্যে বৈষ্ণবী স্ত্রীলোককৃত রুটিব্যবহারের রীতি থাকিলেও তাঁহারা প্রভুকে উদাসীন বৈষ্ণব-বোধে আগ্রহ করত নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাঁহাদের হাতে রুটিপ্রসাদ পাইতেন।

প্রভুপাদ দীনবেশে থাকিলেও নিজেই জমিদারী-কার্য্য দেখিতেন এবং শাসন-সংরক্ষণও করিতেন। তাঁহার প্রভাবে কেহ তাঁহার কথার অন্যথা করিতে পারিত না। একবার প্রজাগণ আসিয়া জানাইল—'মথুরা পল্টনের ঘোড়ার ঘাসীরা ক্ষেত কাটিয়া লইয়া যায়, নিষেধ করিলেও মানে না।' প্রভু আদেশ করিলেন—'যারা ক্ষেত কাটিতে আসে, তাহাদিগকে মেরে তাড়িয়ে দিবে, খুন করিবে না।' প্রজারা প্রভুর আদেশে তাহাই করিল। তখন ঘাসীরা তাহাদের মালিকদিগকে জানাইলে ওয়ারেণ্ট-সমেত বহু ঘোড়-সওয়ার প্রভুকে ধরিতে আসিল—তিনি অভ্যন্তর বাটীর দরজায় একটি সিপাহী রাখিয়া অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। এই ভাবে দুই একবার ঘুরাঘুরি করিয়া প্রভুকে

কেহ ধরিতে পারিল না। মকদ্দমা খারিজ হইয়া গেল—গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে প্রভুকে হাজির করাইতে পারিতেন—কেন করিলেন না শ্রীনিতাইচাঁদই জানেন।

শিষ্য শিষ্যাদের প্রতি তাঁহার ও তৎপরিবারগণের অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। এই গুণে শ্রীপ্রভুর দেশ দেশান্তরেও বহু শিষ্য হইয়াছিল। বাংলা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাবুল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল। মালদহ-নিবাসী জনৈক ভক্তের প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া তত্রত্য অপর ভক্ত আসিয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করেন—প্রভু তাঁহাকে বেশাশ্রয় করাইয়া 'শ্রীমাধব দাস' নাম রাখেন। তাঁহাকে সুচতুর, প্রীতি-ভক্তিমান্ দেখিয়া প্রভু কিছু কিছু সেবাকার্য্যের ভারও দিলেন। কয়েকদিন পরে শ্রীমাধব দাসজি জানিলেন যে দেশের দীক্ষা গুরুর নিকট যে মন্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। অন্যান্য বৈষ্ণবগণের উপদেশে তিনি প্রভুকে জানাইয়া পুনরায় দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। প্রভু কিন্তু সহসা তাহার অনুমোদন করিলেন না—সেইজন্য বাবাজি মহাশয় সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। শ্রীপ্রভুপাদও তাহা বুঝিয়াছিলেন—এক বৎসর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উৎসবের দিবস তাঁহার প্রতি বিবিধ সেবার ভার অর্পণ করিয়া শ্রীপ্রভুপাদ তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কার্য শেষ করিয়া বাবাজি মহাশয় যখন নিজ কুটীরে যাইতেছেন, তখন প্রভুপাদ বাবাজি মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন—'ঠাকুর-আঙ্গিনায় অনেক ফুল রয়েছে, একটি ফুল কুড়িয়ে নিয়ে এসো।' বাবাজি মহাশয় তাহাই করিলেন। তখন প্রভু বলিলেন—'এসো তোমায় মন্ত্রদীক্ষা দিই।' প্রভুপাদ বাবাজি মহাশয়কে দীক্ষা দিয়া বলিলেন—'আমাকে পরিক্রমা করিয়া আবার প্রণাম কর।' বাবাজি মহাশয় তাহাই করিলেন। এই ভাবের শিষ্য তাঁহার অনেকই ছিল।

ইনি শ্রীগুরুদেবের বার্ষিক উৎসবটি অতি সমারোহে করিতেন এবং তাহাতে শ্রীগুরুদেবের উৎসব কেমন ভাবে সম্পাদন করিতে হয়, তাহা অনেকেরই শিক্ষা হইত। প্রভু স্বয়ং দৈন্য-ভক্তির আদর্শ হইলেও মর্য্যাদারক্ষণে যত্নবান্ ছিলেন। কোন সময়ে বাটীর পরিচারিকা প্রভুপাদের ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শ্রীসদানন্দের জন্য জলখাবার নিতে আসিয়াছে—শ্রীপ্রভু মাধবদাস বাবাজি মহাশয়কে কিছু প্রসাদ দিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি কিছু প্রসাদ বারান্দায় দাঁড়াইয়া নীচে দণ্ডায়মানা পরিচারিকার হাতে দিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেলে বাবাজি মহাশয়কে ডাকিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দিলে? কাকে দিলে?' বাবাজি মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'যেই প্রসাদ দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন—শ্রীস দাদা প্রভুর জন্য সেই প্রসাদই দিলাম।' প্রভু বলিলেন—'কাহাকেও প্রসাদ দিতে হইলে নিজে উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া কি প্রসাদ দিতে হয়? নিম্ন স্থান অথবা সমভূমিতে দাঁড়াইয়া প্রসাদ দিতে হয়, তাহাতে তোমার গুরুভ্রাতা প্রভু-সন্তানকে প্রসাদ দিতেছ। ভক্তিস্থানে অপরাধ হইলে ভক্তি স্থগিতা হন।'

প্রভুপাদ মিতব্যয়ী ছিলেন—যদিও অকাতরে যথাযোগ্য স্থানে দান করিতেন, তথাপি বৃথা অপচয় তিনি দেখিতে পারিতেন না। এক দিবস সন্ধ্যার পর তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধব দাসজিকে একটু ঠাণ্ডাই (পানক) প্রস্তুত করিতে বলিলেন। ঠাণ্ডাই প্রস্তুত হইলে প্রভু পান করিলেন। পরদিন প্রাতে যখন বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন, তখন তিনি বলিলেন—'হা বাবা, বেশ প্রণাম পর্য্যন্তই ভাল; আর সেবা করিতে হইবে না, সেবা করিতে হইলেই ত গুরুর অপচয়ই করিবে। কাল তিনটি গোলমরিচ ফেলিয়া গিয়াছিলে!' অথচ একদিন আগে নিজের পূর্ব্বজীবনের ইতিবৃত্ত বলিতে তিনি বলিয়াছিলেন এখনও শ্রীনিতাইচাঁদের ভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকা মজুত আছে।'

বঙ্গাব্দ ১৩০৩ সালে জ্যৈষ্ঠী শুক্লা তৃতীয়ায় ইনি শ্রীবৃন্দাবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসী এখনও বর্ত্তমান আছেন।

সিদ্ধ শ্রীবলরাম দাস বাবাজি মহারাজ

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজির মহাশয়ের শিষ্য। দীক্ষাকালে তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর, কিন্তু সিদ্ধ বাবার কৃপাতে অত্যল্প কালেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া স্বহস্তে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়া সিদ্ধ বাবাকে দেন। ইনি বৃন্দাবনে ঝাড়ুমণ্ডলে থাকিতেন। সদাচার ও বৈরাগ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কাহারও কোন ত্রুটি দেখিলে ইনি তাঁহাকে শাসন করিয়া সংশোধন করিতেন। উৎকল-বাসী শ্রীজগদানন্দ দাস বাবাজি মহাশয় মদনমোহন ঠৌরের শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দাদ বাবাজি মহারাজের নিকট ভেক লইয়া তীব্র বৈরাগ্যের সহিত রাগানুগা ভজন করিতেছিলেন। একদিন তিনি জ্যেঠাগুরু শ্রীবলরাম দাস বাবাজি মহাশয়কে প্রণাম করিতে আসিলে তাঁহার গলায় যজ্ঞোপবীত দেখিয়া শ্রীবাবাজি মহাশয় তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন—'ভেক নিয়াছ, জাতির অভিমান ত্যাগ করিতে পার নাই? ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়া সম্মানলাভের জন্য পৈতাগাছি রাখিয়াছ?' শ্রীজগদানন্দজি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীযমুনায় পৈতা বিসর্জ্জন দিয়া বাবাজি মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। শ্রীবলরাম দাস বাবাজি মহারাজও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাবাজি মহাশয়ের নিকট যাঁহারা যাইতেন, তাঁহাদের মনে সাধ্বস থাকিত। বাবাজি মহাশয় বিশেষ প্রেমিকও ছিলেন। পূর্ব্বকালে কোন নগরকীর্ত্তন বাহির হইলে বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্ত ও আচার্য্য-সন্তানগণকে একদিন পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া হইত।

বাবাজি মহাশয়ের কিন্তু নগর-কীর্ত্তনের সংবাদ পাওয়া মাত্রই প্রেমে গরগর ও নৃত্যাদি ভাব দেখা যাইত।

বাবাজি মহাশয় স্ত্রীসম্ভাষণও করিতেন না। কথিত আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কোন ঠাকুরমন্দিরে যদি কখন তিনি দর্শনে যাইতেন— তাঁহার ভয়ে শ্রীমন্দিরের সেবকগণ স্ত্রীগণকে হটাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবায়েত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামিপাদ বলিতেন— এই সিদ্ধ বাবা অতি বৃদ্ধবয়সেও চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া যষ্টিহস্তে পথে বাহির হইতেন। একদিন তিনি এই রূপেই শ্রীশ্রীরাধারমণজিউর দর্শনে আসিয়াছিলেন—গোস্বামিজি তখন যুবক, শ্রীমন্দিরের দ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন—চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় সিদ্ধ বাবাকে দেখিয়া তিনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন—'বাবাজি মহারাজ! আপনি এত বৃদ্ধ হইয়াছেন—অস্থিচর্ম্মসার আপনার দেহ—এখনও আপনার স্ত্রীলোকের এত ভয় কেন?' তদুত্তরে সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'মহাপ্রভু বলিয়াছেন—বৈরাগী বৈষ্ণব সাধুর পক্ষে স্ত্রীদর্শন ও সম্ভাষণ নিষিদ্ধ—"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।" যতক্ষণ দেহে হাড়, মাস ও রক্ত থাকে ততদিনই কামপ্রবৃত্তি মানুষের জাগরূক থাকে। বৈরাগীর বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।'

নিত্যধামগত প্রভুপাদ শ্রীনীলমণি গোস্বামী ব্রজে বাস করিতেন। যখনই তাঁহার কোন উৎসব হইত, প্রসাদের দুইটি পারস তিনি তাঁহার নিজলোক দ্বারা নিয়মিতভাবে সিদ্ধ বাবার ভজন-কুটীরে পাঠাইতেন। একদিন কলিকাতার কয়েকটি বাবু জনকতক স্ত্রীলোক সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীগোস্বামিজির ঠাকুর-মন্দিরে মহোৎসব দেন— আর নীলমণিপ্রভুর মন্দির হইতে যথারীতি দুইটি পারস ঝাড়ুমণ্ডলে প্রেরিত হইল। বাবাজি মহারাজের সেবকগণের রীতি ছিল যেখান হইতে যে প্রসাদ আসুক না কেন, তাহা সিদ্ধ বাবাকে জানাইয়া

নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিতেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সিদ্ধ বাবা কখন কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিতেন; কখন বা নাও করিতেন। নীলমণি প্রভুকর্ত্তৃক প্রেরিত প্রসাদটি কুটীরাভ্যন্তরে একটি শিকায় রাখা হইয়াছিল। সিদ্ধ বাবা ঐ প্রসাদের প্রতি সসম্মানে দৃষ্টিপাত করিবা-মাত্র উপরিস্থিত প্রসাদপাত্র হইতে টপ্ টপ্ করিয়া তাজা রক্ত কয়েক ফোঁটা নিম্নে পড়িল—বাবা দেখিলেন প্রসাদের ঝুলির নিম্নদেশ রক্তাক্ত। তখনি তিনি সেবকদ্বারা নীলমণি প্রভুকে ডাকাইলেন। গোস্বামিপ্রভু সর্ব্ব কার্য ত্যাগ করিয়াও সিদ্ধ বাবার আহ্বানে ঝাড়ু-মণ্ডলে আসিলে তাঁহাকে যথারীতি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আসনে বসাইয়া সিদ্ধ বাবা ধীরে ধীরে বলিলেন—'গোস্বামিজি! আমার সর্ব্বনাশ করিয়া তোমাদের লাভ কি? আমি শুকা রুখা মোটা রুটির দুই একখণ্ড টুক্‌রার ভিখারী—এ সব কি? দেখত—তোমার মন্দিরের প্রসাদ হইতে তাজা রক্তের ফোঁটা পরিতেছে!!" দেখিয়া ও শুনিয়া প্রভুর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি অনুসন্ধান করিতে গৃহে ফিরিয়া কলিকাতার বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে বেশ্যাবৃত্তির টাকাতেই ঐ মহোৎসব দেওয়া হইয়াছে। বাবাজি মহারাজও তখন তাঁহার সেবকদ্বারা ঐ রক্তাক্ত প্রসাদপাত্রটি ফেলাইয়া স্থানটি গোময়দ্বারা পরিষ্কার করাইলেন।

শ্রীযমুনাতীরে ঝাড়ুমণ্ডলে বসিয়া সিদ্ধ বাবা নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। সাধু বৈষ্ণবগণ এই পাঠ-শ্রবণে যাইতেন—ব্রজবাসী স্ত্রী[redacted]ও কখনও যাইতেন। একদিন বৈকালে সিদ্ধ বাবা ব্যাসাসনে বসিয়া পাঠ করিতেছেন—এমন সময় তাঁহার দৃষ্টি একটি যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি পতিত হইল। স্ত্রীলোকটির গাত্রবসন স্খলিত হওয়ায় তাহার বক্ষস্থল সিদ্ধ বাবার নয়নগোচর হইয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইল। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীভাগবতে ডোর দিয়া পাঠ বন্ধ করিলেন এবং

অত্যন্ত কাতরতার সহিত অশ্রুপূর্ণনয়নে শ্রোতৃবর্গকে বলিলেন—'শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতীরে ব্যাসাসনে বসিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতে করিতে স্ত্রীলোকের গুহ্যাঙ্গ দর্শনে আমার মনে কামোদ্রেক হইয়াছে। আপনারা আমাকে সিদ্ধ বাবাজি মনে করেন—আমি অকপটে সকলের চরণে নিবেদন করিতেছি যে আমি মহাপাপী ও মহাপাষণ্ডী। এ প্রাণ আর রাখিব না—আপনাদের সম্মুখে যমুনায় ঝাঁপ দিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দেহত্যাগ করিতেছি।' সমবেত বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে এ সংকল্প ত্যাগ করিতে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াও দেখিলেন যে সিদ্ধ বাবা মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তখন সকলে তাঁহাকে বলিলেন—'আমরা আপনার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতেছি—আপনি স্থির হউন। আজ কোথায় প্রসাদ পাইয়াছিলেন, বলুন ত?' তখন তিনি বলিলেন যে আজ আমরা শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে প্রসাদ পাইয়াছি। তৎক্ষণাৎ তিন মূর্ত্তি বৈষ্ণব শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে গিয়া জানিলেন যে সেই দিনের মহোৎসব দিয়াছেন—বঙ্গদেশীয় কোন শ্রীপাটের বৃদ্ধা মা-গোস্বামিনী। তাঁহারা আবার অনুসন্ধানক্রমে সেই মা-গোস্বামিনীর নিকট গিয়া প্রশ্নক্রমে জানিলেন যে তিনি ঐ ধন পাপপথে অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা আবার সিদ্ধ বাবার নিকট আসিয়া সব ঘটনা নিবেদন করিয়া বলিলেন যে অদ্যকার প্রসাদের দোষেই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়াছে। ঐ মহোৎসবটি কলিকাতার জনৈক বৃদ্ধা বেশ্যার পাপার্জিত ধনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হইতে সিদ্ধ বাবার মহোৎসবে প্রসাদ পাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

শ্রীবলরাম দাস বাবাজি মহাশয়

(সূর্য্যকুণ্ড ও শ্রীবৃন্দাবন)

বার বৎসর বয়সে ইনি সূর্য্যকুণ্ডে সিদ্ধ বাবার নিকট আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। আঠার বৎসর পরে তিনি একদিন লক্ষ্য করিলেন যে তত্রত্য জনৈক বাবাজি প্রতি রাত্রেই কোথাও যান। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল—সেই বাবাজির চরিত্র বোধ হয় দূষিত হইয়াছে। তথ্য-নিরূপণের জন্য ইনি তাঁহার অলক্ষিতে পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিলেন—দেখিলেন যে প্রাঙ্গণের একস্থানে ব্রজ-মায়ীদের নৃত্যগীত হইতেছে এবং ঐ বাবাজি একটু দূরে কাপড় ঢাকা দিয়া বসিয়া তাহাই দর্শন করিতেছেন। তখন ইনি মনে করিলেন যে, যে সব ব্রজমায়ী নৃত্য করিতেছেন—তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সহিত ইঁহার অভিযোগ আছে। শ্রীবলরাম দাসজি ফিরিয়া ঘরে আসিলেন, কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় সিদ্ধ বাবার সেবায় সুখ পাইলেন না। সিদ্ধ বাবার চরণে বিদায় লইয়া ইনি শ্রীগৌরমণ্ডলে আসিলেন—আখড়া করিলেন এবং বৈষ্ণবসেবার প্রচুরতর ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডল বা শ্রীগৌড়দেশ হইতে সমাগত বৈষ্ণবদিগকে প্রযত্ন ও আদর সহকারে ইনি সেবা করিতেন। তিনি প্রতি বৎসর বড় বড় উৎসব করিতেন। এইরূপে ত্রিশ বৎসর ভোগের পর শ্রীব্রজধাম হইতে সমাগত কোনও পরিচিত বৈষ্ণবের দর্শন পাইলেন, তাহাতে তাঁহার ব্রজবাসকালীন আনন্দময় স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি এই অতিথির মুখে শুনিলেন যে গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ বাবা এবং সূর্য্যকুণ্ডের সিদ্ধ বাবা ও তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত বহু বৈষ্ণব মহাত্মা দেহ রক্ষা করিয়াছেন। এই সব কথা শ্রবণমাত্রই তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং অসঙ্গ হইয়া একান্তে বাস করিতে

লাগিলেন। মধ্যাহ্নে আহারের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। বাবাজি বা মাতাজি যে কেহ আদর করিতেন, তাঁহার নিকটেই ভোজন করিতেন। কখনও কখনও কোন মাতাজির নিকট ফরমাইস করিয়াও ভিক্ষা লইতেন। দেহধারণ মাত্র অপেক্ষা ছিল—ভাল কি মন্দ তদ্বিষয়ে তাঁহার বিচার ছিল না। রাত্রিবেলার আহারের জন্য জনৈক পেন্সন্‌প্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার তাঁহাকে একটি করিয়া টাকা দিতেন—তাহারা দুই পয়সার পুরি তরকারী যাহা পাওয়া যাইত, তাহাই ভোজন করিতেন। কোন স্থলে নিয়মিত পাঠ কীর্ত্তন থাকিলে তথায় আগে গিয়া দণ্ডবৎ করিয়া বসিতেন—যেই সমাধা হইয়া গেল, অমনি একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। কাহারও মুখের দিকে তিনি তাকাইতেন না—অন্য সময়ে যে কোনও বাবাজি, মাতাজি বা গৃহস্থ পাঠ করিলে তথায় বসিয়া শুনিতেন। কি পাঠ শুনিতেছেন সে দিকে লক্ষ্য ছিল না ; কেবল কাণ দুইটি বন্ধ রাখাই উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ যাহাতে বিষয়-প্রসঙ্গ কাণে না আসে, তজ্জন্য সতত শ্রবণকীর্ত্তনে আগ্রহ রাখিতেন। রায়শেখরের পদাবলী কণ্ঠস্থ ছিল—পাঠ কীর্ত্তন হইতে উঠিয়াই তিনি ঐ পদ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন। শেষ জীবনে শ্রীল মাধব দাস বাবাজি মহাশয়কে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্রীল যদুনন্দনঠাকুর-কৃত পয়ার ও শ্রীপদকল্পতরুগ্রন্থের পাঠক করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটীরে আসিয়াই তিনি পাঠ শুনিতেন—তাঁহাকে লইয়া একবার ব্রজ-পরিক্রমাও করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজর্ষি বাহাদুরের গর্ভধারিণী জননী তাঁহার নিকট বেশাশ্রয় করেন। শেষ জীবনে শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত রাজর্ষি বাহাদুরের বাড়ীতে একটা চালাঘরে থাকিতেন। পরচর্চ্চা কেহ তাঁহার মুখে কখনও শুনে নাই। প্রায় ৮৫ বর্ষ বয়সে ইনি রজোলাভ করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্বরূপ দাস বাবাজি মহাশয় (শ্রীবৃন্দাবন)

ইনি সিদ্ধ তোতা রামদাস বাবাজি মহাশয়ের শ্রীবৃন্দাবনস্থ ঠৌরের অধিপতিরূপে বাস করিয়া ভজন করিতেন। ইনি পরম পণ্ডিত বৈরাগ্যবান্ ও মিতভাষী ছিলেন। শ্রীরাধিকা-নাথ গোস্বামিপ্রভু রাজর্ষি বাহাদুরের সহিত ইঁহার পরিচয় করাইয়া দেন—তদবধি রাজর্ষি বাহাদুরই নিয়মিত ভাবে ইহার সেবা-সমাধান করিতেন। যৎকালে বনমালী বাবু শ্রীকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীকুণ্ডের পঞ্চায়তী বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্যামকুণ্ডের সংস্কারকল্পে তাহার জলসিঞ্চন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে পঙ্কোদ্ধারাদি সংস্কার করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের সময়ে শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের যে সংস্কার হয়, তৎপরে আর কোন সংস্কার হয় নাই। বাবাজি মহাশয় কুণ্ডের এই অবস্থা শুনিয়া দর্শন করিতে গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখনই শ্রীশ্যামকুণ্ড-সংস্কারের জন্য অর্থ-সংগ্রহে দৃঢ়সংকল্প হইয়া রাজর্ষি বাহাদুরের প্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকা প্রথমতঃ মূলধনরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকেই এই কুণ্ড-সংস্কার কার্য্যের কোষাধ্যক্ষ ও সমাধানকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। বাবাজি মহাশয় ভিক্ষা করত যেখানে যাহা পাইতেন, তাহা রাজর্ষি বাহাদুরের নিকটই জমা করিতেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কামিনী বাবু প্রভৃতি এই কার্য্য সমাধান করিতেন। বাবাজি মহাশয়ের তাৎকালিক দৃঢ় অধ্যবসায় দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীকুণ্ডে বা অন্যত্র যাতায়াত করিবার খরচ তিনি নিজে অন্যপ্রকারে সংগ্রহ করিতেন, কাহাকেও পত্র লিখিতে হইলেও শ্রীকুণ্ডসংস্কার-তহবিল হইতে একটি পয়সাও ব্যয় করিতেন না। তিনি বলিতেন—'কেহ যদি আমাদ্বারা কোন অকার্য্য করাইয়াও

আমাকে শ্রীশ্যামকুণ্ড-সংস্কারের জন্য যথাযোগ্য সহায়তা করে, আমি সেই অকার্য্য করিতেও প্রস্তুত আছি।' শ্রীশ্যামসুন্দর ত বৈষ্ণবগণের প্রাণ এবং বৈষ্ণবগণও তাঁহার প্রাণ—সুতরাং তাঁহারা এই সঙ্কল্পেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর অকার্য্য করিতে দেন নাই। এজন্য তাঁহাকে দুই তিন বৎসর যথেষ্ট উদ্বেগ-ভোগ, ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি করিতে হইয়াছিল—একথা বলাই বাহুল্য। যথাসময়ে তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ হইয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের সংস্কার হইয়াছিল।

শ্রীবৃন্দাবন দাস বাবাজি মহারাজ (বর্ষাণা) *

শ্রীবৃন্দাবন দাসজি বর্ষাণায় বাস করিতেন এবং শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করত মলমূত্রাদি ত্যাগ ও স্নানাহ্নিক করিয়া শ্রীহরিনামের মালিকাটি হস্তে লইয়া বার মাস ত্রিশ দিন শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেন এবং প্রসিদ্ধ সাত দেবালয়ে গিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেন; শ্রীচরণতুলসী, শ্রীরজ ও শ্রীচরণামৃত গ্রহণ করিয়া আবার বর্ষাণায় ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলা মাধুকরী করিতেন। কোথাও নিমন্ত্রণ খাওয়া বা অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল না। এইভাবে তিনি বহুদিন কাটাইলেন—একবার শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে একটা বিরাট উৎসব হইতেছিল—শ্রীবৃন্দাবনীয় বহু বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সেইদিন তিনি শ্রীগোবিন্দ-দর্শন করিতে গেলে তত্রত্য বাবাজি বৈষ্ণবগণ সকলেই আগ্রহ-সহকারে তাঁহাকে শ্রীগোবিন্দের প্রসাদ পাইতে বলিতে লাগিলেন। তিনি যথেষ্ট কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেও তাঁহারা কিছুতেই শুনিলেন না—অগত্যা অপরাধাশঙ্কায় তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং যথাসময়ে প্রসাদ পাইয়া আবার বর্ষাণায় চলিয়া

* এই ঘটনাটি গোবর্দ্ধন-গোবিন্দকুণ্ডের পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমনোহর দাস বাবাজি মহারাজের মুখে শুনিয়াছি।

আসিলেন। শেষরাত্রে যথারীতি গাত্রোত্থান করত নিত্যকৃত্যাদি সারিয়া মালিকাহস্তে বহির্গত হইয়াছেন—কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠটি নামগণনা করিতে জড় হইয়া গিয়াছে—কোনও ব্যথা-বেদনা নাই, জ্বালা যন্ত্রণা নাই, অথচ মালা ঘুরাইতে পারিতেছেন না!! ব্যাপার দেখিয়া ত তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কেন তাঁহার অঙ্গুলিটি আড়ষ্ঠ হইয়া রহিল—তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুল প্রাণে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে গিয়া শ্রীশ্রীমন্ মনোহর দাস বাবাজি মহারাজের চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজজি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিরে বৃন্দাবন দাস! তোর কি হয়েছে?' তিনি বলিলেন—'বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—কি জানি কেন যে নাম-গণনা করিতে গেলে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি আর নড়ছে না!! এখন কি উপায় করিব বলুন।' মহারাজজি—'কাল কোথায় প্রসাদ পাইয়াছিলি?' তিনি—'আজ্ঞে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজিউর প্রসাদ পাইয়াছি।' মহারাজজি—'আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে আয় ত কাল্‌কে কার অর্থে শ্রীগোবিন্দের ভোগ হয়েছে?' শ্রীবৃন্দাবনদাসজি ব্যাকুল প্রাণে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন এবং যথাসময়ে পৌঁছিয়া তত্রত্য পূজারিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে গত দিনের ভোগ কলিকাতা হইতে আগত কোনও এক বার-বনিতার অর্থেই সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি পুনরায় মহারাজজির নিকট ফিরিয়া সব কথাই বলিলেন। মহারাজজি বলিলেন—'তোর পেটে ঐ অন্ন সইবে কেন! যা তিন দিন শ্রীকুণ্ডে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে গিরিরাজ পরিক্রমা কর, পথে যা জুট্‌বে তাই খাবি।' বলা বাহুল্য যথাযথভাবে আদেশ পালন করিলে চতুর্থ দিবসে শ্রীবৃন্দাবন দাসজির অঙ্গুষ্ঠের জড়তা দূর হইল।

সিদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজি মহাশয় (কোশী-নিবাসী)

যে সময়ে কাম্যবনে সিদ্ধ জয়কৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজ ভজন করিতেন, তখন ইনিও কোশীতে বিরাজমান ছিলেন। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইলেও হাতে একটা লোহার চিম্‌টা থাকিত। ইনি বৃক্ষ-তলবাসী ছিলেন—মাধুকরীর ঝোলাও গাছে লটকান থাকিত। বাবাজি মহাশয় বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। শ্রীশৃঙ্গারবটের শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-সন্তান শ্রীপূর্ণানন্দ গোস্বামিপ্রভু অপুত্রক ছিলেন এবং ইঁহারই বাক্যপ্রভাবে শ্রীনৃসিংহানন্দ, প্রেমানন্দ ও যাদবানন্দ—এই তিন পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। ইহার মহিমা শুনিয়া যোধপুরের রাজা তাঁহার দর্শনে আসেন এবং কিছু সেবাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কোনই প্রয়োজন নাই বলিয়া বাবাজি মহাশয় পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করিলেও রাজা নির্বন্ধাতিশয় ত্যাগ না করায় ইনি রাজাকে একটি মন্দির প্রস্তুত করত শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে রাজা যে সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি কোশীতে বিরাজমান আছেন। গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা ইঁহাকেও কাম্যবনের সিদ্ধ জয়কৃষ্ণদাস বাবার ন্যায় সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন।*

শ্রীব্রজকিশোর দাস বাবাজি মহাশয়

সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহাশয়ের প্রধান ও প্রসিদ্ধ শিষ্যদের অন্যতম। ইনি দৈন্য, বৈরাগ্য ও ভজনে সিদ্ধবাবার উপযুক্ত শিষ্যই ছিলেন। তিনি কখনও কুটীরে বাস করেন নাই—ভাতরোলে 'ভূতের বাউরীতে' অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন

* পণ্ডিত গায়ক শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজি মহাশয়ের মুখাশ্রিত।

তত্রত্য জনৈক ভূত বাবাজি মহাশয়ের তেজে ভীত হওয়ায় ঐ জীবের দুঃখ হইলে অপরাধ হইবে ভাবিয়া তিনি সেস্থান হইতে 'সিন্দুরক' গ্রামের নিকট শ্রীবৃন্দাবন হইতে যাওয়ার পথে এক প্রাচীন পুলের নীচে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়াছেন। কাহারও স্পর্শ হইলে অপরাধ হইবে—এই ভয়ে তিনি মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া কখনও শ্রীগোবিন্দাদির দর্শন করেন নাই। ইঁহার নিকট শৃঙ্গারবটের শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য শ্রীপ্রেমানন্দ প্রভু ভজন শিক্ষা করেন। সমগ্র শ্রীগোবিন্দলীলামৃত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি এক করোয়া ও এক গুদ্‌রী (কাঁথা) লইয়াই জীবন যাপন করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে দেখিয়া দণ্ডবৎ করিবে—এই ভয়ে তিনি অলক্ষিত ভাবেই থাকিতেন।

শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ গোস্বামিপ্রভু (শৃঙ্গারবট)

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর গাদি-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপরমানন্দ বা শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামিপ্রভুর চতুর্থ অধস্তন। ইনি সুদর্শন ছিলেন, কথিত আছে যে ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রীনৃসিংহানন্দপ্রভু ও ইনি কীর্ত্তনে দাঁড়াইলে দর্শকবৃন্দের মনে শ্রীনিতাইগৌরের আবির্ভাব খেলিয়া যাইত। ইনি ভক্তি-শাস্ত্রজ্ঞ, কীর্ত্তনে পারদর্শী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি কোথাও কীর্ত্তন করিবেন শুনিতে পাইলে স্ত্রীপুরুষ ঘরে থাকিতে পারিত না। রাত্রিতে কীর্ত্তন হইয়াছে—বিশিষ্ট শ্রোতাগণ ও কীর্ত্তনীয়াগণ তাঁহার মিষ্টভাষিতা সদালাপ ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ভুলিয়া গিয়াছেন—কত রাত্রি হইয়াছে। রাত্রি বারটার কালে তাঁহার কার্য্য-পরিচালক শ্রীযুগলদাসকে ইঙ্গিত করিলেন যে সমাগত চল্লিশ মূর্ত্তি বৈষ্ণবের সমাধান করিতে হইবে। শ্রীযুগলদাসও

প্রভুপাদের অনুগত ও কার্যতৎপর ছিলেন—এত রাত্রেও তাঁহার অভিমত ভোজ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করত সকলের সমাধান করিলেন। এজাতীয় ঘটনা প্রায়ই হইত।

শ্রীলপ্রভুপাদ তাঁহার পিতৃ-মাতৃ-উৎসব দুইটি বিশেষ যত্ন করিয়া করিতেন। তৎকালে প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ ব্রজবাসীর পিতা শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি ও পিতৃব্য শ্রীগৌরদাস বাবাজি মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক ছিলেন। সমস্ত দিন কীর্ত্তন হইয়াছে—পরদিন শ্রীনগরকীর্ত্তন হইবে। শ্রীলপ্রভুপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজি মহাশয়কে নিজের নিকটে পৃথক্ শয্যায় শয়ন করাইলেন—সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বাবাজি ঘুমাইয়া পড়িলেন—শ্রীলপ্রভুপাদ তখন উঠিয়া অতিনৈপুণ্যে তাঁহার গাত্র-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জাগিয়া 'কে কে' বলিয়া অনুসন্ধান নেওয়ায় শ্রীপ্রভুপাদ বলিলেন—'ভাই! তুমি গোলমাল করিও না, আগামী কল্য শ্রীনগর-কীর্ত্তনটি ত সমাধান করিতে হইবে।' তৎকালে তাঁহাদের নগর-কীর্ত্তন অতুলনীয় ছিল।

শ্রীপ্রভুপাদ নির্লোভ ছিলেন—যে যাহা ইচ্ছা করিয়া দিত, তাহাই গ্রহণ করিতেন। শ্রীলপ্রেমানন্দ গোস্বামিপ্রভুপাদ তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবদাসজিকে বলিয়াছিলেন—'এই দাদা নিজ প্রভাবে দুই লক্ষ টাকার কম উপার্জন করেন নাই, কিন্তু একটি পয়সাও রাখেন নাই।'

শ্রীপ্রভুপাদ অক্রোধ পরমানন্দ ছিলেন—মর্য্যাদা-রক্ষাবিষয়েও তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল। সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজি মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। [তৎপ্রসঙ্গ শ্রীজগন্নাথ বাবাজি-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য] শ্রীপাট পুরুনিয়ায় অবস্থানকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে দেহত্যাগ করিলেন—শ্রীলপ্রভুপাদ তখনই আহ্নিক কৃত্যাদি করিয়া উঠিয়াছেন—আত্মীয় স্বজন শোকার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন—শ্রীপ্রভুপাদ সে দিকে তিলমাত্রও দৃষ্টি না দিয়া ঠাকুর

বাড়ীতে চলিয়া গেলেন—ঠাকুরের ভোগ সরিলে পূজারির নিকট চাহিয়া প্রসাদ পাইলেন, তৎপর নিত্যকৃত্য ভজনাদি করিতে লাগিলেন—মৃতপুত্রের বিষয়ে বিন্দুমাত্রও মন দিলেন না জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণ মৃতদেহের সংকার করিলেন—অতঃপরও তাঁহার মুখে এই প্রসঙ্গ কেহ কখনও শুনেন নাই।

ইনি অদোষদর্শী ছিলেন—কেহ কাহারও ত্রুটির বিষয় ইঁহাকে জানাইলেন ইনি তাহা নিজেরই ত্রুটি বলিয়া ধরিতেন, অথচ যাহার ত্রুটি বলা হইতেছে, তাহার ত্রুটি মনে করিতেন না। একবার তাঁহার আশ্রিত কোন ভক্তের সম্বন্ধে কিছু অপবাদের কথা প্রভুপাদকে নিবেদন করা হইল। তিনি অম্লান বদনে বলিলেন—'তাহার কি দোষ? এ'ত আমারই ত্রুটি—আমার কর্ত্তব্য আমি যথাসময়ে করিলে আমাকে অযথা এ কথা শুনিতে হইত না।' এই কথা বলিয়া সেই ভক্তকে ডাকাইয়া তাহার হাতে দশ টাকা দিয়া বলিলেন—'তুমি কিছুদিন আমার ভগ্নীর বাড়ীতে গিয়া থাক, আমি ডাকিলে আসিও।'

গোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ বাবা শ্রীকৃষ্ণদাসজির সাধক চেলা দ্বিতীয় সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাসজি শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রভুকে একবার শ্রীরাধার স্নান-শৃঙ্গার-লীলা শুনাইতে বসিয়া এক প্রাতঃকালাবধি আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত একভাবে আত্মহারা ছিলেন।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে একটি নাবালক পুত্র রাখিয়া শ্রীপ্রভুপাদ শ্রীবৃন্দাবন-রজঃ লাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজি মহারাজ (কালনা)

শ্রীগোবর্দ্ধনের সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের ভেকের চেলা ; শুনা যায় যে ইনি উৎকলবাসী ছিলেন, তথাপি বাংলা ভাষাতেই কথা বলিতেন। কাল্নায় তাঁহার শ্রীনামব্রহ্মের সেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইনি খুব গম্ভীরাশয় ছিলেন। রাগানুগা ভজনের কথা প্রায়ই কাহাকেও বলিতেন না—শ্রীজগদীশ দাস বাবাজিকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিলেও অতিসংক্ষেপে তাঁহাকে রাগানুগামার্গ বলিয়াছেন। নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজি মহাশয় স্বীয় ভাবের উচ্ছ্বাসে যে সব ব্যবহার করিতেন—তাহা ইঁহার পছন্দ হইত না—তাহার জন্য তাঁহাকে ইনি 'ফচ্‌কে' বলিতেন।

একবার শ্রীনামব্রহ্মের পূজারি ঠাকুরের অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করিল। অনুগত ভক্তগণ পুলিসে সংবাদ দিবে বলিয়া তর্জন গর্জন করিতে থাকিলে সিদ্ধ বাবা হাসিয়া সকলকে নিষেধ করত বলিলেন —'শ্রীনামব্রহ্মের অলঙ্কার পরিবার ইচ্ছা নাই, তাই পূজারিকে দিয়াছেন। এখন এমনি থাকুন।' কয়েক মাস পর আবার সেই পুজারি অলঙ্কারগুলি লইয়া বাবাজি মহাশয়ের সামনে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'বাবা! লোভ বশতঃ নিয়ে ত গিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই ভাঙ্গিতে মন হয় নাই। প্রাণে প্রচুর অশান্তি হয়, তাই ফিরিয়ে এনেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।' তখন ভক্তগণকে ডাকিয়া সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'দেখ্, এখন আবার শ্রীনামব্রহ্মের অলঙ্কার পরিতে ইচ্ছা হয়েছে, আবার সব আনাইয়া নিলেন। ফচ্‌কে, কখন কি মনে হয়, ঠিক নাই। নিয়ে যাও, গয়না পরাও।' এই বলিয়া পুজারিকে পুনঃ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা কাঠ বিক্রয় করিতে বাজারে আসিত। জনৈক

সেবক হয়ত তিন আনা দাম করিয়া এক বোঝা কাঠ লইয়া শ্রীনাম ব্রহ্মে আসিয়া পয়সা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন বাবা কাঠওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোর আর কে আছে?' কাঠওয়ালী বলিল—'বাবা, আমার আর কেহ নাই; একটি ছেলে কোলে, আর ইহার বড় দুইটি ছেলেকে ঘরে রেখে এসেছি।' তখন তাহাকে বলিলেন—'এই তিন আনায় তোর কিরূপে নির্ব্বাহ হবে?' যিনি বোঝা কিনিয়াছেন—তাঁহাকে বলিলেন—'এর তিন আনায় কি হবে? একে ছয় আনা দাও।' তাহাকে তাহাই দেওয়া হইল। তারপর হইতে এ জাতীয় বিক্রেতাকে আর সিদ্ধ বাবার সম্মুখে আনা হইত না।

একদিন আশ্রমে একটি সাপ আসে—কোন ভক্ত তাহাকে ধরিয়া দূরে ফেলাইয়া দেন। বাবা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া বলিলেন—'উনি আমার নামব্রহ্মের বড ভাই, তাঁর প্রতি তুমি এই জাতীয় ব্যবহার করিলে? তুমি আর এখানে আসিও না।' অনেকদিন পর্য্যন্ত উঁহার প্রতি ইনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। শুনা যায় যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রসাদ উঁহার সাম্‌নে ধরা থাকিত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সাপটি কিঞ্চিৎ গ্রহণ না করিতেন, ততক্ষণ সিদ্ধ বাবা ভোজন করিতেন না।

বাবাজি মহাশয়ের ভজনাবেশে ভোজনের সময় অনেকদিন ঠিক থাকিত না। একটি বিড়াল তাঁহার সঙ্গে প্রসাদ পাইত। প্রসাদ পাইতে দেরী থাকিলে বিড়ালটি 'ম্যাও ম্যাও' শব্দ করিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘুরিত। সিদ্ধ বাবা তাহার মন বুঝিয়া প্রসাদের ঢাক্‌না উঠাইয়া দিতেন—বিড়াল যথেচ্ছ খাইয়া চলিয়া গেলে আবার ঢাক্‌না দিয়া রাখিতেন। কোন দিন ভজনের স্ফুরণ না হইলে সিদ্ধ বাবা আহার করিতেন না—বলিয়া দিতেন যে তাঁহার শরীর ভাল নাই। অন্যান্য সকলকে আহার করিতে আদেশ দিলেও তাঁহাকে ছাড়িয়া

শিষ্যগণ আহার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন—'যদি না খাও, তবে এস বাপ বেটা সকলে শুইয়া থাকি।' অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রসাদ পাইতে হইত। এই ভাবে সিদ্ধ বাবার দুই তিন দিনও কাটিয়া যাইত। হয়ত অধিক রাত্রিতে ভজনের উল্লাস পাইয়াছেন, তখন আহারেরও চেষ্টা হইয়াছে—ঘরে কিছুই নাই জানিয়া বাজার হইতে রসগোল্লাদি কিছু আনাইয়া বলিতেন —'এই জিনিষ ত আর নামব্রহ্ম খাবেন না—ইহাতে চরণামৃতের ছিটা দাও।' শ্রীচরণামৃত স্পর্শ করাইয়া তবে ভোজন করিতেন।

সদাচার-সম্বন্ধে সিদ্ধ বাবার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। কোথাও হইতে প্রসাদ আসিলে, যে স্থানটিতে নামান হইবে সেই স্থানটি পূর্ব্বেই জলছিটা দ্বারা হাত না ফিরাইলে শিষ্যের প্রতি রাগ করিয়া বলিতেন 'এ বেটা মোছলমান্ রে মোছলমান্ !!' প্রসাদি মাল্যাদি কেহ আনিয়া দিলে তিনি তাহা মস্তকেই স্পর্শ করাইতেন, পরিধেয় বস্ত্রাদিতে স্পর্শ করাইতেন না।

তদীয় শিষ্য শ্রীবিষ্ণুদাস বাজাজির একবার জ্বর হইয়া দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। জ্বর সারিতেছে না দেখিয়া সিদ্ধ বাবা বলিলেন —'বিষ্ণুদাস ! তোর জ্বর ত ভাল হচ্ছে না, কিছু ঔষধ খা।' বিষ্ণুদাসজি উত্তর করিলেন—'আর কি ঔষধ খাব ? শ্রীনামব্রহ্মের কৃপাতেই ভাল হইয়া যাইব।' সিদ্ধ বাবা বলিলেন—'হাঁ, তুমি আজই এত সিদ্ধ হইয়া গেলে ? নামব্রহ্ম তোমার জন্য ডাক্তারও হইবেন ? রোগ হয়েছে, ঔষধপত্র খাও, এ সব প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে। নামব্রহ্মের প্রতি কেন ভার দিবে ?' শ্রীবিষ্ণুদাসজি তাঁহার আদেশানুসারে ডাক্তারী ঔষধ সেবা করিয়া সুস্থ হইলেন।

একবার সিদ্ধ বাবার তালশাঁস খাওয়ার ঝোঁক চাপে, কেবল তালশাঁস খাইয়াই কয়েকদিন কাটাইলেন—অন্নাদি স্পর্শও করিতেন

না। তাহাতে পেটে আমাশয় দেখা দিল। শ্রীল জগদীশ বাবা, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বাবা প্রভৃতি যথাশক্তি অনুরোধ কয়িয়াও কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বাবা এক বুদ্ধি করিলেন—একজন মালী ডাকিয়া নামব্রহ্মের সাম্‌নে দিয়া ঢেঁরা দেওয়াইলেন 'বাজারে কেহ তালশাঁস বিক্রয় করিতে পারিবে না—যদি কেহ বিক্রয় করে, তবে তাহার ২৫৲ জরিমানা হইবে।' সিদ্ধ বাবা শুনিয়া বলিলেন—'তবে ত আমি মরিব রে? তালশাঁস যে আমার প্রাণ! এখন যদি একটা তালশাঁস চারি গণ্ডা পয়সাও হয়, তবেও আন্‌তে হবে।' সেবকগণ ধীরে ধীরে তাঁহাকে অন্নাদি প্রসাদ পাওয়াইতে লাগিলেন। একবার ঝোঁক চাপিল—নামব্রহ্মের নিকটে একটি পুকুর খুঁড়িয়া তাহাতে টুঙ্গি বাঁধিয়া ভজন করিবেন। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসজির প্রতি হুকুম হইল—'কল্য প্রাতে লোক লাগাইয়া পুকুর খোঁড়াও।' তখনকার দিনে দুই আনা করিয়া মজুর ছিল, গাছে প্রচুর নারিকেল ছিল। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বাবা একেবারে পঞ্চাশ জন লোক লাগাইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুকুর করিয়া দিলেন। সিদ্ধ বাবা আনন্দে আত্মহারা হইলেন। একাদশীর দিন শ্রীজগদীশ বাবার প্রতি আদেশ হইল—'আগামী কল্যই বাজার হইতে বাঁশ কিনিয়া স্কন্ধে বহিয়া আনিবে এবং টুঙ্গি প্রস্তুত করিবে।' শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বাবার সাহায্যে শ্রীজগদীশ বাবা দ্বাদশীর দিন সন্ধ্যায় সব প্রস্তুত করিয়া দিলে সিদ্ধ বাবার আনন্দ আর ধরে না। কয়েকদিন টুঙ্গিতে বসিয়া ভজন করিতেছেন—একদিন একটি গরুর বাছুর জলে পড়িয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া বাছুরটাকে জল হইতে উঠাইলেন এবং বলিলেন—'আর দরকার নাই, পুকুরটাকে বুজাইয়া ফেল, শেষকালে গোবধ হইবে।' আদেশ যথাসময়ে কার্য্যে পরিণত হইল।

একদিন ভজনাবেশে তিনি কালনায় বসিয়া শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীগোবিন্দ-

মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থ তুলসী বৃক্ষের নাশকারী একটী ছাগলকে তাড়াইতেছেন —এমন সময় বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁহার প্রভাব জানিয়া দর্শনেচ্ছু হইয়া আসিয়া শুনিলেন যে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বাবা 'দূর হও, দূর হও' বলিয়া তাড়াইতেছেন। ইহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাহ্যদশা লাভ হইলে অনুগত সেবকগণ রাজার দুঃখকারণ নিবেদন করিলে তিনি সসম্ভ্রমে বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহাকে আবার আসিতে হইবে। তাঁহার আহ্বান শুনিয়া রাজা আসিলেন, সিদ্ধ বাবা তাঁহাকে সব খবর বলিয়া ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে বলিলেন। রাজা কিন্তু ব্যাপারটি সত্য কিনা জানিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে তার করিয়া জানিলেন যে ব্যাপারটি সবই ঠিক। সেই হইতে ইঁহার 'সিদ্ধ' নাম প্রচার হয়।

সিদ্ধ বাবা লীলা কথাদি বলিতেন না, কিন্তু অনুগত জনের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করত প্রকাশ করিতেন। তিনি একদিন শ্রীজগদীশ বাবাকে বলিলেন—'এই নাম কয়েকটা লিখিয়া নে, পরে কাজ দিবে।' শ্রীজগদীশ বাবা ঐ নাম কয়েকটিকে তাঁহার শ্রীগুরুপ্রণালী বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। সিদ্ধ বাবা ভক্তদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে হাসিয়া ফেলিতেন, অথচ সেটি হাসিবার কথা নহে এবং হাসিবার মত কোনও ঘটনাও ঘটে নাই। ইনি নিজ ভজনের কথা কাহাকেও বলিতেন না, তবে তাঁহার ভিতরে স্মরণের স্রোত নিরন্তরই চলিত এবং সেই আবেশেই মাঝে মাঝে হাসিতেন।

গৌণ কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে ইনি অন্তর্ধান করেন।

সিদ্ধ শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজি মহাশয় (সূর্যকুণ্ড)

পূর্ব্বাশ্রমে এই সিদ্ধ বাবা কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। নবীন বয়স, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ছিল। শিশুকাল হইতেই ইঁহার শ্রীকৃষ্ণানুরাগ ও পরমবৈরাগ্য ছিল। মাতাপিতা বাল্যকালে অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের দিন রাত্রে কিন্তু ইনি বাসরঘর হইতে পলায়ন করত শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। লোকপরিচয়-ভয়ে তিনি লোকালয় হইতে দূরে থাকিতেন এবং অনেক সময় অনাহারে বনে জঙ্গলে যমুনাতীরে দিন কাটাইতেন। একদিন মনে করিলেন, আমার ত দীক্ষা হয় নাই, অতএব কোন মহাত্মা বৈষ্ণবের নিকট শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। যমুনাতটে কেশিতীর্থে বসিয়া এরূপ চিন্তা করিতেছেন—এমন সময় জনৈক মহাত্মা (গঙ্গামাতা-বংশ্য) যমুনায় স্নান করিতে আসিয়া বালক মধুসূদনকে দেখিয়া বলিলেন—'বেটা, যা তুই যমুনায় স্নান করে আয়, আমি তোকে দীক্ষামন্ত্র দিব।' দিব্যচিন্তামণি ধামের অলৌকিক প্রভাবে শ্রীমধুসূদন হর্ষভরে যমুনায় স্নান করিয়া আসিলেই সেই বৈষ্ণব মহাত্মা মন্ত্রার্থের সহিত দশাক্ষর-মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। মন্ত্রলাভ করিয়া তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়িলে সেই বৈষ্ণবটিও অন্তর্হিত হইলেন। সেই মহাত্মা কে, তাঁহার কি পরিচয় ইত্যাদি কিছুই তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। শ্রীমধুসূদন দাসজি ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে মানসগঙ্গায় আসিয়া সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণপূর্বক বলিলেন—'আমি মূর্খ বালক, কিছুই জানি না; আমাকে কৃপা করিয়া ভজন-রীতি উপদেশ করুন।' সিদ্ধবাবা তাঁহার তেজঃ ও ভাব দেখিয়া স্নেহের সহিত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তিনিও গৃহত্যাগাবধি দীক্ষালাভ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই নিবেদন করিলেন। সিদ্ধবাবা সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন—'আমাদের রাগের ভজন ত সম্বন্ধানুগা, গুরু-পরিবার হইতেই সম্বন্ধ-নির্ণয় হয়। তোমার শ্রীগুরুদেবের নাম পরিবার ইত্যাদি কিছুই জানা নাই, এজন্য রাগানুগা ভজনে তোমার অধিকার নাই, অথচ তুমি মন্ত্রার্থের সহিত এ সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাইয়াছ; এজন্য পুনঃ দীক্ষালাভেরও তোমার অপেক্ষা নাই। অতএব আমা দ্বারা তোমাকে ভজনশিক্ষা দেওয়া হইবে না।' সেই সময়ে সম্প্রদায়-পরম্পরার তীব্র শাসন ছিল—কেহ তিলমাত্র ব্যতিক্রম করিতেন না। সিদ্ধ বাবার কথায় তিনি হতাশ হইয়া দারুন ক্রন্দন করিলেন, তাঁহার রোদনে সিদ্ধ বাবা দয়াপরবশ হইয়া পুনরায় বলিলেন—'ভাই! তুমি কাম্যবনের সিদ্ধ জয়কৃষ্ণ দাস বাবাজি মহাশয়ের নিকট যাও, তিনি সর্ববেত্তা, তিনিই তোমার শ্রীগুরুদেবের পরিচয় ও সম্বন্ধাদি নির্ণয় করিয়া দিবেন।' তৎপরে তিনি কাম্যবনে গিয়া সিদ্ধ বাবাজি মহারাজের চরণে পড়িয়া আমূল সব বৃত্তান্ত জানাইলেন। সিদ্ধ বাবা সর্ব্ববিৎ হইয়াও ভবিষ্যতে উপধর্মের সৃষ্টি না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করত বলিলেন—'ভাই! এ বিষয়ে আমিও কিছু অনুমান করিতে পারিতেছি না, অথচ তোমার দীক্ষালঙ্ঘন করাও অনুচিত; এ অবস্থায় তোমার রাগানুগা ভজনে অধিকার নাই, তুমি একান্তে বসিয়া হরিনাম কর; শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীরাধারাণী যাহা করেন, তাহাই হইবে। অথবা তোমার চিন্তামণি-স্বরূপ শ্রীগুরুদেব হইতে ইচ্ছামাত্র যেমন মন্ত্র লাভ করিয়াছ, তেমনি অবশিষ্ট বাঞ্ছাও তিনিই পূর্ণ করিবেন।' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শ্রীমধুসূদন দাসজি বিষণ্ণচিত্তে রোদন করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে আসিলেন, মনে মনে বিচার করিলেন—'যদি আমার ভজনে অধিকার নাই, তবে এই দেহ রাখার কি প্রয়োজন? অদ্য রাত্রিতেই

শ্রীকুণ্ডের জলে এবারকার মত দেহনির্ব্বাণ করিব।' কার্য্যতঃ তাহাই হইল—তিনি অর্দ্ধরাত্রে গলায় শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা বাঁধিয়া শ্রীকুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিলেন এবং ক্রমশঃ অতল জলে গিয়া পড়িলেন। সেই সময় হঠাৎ কেহ তাঁহার কণ্ঠবদ্ধ শিলা খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহার হস্তে একখানি তালপত্র প্রদান করত তাঁহাকে তীরে ক্ষেপণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই প্রভাত হইল। মৃত্যু হইল না বলিয়া দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তালপত্রখানি পাইয়া হর্ষলাভও করিলেন। পত্রখানি লইয়া তিনি গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সব কথা বলিলেন। সিদ্ধ বাবা পত্র-বিষয়ে কিছু না বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় কাম্যবনের সিদ্ধ বাবার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সিদ্ধ জয়কৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজ সেই তালপত্রখানি দেখিয়া বলিলেন—'তোমার উপর শ্রীপ্রিয়াজির যথেষ্ট কৃপা আছে, কিন্তু যাহা পাইয়াছ, তাহাও অব্যক্ত, বহির্জগৎকে ত আমি বুঝাইতে পারিব না, তুমি পুনঃ শ্রীকুণ্ডে গিয়া শ্রীপ্রিয়াজিকে ডাক, তিনি অবশ্যই কৃপা করিয়া তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। তিনি উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেন। সিদ্ধ বাবার কৃপায় সেই রাত্রিতে শ্রীপ্রিয়াজি সাক্ষাৎ হইয়া শ্রীমধুসূদন দাসজিকে উপদেশ করিলেন—"সূর্য্যকুণ্ডে গিয়া বাস করত ভজন কর, সেই স্থানেই তোমার সেবা লাভ হইবে। অধিকন্তু যে মন্ত্র তুমি পাইয়াছ, সেই মন্ত্রে কাহাকেও দীক্ষিত করিও না। যাহা আমি তোমাকে দিলাম, তাহা আজীবন গোপন রাখিও।' উত্তরকালে সিদ্ধ বাবার ভেকের শিষ্য ও ভজনশিক্ষার শিষ্য অনেক হইয়াছিল বটে, কিন্তু কাহাকেও তিনি মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই।

কথিত আছে যে তাঁহাকে একদিন প্রিয়াজি স্বপ্নাদেশে বলিলেন—'তুমি সূর্যকুণ্ডের যে ঘাটে স্নান কর, ঐ ঘাটের কণ্ঠদঘ্ন জলে একটি শিলা আছে, তাহাতে আমাদের দুই ভগ্নীর কেয়ূর অঙ্গদাদির চিহ্ন

আছে। আমরা স্নান করিবার সময় অলঙ্কার খুলিয়া ঐ পাথরের উপরে রাখিতাম। তাহাতে পাথরখানি গলিয়া ঐ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছে। তুমি ঐখানা উঠাইয়া আনিয়া পূজা কর।' স্বপ্নাদেশ পাইয়া জলে ডুবিয়া তিনি ২ মণ, ২॥০ মণ ভারি শিলাখানি ফুলের মালার ন্যায় বুকে ধরিয়া উপরে রাখিলেন। এখনও ভাগ্যবান্‌গণ সেই শিলায় সেই চিহ্নাদি দেখিতে পান।*

বর্ষাণে হোলিখেলার সময় ফাল্গুনী শুক্লা নবমীর দিন অপরাহ্ণ-কালে তিনি সাদা কাপড় গায়ে দিয়া অতিদ্রুত গতিতে কুটীর হইতে বাহির হইয়া একতান চিত্তে বর্ষণাভিমুখে ছুটিতেন। বোম্বার (খালের) নিকট পর্যন্ত গিয়াই পড়িয়া যাইতেন। বোম্বার ধারে গোরক্ষক গোয়ারিয়া বালকগণ আসিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া দেখিতেন যে তাঁহার চোখের জলে, মুখের লালায় সমীপবর্ত্তী ভূমিখণ্ড কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে, তাঁহার মুখে ফেন ঝরিতেছে; ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে (হোলিযুদ্ধের অনুভাব !!), ক্ষণে ক্ষণে অপরূপ রোমাঞ্চ-সহকারে সর্ব্বাঙ্গের স্ফীতি প্রভৃতি চলিতেছে। এই ভাবে তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ স্থানে পড়িয়া থাকিতেন। যখন তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন, তখন দেখা যাইত যে সাদা বস্ত্রখানি ভিজিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে !!*

শেষরাত্রে কুণ্ডতীরে বসিয়া অত্যুচ্চস্বরে 'বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্র ! বৃষভানু-নন্দিনী রাধে !!' বলিয়া তিনি কীর্ত্তন করিতেন। প্রাতঃকালে লোক-গতাগতি আরম্ভ হইলে কুটীরে বসিয়া ভজন করিতেন। তৎ-কালে কাদামাটি দ্বারা দেওয়াল ও গাছের ডাল দিয়া ছাদ করিয়া তাহার উপর মাটি পিটাইয়া দেওয়া হইলেই কুটীর হইত। ইনি

---

* জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সূর্য্যকুণ্ডবাসী শতঞ্জীব ব্রজবাসী ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজি মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রুত ঘটনা।

এ জাতীয় কয়েকটি কুটীর বৈষ্ণবদের জন্য তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। গ্রাম হইতেই বৈষ্ণবদের মাধুকরী নির্ব্বাহ হইত।

বাবাজি মহাশয়ের প্রাচীনাবস্থায় একদিন শুনিলেন যে তাঁহার ধর্মপত্নী তাঁহার দর্শনার্থে আসিয়াছেন। শুনিবামাত্র ইনি 'গোবর্দ্ধন যাই' বলিয়া চলিয়া গেলেন। তদীয় ধর্মপত্নী তখন প্রাচীনা হইলেও অনুসন্ধান করিতে করিতে সূর্যকুণ্ডে আসিয়া শুনিলেন যে বাবাজি মহাশয় গোবর্দ্ধনে গিয়াছেন। ব্রাহ্মণী গোবর্দ্ধনে যাইয়া শুনিলেন যে বাবাজি মহাশয় সে স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন। এইভাবে তিনি চার পাঁচ স্থানে ঘুরিয়াও তাঁহার দর্শন না পাইয়া বুঝিলেন যে বাবাজি মহাশয় দর্শন দিবেন না। 'বিয়োগেও বাঞ্ছে প্রিয় হিত'—এই প্রীতির রীতি স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণী তখন 'তিনি স্বচ্ছন্দে ভজন করুন'—এই বলিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। তাহার কিছুদিন পরে সিদ্ধ বাবা দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পায়ে ক্ষত-রোগ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার নাই ভাবিয়া তিনি দেহত্যাগ করার সংকল্প লইয়া পায়ে ন্যাকড়া জড়াইয়া অতিকষ্টে কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং কোনও বনের মধ্যে পড়িয়া রহিলেন। বৈষ্ণবগণ চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া বিবিধ জল্পনা করিতে লাগিলেন—কেহ কেহ ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। এদ্দিকে বনমধ্যে তিনি পড়িয়া আছেন—ব্যাধির বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস নাই। তখন অনন্তোপায় হইয়া তিনি শ্রীরাধারাণীর নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন এবং প্রতিক্ষণে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন। দুই দিন অতিবাহিত হইল—বাবার মুখে একবিন্দু জলও পড়ে নাই !! পাছে কেহ তাঁহার অনুসন্ধান পায়—এই ভয়ে তিনি নীরবে নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। করুণাময়ী আর থাকিতে পারিলেন না—কিশোরী ব্রজবালিকারূপে কিছু রুটি ও জল লইয়া

তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন— 'আরে তু হিয়া কাইকো আয় পড়া হ্যায়? হাম্ ত কেত্না ঢুড়তে হুয়ে হিয়া আয়ী। তু কাল্ভি মাধুকরী লানেমে নেই গিয়ে, পরশুভি নেই গিয়ে, মাইয়ানে তেরে তাঁই রোটি ভেজি, খাইলে।' কিশোরী বালিকাটি বহুদিনের পরিচিত, যে বাড়ীর বালিকা তাহাও তিনি জানিতেন। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পরিহাস ও প্রণয়কোপের সহিত তিনি বলিলেন— 'তূ কাইকো হিঁয়া আয়ী? তু কৈছে জানি হাম্ হিঁয়া পড়া হুঁ?' বালিকা—'হামে সব খবর পড় যা, খা লে; হাম যাউঙ্গী, কাম হ্যায়।' বাবাজি—'মেঁ নেই খাউঙ্গে, তূ লে যা।' বালিকা—'মাইয়ানে কহ দিয়া সাম্নে জিমায়ে আইয়ো। খায় গা কেঁউ নেহি? শরীরমে আরাম ব্যারাম সব্হি হোতা হে, জীউ ছোড়্নেছে ভজন পূরা হোতা? খাইলে।' বালিকার মিষ্ট কথায় বাবাজি মহাশয় খাইতে বাধ্য হইলেন। তিন দিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সবই খাইলেন এবং বলিলেন —'ফির কব্ভি মৎ আইয়ো।' কিশোরী তাঁহার দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু মন্দ হাসিয়া চলিয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন যে গায়ে কোনও জ্বালা যন্ত্রণা নাই, নেকড়া সরাইয়া দেখিলেন যে পায়ে ক্ষতও নাই। তখন মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া তিনি যে বাড়ীর বালিকা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে গেলেন। ব্রজমায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা লালী কাঁহা?' ব্রজমায়ী—'ও ত শ্বশুরালয়মে হ্যায়।' বাবাজি 'কভ্তে গঈ?' ব্রজমায়ী—'তিন মাহিনা ত হুয়াই।' বাবাজি মহাশয় তখন রহস্য বুঝিলেন যে ব্রজমায়ী রুটি পাঠান নাই। কথা-প্রকাশের ভয়ে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কুটীরে আসিলেন। গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও কিন্তু ঘটনা গোপন রহিল না। তাঁহার 'সিদ্ধ' নাম খ্যাত হইল।

এই সময় বহু বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে

লাগিলেন। একদিন প্রাতে প্রহরেক সময়ে এক বাবাজি আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন 'আমি যোগপীঠ ভাল বুঝিতে পারি না, আমাকে বুঝাইয়া দিন।' সিদ্ধ বাবা বুঝাইতে বসিলেন এবং বুঝাইতে বুঝাইতে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন অর্থাৎ অন্তর্দশা প্রাপ্তি করিলেন। তত্রত্য বৈষ্ণবগণ তাঁহার সমাধি-ভঙ্গের জন্য বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তনাদি করিলেন, কিন্তু তাঁহার আর চৈতন্য হইল না। অপরাহ্নে দেহত্যাগ হইয়া গেল !! ঐ দিন—অগ্রহায়ণী শুক্লাষ্টমী। অদ্যাপি ঐ তিথিতে সূর্য্যকুণ্ডে তাঁহার সমাধিস্থানে বিরহোৎসব হইয়া থাকে।

ব্রজবাসী বিহারী দাসজি কিন্তু অন্যরূপ বলিয়াছেন। সূর্য্যকুণ্ডের বাবা একবার কার্ত্তিকমাসে বলিলেন—ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। একথা শুনিয়া তত্রত্য ব্রজমায়ীরা বলিলেন—'বেশ, আপনি বাংলায় পাঠ করুন, কিন্তু আমাদিগকে ব্রজভাষায় বুঝাইয়া দিন।' রাস-পঞ্চাধ্যায়ী তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকুণ্ডবাসী জনৈক ডোমের ছেলে প্রত্যহ সিদ্ধ বাবার পাঠ শুনিতে আসিত। তাহা দেখিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিত। পাঠ যে দিন পূর্ণ হইবে, সেই দিন সেই ছেলেটী সিদ্ধ বাবার কোলের উপর বসিয়া পাঠ শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল—'বাবাজি! শ্রীকৃষ্ণ রাস করিয়া কোথায় বিশ্রাম করিল? সেবাকুঞ্জে, না সঙ্কেত বনে?' তাহার পর বোমের মত শব্দ হইয়া বাবাজি মহারাজের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণ চলিয়া গেল। সকলে বলিল—'বাবার ভাব হইয়াছে।' তখন তিনি হেলিয়া পড়িলেন—পরে সেইস্থানে সমাধি দেওয়া হয়। অদ্যাপিও সূর্য্যকুণ্ডে সেই সমাধি আছে। *

---

* নবদ্বীপবাসী শ্রীসনাতন-দাস কর্ত্তৃক লিখিত কাহিনী।

সূর্যকুণ্ডের শ্রীসিদ্ধ মধুসূদন দাস বাবাজি মহারাজের স্বহস্ত-লিখিত পত্রের অবিকল প্রতিলিপি।*

শ্রীহরিঃ। পরমপূজনীয় শ্রীগৌরাঙ্গচরণারবিন্দ-ভক্তিসমুদ্রবিহারি-সংশয়-নিরসন-পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজিউ মহাশয় শ্রীচরণেষু॥

ভৃত্যাভ্যাস সংশয়ব্যাপ্ত শ্রীমধুসূদন দাসস্য প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদমিতি বিশেষঃ পরঞ্চ—আপনকার চরণ-কৃপাতে অত্রানন্দ, আপনকার চরণ-কৃপাতে শ্রীসূর্যকুণ্ড তীরে পড়িয়া আছি মাত্র—ভজন-সাধন কিছু জানি না—জে কিছু জানি সেও আপনকার কৃপাতে। আপনকার আজ্ঞা-প্রমাণ শ্রীসূর্য্যকুণ্ড তীরে পড়িয়া আছি—এই মাত্র। তাতে বিশেষ জিজ্ঞাসা করি—শ্রীনবদ্বীপধাম-ধ্যানপূজা কি প্রকার এবং স্মারসিকী মন্ত্রময়ী প্রকার কেমন হবে এবং পদ্ধতিকার লিখেছেন—শ্রীমহাপ্রভুর যোগপীঠ-ধ্যান পূজা এবং শ্রীনারায়ণ মন্দির-ধ্যানে লিখেছেন এবং যোগপীঠেতে শ্রীগুরুধ্যান পূজা লিখেছেন এবং শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ধ্যান পূজা লিখেছেন এবং সাধকের ধ্যান লিখেছেন। শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলা আপনকার কৃপাতে 'প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে আপনকার বর্ণনে পাইয়াছি। তাহাতে মন্ত্রময়ী স্মারসিকী কি প্রকার করিতে হবে। তাতে ভিন্ন ভিন্ন করিতে হবে কি মিলিয়ে করিতে হবে—ইতি এক সন্দেহ। শ্রীশচীমাতার ঘরে ভক্তবৃন্দ সহিত যখন শ্রীমহাপ্রভু ভোজন করেন, নারায়ণের প্রসাদ ভোজন করেন কি আমানিয়া করেন—ইতি সন্দেহ। এবং পূজার সময়ে বসাবার প্রকার কেমন হবে—কেউ বলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দক্ষিণে শ্রঅদ্বৈতপ্রভু, কেউ বলেন শ্রীমহাপ্রভুর

---

* শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীল যদুনন্দন দাসজির নিকট প্রাপ্ত।

বামে ইতি সন্দেহ। এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত কুত্র বসিবেন—কেউ বলেন গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর বামভাগে এবং শ্রীবাস পণ্ডিত অদ্বৈতপ্রভুর দক্ষিণে, কেউ বলেন গদাধর পণ্ডিতের বামে—এ এক সন্দেহ। এবং শ্রীশচীজগন্নাথমিশ্র-পূজাতে কি প্রকার আমানিয়াতে কি নারায়ণের প্রসাদে পূজা হবে—ইতি সন্দেহ। এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ পূজা আমানিয়াতে কি প্রসাদিতে পূজা হবে কি মহাপ্রভুর প্রসাদিতে হবে—ইতি সন্দেহ। এবং সাধকদেহ ধ্যান কি ওর সিদ্ধ-দেহধ্যান তামে এই বৈরাগ্যস্বরূপ ওর কী স্বরূপ—ইতি সন্দেহ। এবং শ্রীরূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামী এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যাদিক ঞিহাদের ধ্যান শ্রীনবদ্বীপে কি ওর স্থানান্তর—ইতি সন্দেহ। এবং শ্রীছয়-গোস্বামীর ধ্যান বৈরাগ্যস্বরূপ কি ওর—ইতি সমূহ সন্দেহ-সমুদ্রে পড়িয়াছি—তাহাতে আপনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন ইতি। আমি অপরাধী ভজনসাধনহীন অধম জীব, আপনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিবেন। এহাতে উপেক্ষা করিবেন্না—আপনকার চরণ-কৃপা বিনা ওর গতি নাঞি—এবং সন্দেহনিবারণকর্ত্তা এ সময়ে আওর কেউ নাঞি। আপনকার চরণদর্শনে জাবার মন হয়—তবু জাইতে পারি না কেনে পারি না রোগগ্রস্ত দেহ (ঘোট্ দুখ?) ভবরোগ দেহরোগ আধিব্যাধি অনেক রোগ লাগিয়াছে। এতদ্বিবিধসমুদ্রো-দ্ধার তবে হয় যদি আপনকার শ্রীমুখকমলবাক্য এবং আপনকার হস্তাক্ষর প্রাপ্তি হয়। আপনকার আগমন এবং আমার গমন দুই অসম্ভব। এতদর্থ চিন্তাব্যাপ্ত হইয়াছি। এবং আপনি পরম দয়ালু… সহিষ্ণু, অবশ্য সন্দেহভঞ্জন জাতে হয় তাহা করিবেন ইতি। এবং শ্রীমহাপ্রভুর মন্ত্র আছে কি নাঞি, কেউ বোলে মহাপ্রভুর মন্ত্রে কাজ কী, কৃষ্ণমন্ত্রতে সব হয়—এই প্রকার সন্দেহ অনেক। আপন-কার জেমত সেই মত আমার বিশ্বাস, অন্য মত আমার বিশ্বাস

নাক্রি—তাতে আপনি যেমন বলিবেন তাহাতেই আমার বিশ্বাস—এ পত্র আপনি কাউকে দেখাবেন্না স্নাবেন্না ইতি।

এবং শ্রীবৃন্দাবনধাম যোগপীঠধ্যান করিতে হবে কি নাহি—এহ এক সন্দেহ। ওর কাঁহাত লিখকে জানাউ, আপনি অন্তর্য্যামিরূপে সকল জানেন। এ সব সন্দেহ চিরকাল আমার হৃদয়ে বর্ত্তে, তাতে, আপনি কৃপা করে নিরস্ত করিবেন। আর যে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না জানি, তাহাও কৃপা করে নিজগুণে শিক্ষা দিবেন যাতে শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণ-সেবা আমাকে প্রাপ্তি হয়। আপনি বিজ্ঞ, সব তত্ত্ব জানেন—আমি অজ্ঞ কিছু জানি না। বিচার করে যথা কর্ত্তব্য তাই করিবেন ইতি অলমতিবিস্তরেণ। এই পত্র কাউকে দেখাবেন্না স্নাবেন্না। হরিবোল ! হরিবোল ॥ * ॥ * ॥

ইহার নিকট সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের একখানা পত্র।

শ্রীশ্রীমদ্রাধাগোবিন্দদেব-শ্রীমচ্চরণারবিন্দ-বিগলচ্চিন্মকরন্দ-মধুর-রসানন্দিত-চিত্তচঞ্চরীকেষু শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবর-শ্রীমধুসূদন-দাসাভিধেষু কৃষ্ণদাসের কৃতানন্তপ্রণতিততয়ঃ সন্তু—

অপরঞ্চ উদন্তস্তু ভাবয়া—আপনি পত্র লিখিয়াছেন—তা'তে অনেক প্রশ্ন আছে, তাহা বক্রমতে লিখিয়া পাঠাব। মন্ত্রময়ী উপাসনা হ্রদবৎ, স্বারসিকী স্রোতোবৎ। কালিন্দীর হ্রদ হয়, হ্রদের কালিন্দী নয়। তেমনি স্বারসিকীর অন্তর্ভূত মন্ত্রময়ী হয়। তথাপি দুই প্রকাশ নিত্য হয়। স্বারসিকী লীলা সবাই করে না। তা'র মন্ত্র-জপ-ধ্যান-পূজাবশ্যক যোগপীঠ হয়। যিনি স্বারসিকী লীলা স্মরণ করেন, তিনি রাধাকুণ্ড মিল করান। বনবিহার করিতে করিতে বৃন্দাবন-যোগপীঠে যাইয়া বসেন, সেখানে দুই প্রকাশ এক হইয়া যায়, তা'তে মন্ত্রজপাদি সকল হয়। এইমতে কৃষ্ণভাবনামৃতে লিখিয়াছেন, কিম্বা যেখানে মিলন হয়, সেই যোগপীঠ হয়। আর শ্রীনন্দ-শ্রীযশোদাদি পরিকর সব

ভগবৎপ্রসাদ খান। ইতি। আর সকল কথা সাক্ষাৎ হইলে কহিব। কিম্বা লিখিয়া এই মত পাঠাব। ইতি॥ * ॥

শ্রীল মনোহর দাস বাবাজি মহাশয় (শ্রীগোবিন্দকুণ্ড) *

নদীয়া জেলার মাধবপুর নামক গ্রামে ১২৫৪ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীভোলানাথ অধিকারী মহাশয়ের ঔরসে ও শ্রীপ্যারী সুন্দরীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। পূর্ব্বাশ্রমে নাম ছিল—মহেন্দ্র। শিশুকালে মাতৃদেবী পরলোকগত হন—ছয় বর্ষকালে স্বপ্নে দেখিলেন যে জনৈক সাধু আসিয়া তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া বনে লইয়া যান এবং ঐ বনের চারিধারে আগুন ধরাইয়া দেন—এই স্বপ্ন তাঁহার সংসারধর্ম্মে বিরক্তি আনয়ন করায়। তের বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে এবং সাংসারিক কার্যে ইঁহার অমনোযোগ প্রকাশ পাইলে ইনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিরক্তিভাজন হইয়া নদীয়া জিলার শিমুলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী মাসীমাতার আশ্রয়ে আসেন। এস্থানে তিনি শ্রীঅদ্বৈত-বংশ্য শ্রীপাদ নন্দকিশোর গোস্বামি-মহোদয়ের নিকট দীক্ষিত হইলেন। শিমুলিয়া গ্রামের আখড়ায় মোহান্তজির অভাব হইলে ইনি শ্রীল প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজির নিকট বেশাশ্রয় করত অম্বিকাদাস নাম গ্রহণপূর্ব্বক তিন বৎসর ঐ আখড়ায় সেবা চালাইয়াছেন। আশৈশব বিদ্যাশিক্ষার প্রবণতা থাকায় ইনি জনৈক বৈষ্ণবের প্রেরণায় নবদ্বীপে বড় আখড়ায় যাইয়া দুই বৎসর কাল শ্রীল বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন প্রভৃতির নিকট অধ্যয়ন করেন। তৎপরে রামকেলি, গয়েশপুর, কেন্দুবিল্ব, ময়নাডাল প্রভৃতি দর্শন করিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। বড় আখড়ায় শ্রীরূপ

* 'আমার গুরুদেব' গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে।

দাস বাবাজি মহাশয় ইঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন এবং তিনি পুনরায় ইঁহার ভেক সংস্কার করিয়া 'মনোহর দাস' নাম রাখেন। এই বড় আখড়ায় পণ্ডিত শ্রীনরোত্তম দাস বাবাজি মহারাজের সঙ্গে ইনি সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবার নিকট যাইয়া উভয়ের শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিতেন—আর একবার তিনি কালনায় গিয়া সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবারও দর্শন করিলেন। অতঃপর ইনি কিছুদিন কলিকাতা কম্বুলিয়া টোলার আখড়ায় ছিলেন, চারি বৎসর পরে আবার পাঠ্যগ্রন্থ সংগ্রহার্থ পদব্রজে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

১২৮৬—৮৭ সালে ইনি বৈশাখ মাসে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনে বহির্গত হইয়া কাঁটাপুকুর গ্রামের আখড়ায় কয়েক মাস থাকিয়া গোপীবল্লভপুর, রেমুণা প্রভৃতি দর্শন করত কার্ত্তিক মাসে শ্রীক্ষেত্রে গঙ্গামাতার মঠে উপস্থিত হইলেন। দর্শনাদি করত পুনরায় রেমুণায় আসিয়া ৫।৬ মাস অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলেন। শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া ইনি বড় আখড়ার মহান্তের চেলা শ্রীরাধাচরণ দাসজির বিশেষ অনুরোধসত্ত্বেও আকুল উৎকণ্ঠাভরে ১২৮৮ সালে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন—মেমারী ষ্টেশনে আসিয়া অত্যন্ত অসুস্থ হইলে জনৈক দাতার অর্থে রেলপথেই শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। ইনি শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের পূর্ব্বতন কামদার শ্রীগুরুচরণ দাসজির প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরমন্দিরে পাঁচ বৎসর বাস করিয়া তত্রত্য সেবাদি চালনা করেন। এস্থানে থাকিয়া তিনি শ্রীরাধারমণ-সেবায়েত শ্রীপাদ গোপীলাল গোস্বামিপ্রভুর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে ঝাড়ুমণ্ডলের সিদ্ধ শ্রীবলরাম বাবা, কালীদহের সিদ্ধ শ্রীজগদীশ বাবা এবং মদনমোহন ঠৌরে সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবা প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিলেন।

তৎপরে ইনি শ্রীগুরুচরণ দাসজির অনুমতি লইয়া ভজন করিবার

জন্য কুসুমসরোবরে আসিলেন—তৎকালে সিদ্ধ দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা গোবর্দ্ধনে ও শ্রীহরিগোপাল দাসজি সূর্য্যকুণ্ডে প্রকট ছিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্ভুজ পণ্ডিত এই সময়ে ইঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন। এস্থানে পাঁচ বৎসর বাস করিয়া ইনি শ্রীল রামকৃষ্ণ পণ্ডিত বাবাজি প্রভৃতি সহ ব্রজ-পরিক্রমায় যাইয়া আদি-বদরীর নির্জন প্রদেশে ভজন-স্থান নিরূপণ করিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানগণের অত্যাচার-ভয়ে কাম্যবনে ও পরে নন্দগ্রামে আসিলেন। তখন ভাদাবলীর শ্রীল গোপাল দাস বাবাজি-প্রমুখ বৈষ্ণবগণের অনুরোধে ইনি একবৎসর কাল ভাদাবলীতে থাকিয়া ষট্সন্দর্ভ পাঠ করিলেন। তৎপরে ইনি গিরিরাজ-তটবর্ত্তী গোবিন্দকুণ্ডে আসিয়া স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া আনুমানিক ১৩০০ সালে চিরকালের জন্য বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে শ্রীগোপাল দাসজি ও আনোর গ্রামের রামস্বরূপ মিশ্র প্রভৃতি ইঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন। মহারাজজি মাধুকরীদ্বারা জীবিকার্জন করিতেছিলেন—তৎপরে আটা ভিক্ষা করিতেন। রামস্বরূপ মিশ্র বল্লভকুলীয় গোস্বামিদের পুরোহিত হইয়াও ইঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইলে গ্রামে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে তত্রত্য মণিরাম বৈশ্য প্রভৃতিও ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

মহারাজজি নিরন্তর হরিনাম করিতেন, অষ্টকালীয় লীলাস্মরণে সর্ব্বদা আবিষ্ট থাকিতেন—নিদ্রা ছিল অতি অল্প, বিছানাপত্র নাই বলিলেই হয়, কথাবার্ত্তাও খুবই কম বলিতেন। নির্জ্জন বটবৃক্ষের ছায়ায় ভজনকুটীরেই সর্ব্বসময় কাটিয়া যাইত। **বৈদগ্ধীবিলাস** ও **নামরত্নমালা** গ্রন্থদ্বয় এই কালেই ইনি রচনা করেন।

ইঁহার কিছুকাল পরে বায়ু প্রকুপিত হইয়া ইনি এক বৎসরকাল অসুস্থ ছিলেন; সুস্থতালাভ করিলে দেখা গেল যে ইঁহার স্বভাব-

পরিবর্ত্তন হইয়াছে—হৃদয় সুকোমল হইয়াছে—কাহারও কষ্ট সহিতে পারেন না—রীতিমত মালাজপ ত্যাগ করিয়াছেন—তিলকস্বরূপও প্রত্যহ করেন না। বাগিচাতে বানর ও শকুনের উৎপাতে ইনি ১৯১৫ ইং সালে এক গোফা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বাস করেন—১৯১৭ সালে এক মন্দির নির্ম্মাণ করত শ্রীমদনমোহনের সেবা প্রকাশ করেন—১৯১৮ সালে জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশীতে ৺ঠাকুরের সিংহাসন-যাত্রা উপলক্ষে ব্রজ চৌরাশি ক্রোশের বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ইনি এক বিরাট উৎসব করেন। এই সময় রুটি ও নিম পাতার রসা ঠাকুরভোগে লাগিত—তৎপরে শ্রীঅনন্ত দাসজি প্রভৃতি আসিলে অন্নাদি ভোগ আরম্ভ হইল। ১৯৩৬ সালে সিংহাসন-যাত্রা উপলক্ষে ইনি আবার বিরাট উৎসব করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে আবার বায়ুরোগে পীড়িত হইয়া ইনি পুনরায় স্বভাব পরিবর্ত্তন করিলেন—নিরন্তর দাহ, দুঃখ ও অনুতাপে, দৈন্য, নৈরাশ ও আর্ত্তিতে ইনি সদাকালের জন্য অস্থির হইলেন। শিষ্য করিবার কথা হইলে অস্থির হন—যাহাকে দেখেন তাহাকেই দণ্ডবৎ করেন—নিত্যকাল আত্মনিন্দা করিতেন—সর্ব্ববিষয়ে স্পৃহাবিরহিত হইলেন—মন্দিরের সেবাদি-পরিচালনাদিতেও ইনি উদাসীন রহিলেন। নিশ্চিন্ত মনে একাকী দিন যাপন করেন—লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন—সামান্য একটু দুগ্ধমাত্র পান করত দেহরক্ষা করিতেন—বাংলা ১৩৫৪ সালে শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে অপ্রকট লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

মহারাজ কাহাকেও চরণে হাত দিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না—চরণে জল দিয়া তাহা আবার চরণদ্বারা ঘসিয়া রজে মিশাইয়া দিতেন, পাছে কেহ মুখে তুলিয়া দেয়। তিনি মশারি ব্যবহার করেন নাই—তিনি বলিতেন 'মশা বন্ধুর কার্য্য করে, বেশী নিদ্রা যাইতে দেয় না'। একবার ব্রজে দারুণ শীত পড়িয়াছিল—ললিতা

কুণ্ডের উপর বরফ ভাসিতেছিল—মহারাজজির গাত্রাবরণ একটি ছিন্ন কন্থা ছিল—রাত্রিতে বসিয়া ভজন করিতে করিতে দেহ কাঁপিতেছিল, ভজনে নিবিষ্টতা হইতেছে না দেখিয়া তাঁহার দেহের উপর ক্রোধ আসিল এবং বাহির হইয়া কুণ্ডের বরফজলে খুব স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। শ্রীল নবদ্বীপ দাসজি গভীর রাত্রে স্নানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'দেহ বড় পোষাকি হইয়াছে।' রেজাই বা লেপ দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—'বৈরাগীর তুলা ব্যবহার করিতে নাই।'

জনৈক বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—'ভজনের বিঘ্ন কিসে যায়?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন—'প্রাণপণে ভজনের চেষ্টা করিলে, সরল ঐকান্তিক চেষ্টা দেখিয়া পরমাত্মার কৃপা হয় এবং তিনি ভজনের দরজা খুলিয়া দেন। বিঘ্ন সব ভজন করিতে করিতে ক্রমশঃ অন্তর্ধান করে—একদিনে হয় না। ভজনে যেমন দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা চাই, তৈমনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। ভজনের উপযুক্ত অবস্থায় চিত্তকে রাখা বড়ই কঠিন। জড় বস্তুতে আসক্তি না গেলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না; চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ভক্তি হয় না; আর ভক্তি না হইলে চিদ্বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। ভজন-প্রভাবে জড়ীয় সংস্কার যতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, চিত্ত ততই নির্মল হইবে এবং বিঘ্নও ক্রমে চলিয়া যাইবে।'

শ্রীমাধবদাস বাবাজি মহাশয় (শ্রীবৃন্দাবন)

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের স্মৃতি-বিজড়িত রামকেলি গ্রামের অনতিদূরে মহানন্দা নদী আসিয়া পদ্মায় মিলিত হইয়াছে, তাহার এক পারে নবাবগঞ্জ সহর ও অপর পারে বারঘরিয়া গ্রাম। শ্রীমাধবদাসজি ১২৬৪ বঙ্গাব্দে বারঘরিয়ার জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, জননীর একমাত্র পুত্র বলিয়া লেখাপড়া শিক্ষা-বিষয়ে

বিশেষ সুবিধা হয় নাই। অল্প বয়সে ইনি সাধারণ হিসাব-পত্রাদি লেখার অভ্যাস করত মোটামুটি জীবিকার্জনের পন্থাবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপসনাতনের প্রভাবে মালদহ অঞ্চলে বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক হইলেও বিশুদ্ধ-মতাবলম্বী বৈষ্ণব আশানুরূপ ছিল না। বাবাজি মহাশয় নিজে অধিক লেখাপড়া না জানিলেও ভক্তিগ্রন্থপাঠে ও সৎসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনে সুখ পাইতেন। ভক্তসঙ্গে ক্রমশঃ ইঁহার ভজন করিবার জন্য তীব্র পিপাসা জাগিতে লাগিল এবং ২৭ বৎসর বয়সে অজাতপুত্রা পরমপ্রীতিময়ী পত্নীর নিকট হইতে পরোক্ষে চিরবিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করত শৃঙ্গারবটস্থ শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিলেন। ব্রজে আসিয়া তিনি মাধুকরী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত নিশ্চিন্ত মনে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ও গ্রন্থাদি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। বাল্যাবধি প্রীতিময় স্বভাব ছিল বলিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সহিত সহজেই প্রীতিবদ্ধ হইতেন। গুরুস্থানে মাতাগোস্বামিনীরা ইঁহাকে তাঁহাদের একটি বিধবা কন্যা বলিয়া মনে করিতেন এবং নিসকড়ী রন্ধনাদিতে ইঁহাকে সঙ্গে রাখিয়া রন্ধনাদি শিখাইতেন।

শ্রীবৃন্দাবনের নানাস্থানে দিন কতক বাস করিয়া পরে ব্রজের গ্রামে যাইতে ইচ্ছা লইয়া ইনি শ্রীগুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলে প্রভু আদেশ করিলেন—'ভালই যাও, কিন্তু ভজনানন্দ-নাম প্রকাশ করিও না।' ইহার পর তিনি শ্রীবৃন্দাবনের সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহাশয়ের শিষ্য শ্রীজগদানন্দ দাসজির সহিত কিছুদিন সঙ্কেত-বটে ও কিছুদিন বর্ষাণে ভানুকুণ্ডতীরে বাস করিয়াছিলেন। উভয়ই পৃথকভাবে মাধুকরী করিতেন এবং রাত্রিতে ভজনকুটীরের বাহিরে বসিয়া দুইজনে ভোজন করিতেন। বাবাজি মহাশয় একদিন বলিলেন— 'মাঠার সঙ্গে একটু নুন হইলে ভাল হয়, একটু নুন না হয় চাহিয়া

আনিব।' শ্রীজগদানন্দজি বলিলেন—'নুন আনিও না, নুন আনিলে গুড় চাহিতে মনে হইবে। খাইতে খাইতে বিনা নুনেই ভাল লাগিবে।' কোন একদিন গ্রামে এক উৎসবে বাবাজি মহাশয় ভোজন করিয়া আসিলেন—শ্রীজগদানন্দজি জিজ্ঞাসা করিলেন—'গ্রাম এখান হইতে কত দূরে?' উত্তর—'দুই ক্রোশ।' প্রশ্ন—'কয়খানা মালপোয়া খাইলে?' উত্তর—'আটখানা।' প্রশ্ন—'এখন শরীর কেমন লাগিতেছে?' উত্তর—'শরীর পরিশ্রান্ত হইয়া এখন অলস হইয়াছে।' শ্রীজগদানন্দজি—'তবে এখানে বনে কেন কষ্ট করিয়া পড়িয়া আছ? শ্রীবৃন্দাবনে থাকিলে ত কাছে কাছে অনেক মালপোয়া লাড্ডু কচুরীর উৎসব খাইতে পারিতে!!' বাবাজি মহাশয় শ্রীজগদানন্দজির মন বুঝিয়া উৎসবাদিতে যাওয়া বন্ধ করিলেন। পরে তাঁহার সঙ্গে কিছু দিন বর্ষাণে ও তৎপরে কাম্যবনে ছিলেন। কাম্যবনে বিমলা কুণ্ডের উপরে সিদ্ধবাবার আস্থানের অনতিদূরে ইনি এক কুটিরে অনেক দিন ছিলেন। সেই সময়ে একদিন 'ভজন করিতে পারিলাম না'—বলিয়া মনে নির্ব্বেদ আসায় তিনি মাধুকরীতে না যাইয়া গা ঢাকা দিয়া শুইয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে একটি কিশোরী ব্রাহ্মণ-বালিকা অনেক প্রকার খাবার লইয়া আসিয়া দরজায় ডাকিতে লাগিলেন—বাবাজি মহাশয় দরজা খুলিয়া দিলে বালিকা খাবার সাম্‌নে রাখিয়া বলিলেন—'তু আজ মাধুকরীমে নেহি গয়ে? মাইয়ানে তেরে তাঁই এই থানেকো ভেজ্ দিয়া।' বাবাজি মহারাজ সোজাসুজি মনে করিলেন—মাধুকরীর রুটির সঙ্গে পুরি কচুরী পক্বান্ন থাকিলে ব্রজবাসী ব্রাহ্মণেরা তাহা খান, তদনুসারে বালিকাকেও পুরি খাইতে অনুরোধ করিলেন। বালিকা বলিলেন—'মে ত বাণিয়াকো ঘরমে ক্ষীর রোটী জেঁকে আয়ী, পেট ফাট্ জাতা হায়, মে জাতা হুঁ।' এই বলিয়া বালিকা চলিয়া গেলেন। বাণিয়ার ঘরে ব্রাহ্মণেরা ক্ষীর রোটি খান না—

একথা তাঁহার জানা থাকিলেও তৎকালে রহস্যানুসন্ধানের স্পৃহা তাঁহার আসে নাই। তাঁহার প্রতি যে শ্রীরাধারাণীর করুণা আছে —ইহাই মনে করিয়া সেই প্রসাদ পাইলেন। অনেকদিন পরে এই ঘটনাটি মনে করিয়া তিনি কৃপাই অনুভব করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি সিদ্ধ শ্রীজয়কৃষ্ণদাস বাবার সেবিত শ্রীশ্রীমদন-গোপালের মন্দিরের মহান্ত শ্রীধর্মদাস বাবাজির নিকটে ছিলেন। মাঝে মাঝে ব্রজের অন্যান্য গ্রামে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সমাজ-সেবায়, লোটন কুঞ্জের ঠৌরে এবং ঝাড়ুমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। তাহাতে সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ বাবা ও শ্রীল শিরোমণি মহাশয়দের সঙ্গলাভও হইয়াছিল। ঝাড়ুমণ্ডলে বাসকালে একদিন তাঁহার মনে হইল—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ব্রজের কাঙ্গাল বৈষ্ণব-গণকে ত প্রতিপালন করেন। আমি দেখি, আজ মাধুকরী করিতে কাহারও বাড়ীতে যাইব না, রাস্তায় যাইতে যাহা পাই, তাহাই নিব।' প্রতিদিন যে সব বাড়ীতে মাধুকরী আনিতে যাইতেন, সেইসব জায়গায় রাস্তা দিয়া তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কাহারও বাড়ীতে ঢুকিলেন না। যখন শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সমাজের দরজায় আসিলেন, তখন সমাজ-সেবক শ্রীমথুরদাস বাবাজি মহাশয় দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিলেন—'মাধব দাস! মাধুকরীতে যাইতেছ? যেও না, ভিতরে এসো। আমায় জ্বর হইয়াছে, পুরি তরকারী ধরা আছে, ঠাকুরের ভোগ দিয়া সমাজের ভোগ দাও এবং তুমিই প্রসাদ পাও।' [বলা বাহুল্য তিনি শ্রীমথুরাদাসজির অধীনে বহুদিন ঐ সমাজসেবা করিয়া তাঁহার স্নেহবিশেষ লাভ করিয়াছিলেন।] বাবাজি মহাশয় তাহাই করিলেন এবং শ্রীশ্রীসনাতন প্রভুর কৃপা স্মরণ করিয়া উল্লসিত হইলেন।

বর্ষাণে বাসকালে ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দাস পণ্ডিত বাবাজি এবং

শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজি মহাশয়ের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। নিম্বার্কসম্প্রদায়ী শ্রীহংসদাস বাবাজি মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গে বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন ও বিলাসগড়ে বাস করিয়া ভজন করিতেন। তাঁহারা পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীও গোবর্দ্ধনে থাকিয়া ভজন করিতেন। তিনি অত্যন্ত পীড়িতা হইলে তাঁহাকে ইনি স্ব-নিকটবর্ত্তী কুটীরে আনাইয়া নিজতত্ত্বাবধানে রাখিয়া একটি সেবিকাদ্বারা শুশ্রূষা করাইতে লাগিলেন। শ্রীহংসদাসজি সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ বাবা ও শ্রীশিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গ করিতেন—এই সম্বন্ধেই তাঁহার সহিত ইঁহার প্রিয়তা হয়, তাঁহার পত্নীকেও যত্ন করিতেন এবং শ্রীভগবল্লীলা-কথাদি শুনাইতেন। ইঁহার একটি বিশিষ্ট স্বভাব এই ছিল যে যখন যেখানেই থাকুন না কেন, পাঠ কোনই দিন বাদ যাইত না।

যৎকালে ব্রজের গ্রামে ইঁহার যাতায়াত ছিল, সেই সময়ে একবার তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পত্নী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন শুনিয়া ইনি পরদিন অতিপ্রত্যুষে শ্রীগুরুদেবের চরণে আসিয়া ব্রজগ্রামে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রভু দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ এত প্রত্যূষে কেন?' তিনি উত্তর দিলেন—'বনের গ্রামে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।' প্রভু—'কেন? ধর্ম্মপত্নী এখানে আসিয়াছেন বলিয়া; তাহাতে তোমার কি? তুমি কি তাঁহাকে মাধুকরী করিয়া খাওয়াইবে? তাঁহার মত তিনি ভজন করিবেন, তোমার মত তুমি ভজন করিবে। এখান হইতে যাইবে কেন?, বাবাজি মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনেই থাকিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী কিছুদিন ব্রজে বাস করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন।

ইনি যখন কাম্যবনে সিদ্ধবাবার ঠাকুর-বাড়ীতে ছিলেন, তখন ব্রজের প্রায় সকল বৈষ্ণবের নিকটই পরিচিত হইয়াছিলেন; শ্রীবৃন্দাবনের বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সিদ্ধ বাবার আস্থানের মহান্ত করিলেন—ইঁহার কিন্তু ভজন-স্পৃহা প্রবল, বন্ধনে পড়িবেন না বলিয়া

তাঁহার দৃঢ় সংকল্প ছিল, কাজেই মহাত্মা বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া কয়েকদিনের জন্য মহান্তপদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

১২৯৯ সনের চৈত্রমাসে শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ইনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার মুখে হরিকথা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইলেন এবং প্রভুপাদও ইহার রসগ্রন্থ বুঝিবার প্রচুর শক্তি অনুভব করত এত প্রীতি করিলেন যে ইনি আর কোথাও যাইতে পারিলেন না। ইনি প্রভুপাদকে শিক্ষাগুরু বলিয়া মনে করিলেও কিন্তু প্রভুপাদ ইহাকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়াই জানিতেন। শ্রীগোপী-নাথের মন্দিরে শ্রীরাধাবল্লভ গোস্বামিজিও প্রভুপাদের উত্তম শ্রোতঃ ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রভুপাদের বাড়ীতে ইঁহারা তিন জন একত্র হইয়া হরিকথাপ্রসঙ্গে যে উচ্চ হাস্য করিতেন, তাহাতে সমস্ত বাড়ী যেন ভরিয়া যাইত এবং তাহাতে কত সময় অতিবাহিত হইত, তাহাও তাঁহাদের অনুভব থাকিত না।

১৩০১ সনে তাড়াসের জমিদার রাজর্ষি বনমালি রায় বাহাদুর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামিজির সহিত মিলিত হইলে শ্রীমাধব দাসজিরও তাঁহার সহিত হৃদ্যতা হইল— একপ্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন ইনি গোপালকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভুর সমাজবাড়ীর ঠৌরে থাকিতেন। দুইজনে প্রায় ২০।২১ বৎসর একত্র ছিলেন—ইনি কখনও রাজর্ষি বাহাদুর হইতে অর্থসাহায্য বা বস্ত্রাদি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। শ্রীল রাজর্ষি বাহাদুর যখন ১৩০২ সনে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীমাধব দাসজিকে ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান। কালীদহের সিদ্ধ শ্রীজগদীশ বাবাও ইঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন। শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজি মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে ইঁহার প্রীতিতে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীরাম

দাস বাবাজি মহাশয় প্রভৃতিও ইহাকে গুরুবুদ্ধি করিতেছেন। শ্রীকুণ্ডে থাকিলে শ্রীল রাধিকানাথ প্রভুপাদের সঙ্গসুখে বঞ্চিত হইতে হয় দেখিয়া রাজর্ষি বাহাদুর শ্রীবৃন্দাবনে মন্দির করিয়া পুনরায় ১৩১১ সনে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। ১৩১২ সনের প্লেগে শ্রীপ্রভুপাদ ও রাজর্ষি বাহাদুর শ্রীগৌড়মণ্ডলে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন—কিন্তু শ্রীমাধব দাসজি শ্রীবৃন্দাবনেরই আশ্রয়ে রহিলেন।

১৩০২ সনে ইনি যখন শ্রীকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শ্রীগুরুদেব অসুস্থ হইয়া আগ্রায় রায় বাহাদুর নবীন ডাক্তারের বাসায় গিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া বাবাজি মহাশয়ও আগরায় চলিয়া যান। তাঁহাকে পাইয়া প্রভুপাদ ও মাতা গোস্বামিনীগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ইনি প্রভুপাদের সকল পরিচর্য্যাই করিতেন—কোন দিন প্রভুপাদ তদীয় গুরুপত্নী মাতা গোস্বামিনীকেও বলিলেন—'বড় মা, আপনার এই মেজ গোস্বামিনী আমার মলমূত্র স্পর্শ করিলে আমার মন সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু মাধবদাস এই সব কাজ করিলে আদৌ সঙ্কোচ হয় না'। একদিন ডাক্তার নবীন বাবুর স্ত্রী একটু লাউয়ের তরকারী রান্না করিয়া প্রভুকে দিতে আনিয়াছেন—বড়মা গোস্বামিনী বলিলেন—'গোসাই! বৌমা তোমার জন্য লাউয়ের তরকারী আনিয়াছেন।' প্রভু অমনি শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'বৌমা তরকারী আনিয়াছেন তা আপনি নেন।' তখন প্রভু প্রসাদ পাইতেছিলেন—মা গোস্বামিনী তরকারী হাতে লইয়া প্রভুকে পরিবেশন করিলেন। প্রভু ঐ তরকারী পাইলেন দেখিয়া নবীন বাবুর স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন। শ্রীমাধবদাসজি এই ব্যাপারে মনে করিতেছিলেন—'ইহাদের কোন সদাচার নাই। প্রভু ইহাদের হাতের তরকারি কিরূপে খাইলেন?' মাতা গোস্বামিনীরাও ঐরূপই ভাবিতেছেন—তখন প্রভুপাদ বলিলেন—'বড় মা! আপনি যে জিনিষ হাতে

করিয়া নিয়াছেন, তাহা কি আর অপবিত্র আছে ?' এ কথার সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। এই ঘটনাটি কোন সময়ে কালীদহের সিদ্ধ শ্রীজগদীশ বাবার নিকট উত্থাপিত করা হইয়াছিল—তাহাতে সিদ্ধ বাবা বলিয়াছিলেন—'যাঁহাদের চরণস্পৃষ্ট জল চরণামৃত বলিয়া গ্রহণ করিলে পবিত্র হইলাম বলিয়া মনে করা যায়, তাঁহাদের হস্তস্পৃষ্ট ব্যঞ্জনাদি যে পবিত্র হইবে, ইহাতে বিচারের কিছুই নাই।' এই আগ্রাতেই অবস্থানকালে শ্রীরামনবমীর দিন প্রভুপাদ ইঁহাকে কোনও হিন্দুস্থানী সাধুর সেবিত শ্রীরামজির মন্দির হইতে অভিষেকের চরণামৃত আনিতে আদেশ করিয়া বলিলেন—'হিন্দুস্থানীদের মন্দিরে অনেক সময় শিবলিঙ্গ থাকেন, শিবলিঙ্গ থাকিলে চরণামৃত আনিও না।' তাৎপর্য্য—শ্রীশিবলিঙ্গের চরণামৃত গ্রহণের বিধান নাই।

একবার শৃঙ্গারবটে তাঁহার গুরুস্থানে বৈষ্ণবসেবা হইতেছে। তদীয় গুরু শ্রীপ্রেমানন্দ প্রভু ঠাকুরের জগমোহনে বৈষ্ণবগণের পাতা দিলেন। বাবাজি মহাশয় যে ঠৌরে থাকিতেন, তত্রত্য জনৈক বৈষ্ণব তাঁহার নামে একখানা পাতা চাহিয়া তাঁহার পাশে রাখিয়া ইঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইনি কোনও উত্তর দিলেন না। প্রভু প্রাঙ্গণে আসিয়া ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কোথায় বসিবে ?' ইনি উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই প্রভুপাদ 'এখানে বসিবে ?' বলিয়া ঠাকুরের ফুলমালা যোগানিয়া মালিনীর অনতিদূরে একখানি পাতা দিলেন। তিনি তথায় বসিলেন। তখন জগমোহনে উপবিষ্ট বৈষ্ণবগণ বারংবার বলিতে লাগিলেন—'ওখানে নীচে মালিনীর কাছে কেন বসিলে ? এখানে তোমার জন্য পাতা রাখা হইয়াছে।' ইনি বলিলেন—'প্রভু এখানেই দিয়াছেন।' প্রভুপাদ সব শুনিলেন, কিছুই বলিলেন না। তিনি 'এইভাবে চিরজীবন দৈন্যের যাজন করিয়াছেন—ইচ্ছা করিয়া কখনও বৈষ্ণবের পঙ্গতে (পংক্তিতে) বসিতেন না বা যাইতেন না।

বর্ষাণের অতি প্রাচীন শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজি মহাশয় বৈষ্ণবগণের প্রয়োজন হইতে পারে বিবেচনায় শিষ্যাদিদ্বারা সংগ্রহ করাইয়া শুক্তা পাতা, পুরাতন তেঁতুল ও গুড় প্রভৃতি জিনিষ রাখিতেন। ইনি যখন কাম্যবনে সিদ্ধ বাবার ঠাকুর-মন্দিরে থাকিতেন, তখন জনৈক বৈষ্ণব আমাশয়-রোগে পীড়িত হইয়া দুর্ব্বল ও শীর্ণদেহে তথায় আসিলেন। নবাগত বৈষ্ণবের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তিনি বুঝিলেন যে ঔষধপত্র সংগ্রহ করিতে তিনি অসমর্থ এবং শ্রীমাধবদাসজি যাহা খাইতে দিবেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন। ইনি আমাশয়ে শুক্তা পাতাই ভাল মনে করিয়া কাম্যবন হইতে বর্ষাণে গিয়া শ্রীজগন্নাথ বাবার নিকট হইতে শুক্তা পাতা আনিয়া বাটিয়া বাবাজি মহাশয়কে দিলেন এবং মাঠাসহ অন্ন-প্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। পীড়িত বৈষ্ণব ৩।৪ দিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া চলিয়া গেলেন। বর্ষাণে তিনি যে শ্রীজগদানন্দ বাবাজির নিকট থাকিতেন, তিনি 'একবার উৎকট রোগে পীড়িত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। রুটি হজম হইত না, দুইটি অন্ন ও একটু রসা রাঁধিয়া ভোগ দিয়া তাঁহাকে দিতে হইত—তাঁহার শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীমাধবদাসজি এই সেবা করিয়াছেন। তিনি যে ঠৌরে থাকিতেন, তত্রত্য এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়াছিলেন—তাঁহাকে কোলে করিয়া বাহিরে আনিয়া একবার মূত্র ত্যাগ করাইতে হইত এবং একবার রৌদ্রে আনিয়া বসাইতে হইত, মরিচজল প্রস্তুত রাখিয়া খাওয়াইয়া আবার ঘরে নিয়া শয়ন করাইতে হইত। ইনি অকাতরে এই বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা করিতেন। দেহ অশক্ত হইয়াছে, কিছু আহার করিলে মলমূত্রের চেষ্টা হইতে পারে—এই আশঙ্কায় বৃদ্ধ বৈষ্ণব কিছুই আহার করিতেন না; প্রায় দেড় মাস পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। শ্রীমাধবদাসজি পাদসম্বাহনাদি সেবাতেও নিপুণ ছিলেন এবং এই সেবা হইতেই বহু কৃপাও পাইয়াছিলেন।

১৩১৮ সনের বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীতে শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামি-প্রভু দেহরক্ষা করেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে কেয়ারিবনে (বর্ত্তমানে—যেস্থানে তাঁহার সমাধি-মন্দির আছে, তথায়) তিনি একটি নির্জ্জন ভজনকুটীর করিয়াছিলেন। ঐ স্থানটি রাজর্ষি বাহাদুরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী, তাঁহার সঙ্গে হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠীর অনুকূল হইবে—এই ভাবিয়াছিলেন; এ জন্য আবার শ্রীমাধব দাসজিও নিকটবর্ত্তী দিল্লীর বাগানে বাস করিতে লাগিলেন। বাহিরের যে সকল বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শ্রীবৃন্দাবনে আসিতেন, তাঁহারা প্রায়ই ঐ বাগানে অবস্থিতি করিতেন। এই সময়ে নারায়ণ মুনি নামে এক বড় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তথায় আসেন—সাধারণ সন্ন্যাসিরা ইঁহাকে খুবই মান্য করিত—ইনি প্রায়ই মৌন থাকিতেন। এখানকার কোন একজন বিশিষ্ট আচার্য্য-সন্তান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করিলেন বটে, কিন্তু নারায়ণ মুনি তাঁহার দিকে না তাকাইয়া কেবল 'নারায়ণ' উচ্চারণ করিলেন। শ্রীমাধব দাসজি সংস্কৃত না জানিলেও শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থ এত অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ-শ্রবণে এত পরিপক্বতা লাভ করিয়াছিলেন যে কোন নূতন পণ্ডিত তাঁহার সম্মুখে পাঠ করিতে সাধ্বস হইত। এই নারায়ণ মুনি বাবাজি মহাশয়ের পাঠে প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহার সহিত মিশিতে লাগিলেন। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া ইনিও তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অভিপ্রায় ও ভজনের রীতি বলিতে লাগিলেন। মুনি কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলা শিখিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত সমগ্র পাঠ করিলেন এবং বলিলেন—'উপাসনা ত ইহাই পরমোত্তম, কিন্তু কি করিব? আমার সংস্কার আমাকে বাধা দিতেছে।' বাবাজি মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া তিনি রাজর্ষি বাহাদুরের শ্রীশ্রীরাধা-

বিনোদ দর্শন করিলেন, প্রসাদ পাইলেন এবং রাজর্ষি বাহাদুরের প্রীতিপরিপাটিতে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—'এমন লোক আমি কখনও দেখি নাই।' যে দিন ঐ আচার্য্য-সন্তান দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তিনি চলিয়া গেলে শ্রীমাধব দাসজি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'উনি ত বিশিষ্ট লোক, আপনি উঁহার সঙ্গে সম্ভাষণ করিলেন না কেন?' মুনি বলিলেন—'এ ত দোকানদার, আমি ওর সঙ্গে কি কথা বলিব?' ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণানন্দ নামে আর এক সন্ন্যাসী বাবাজি মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে এখান-কার ব্রজবাসী কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। বাবাজি মহাশয়ের উপদেশে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িতে লাগিলেন—শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলেন—সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় বুঝিয়া গৈরিক বসন ত্যাগ করিলেন এবং বাবাজি মহাশয়ের প্রতি সর্ব্বদা গুরুবুদ্ধি রাখিয়া সখ্যরসে ভজন করিতে লাগিলেন। [ইনি আর্যসমাজী দয়ানন্দীদের মত খণ্ডন করত বহু শিষ্য করেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে বর্ত্তমান শ্রীরাম-দাস শাস্ত্রী প্রসিদ্ধ।]

মুঙ্গেরের রাজা শ্রীরঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহ ১৮।১৯ বৎসর বয়সে যখন কুমার সাহেব ছিলেন, তখন মহৎকৃপায় ভক্তি লাভ করত একবার ব্রজে আসেন। শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজি মহাশয়ের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল—ইঁহার সাহায্যে তিনি সিদ্ধ শ্রীজগদীশ বাবা, শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত বাবা, রাজর্ষি বাহাদুর, শ্রীদয়াল দাস বাবাজি মহাশয় এবং শ্রীমাধব দাসজির সহিত পরিচিত ও কৃপাভাজন হন। ক্রমে শ্রীল মাধব দাসজির সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল—

উত্তরকালে তিনি রাজা হইয়া একবার শ্রীবাবাজি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি বলিলেন—'রঘুনন্দন! আমি মরিলে আমার উৎসবের জন্য এই কামিনী বাবুরা তোমাকে ছাড়িবে না, টাকা চাহিবে; তুমি তখন কিছুই দিও না, এখন আমাকে কিছু বেশী করিয়া দাও, আমি পাঠকীর্ত্তন শুনি।" রাজা তখনই তাঁহাকে ৫০০৲ টাকার নোট দিয়া দিলেন। বাবাজি মহাশয় গোপীনাথবাগে গোপাল ছড়িদারের ঠৌরে প্রায় ১৮।১৯ বৎসর ছিলেন। প্রায় প্রত্যহই পাঠ বা কীর্ত্তন হইত। মুঙ্গেরের রাজা এখানে বহু উৎসব করিয়াছেন—অন্যান্য ভক্তগণ এবং বাবাজি মহাশয় নিজের উদ্যোগে এস্থানে বহু বহু উৎসব হইয়া স্থানটিকে যেন সিদ্ধপীঠ করিয়াছিল।

১৩৪০ সনে ১৮ই বৈশাখ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিপাদের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া গণেশ দাসের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে বহু গোস্বামী, বৈষ্ণব মহান্ত সজ্জনের সম্মুখে ইনি শ্রীবৃন্দাবন লাভ করেন।

শ্রীরাধাবল্লভ গোস্বামী মহাশয় (শ্রীবৃন্দাবন)

শ্রীশ্রীমধু পণ্ডিতের বংশধর। বাল্যকালেই ইঁহার পিতামাতার বিয়োগ হওয়ায় অধ্যয়নাদি বিশেষ কিছু হয় নাই, তবে স্বভাবে কোন প্রকার দোষ ছিল না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আত্মীয়গণের উপদেশে অর্থ-সংগ্রহের জন্য ইনি শিষ্যবাড়ীতে গেলেন। যে শিষ্যের বাড়ীতে প্রথমতঃ ইনি গেলেন- সে শিষ্যটি সেইদিন অন্যত্র ছিল—তাহার অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও শিশুপুত্রটিমাত্র বাড়ীতে আছে। বধূটি তাঁহার রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলে ইনি রন্ধন করিয়া আহার করিলেন এবং শিশুকেও প্রসাদ দিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া উঠার পর বধূটি ছেলেদ্বারা বলাইলেন—'প্রভু কিছু কৃষ্ণকথা বলুন।' প্রভু তখন

মহাবিপদে পড়িলেন—কৃষ্ণকথা কি তাহা ত তিনি জানেন না—শিষ্য বাড়ী যাইতে হয়, ভোজন করিতে হয়, প্রসাদ দিতে হয়, প্রণামী নিতে হয়—তিনি এইমাত্র জানেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'আগে যদি জানিতাম যে কৃষ্ণকথা বলিতে হইবে, তবে শিষ্যবাড়ীতে আসিতাম না।' যদিও সে দিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি শিষ্য বাড়ী নাই এই উপলক্ষে ইনি বিদায় লইয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন—'কৃষ্ণকথা না শিখিয়া আর কখনও শিষ্যবাড়ী আসিব না।' গোস্বামি-প্রভু বাড়ী ফিরিয়া কৃষ্ণকথার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি একমাত্র বংশধর হইলেও অকৃতদার হইয়াই গৃহত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। শ্রীমন্দির হইতে তাঁহার দুইবেলা আহার্য্য ও মাসিক এক টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। এই জন্য তাঁহাকে ভাণ্ডারের খাতাটি লিখিয়া দিতে হইত। প্রাতে নিত্যকৃত্য সমাধানের পর ইনি এক ঘণ্টা কাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা তজ্জাতীয় বাংলা গ্রন্থ প্রেমের সহিত পাঠ করিতেন। শ্রোতৃবর্গ তাঁহার মুখে পাঠ-শ্রবণে সুখ পাইতেন। কীর্ত্তন ও পাঠাদি-শ্রবণে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আনুষ্ঠানিক বৈরাগ্যাদি না করিলেও তাঁহার বৈরাগ্যের ব্যবহারই ছিল। বস্ত্রাদি কখনও তিনি কিনিয়া পরিতেন না, ভক্তগণ যে যাহা দিত, তাহাই ব্যবহার করিতেন। নিজে মন্দির হইতে বা পাঠে যদি কিছু পাইতেন, তৎসমস্তই পীড়িত বা দুঃস্থ বৈষ্ণবের সেবায় লাগাইয়া দিতেন—নিজে কিছুই রাখিতেন না। তাঁহার পদধূলি বা উচ্ছিষ্ট নেওয়ার কাহারও সাধ্য ছিল না।

১। কোনও বৈষ্ণব শেষরাত্রে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করিতেন। একদিন তিনি দেখিলেন—রাজপুরাগ্রামের নিকটে হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের ভোজন হইতেছে, তিনি দেখিয়া একটু দাঁড়াইলেন। কেহ আসিয়া

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভোজন করোগে?' বাবাজি—'ইস্ বকত্ ভোজন নেহি করুঙ্গে, দেও ত কুছ্ লে যাঁউ।' তিনি একখানি গামছায় কিছু প্রসাদ বাঁধিয়া লইয়া আসিলেন এবং নিজের কুটীরে রাখিয়া দিলেন। বেলায় গামছা খুজিয়া দেখিলেন যে তাহাতে খোলা খাপরা ভিন্ন আর কিছুই নাই। এ কথাটি বৈষ্ণবগণের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল এবং অনেকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে মাঝে মাঝে এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে; যাহাদের ধাম বা অন্যত্র কোন স্থানে অপরাধ থাকে, তাহাদের ধাম-ত্যাগ হয় না বটে, কিন্তু যথাযোগ্য সদ্‌গতি হয় না।

২। শ্রীবৃন্দাবনে ঝাড়ুমণ্ডলের বৈষ্ণব-ঠৌরে দুই মূর্ত্তি বৈষ্ণব বাস করিতেন। পরস্পরের হৃদ্যতা ছিল, এক মূর্ত্তির দেহত্যাগ হয়; অপর জন গ্রীষ্মকালের শেষ রাত্রে শ্রীরাধাকুণ্ডে রওনা হইয়াছেন—মেঘাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না রাত্রিতে তিনি মনে করিলেন যে রাত্রি ভোর হইয়াছে। পদব্রজে যাইতে দিল্লী সড়কের পূর্ব্বে জেত-নামক একটি গ্রাম পড়ে। তিনি ঐ সড়কের পশ্চিম দিকে দেখিলেন যে একটি সাধুর বড় জমায়েত পড়িয়াছে; ঠাকুর-সেবা হইতেছে, ঘড়ী ঘণ্টা বাজিতেছে। বাবাজি মহাশয়ের ধুমপানের অভ্যাস ছিল—কাহারও নিকট তামাক পাওয়া যাইবে ভাবিয়া তিনি জমায়েতের প্রবেশ-পথেই তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত বাবাজি মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাকে বিস্মিত ও ভীত দেখিয়া সেই বাবাজি বলিলেন—'তুমি ভীত হইও না; আমার দেহত্যাগ হইলেও অভীষ্ট স্থানে যাইতে পারি নাই। এই যত দেখিতেছ, সকলই এই রকম।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি ত অত নিষ্ঠার সহিত ভজন করিয়াছ, তোমার কেন বাধা পড়িল?' তখন ঐ বাবাজি বলিলেন—'আমি যে কুটীরে ভজন করিতাম, সে কুটীরের একটি তাকে দুটি টাকা

ইট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম। তদ্দ্বারা বৈষ্ণবসেবা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু করিতেও পারি নাই, কাহাকেও বলিতেও পারি নাই। এই বাসনার জন্য আটকাইয়া পড়িয়াছি; তুমি আজ আর শ্রীকুণ্ডে যাইও না, ফিরিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাও—টাকা দুটি সেখানে আছে, তদ্দ্বারা বৈষ্ণবসেবা করাইয়া আমাকে উদ্ধার কর। পরে শ্রীকুণ্ডে যাইও।' বাবাজি মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া ঐ টাকা দ্বারা বৈষ্ণব সেবা করাইলেন।

এই ঘটনা দুইটি গোস্বামিপ্রভু অনেককেই বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রাপ্তির সময় তাঁহার নিকট দুই টাকা দশ আনা ছিল; যখন বুঝিলেন যে দেহ আর টিকিবে না, তদ্দ্বারা বৈষ্ণবসেবা করাইয়া দিলেন।

শ্রীরাধারমণ ঘোষ ভাগবতভূষণ

ঢাকা কাগজিটোলা-নিবাসী পরম ভক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষ মহাফেজ মহোদয়ের পুত্র। ইনি যথাসময়ে বি. এ., পাশ করিয়া কিছুকাল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ষ্টেটের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। পরে ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমে ক্রমে যৌবনকালেই রাজ্যের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। মহারাজ বীরচন্দ্র পরম গৌরভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন—রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি অবসরমত সাধন ভজন করিতেন—সদাকালের জন্য তাঁহার সহিত ঘোষ মহাশয়কে থাকিতে হইত। ঘোষঠাকুর স্বয়ং বৈষ্ণব-তন্ত্রের লোক না হইলেও—বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবীয় দৈন্য প্রভৃতি রুচিকর না হইলেও—চাকুরির দায়ে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কিছু কিছু করিতে হইত। গুণমুগ্ধ মহারাজা ইহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন—যেহেতু ঘোষ

ঠাকুরের মত তাঁহার রাজসভায় তেমন সজ্জন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী কেহই ছিলেন না।

মহারাজা বীরচন্দ্র প্রায়ই শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেন এবং নিজ কুঞ্জে বাস করত বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতেন। ঘোষ মহাশয় তাঁহার সঙ্গেই থাকেন। একবার এস্থানে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া ঘোষমহাশয়কে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিবার সূচনা করে। একদিন মহারাজ নিজ কুঞ্জের দ্বিতল গৃহে পাত্রমিত্রাদি সহ বসিয়া আছেন—বারন্দায় ইতস্ততঃ দ্রব্যাদি রহিয়াছে—তাহার মধ্যে একখানা বহুমূল্য শালও ছিল। হঠাৎ একটি বানর আসিয়া শালখানা লইয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া উহাকে নষ্ট করিতে লাগিল। রাধারমণ বাবু প্রভৃতি সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উহা পুনঃ প্রাপ্তির বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন—মহারাজ কিন্তু স্থিরভাবে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া বানরের প্রতি তাকাইয়া মৃদু মধুর হাস্য সহকারে তাহার রঙ্গ দেখিতেছেন। বানর শালখানিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। মহারাজ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সকলি দেখিতেছেন—তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব প্রেমাশ্রুর অভিষেক হইতেছে। মহারাজের পাত্রমিত্রগণ সকলেই গিয়া গৃহে বসিলেন—কিন্তু মহারাজকে এবিষয়ে কিছু বলিতে কেহই সাহস করিলেন না। এই ব্যাপারে ঘোষমহাশয়ের মনে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল—অপরাহ্নে তিনি মহারাজার নিকট গিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আজকার এই বানরের কীর্ত্তিতে আমরা বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি! কিন্তু আপনি ত কিছুই বলিলেন না, অথচ এই দৃশ্য দেখিয়া আপনার মনে যেন একটা অপূর্ব্ব ভাবোদয় হইয়াছে; তাহার লক্ষণ সকল আপনার চোখে ও মুখে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই ভাবটি কি—তাহা আমাকে দয়া করিয়া বলুন!" মহারাজ সহাস্যবদনে বলিলেন—

"রাধারমণ! এই বানরটি আজ আমাকে একটি মহাশিক্ষা দিয়াছে। তজ্জন্য আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীবৃন্দাবনে নিষ্কিঞ্চন হইয়া আসিতে হয়; আমি বিষয়ী, বিষয়ের স্তূপ লইয়া এখানে আসিয়াছি—বহুমূল্য শালখানি তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র। সেইখানি নষ্ট করিয়া এই বানররূপী মহাপুরুষ শিক্ষা দিলেন—যে শ্রীবৃন্দাবনে এ সকল দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে নাই। এখন শিক্ষা পাইয়া আমার চৈতন্য হইয়াছে—এখন হইতে সাবধান হইব। এই শিক্ষা পাইয়াই আমার আনন্দ হইয়াছে এবং সেইজন্য পাপচক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িয়াছিল!!"

ঘোষমহাশয় মহারাজের মুখে এই কথা শুনিয়া নীরব রহিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে ভাবতরঙ্গ খেলিতে লাগিল—তাহাতে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইল। চতুর-শিরোমণি মহারাজ তাঁহার ভাব অনুভব করিয়াই বলিলেন—"রাধারমণ! প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া বড়ই কঠিন—বৈষ্ণবের দীক্ষা শিক্ষা সকলি সাধুসঙ্গ-বলে প্রাপ্ত—বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ দীনতা আর এই দীনতার অবতার ছিলেন—শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁহার কৃপা দীনদরিদ্র কাঙ্গালের প্রতিই অধিক! আমি মহারাজা, ঘোর বিষয়ী, আমার প্রতি কি তাঁহার কৃপা হইবে?" এই কথা বলিতে বলিতে মহারাজার গণ্ডস্থলে প্রেমাশ্রুর বন্যা ছুটিল।

ঘোষ মহাশয় সকলি দেখিলেন—সকলি শুনিলেন—অথচ কোনই কথা কহিলেন না। মহারাজ গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। ঘোষ ঠাকুর একাকী নিভৃত স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন—"যে ধর্ম্মে মানুষকে এত উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারে—যে ধর্ম মানুষের মন এমন কুসুম-সুকোমল হয়—সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। অতএব বৈষ্ণব ধর্ম্মই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীগৌরাঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার। আমি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর উপাসনা করিব।" ইহাই হইল রাধারমণ

ঘোষের ধর্ম্মাশ্রয়ের মূল কারণ—মহারাজ বীরচন্দ্রই তাঁহার বর্ত্মোদেশ গুরু।

ইহার পরে ঘোষ মহাশয়ের জীবনে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল। শ্রীবৃন্দাবনে যে কয়দিন ছিলেন, নির্জনে বেড়াইতেন, সুযোগমত সাধু বৈষ্ণবসঙ্গ করিতেন। একদিন নির্জনে বনভ্রমণকালে একটি তমাল বৃক্ষের মূলে জনৈক নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই বৈষ্ণবটি তমালবৃক্ষমূলে আসন করিয়া নিত্য নিয়মিত শ্রীমদ্‌-ভাগবত পাঠ করিতেন—শ্রোতা কেহই থাকিত না—কিন্তু শ্রীভাগবত-পাঠে এই সিদ্ধ বৈষ্ণবটির কোন প্রকার ত্রুটি লক্ষিত হইত না। তিনি টীকাটিপ্পনীসহ শ্লোকের মর্মার্থ অতি অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও ভক্তি-সহকারে ব্যাখ্যা করিতেন। এই ভাগবত-পাঠক তাঁহার অভীষ্টদেব তমালবৃক্ষরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই ভাগবত শুনাইতেন। দৈবক্রমে কোনও শ্রোতা আসিলেও তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্যই থাকিত না। ঘোষ মহাশয় নির্জনে এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়া পশ্চাদ্দেশে বসিয়া ভাগবত শুনিতেন এবং শ্রবণান্তে প্রণাম করিয়া অলক্ষ্যে উঠিয়া আসিতেন। ঘোষ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। রাজসভায়, রাজবাটীতে এবং অন্যত্র অনেকবার ভাগবতপাঠ শুনিয়াছেন—কিন্তু এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পাঠ তিনি কোথাও শুনেন নাই। ঘোষ মহাশয়, অলক্ষ্যে নিত্যই পাঠ শুনিতেন, কিন্তু একদিন হঠাৎ ধরা পড়িলেন। সিদ্ধ মহাত্মা তাঁহাকে দেখিয়া আদর করিয়া নিকটে ডাকিলেন এবং শেষদিন পর্য্যন্ত পাঠ শুনিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সংকল্প করিয়া পাঠ করিতেছিলেন। ঘোষ মহাশয় সশঙ্কভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এবার হইতে এক পার্শ্বে বসিতেন। শেষদিনে এক অপরূপ ঘটনা ঘটিল—যে তমালবৃক্ষের মূলে বসিয়া বাবাজি মহারাজ পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার পাদমূল যেন দ্বিভাগ হইয়া তন্মধ্যে

হইতে এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতিবিশিষ্ট জ্যোতির অভ্যন্তরে দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীশ্যামসুন্দর দৃষ্ট হইলেন। দেখিয়াই ত রাধারমণ বাবু মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন—বাবাজি মহাশয়ের কি হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিলেন না—মূর্চ্ছান্তে দেখিলেন যে তাঁহার মস্তক বাবাজি মহারাজের ক্রোড়ে এবং তিনি সেই তমাল-তলে শায়িত। বাহ্যজ্ঞান হইলেই তিনি লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিভরে বাবাজি মহারাজকে প্রণাম করিলেন। বাবাজি সস্নেহে তাঁহার শিরঃ স্পর্শ করত মধুরবাক্যে বলিলেন—"রাধারমণ! তোমাকে আমার রাধারমণ কৃপা করিয়া সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছেন। আমার আদেশ—তুমি এইরূপে ভাগবত পাঠ করিবে। শ্রোতার অপেক্ষা করিও না, ভাগবত ভাগবতরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই শুনাইবে—ইহাতে তোমার ভাগবত-পাঠের প্রকৃত ফল লাভ হইবে।" বলা বাহুল্য—ঘোষ মহাশয় এই রূপে বৈষ্ণবকৃপা ও বৈষ্ণবাদেশ পাইয়া আজীবন নিজগৃহে বা অন্তরঙ্গ ভক্তসমীপে ভাগবতপাঠ করিয়া ভাগবতরূপী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার ভাগবতপাঠে কি অমৃতবর্ষা হইত—তাহা যাঁহারা শুনিবার ভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন। ভাগবতের প্রতিশ্লোক তিনি গৌরপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে শ্রীগ্রন্থ-পাঠকালে তাঁহাতে শ্রীশ্রীজীবপ্রভু ও শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের আবেশ হইত। শ্রীচরিতামৃতের একটি কি দুইটি পয়ার পাঠ করিতেন আর চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক তিনি উহার রস নিষ্কাসন পূর্ব্বক এমত ব্যাখ্যা করিতেন যাহাতে অতিবড় পাষণ্ডীরও সকল সংশয় নিরসন পূর্ব্বক শ্রীগৌরচরিতে রতিমতি হইত। তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা পাঁচটি কি সাতটি, স্থান ছিল—ভাঙ্গা ঘর কিম্বা তৃণাচ্ছাদিত বৃক্ষতল। অতি সহজ ভাষায় কঠিন কঠিন দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিও তিনি এমন

মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ করিয়া বুঝাইতেন যাহাতে শ্রোতার মনে বিস্ময়-রসের প্রবাহ ছুটাইয়া এক অপার্থিব ভাবরাজ্যের সন্ধান আনিয়া দিত।

এই ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বহরমপুরে শ্রীলরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহোদয় শ্রীমদ্‌ভাগবতের চারি টীকা ও অনুবাদযুক্ত একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং শ্রীলমহারাজ বাহাদুরের লক্ষাধিক মুদ্রা পাইয়া তিনি তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করিতে সক্ষম হন। এতদ্ব্যতীত বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ ঘোষঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ও মহারাজা বাহাদুরের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে।

পারিবারিক জীবনে ঘোষঠাকুর স্নেহময় পিতা, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ গৃহস্থ, আবার পরম ভাগবত ছিলেন। ছোট বড় সকলের সহিত তিনি প্রাণ ঢালিয়া মিশিতেন। একাধারে অগাধ পাণ্ডিত্য, বিনয় ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা তাঁহাতে বিরাজিত ছিল। বসন্তের প্রকোপে দুঃস্থ প্রতিবেশীর সেবা শুশ্রূষা করিতে যাইয়া তিনি ঐ রোগেই আক্রান্ত হইয়া পরিণত বয়সে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভু (শ্রীবৃন্দাবন) *

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হইতে দশম পর্য্যায়ে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামিপাদের ঔরসে শান্তিপুরে ইঁহার জন্ম হয়। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে ইনি পিতৃমাতৃহীন হইলেন—শ্রীমদনগোপাল গোস্বামিপাদের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করিতেছিলেন—ব্রহ্মদেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী ইঁহাকে শান্তিপুর হইতে কয়েকমাসের জন্য ব্রহ্মদেশে লইয়া যান—কিছুদিন পরে তত্রত্য রাজপণ্ডিত-পদে বৃত হইলেন—

* তৎপ্রণীত 'যতিদর্পণ' গ্রন্থের ছায়া।

পরে ওখানকার রাজা সভা করিয়া 'শ্রীগোস্বামিপণ্ডিত রাজগুরু' এই উপাধি স্বর্ণপত্রে লিখিয়া ইঁহাকে দান করেন। কিছুদিন পরে বিশ ভরি স্বর্ণের মুকুট ও চল্লিশ ভরি স্বর্ণের যজ্ঞোপবীত দান করেন—ব্রহ্মদেশে মারীভয় উপস্থিত হইলে তিনি ১২৮৪ সালে দেশে আসিয়া দার পরিগ্রহ করিলেন। পুনরায় ব্রহ্মদেশে গিয়া পূর্ব্ব রাজার দেহত্যাগ ও রাষ্ট্রবিপ্লব দেখিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—৩৩ বৎসর বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন হয়—পুনরায় দেশে গমন করত ১২৯৮ সালে রাজর্ষি বাহাদুরের সঙ্গে সপরিবারে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন—কয়েকবার যাতায়াতের পর শেষবারে শ্রীগৌরহরি দাস ও শ্রীগৌরকিশোর দাস শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটের শ্রীশ্রীগিরিধারীর সেবাসহ অট্টালিকা সমর্পণ করিলে ইনি তাহাতে বাস করিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে সৎকথালাপে ও সৎশাস্ত্র-ব্যাখ্যায় কালাতিপাত করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে প্লেগের সময় ইনি আবার শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন—আড়াই বৎসর পরে বৃন্দাবনে গিয়া হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ক্লিষ্ট হইয়া ৫৬ বৎসর বয়সে দোলপূর্ণিমার দিন শ্রীযমুনাতটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইনি শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রণীত নিকুঞ্জরহস্যস্তবের 'রহস্যার্থ-প্রকাশিকা' নামক টীকা, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতের, চমৎকারচন্দ্রিকার ও সংকল্পকল্পদ্রুমের বঙ্গানুবাদ, 'স্তব ও গীতাবলি'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে যে ইনি যমুনা-স্নান করিয়া আসিবার কালে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ইঁহার সহিত তদীয় বাসস্থানে আসিয়াছিলেন এবং কৃপাপরবশ হইয়া ইঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন—তদবধি ইঁহার কেশীঘাটস্থ বাড়ীতে অদ্যাপি শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের আসনটি সেবিত হইতেছে।

পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজ

কুলীন গৌড় ব্রাহ্মণ বংশে ১৯১৪ সম্বতে ভাদ্রমাসে জয়পুরের অন্তর্গত ভুরাটিপা পঙ্গলিতে জন্ম—পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীরামপ্রতাপ মিশ্র (পাণ্ডা)। ১৯২২ সম্বতে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, পিতা ছিলেন রামানন্দী বৈষ্ণব এবং মাতা বল্লভকুলের কন্যা। ইঁহার পিতামহ রামানুজীয় বৈষ্ণব ছিলেন, কথিত আছে যে তিনি অশ্বারোহী শ্রীরঘুবীরের দর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহারা জয়পুরের রাজার অধ্যাপক-বংশ। রামপ্রতাপের পাঁচ ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই ভক্তিতে আগ্রহ দেখা যাইত। সাত কি আট বর্ষে ইনি দূরবর্ত্তী মাধবপুর ঝরণা হইতে শ্রীকৃষ্ণপূজার নিমিত্ত জল আনয়ন করিতে নিত্য একাকী যাইতেন। একদিন পথে তিনি দেখিলেন যে একটি ব্যাঘ্র মনুষ্যভক্ষণ করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি ব্যাপারটি দেখিয়াও অকুতোভয় হইয়া সেই পথেই মাধবপুর হইতে জল আনিতেন—তাঁহার ধারণা ছিল যে ব্যাঘ্র যখন খাদ্যদ্রব্য পাইয়াছে, তখন আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিবে কেন? ইনি নবম বর্ষে পাণিনীর ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিলেন। কথিত আছে যে এই সময়ে জয়পুরে কর্ণাটি বিপ্র শ্রীনৃসিংহানন্দ ভট্ট (যিনি সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন) মহাশয়ের সহিত ইহার আলাপ পরিচয় হয়। এই নৃসিংহদাসজি ষড়্‌দর্শনের পণ্ডিত, বীণাদিবাদ্যযন্ত্রে সুনিপুন এবং সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাদির গানে আবিষ্ট হইতেন। রামপ্রতাপ ইহার সান্নিধ্যে আসিয়া ইহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া ভাবিলেন যে এতাদৃশ প্রতাপী শিষ্যের যিনি গুরুদেব তিনি মহামহীয়ান্‌ই হইবেন—এই ভাবিয়া তিনি তখন হইতে গৌড়ীয় মহাত্মদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং উত্তরকালে শ্রীবৃন্দাবনে

আসিয়া তাঁহারই চরণাশ্রয় করেন। তখন হইতে ইনি শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী কাকাজির সংস্পর্শে আসিয়া তত্রত্য প্রফেসার কান্তি চন্দ্র সেনের নিকট বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিতে থাকেন। দশম বর্ষে ইনি উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। একাদশ বর্ষে উপনয়ন-সংস্কার হইলে ইনি সাবিত্রীদাতা পুরোহিতের নিকট হইতে সাবিত্রীর পুরশ্চরণ করিতে আদিষ্ট হন। আরোহী পুরশ্চরণান্তে ইনি সাবিত্রীর দর্শন ও বর লাভ করেন। সাবিত্রী তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার নির্দ্দেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলে ইনি তিন বৎসর যাবৎ পলায়নের চেষ্টা করিলেন—কিন্তু মাতা ও রাজসরকার কর্তৃক অবরুদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন পুরোহিতজির নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে তিন মাস পরেই ত্রয়োদশ বর্ষে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। তখন তিনি শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের নিকট গোস্বামিদের আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গজির মন্দিরের শ্রীসুদর্শন শাস্ত্রীর নিকট ন্যায়, শ্রীনীলমণি গোস্বামিপাদের নিকট ষট্‌সন্দর্ভাদি ভক্তিগ্রন্থ, সুরমা কুঞ্জের মোহন্ত ও করোলী কুঞ্জের শ্রীনৃসিংহ দাসজির নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং শ্রীগোপীলাল গোস্বামিজির নিকট শ্রীহরিভক্তিবিলাস অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বিশবর্ষ কালে সব অধ্যয়ন শেষ হইল। [ইতি মধ্যে মাতার প্রেরণা ও আগ্রহে দুই তিন বার জন্মভূমিতে গেলেও পুনরায় পলায়ন করত শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন।] অধ্যয়নান্তে ইনি সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহারাজের নিকট দীক্ষা ও বেশগ্রহণ করেন। ভজন-বিষয়ক যাবতীয় উপদেশ পাইয়া ইনি শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের সমগ্র কণ্ঠস্থ করেন। স্মরণ-মননে সম্যক্ শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য তখন তিনি সিদ্ধ বাবার আদেশে গুটিকাবালা সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের নিকট গিয়া ভজনের সহিত শাস্ত্র সমন্বয় করিলেন। তৎপরে আবার শ্রীনিত্যানন্দ বাবার আদেশে বর্ষাণে যাইয়া ভজনে

প্রবৃত্ত হইলেন। সেখানে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরচরণ দাস বাবাজির * মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া কীর্ত্তন শিখিতে লাগিলেন, বড় দশকুশী তালে 'বিকচ সরোজ, গানটি আয়ত্ত করিতে তিন মাস লাগিল—ভজনের আবেশ কমিয়া ইহাতে কীর্ত্তনের আবেশে আসিল। সিদ্ধ বাবা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে আনয়ন করেন এবং কীর্ত্তন বন্ধ করাইয়া ভজনে প্রবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করিলেন। ইনি কখনও স্বয়ং সিদ্ধ বাবার সহিত কাথাবার্ত্তা বলিতেন না, বড় গুরুভাই শিরোমণি মহাশয়দ্বারা আলাপ করিতেন। সিদ্ধ বাবার আদেশে পুনর্ব্বার বর্ষাণায় যাইলেও কিন্তু ইহার ভজনে মন বসিল না দেখিয়া তিনি অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্রের সতর দিন যাবৎ পুরশ্চরণ করিয়া উদ্ধব কেয়ারীতে কদম্বতলে শ্রীপ্রিয়া প্রিয়তমের দর্শন লাভ করেন। বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি জানাইলেন "শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় ভজন করিতেছি, কি চাই জানি না, যুগলকিশোরের প্রসন্নতাই চাই।" তখন আজ্ঞা হইল—'রাঘবের গোফায় গিয়া ভজন কর।' তখনই সেই হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল গোফায় গমন করিয়া তিনি দেহদৈহিকাদির অনুসন্ধান-রহিত অবস্থায় ছয় বৎসর কাল তীব্র ভজন করিলেন। তাঁহার মাতা অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বৈষ্ণব-মুখে পুত্রের বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীরাঘবের গোফাদ্বারে তিন দিন বসিয়া রহিলেন। এই সময়ে তিনি দুই তিন দিন পরে গোফা হইতে বাহির হইতেন। একদিন তিনি ছেঁড়া টাটি, গুদ্‌রী ও একটি ছিদ্রযুক্ত করোয়া হাতে করিয়া বাহির হইলেন বটে, কিন্তু দ্বারে নিজ মাতাকে দেখিতে না পাইয়া চলিয়া গেলেন। জননী পশ্চা-

---

* কথিত আছে যে এই শ্রীগৌরচরণ দাসজি শ্রীজির স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কালীয়দহে অপ্রকট হন। অপ্রকট কালে ইহার কৃষ্ণবর্ণ দেহটি গৌরবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

দন্থসরণক্রমে ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলেন না, অগত্যা তিনি রোদন করিতে করিতে জয়পুরে চলিয়া গেলেন। এদিকে মাতার গমনের পর হইতে ক্রমশঃ ভজনে তারল্য আসিল—কয়েকদিন পরে মনে করিলেন যে কোথাও অপরাধ হইয়াছে—বৈষ্ণবগণের মুখে তখন জানিলেন যে তাঁহার গর্ভধারিণী আসিয়া তাঁহার দর্শন বা বাক্যালাপাদি না পাইয়া দুঃখিত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মাতাকে সন্তোষ দিতে না পারিলে ভজনে ঘোরতর বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া চিঠি লিখিয়া মাতাকে পুনরায় বৃন্দাবনে আনাইলেন—পুছরিতে তাঁহাকে রাখিয়া সেবা করিতে লাগিলেন—ভজনে আবেশ কমিয়া গেল। মাতৃসেবা ও ভজন উভয়তঃই ক্রমে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে উৎকল হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস নামে জনৈক ব্রাহ্মণ-বালক পণ্ডিত বাবাজির নিকট আসেন। ভাদাবলীর বাবাজির গুরু মহারাজ শ্রীপ্রভু দাসজির নিকট দীক্ষা ও ভেক গ্রহণ করাইয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে রাখিয়া ভজন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এখন হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তিনি স্বমাতৃ-সেবায়নিয়োগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসজি তিন বর্ষকাল ভজন করিয়াই ভাবসিদ্ধিলাভ করেন। [পুছরীর মাধব দাসজি মহারাজ উঁহার শিষ্য ছিলেন।] সাত আট বৎসর পরে পুছরীতে ইঁহার মাতৃদেবীর অন্তর্ধান হইলে পণ্ডিত বাবাজি পুনরায় যথেষ্ট আবেশ সহকারে ভজনে প্রবৃত্ত হন।

কয়েক বৎসর পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়-মধ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মন্ত্র লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই মন্ত্রের স্বপক্ষে কাকাগুরু গুটিকাবালা শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা, শ্রীরাধারমণ-সেবায়েত শ্রীগোপীলাল গোস্বামিপ্রভৃতি এবং বিপক্ষে জেঠাগুরু সিদ্ধ বলরাম দাস বাবাজি মহারাজ, বিদ্যাগুরু শ্রীনীলমণি গোস্বামিজি, শ্রীরাধাকুণ্ডের মোহন্ত নৈয়ায়িক শ্রীজগদানন্দ দাসজি পণ্ডিত প্রভৃতি। দুই পক্ষেই

শুরু থাকতে ইনি মহাসমস্যায় পড়েন এবং গোফা হইতে পলায়ন করত বর্ষাণে ময়ূরকুটীতে বাস করেন। শ্রীরাধাবল্লভী ভাগবত-পরমহংস প্রিয়াদাসজি এবং স্বামিচরণ বাবার (যাঁহার শিষ্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত অমোলক রাম শাস্ত্রীজি) সঙ্গে তিনি তথায় গোপনে আট বৎসর অতিবাহিত করিলেন। বিবাদ মিটিলে পুনরায় ঐ রাঘবের গোফায় আসিয়া তিনি দশ বৎসর যাবৎ মনোনিবেশ সহকারে ভজন করেন। এই সময়ে বিস্ময়কর তিনটী ঘটনা ঘটে—(১) মাঘ মাসের এক রাত্রিতে তিনি কয়লার আগুন নিয়া গোফার মধ্যে প্রবেশ করত দরজা বন্ধ করিলেন। কয়লার গ্যাসে মানুষের প্রাণহানি পর্য্যন্ত হইতে পারে—ইহা তাঁহার জানা ছিল না। বিষাক্ত গ্যাসে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন অলক্ষ্য সিদ্ধ দেবতা তাঁহাকে ওখান হইতে বাহির করত গোবর্দ্ধনের তটদেশে ফেলিয়া রাখেন। প্রভাতকালে শীতে চেতনা হইলে দেখিলেন যে তিনি গোফায় নাই—দুই দিন পর্য্যন্ত আর চলচ্ছক্তি ছিল না। (২) পুছরির গঙ্গাজির মন্দিরে একবার কোনও উৎসবে পুয়া বণ্টন হইয়াছিল। দুইজন ভাঙ্গী চোর পুয়ার লোভে গঙ্গাজির মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মনে করিলে যে পণ্ডিত বাবজি নিশ্চয়ই পুয়া পাইয়াছেন, সুতরাং তাহারা গোফার দ্বারে আসিয়া তাঁহাতে ডাকিয়া বাহির করে এবং পুয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়। তখন উত্তরে পুয়া নাই বলিলে একজন চোর লাঠির আঘাতে তাঁহার কপাল ফাটাইয়া রক্তপাত করিল। অন্যজন ঘরে ঢুকিয়া কিছুই না পাইয়া বড়ই অনুতপ্ত হইল এবং নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে একখানা উনবস্ত্র আনিয়া পণ্ডিত বাবার মাথা বাঁধিয়া চলিয়া গেল। (৩) একদিন দিবা-ভাগে এক বিষধর সর্প তাঁহার গলা ও বুক বেষ্টন করিয়া কতক্ষণ পরে আপনিই চলিয়া গেল। সেই দিন রাত্রিতে তিনি এক ধ্বনি

শুনিলেন, 'তুমি এই গোফা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও।' তৎপরে তিনি কুসুম-সরোবরে শ্যামকুটিতে আসিলেন। গোফাতে অবস্থান-কালে একবার গোয়ালিয়রের রাজা মাধব রাওয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলবন্ত রাও আসিয়া ইঁহার অনুগত হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসজির নিকট দীক্ষা দেওয়ার কথা হইয়াছিল, কিন্তু সহসা তাঁহার অন্তর্ধান হইলে তাঁহাকে গোপীনাথবাগের কেশবদেবের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়াইলেন। শ্যামকুটীতে অবস্থানকালে এই বলবন্ত রাও নিজ মাতার চৌদ্দ লক্ষ টাকার অলঙ্কার হইতে গোপনে বৈষ্ণবদিগকে দান করিবার উদ্দেশ্যে ছয় লক্ষ টাকার অলঙ্কার আনিয়া পণ্ডিত বাবার নিকট দিলেন এবং জানাইলেন—'আমি প্রকাশ্যভাবে এই টাকা ব্যয় করিতে দেখিলে রাজা ঐ ধন বাজেয়াপ্ত করিবেন'। পণ্ডিত বাবা কিন্তু এই ধন অঙ্গীকার না করিয়া তাঁহাকে বহু তাড়ন ভৎর্সন করিয়া পরে পরামর্শ দিলেন—'শ্রীগৌরশিরোমণি মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীহরিচরণ দাসজির নিকট যাও।' তিনি ঐ অর্থদ্বারা মন্দির-নির্ম্মাণ, ঠাকুরসেবার রীতি-মত ব্যবস্থা এবং নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবদিগকে যথাযোগ্য ভাবে দানের বন্দোবস্ত করিলেন। উহার এক লক্ষ টাকা রাজসরকারে জমা আছে, তাহাতে মাসিক ছয় শত টাকা আয় হয় এবং চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-গণকে অবস্থানুসারে অদ্যাপিও মাসিক পাঁচ টাকা হারে দেওয়া হইতেছে।

শ্যামকুটীতে অবস্থানকালে শ্রীগৌরাঙ্গ দাসজি ও প্রিয়াশরণ দাসজি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করিতে থাকেন। রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর এবং রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় প্রভৃতি সৎসঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। তৎপরে শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসজি আসিয়া ইঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন।

ইংরেজী ১৯১৮ (বাংলা ১৩২২) সালে পণ্ডিত বাবাজি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে গুরুতর আক্রান্ত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীল কামিনী

কুমার ঘোষ ও শ্রীদীনেশ চরণ দাস প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে কার্ত্তিক মাসে শ্রীমদনমোহনের বাগিচায় লইয়া গেলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনে এই সময়ে ভীষণ জলপ্লাবন ও প্লেগ হওয়ায় তিনি বৃন্দাবনে টাটিয়াস্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং দুই বৎসর যাবৎ মথুরায় পুরুষোত্তম ভট্টের মুখে হরিকথা শুনিতে লাগিলেন। তৎপরে ক্রমে কেয়ারী বনে, দিল্লীর ধর্ম্মশালায় এবং মদনমোহন বাগিচায় তিন বৎসর বাস করেন। এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ দাসজিকে ইনি সন্দর্ভাদি বৈষ্ণব দর্শন অধ্যয়ন করান এবং শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসজিকে সেবায় অঙ্গীকার করত ভজন ও বৈরাগ্যবিষয়ে তীব্র শাসন করেন। তিন বৎসর পরে বরাহঘাট বারদুয়ারীতে বাসকালে নেপালী যুবরাজের ছদ্ম করিয়া জনৈক দস্যুর আগমন হয়। পণ্ডিত বাবা তাহাকে শ্রীরাধাচরণ গোস্বামিপ্রভু দ্বারা দীক্ষা দেওয়াইয়া দুই মাস ভজন শিক্ষা দেন। তিনি কিন্তু স্বাভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল না হওয়ায় শচীনন্দন মাষ্টার প্রভৃতি হইতে কতক টাকা লইয়া চম্পট দেন। শ্রীবৃন্দাবনে জলপ্লাবনকালে ইনি মীর্জাপুরের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নেন এবং ছয় মাস পরে করৌলীকুঞ্জে বাস-কালে আবার ভীষণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। একালে তাঁহার দেহনির্ব্বাণের উপক্রম হইলে শ্রীকৃপাসিন্ধুদাসের দারুণ দুঃখ এবং স্বপ্নাদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি হইল। ১৩৩২ সনে কার্ত্তিক মাসে দাউজির বাগিচায় আসিয়া তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন এবং দুই জনেই ভজনে অভিনিবিষ্ট হইলেন। ভজনে অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসজির সেবায় ঔদাসীন্যফলে মথুরার হাসপাতালে প্রাণান্তকর রোগে মুমূর্ষু হন এবং তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নাদেশে রোষকষায়িত নেত্রে তীব্র শাসন ও অনুগ্রহ করিলে তিনি পুনঃ সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তিনি ভজনাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া শ্রীপণ্ডিত বাবাজির সেবায় নিরত হইলেন এবং

পণ্ডিত বাবাও ভজনে প্রগাঢ় আবেশে বাহ্যাবেশ-রহিত হইয়া দিনদিনই অন্তর্মনা হইলেন। আহার বিহারাদি ব্যতীত ও দেহের পুষ্টি হইল শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসজির উপর দেহরক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া ইনি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীশ্রীভৃগর্ভগোস্বামিপাদের সন্তান শ্রীল বিনোদবিহারী বেদান্তরত্ন গোস্বামিজিকে ইনি একদিন বেশাশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

শ্রীপণ্ডিত বাবাজির জীবনে আমরা ইষ্টনিষ্ঠা, বৈরাগ্যনিষ্ঠা, অকিঞ্চনা ভক্তিতে নিষ্ঠা; শ্রীগুরুতে নিষ্ঠা, ব্রতনিষ্ঠা এবং সম্প্রদায়-নিষ্ঠা (মহৎপরম্পরানিষ্ঠা) প্রভৃতি দেখিয়া কৃতকৃতার্থ ও ধন্যধন্য হইয়াছি। ইহার ভজন-প্রভাবে গোস্বামি-সন্তান, ব্রজবাসী বা বিরক্ত বৈষ্ণব সকলেই তাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিতেন। তাঁহার এই এক অচিন্ত্য শক্তি ছিল যে শ্রীসম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়, মাধ্বসম্প্রদায়, রাধাবল্লভী, টাট্টিবালী এবং বল্লভকুলী প্রভৃতি সকলকেই মনে করিতেন যে পণ্ডিত বাবাজি তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য ও অনন্য উপাসক। এই অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়াই সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই তাঁহার নিকট আসিয়া স্বস্বসম্প্রদায়ের গূঢ় রহস্য জিজ্ঞাসা করিতেন এবং গুরুবুদ্ধিতে শুশ্রূষাও করিতেন। বিনা জিজ্ঞাসাতেও অনেকে তাঁহার নিকট বসিয়াই সন্দিগ্ধ স্থলের সুমীমাংসা পাইয়াছেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্যচর্য্য ষড়্‌দর্শনাচার্য্য শ্রীল সুদর্শন আচার্য্য বলিতেন—'শাস্ত্রের কোন কঠিন বিষয়ের মীমাংসা আমার অসাধ্য হইলে, পণ্ডিত বাবা আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেই—তাহা আমি অনায়াসে মীমাংসা করিতে পারি।'' শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী সভামধ্যে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিয়াছেন—'আমার অবোধ্য শাস্ত্রসিদ্ধান্তগুলি আমি লিখিয়া রাখি। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বাবার সম্মুখে কখন আমি গেলে অথবা তিনি কোনও সভায় আমার সম্মুখে আসিলে

সেই অমীমাংসিত স্থলগুলির সুসিদ্ধান্ত আমার স্ফূর্তি পাইয়া থাকে এবং এতদ্ভিন্ন আমার মনোবুদ্ধির অগোচর সিদ্ধান্তগুলিও আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। তাঁহার এই অলৌকিক শক্তিটি শ্রীসিদ্ধ নিত্যানন্দ দাস বাবাজি মহারাজের কৃপাপ্রসূত বলিয়াই অনেকের সম্মত।

শ্রীপণ্ডিত বাবাজি মহারাজ ১৯৯৭ সম্বতের গৌণ অশ্বিনী কৃষ্ণা চতুর্থীতে অপ্রকট হইয়াছেন।

সূচক

(১) আরে মোর বড় বাবা পণ্ডিত ঠাকুর।

কেবলা ভকতি ধাম, রামকৃষ্ণ দাস নাম, চিত্তেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণরসপূর ॥ ১
ধন্য জয়পুর গ্রাম, গোবিন্দ বিলাসধাম, যাঁহা প্রভু জনম লভিলা।
যাকে অতি শিশুকালে, গুটিকাখেলার ছলে, শ্রীগোবিন্দ অতিকৃপা কৈলা ॥ ২
দেখিয়া শিশুর গুণ, কাকাজি কিশোরীমোহন, স্নেহে তুলি হৃদয়ে ধরিল।
সর্ব্বগুণশিরোমণি, নৃসিংহদাস গুণখনি, শিশু পেয়ে স্নেহেতে বরিল ॥ ৩
কোষ কাব্য ব্যাকরণ, অলঙ্কার অধ্যয়ন, বেদশাস্ত্রে হইল প্রবীণ।
ছোটেলাল পুরোহিত, বরি' কৈল উপবীত, দ্বিজনম লভিল কুলীন ॥ ৪
দেখিয়া শিষ্যের ধাম, পুরোহিত মতিমান্, পুরশ্চর্য্যা উপদেশ দিল।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধরি, বিংশতি সপ্ত বাসর, সাবধানে গায়ত্রী জপিল ॥ ৫
গায়ত্রী দেবী কৃপাবতী, অধিষ্ঠান হৈল তথি, যতনে যাচিয়া দিল বর।
'যাও বাছা বৃন্দাবন, কর কৃষ্ণ-আরাধন, হবে কৃপা তোমার উপর' ॥ ৬
তবে আসি বৃন্দাবন, ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, গুরুসেবা পূর্ব্বক করিলা।
প্রভুপাদ নীলমণি, গোপীলাল গুণখনি, ভক্তিবিদ্যা তাহাতে ধরিল ॥ ৭
গৌর-শিরোমণি গুরু, ভক্তিরস-কল্পতরু, শ্রীচরণে যাই নিবেদিল।
সিদ্ধ নিত্যানন্দ দাস-চরণ সেবার আশ, তাঁর পদে আত্ম সমর্পিল ॥ ৮

দীক্ষা ভেক ভজন, রাগানুগা সাধন, শিক্ষা কৈল বহুত যতনে।
কৃষ্ণদাস কর্ত্তা বাবা, যাই কৈল তার সেবা, গুটিকা-প্রণেতা গোবর্দ্ধনে ॥ ৯
ভানুখোর বর্ষাণে, তবে গেলা কতদিনে, তাঁহা এক পিপ্পল রোপিল।
এক বিরক্ত চূড়ামণি, মুখে শুনি সুরাগিণী, শিক্ষাতরে লোভ উপজিল ॥ ১০
শুনি গৌর শিরোমণি, তাঁহাকে ডাকিয়া আনি, গুরুদ্বারা করিল শাসন।
শুন বাছা প্রাণধন, ছাড় উপশাখাগণ, গুণকলা ভক্তি-বিড়ম্বন ॥ ১১
শ্রীগুরু-শাসন পাই, বসিল ভজনে যাই, পূর্ব্ববত না হয় স্ফুরণ।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য চিন্তায় হইল শীর্ণ, অন্ন জল কৈল বিসর্জ্জন ॥ ১২
দুঃখে আসি গুরুপদে, নিবেদিল মনখেদে, তিঁহ কহে—কর অনুষ্ঠান।
একান্ত বনেতে বসি, মন্ত্র জপ অহর্নিশি, শীঘ্র প্রভু হবে কৃপাবান্ ॥ ১৩
শ্রীগুরুর চরণধূলি, লয়ে মাথে কুতূহলী, তথা হৈতে করিলা গমন।
তবে গেলা নন্দগ্রাম, উদ্ধব-কেয়ারী নাম, যার মাঝে রত্ন-সিংহাসন ॥ ১৪
কদম্ব-তলায় বসি, মন্ত্র জপে অহর্নিশি, সপ্তদশ বাসর বিতিল।
দেবী বর কল্পতরু, সুফল ফলিল গুরু, নীলপীতাংশুক প্রকটিল ॥ ১৫
দোঁহাকার কথামৃতে, পূর্ণ হৈল মনোরথে, আসি কৈল গোবর্দ্ধনে বাস।
সে ফল অমৃতরসে, জগত করিল বশে, বঞ্চিত এ কৃপাসিন্ধু দাস ॥ ১৬

(২) আরে মোর বড় বাবা গুণের নিধান।
ছেঁড়া কান্থা করোয়া হাতে, ছিন্ন কৌপীন চীর মাথে, অনুরাগে অরুণ নয়ান
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, নাহি বাধে অন্ন পান, লীলারসে সদা রহে ভোর।
গ্রাম্য বার্ত্তা চর্চ্চাভয়ে, জন-সঙ্গ ছাড়ি রহে, কৃষ্ণকৃপায় বৈরাগ্য কঠোর ॥ ২
ছয় বর্ষ এক ভাবে, মুহূর্ত্তেকে গেল যবে, শ্রীরাঘব-পণ্ডিত-গোফায়।
কেবলা ভকতি ধাম, শ্রীচৈতন্য দাস নাম, পূজারী গোসাই মিলিল তথায় ॥৩
মাধোদাস ব্রজবাসী সুমধুর গুণরাশি নটবর বয়স কিশোর।
যার দেহে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকেলি আরাধিকা রাস-রসে সদা রহে ভোর ॥ ৪

শাস্ত্রী অমূলক রাম, ভট্ট শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীমহান্ত দাস ভগবান্।
দাস শ্রীসঙ্কর্ষণ হংসদাস গুরুগণ সবে মহা আচার্য্য-প্রধান॥
ভকতি-বৈরাগ্য ধাম, সবে মিলি এক ঠাম, প্রেমরসে জগ ভাসাইলা।
কৃপাসিন্ধু অতি মূঢ়, তখন রহিল দূর, ভাগ্যহীন স্থান না পাইলা॥ ৬

(৩) আরে মোর বাবা মহা গুণের নিবাস।
তবে ত্রিশ বর্ষ পরে শ্রীকুসুমসরোবরে আসি কৈল শ্যামকুটীবাস॥ ১
গৌরাঙ্গ প্রিয়াশরণ, আর কত দাসগণ, আসি আসি মিলন সভার।
বৈরাগ্য ভজন-ঠাট, রচিল বিচিত্র হাট, ভরি, ভক্তিসিদ্ধান্ত-পসার॥ ২
বসি' বৃক্ষ তলে তলে, বিকে কিনে সবে মিলে, বীতি যায় রাত্রি তিন যাম।
কভু চন্দ্রসরোবরে, কভু গোয়ালপুকুরে, নারদ-উদ্ধব-কুণ্ডঠাম॥ ৩
পেঁঠো বা গাঁঠুলী গ্রাম, পিয়ে সবে অবিরাম, প্রেমরস কলসী ভরিয়া।
পিবি পিবি হ'ল মত্ত, নাহিজানে দিবারাত্র, আনন্দ না ধরে আর হিয়া॥ ৪
বনমালী বাহাদুর মহারাজ ছত্রপুর, শ্রীমণীন্দ্র নন্দী রাজঋষি।
দাস হরিচরণ, পণ্ডিতাদি মহাজন, মহাগ্রাহক হইল সবে আসি॥ ৫
বড় ডাকু বলবন্ত, ভাইয়া রাও বলবন্ত, বলে আসি হাটে দিল হানা।
ভাঙ্গি বৈরাগ্য কপাট, প্রেমধন লুটপাট, উড়াইল ভক্তিযশ-বাণা॥ ৬
দাস শ্রীহরিচরণ, চরণে লয়ে শরণ, তাঁহা যাই বলে কৈল থানা।
যেন কোন ভাগ্য মিলে, যাহা শাস্ত্রে বাখানিলে; পরমাণ এবে গেল জানা॥ ৭
অদ্ভুত চৈতন্য-লীলা, যতি-সতী রহি গেলা, ভোগী বিষয়ী লুটিয়া খায়।
মুখে না নিকসে কথা, হৃদয়ে রহিল ব্যথা, দীনহীনের কি হবে উপায়॥ ৮
বহু বাধা বিঘ্ন সয়ে, হাট বাট রুদ্ধ রহে, দেখি মনে কৃপা উপজিল।
হাট বাট পরিষ্কার, করিবারে ঝাড়ুদার, কৃপাসিন্ধুদাসে নিয়োজিল॥ ৯

(৪) আরে মোর বড় বাবা প্রেম-অবতার।
তবে আইল বৃন্দাবনে, ভজন বৈরাগ্যধনে, বিতরিতে করুণা অপার॥ ১

কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, শঙ্কর-মঠের পতি, নিবসয়ে বুদ্ধগয়া ধাম।
পাইয়া ভজন-গন্ধ, প্রেমরসে হয়ে অন্ধ, বাস কৈল গোপেশ্বর ঠাম॥
প্রেমভক্তি-রসপূর, পিয়ায়িল ভরপুর, বাহবা বলিয়া হারি যাই।
বেদান্ত বিচার গেল, ধন মান ডুবাইল, দয়ালুতা তার সম নাই॥ ৩
পুরীধামে রাধাকান্ত, তাহা বসে শ্রীমহান্ত, গন্তরায় রাধাকৃষ্ণ নাম।
অনন্ত গুণের খনি, প্রতাপে দিবসমণি, বৈরাগ্য-ভকতি-রসধাম॥ ৪
তাঁহাকে পাইয়া সুখে, স্নেহরসে ধরি বুকে, রতন-ভাণ্ডার উঘারিয়া।
সমর্পিল বহুধন, সদাব্রত-প্রবর্ত্তন, করিবারে পুরীধামে গিয়া॥ ৫
দীন হীন যতছিল, ভক্তি-রসে ডুবাইল, তারা যশ গায় চিরকাল।
ছিলা হেন গুণনিধি, অনুকূল হয়ে বিধি, ভাগ্য মোর বড় ভালে ভাল॥ ৬
প্রভু শ্রীপ্রাণগোপাল, তিঁহ পরম দয়াল, বিদ্যাভক্তি-বহুগুণখনি।
নিত্যানন্দ-বংশধর, তারিতে দুঃখি পামর, প্রতাপে প্রচণ্ড দিনমণি॥ ৭
যোগ্য পাত্র বিবেচিয়া, পরমআনন্দ হিয়া, সিদ্ধান্ত-রতন দিলা দান।
গৌরাঙ্গ-স্বরূপ কথা, লীলাগুণ-তত্ত্ব-গাথা, নিত্যানন্দ-স্বরূপ আখ্যান॥ ৮
রাধিকা-স্বরূপ-ভাব, গুণপ্রেম অনুভাব, সেবাপরা সখীর মহিমা।
ভাব-ভক্তি-অকিঞ্চনা, প্রেম-সেবন সাধনা, শাস্ত্রযুক্তি-সদাচার সীমা॥ ৯
অমূল্য রতন পাইয়া, তিঁহ পূর্ব্বদেশে গিয়া' দীনহীনে দিলেন যাচিয়া।
তাঁর কীর্ত্তি হর্ষান্বিতে, ভক্তিসন্দর্ভ প্রকাশিতে, আত্ম পত্রে রেখেছে লিখিয়া॥
বিনোদবিহারী গোঁসাই, যারগুণ অন্ত নাই' বেদান্তরতন শিরোমণি।
অমানী মানদ ধীর, দয়ালু বদান্য বীর' ভকতি-বৈরাগ্যরত্ন-খনি॥ ১১
গদাধর শ্রীচরণ, যাঁহার একান্ত ধন, জগ মাহি বড় ভাগ্যবান্।
ভবিষ্য জীবের তরে, ভাণ্ডার তাঁহার করে, সমর্পিয়া হৈলা অন্তর্দ্ধান॥ ১২
আশ্বিনী কৃষ্ণা চতুর্থী, অন্ধকার করি পৃথ্বী, ভাগ্যচন্দ্র অস্তমিত হৈল।
কৃপাসিন্ধু ভাগ্যমন্দ, পথহারা হৈল অন্ধ, ভবকূপে ডুবিয়া মরিল॥ ১৩

শ্রীরামচন্দ্র দাস বাবাজি মহাশয় (মুর্শিদাবাদ)

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জের অপর পারে জঙ্গীপুরে একটি বাগানের মধ্যে পাকা কুটিরে ইনি থাকিতেন। ইনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে এ সম্প্রদায়ের আশ্রয়-স্বরূপ বিবর্দ্ধিষ্ণু ভক্ত-কল্পবৃক্ষসমূহ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যদিও সকলের পরম আশ্রয়, তথাপি এ মায়াময় সংসারে শ্রীশ্রীগৌর-প্রতিনিধিরূপে ভক্তশ্রেষ্ঠের সহায়তা ব্যতীত প্রাণ উৎসাহিত হয় না। তিনি ভক্তগণের এ অভাব দূর করিবার জন্য শ্রীলমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়কে যোগ্যপাত্র-বিবেচনায় কৃপাশক্তি সঞ্চার করত কাশিমবাজারের আধিপত্যসহ বিবিধ বৈষ্ণবসেবা করাইয়াছেন। মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র যে সমস্ত দেশ-বিখ্যাত কার্য্য এ সম্প্রদায়ের জন্য করিয়াছেন, তৎসমস্তই বাবাজি মহাশয়ের কৃপা-প্রসূত।

১৩১৪ সনের মাঘমাসে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ মহোদয় ঐ জঙ্গীপুরের বাগানে দুই ঘণ্টার জন্য ইঁহার সাক্ষাৎকার পান। তখন তাঁহার বয়স ১১০ বৎসর হইলেও মনে হইল যেন ৭০।৭২ বৎসর। প্রথমেই তিনি কামিনী বাবুকে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহাতে কামিনী বাবু তাঁহার ভাই-সম্পর্ক হইলেন। রাজর্ষি বাহাদুরের সহিত কামিনী বাবুর সংস্রবের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—'বনমালী এখন যে বাগানে আছে, আমি পূর্ব্বে যখন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম, তখন ঐ বাগানে বকুল বৃক্ষাদি লাগান হইতেছিল। যখন শ্রীবৃন্দাবন গোয়ালিয়রের রাজার অধীন ছিল, তখন ঐ বাগান ঐ রাজার মুদী খোসাল শেঠ প্রস্তুত করাইয়াছেন। রাজা শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে আসিলে ঐ বাগানটি দেখেন এবং অভ্যন্তরে শ্রীসীতা ও ঊর্মিলাসহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণজি ও শ্রীগোবর্দ্ধননাথজির সেবা দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সেবা ও বাগানের

খরচনির্ব্বাহের জন্য রাজপুরা গ্রামখানির সম্পূর্ণ আয় দান করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঐ বাগান ও গ্রামের 'মাফি' অর্থাৎ নিষ্কর সত্ব ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন। শুনিয়াছি—বনমালীর বহুমূত্র রোগ হইয়াছে। তাহাকে বলিবে সে যেন এ রোগের জন্য চিন্তিত না হয়। আমারও ৪০ বৎসর বয়সে এ রোগ হইয়াছিল, এখন ত ১১০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত আছি। মণি বনমালীর মত ভক্ত নয়; তবে আমি ওকে প্রীতি করি কেন? সম্প্রদায়ে বৈষ্ণবের একটি আশ্রয় হউক—এই অভিপ্রায়ে। সে আমাকে মাঝে মাঝে কিছু দেয়, আমি তাহা খাই না, তাহার কাজেই লাগাই। তাহার সঙ্গে আমার সংস্রব আছে বলিয়া অনেক বৈষ্ণব আমার নিকট আসেন—আমি তাঁহাদিগকে সেই টাকা দেই।"

কামিনী বাবু দ্বারা তিনি তখন রাজর্ষি বাহাদুরকে এক চিঠি লিখাইলেন। সে ভাষার কি পরিপাটী! আরম্ভ করিলেন—

"গ�ৌরাঙ্গসুন্দর আমার প্রাণকুবলয়-শশী।
যেথা গৌরকথা আমি সেথাতে বাস ভালবাসি॥"

তাহার পর শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের একটী পদ লিখাইলেন—

"সেজন কেমন লোক গৌরাঙ্গ পাসরে।
প্রাণের সহিত যার আছে পরিচয় গো, সে কি গোরা পাসরিতে পারে॥"

ইত্যাদি। মণি একখানি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-নামক গ্রন্থ ছাপাইয়াছে এবং তোমাকেও একখণ্ড দিয়াছে। সে জানেনা যে ঐ গ্রন্থ আমাদের সম্প্রদায়ের নহে—উহা সহজিয়া সম্প্রদায়ের। তুমি ঐ গ্রন্থ যমুনায় দিবে।" আরও অনেক প্রীতির কথা পত্রে তিনি লিখাইয়াছিলেন।

কামিনী বাবু তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন না করিতেই তিনি নিজেই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। তিনি একবার কোথাও কীর্ত্তন শুনিতে বসিয়াছিলেন—শ্রীরাধারাণীর প্রাণে যে রসটি উদিত হয় নাই,

গায়ক সেই রসের আখর দিলে তিনি প্রাণে আঘাত পাইয়া তদবধি কোথাও গান শুনিতে যাইতেন না। কামিনী বাবুকে কিছু খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া তিনি সেবককে দুধ দিয়া ক্ষীরসা করিতে বলিলেন। পরে একটা বাটীতে উহা রাখিয়া নিজের বুকের কাছে ধরিয়া তিনি তাহা ভোগ দিলেন—বোধ হইল যে তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও চিহ্ন, চিত্রপট, নাম অথবা তৎস্ফূরক কিছু ছিল, তাহাতেই ভোগ দিয়া নিজে একটু খাইয়া কামিনী বাবুকে বাটীটা দিলেন। তাঁহার নিকট আসিবার কালে কামিনী বাবু প্রভৃতি যে জুতা বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন—তাহা কুকুরে নিয়া যাইবে ভয়ে তিনি যে কখন সরাইয়া রাখাইয়াছিলেন, তাহা কেহই বুঝিল না, যাইবার সময় কিন্তু তাহা দেখাইয়া দিলেন। ঐ সময়েও নাকি তিনি ／১, ／১।০ চাউলের অন্নপ্রসাদ পাইতেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি অপ্রকট হন।

শ্রীরামতনু মুখোপাধ্যায় (ভাগবৎভূষণ) *

নদীয়া জেলায় জন্ম—চারি ভ্রাতার মধ্যে ইনি মধ্যম। বড় ভাই বেদান্তবাগীশ বহুশাস্ত্রপাঠেও প্রাণে শান্তি না পাইয়া গৃহত্যাগ করেন এবং বহুতীর্থভ্রমণান্তে জনৈক সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মার সঙ্গগুণে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া স্বানুজ রামতনুকে বৈষ্ণবধর্মযাজনে উপদেশ দেন। রামতনু শ্রীমদ্‌ভাগবত ও গোস্বামি-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া 'ভাগবতভূষণ' উপাধি লাভ করেন এবং পরমানন্দে শ্রীগৌরভজনে প্রবৃত্ত হন। রাণাঘাটের নিকটবর্তী উলাগ্রামে স্বীয় শ্বশুরালয়ে বাসকালে ইনি শাক্তপ্রধান ঐ গ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

* শ্রী বন্ধুপ্রিয়াগৌরাঙ্গের ছায়াবলম্বনে।

প্রচার করিতে গিয়া উৎপীড়িত হন এবং তদবধি জিরাট বলাগড়ে আসিয়া ভগিনীর বাড়ীতে থাকেন। এখানে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা পাইলেন এবং ভক্তসমাজে অনর্গল গৌরকথা কহিতে থাকেন। কলিযুগোপাস্য শ্রীগৌরই ইহার প্রাণের আরাধ্য দেবতা এবং আজীবন গৌরমন্ত্র ও পঞ্চতত্ত্বের নাম জপ করিয়াই ইনি পরমানন্দভাগী হন।

ভাগবতভূষণের সঙ্গে নবদ্বীপে গঙ্গাতটে সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবার প্রথম মিলন হয়। তদবধি তাঁহারা একত্র কয়েকদিন যাবৎ শ্রীগৌর-দর্শন, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রেমরসালাপ ও গৌরকীর্ত্তন প্রভৃতি যাজন করিতে করিতে গাঢ় প্রণয়াবদ্ধ হন। ভাগবতভূষণের অনুরোধে শ্রীচৈতন্যদাস বাবা জিরাট বলাগড়ে গিয়া পরম গৌরভক্ত জিয়ড় নৃসিংহের সহিত মিলিত হন। এই পুরুষত্রয়ের মিলনে যে প্রেমের উৎস উঠিল, তাহার স্রোতে জিরেট, বলাগড় ও বর্দ্ধমান ভাসিয়াছিল—রাঢ়দেশ ডুবুডুবু হইয়াছিল।

ভাগবতভূষণ যখন বলাগড়ে গৌর মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছিলেন, তখন জিয়ড় নৃসিংহ—কেশব মজুমদার প্রভৃতি ভক্তের সহিত নির্জনে তাঁহার বর্ধমানের বাটীতে গৌরভজন করিতেছিলেন। ভাগবতভূষণ ও জিয়ড় নৃসিংহ মিলিত হইয়া গাঢ় হৃদ্যতায় আবদ্ধ হইলেন। উভয়ের অকৈতব গৌরপ্রেম, কিন্তু জিয়ড় উহা নির্জনে নিজ জনের সঙ্গে ভোগ করিতেন, ভাগবতভূষণ কিন্তু তেজীয়ান্, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন বলিয়া তাহা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে ভালবাসিতেন। এইজন্য তিনি দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন এবং প্রায় সর্ব্বত্রই গৌর-গোষ্ঠী স্থাপন করিতেন।

ভাগবতভূষণের ন্যায় তৎকালে ভাগবত-পাঠক কেহ ছিলেন না—লোক স্তম্ভিত হইয়া ইহার পাঠ শুনিত। পাঠ করিতে করিতে

সুযোগ পাইলেই ইনি শ্রীগৌরমাহাত্ম্য প্রচার করিতেন। কোন কোন সময় শাক্ত পণ্ডিতদের সহিত ইহাঁর তর্ক লাগিত। কিন্তু ইনি সুদৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি-বলে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। শাক্তদের দল প্রবল হইলে, তাহারা তাঁহাকে পাণ্ডিত্যে বা ভক্তিতে ঠেকাইতে না পারিয়া ঠাট্টা করিয়া অপদস্থ করিত। কলিকাতায় হালদার বাবুদের বাড়ীতে একদিন রাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠকালে এক শাক্ত পণ্ডিত যোগ-মায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দর্শন পাইলেন শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন যে তবে ত যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা বড়। ভাগবতভূষণ বলিলেন—'যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবাহিনী ব্যতীত আর কেহই নহেন, শ্রীকৃষ্ণের কোনও কার্য্যসাধন নিমিত্ত যোগমায়ার প্রয়োজন হয়, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, যোগমায়ায় নয়।' ইহাতে শাক্তেরা উগ্র হইয়া উঠিলেন। হালদার বাবু রঙ্গ দেখিতেছেন। এ অবস্থায় ভাগবতভূষণ 'জয় গৌরাঙ্গ' বলিয়া পুঁথি বাঁধিয়া হালদার বাবুর বাড়ী ত্যাগ করেন।

ক্রমে তিনি ফরিদপুর অঞ্চলে বহুদিন ভাগবত পাঠ ও গৌর লীলা প্রচার করত গৃহে ফিরিবার পথে কাটদহার জমিদার গুরুদয়াল সিংহের বাটীতে উপস্থিত হন। গুরুদয়াল বাবু পরমার্থ চর্চ্চা করিলেও বাউল-সম্প্রদায়ী ছিলেন, কিন্তু ইঁহার সঙ্গ-প্রভাবে অল্প দিনেই গৌর-মন্ত্রগ্রহণ করিয়া পরম গৌরভক্ত হইলেন। ক্রমশঃ দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া ইঁহার নিকট গৌরমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। একসময়ে কাটদহার ভক্তবৃন্দ বৃহৎ নৌকাযোগে গৌরকীর্ত্তন করিতে করিতে বলাগড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন—পথে মাথাভাঙ্গা নদী ও চূরণী নদীর তীরস্থিত গ্রামসমূহে প্রবেশ করত ইঁহারা গৌর-সম্প্রদায় গঠন করিতে লাগিলেন। যে দিন হাঁসখালিতে নৌকা লাগান হয়—সেদিন ইঁহারা নৌকার উপরে এমনভাবে সংকীর্ত্তন

করিতেছিলেন যে তাহা শুনিয়া গ্রামবাসিগণ ইঁহাদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া ওখানে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করেন এবং প্রায় ৩০।৪০ জন লোক মন্ত্রদীক্ষা লইলেন। হাঁসখালির লোকেরা বহির্মুখ লোকের ঠাট্টা বিদ্রূপের ভয়ে মালা তিলক লইতে অনিচ্ছুক জানিয়া ভাগবতভূষণ বলিলেন—'তোমাদের মালা তিলক করিতে হইবে না; তবে তোমরা গৌরমন্ত্র জপ কর, ইহাতেই কল্যাণ হইবে।' বলা বাহুল্য—দ্বিতীয়বার যখন ইনি হাঁসখালিতে যান, তখন প্রায় প্রত্যেকেরই গলায় কন্ঠি ও ললাটে হরিমন্দির বিরাজ করিতে দেখিয়াছেন।

তৎপরে তিনি ঢাকা অঞ্চলে গৌরনাম-প্রচারে যান। লৌহজঙ্গে বাসকালে ইনি তত্রত্য বহুলোককে সৎপথে আনয়ন করেন। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক সাহা জমিদারের প্রবল প্রতাপের কথা শুনিয়া তিনি তাহার বাড়ীতে গিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় নেন। জমিদারটি প্রভুর আগমন শুনিয়া বাহিরে আসিলে ইনি জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি কি এ বাড়ীর কর্ত্তা?' উত্তর হইল—'আজ্ঞে হাঁ'; 'তুমি কি বৈষ্ণব?' উত্তর হইল—'আজ্ঞা হা'। চণ্ডীমণ্ডপের খাঁড়াখানা দেখাইয়া ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'তবে বৈষ্ণবের বাড়ী এ আবার কি?' জমিদার একটু উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিলে ইনি দণ্ডায়মান হইয়া সদম্ভে বলিলেন—'বেটা পাষণ্ড, বেরো, আমার সামনে থেকে বেরো বেরো।' জমিদারের মুখে আর কথাটি নাই। অপরিচিত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিজ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলিতেছেন,, অথচ তিনি উত্তর করিতেও পারিতেছেন না। জমিদার অপ্রতিভ হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ইনিও অন্য গৃহীর কুটীরে আশ্রয় লইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জমিদার গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে ভাগবত-ভূষণের সমীপে উপস্থিত। ইনি বলিলেন—'যদি তুমি একটি কার্য্য

কর, তবে আমি কৃপা করিব। চণ্ডীমণ্ডপের ঐ খাঁড়াখানি একশত ঢাক বাজাইয়া পদ্মার মধ্যে নিজহস্তে ফেলিয়া দিতে পার কি?' বলা বাহুল্য তৎপর দিনই জমিদার একশত ঢাক বাজাইয়া খাঁড়াখানি ঘাঁড়ে করিয়া পদ্মা মধ্যে 'জয় গৌরাঙ্গ' বলিয়া বিসর্জ্জন দিলেন। জমিদার ভাগবতভূষণের নিকট গৌরমন্ত্র দীক্ষা পাইয়া পরম ভক্ত হইলেন। আরো দুইটি ঘটনা এইরূপ—ফরিদপুরে মালদহার ফটিক সাহার বাটী হইতে এবং পাবনায় বাট্‌কেমারা কুরুলে গ্রামে তিলক ও কানাই সাহার বাটী হইতে খাঁড়াগুলি ইঁহারই আদেশে পদ্মায় বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছিল।

দিনাজপুরের মহারাজা পরম ভক্ত জানিয়া ভাগবতভূষণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। মহারাজ তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহার পাঠশ্রবণে আনন্দ পাইলেন। গৃহে ফিরিবার পথে ইনি বহু বৈষ্ণবস্থান পবিত্র করেন। একটি গ্রামে ভক্তসঙ্গ পাইয়া সেই খানেই রহিয়া গেলেন এবং আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। সঙ্গীয় শিষ্যগণের মধ্যে নিত্যানন্দ দাসই প্রধান ছিলেন—তাঁহারা প্রাণপণে ইঁহার সেবাশুশ্রূষা করিলেন বটে কিন্তু পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্তিমকাল আসন্ন জানিয়া ভাগবতভূষণ প্রকাশ্য-ভাবে নাগরীভাবে গৌরকীর্ত্তনের জন্য নরহরি, বাসুঘোষ, মাধবঘোষ ও লোচনদাস প্রভৃতির কৃত পদাবলী শুনিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ইঁহারা তাঁহাকে গান শুনাইতে লাগিলেন। অন্তিমকালে তিনি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর কৃত—'শুনি এ কি ধনি! চমকি উঠিয়া, ধরিল সে সখি করে।' এই গানটি শুনিতে শুনিতেই অপ্রকট লীলায় প্রবিষ্ট হন। ১২৫০ কি ১২৫১ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার নির্য্যাণ।

ভক্তগণ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে ভাগবত-ভূষণের দেহ-সংকারে চলিয়াছেন—খোল করতালযোগে কীর্ত্তন চলিতেছে—'হরিবোল

হরিবোল' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইল। নিত্যানন্দ দাস সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন—তাঁহার মুখে কথাটি নাই, চক্ষে জল নাই—শরীরে কোনরূপ শোক-চিহ্নও নাই। অন্যমনস্ক হইয়া যেন কি ভাবিতেছেন—চিতা সাজাইয়া ভাগবতভূষণের দেহ তাহার উপরে রক্ষিত হইলে নিত্যানন্দ দাস একদৃষ্টে তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে তিনি যেন সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। চিতায় অগ্নি দেওয়া হইল, চতুর্দিক হইতে হুহু করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল—অমনি 'হা নাথ' বলিয়া নিত্যানন্দ দাসও ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং ভাগবতভূষণের অর্দ্ধ দগ্ধ দেহ গাঢ় আলিঙ্গন করত চিতার উপর শয়ন করিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তত্রত্য জনতা বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন যে নিত্যানন্দ দাসের অঙ্গ দগ্ধ হইতেছে অথচ তিনি মহানন্দে ভাগবতভূষণের সহিত নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে জন কতিপয় তাঁহাকে বলপূর্ব্বক চিতা হইতে টানিয়া স্কন্ধে করিয়া গৃহে লইয়া গেল। অনেক সন্তর্পণের পর নিত্যানন্দ দাস বাঁচিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু গুরুর বিরহে তিনি বাতুলপ্রায় হইয়াছিলেন।

শ্রীরামদাস বাবাজি মহারাজ (বর্ষাণা ও লোটনকুঞ্জ)

পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীরমেশচন্দ্র দে (?)—ইনি শ্রীল অভিরাম গোপালের পরিবারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সখ্যরসে উপাসনা করিতেন। ব্রজমণ্ডলে আসিয়া তিনি সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের সঙ্গে ও কৃপাবলে শ্রীশ্রীরূপানুগ-ভজনে আকৃষ্ট হইয়া বর্ষাণায় গিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ইঁহার ভজন-খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় এবং তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য লোকের আন্তরিক ইচ্ছা হয়। বাহিরে নির্জনে ভজন করেন দেখিয়া তাড়াসের

রাণী ভানুকুণ্ডের তীরে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং তিনিও তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন—লোকসমাগমও বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; এদিকে তত্রত্য পাণ্ডাগণ তাঁহার প্রচুর ধন আছে বলিয়া সমালোচনাও চালাইল—এইভাবে তিনি ভজন-বিঘ্ন বোধ করিয়া ঐ কুটি ত্যাগকরত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ডাক্তার বিপিনবিহারী দাস-কর্ত্তৃক লোটনকুঞ্জে নির্ম্মিত কুটীতে অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া ভজন করিয়াছেন। ইনি জাতরতি সাধক ছিলেন, বরাবরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন—প্রতিজ্ঞাগুলি ডাইরীতে (স্মারকলিপিতে) লিখিয়া রাখিয়া তদনুযায়ী ভজন করিতেন। তাঁহার বালিশের নীচে একখানা বটি দেখিয়াছিলাম—জিজ্ঞাসাক্রমে জানা গেল যে-যে দিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর * নির্দিষ্ট ভজন-পথ হইতে তিনি বিচ্যুত হইবেন অথবা শিথিলতা আসিবে, সেইদিন ঐ বটি দ্বারা নিজের গলা কাটিয়া ফেলিবেন বলিয়া উহা নিকটেই রাখিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিজ্ঞাগুলি এইরূপ—(১) যে কোনও ব্যক্তি হউক না কেন, সে যদি আমাকে বিনা কারণে জুতা মারে, ঝাঁটা মারে, মুখে প্রস্রাব করে, গাত্রে বিষ্ঠা প্রদান করে, মাথায় বিশ ঘা লাথি মারে, কণ্টক দ্বারা শরীর বিদ্ধ করে, মনে বেদনাযুক্ত দুরুক্তি বলিয়া গালাগালি দেয় কিম্বা আমার মস্তকও ছেদন করে, তথাপি আমি বাক্যবান বা অস্ত্র চালাইব না ; সত্য, সত্য, সত্য—সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম। যদি এই প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করি, তবে ২৭৮৬০ যুগ কাল নরকে পচ্যমান হইব। আমার এই প্রতিজ্ঞা বিষয়ে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষী রহিলেন। এই নিয়ম—আমার জীবনকাল থাকা পর্য্যন্ত। যখন এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখন অগ্রে এই বঁটি দিয়া আপন মস্তকচ্ছেদন করিয়া

---

* ইনি মহাপ্রভুকে 'মহাভগবান্' বলিতেন।

ফেলিব—তবু শ্রীব্রজধামে দেহটা থাকিবে। সন ১৩৩৮ সাল ৮ই মাঘ বেলা দুইটার সময় এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা লিখিলাম।

(২) ব্রজ স্ত্রীলোকগণকে লক্ষ্মীদেবীর সমান ভক্তি করিতে হইবে আর ব্রজবাসী পুরুষগণকে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর সমান ভক্তি করিতে হইবে।……অতএব সাবধান, সাবধান, সাবধান—স্ত্রীলোক হউন কিম্বা পুরুষ হউন, সকলের নিকট গলে বস্ত্র দিয়া জোড়হস্ত হইয়া থাকিব। এই নিয়ম আমার জীবনকাল পর্য্যন্ত। সন ১৩৪৩ সাল ১৭ই ভাদ্র ১২টার সময় এই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিলাম।

(৩) স্বয়ং মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমুখে আমাকে কহিলেন—'দুর্জ্জয় পরমশত্রু মন দেহের মধ্যে বাস করিতেছে। ২৪ ঘণ্টা তাহাকে আধোয়া (?) ঝাঁটা মারিয়া বশীভূত করিয়া রাখিবে, নচেৎ ভজনসাধন নষ্ট করিয়া রৌরব নরকে লইয়া যাইবে। সর্ব্বতোভাবে মনকে নিগ্রহ করিয়া—তাড়ন ভৎর্সন করিয়া লীলায় নিযুক্ত করিবে। মন যখন অসৎপথে যাইবে, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে একাগ্রচিত্তে ডাক।'……

শ্রীরামহরিদাস বাবাজি মহাশয় *

১২৫৪ সালে শ্রীপাট শান্তিপুরে জন্ম হয়। বাল্যাবধি ধর্ম্মে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ ছিল—নামকীর্ত্তন শুনিতে সমধিক প্রীতি পাইতেন। যেখানে কীর্ত্তন হইত, সেইখানেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। ক্রমে জ্ঞানোন্মেষ হইলে বিবিবদ্ধভাবে ভক্তি-অঙ্গ যাজন করিতে থাকেন—কিন্তু পিতা মাতা তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া শীঘ্রই তাঁহার বিবাহ কার্য্য সমাধা করাইলেন। তাঁহার মন কিন্তু হরি-অনুরাগে সর্ব্বদাই বিভোর থাকিত। একদা সমীপবর্ত্তী সজিনা বৃক্ষে সুস্মিতবদন ও

* শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী ১।২৪০ পৃষ্ঠা।

নৃত্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইঁহার কৃষ্ণানুরাগ প্রবলতর হইয়া উঠে এবং ইনি, উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকেন। পিতামাতা প্রযত্নসহকারে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেও কিন্তু সাংসারিক অশান্তি হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ইনি বৈষ্ণবকৃপা লাভের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে ভজনকুঠিরের সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজি মহাশয়ের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ বাবা ইঁহার উৎকণ্ঠা দেখিয়া শ্রীখণ্ডনিবাসী তৎকালে ভজনকুটিতে অবস্থানকারী পূজ্যপাদ শ্রীরাধিকাবিলাস ঠাকুর মহাশয়দ্বারা দীক্ষা দেওয়াইয়া স্বয়ং ভেকাশ্রয় সংস্কার করিয়া নাম রাখিলেন—রামহরি দাস। পূর্ব্বাশ্রম নিকটবর্ত্তী হওয়ায় আত্মীয়স্বজনের উৎপাতে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক কঠোর ভজনে প্রবৃত্ত হন। বার বৎসর শ্রীরাধাকুণ্ডে কাটাইয়া পরে কেশীঘাটের ঠৌরে, বংশীবটে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান করেন।

সকলের প্রতি তাঁহার সমভাবে প্রীতি ও পূর্ণ ভালবাসা ছিল। সকলকে সস্নেহে ভজনোপদেশ এবং সদালাপ করিতেন। স্থুল দেহ দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে 'ভোলানাথ' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিলেই প্রেমের মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত। ভক্তমণ্ডলীর নিকট গৌরকথা কহিতে কহিতে তিনি এরূপ ভাবাবিষ্ট হইতেন যে তিনি ভক্তগণের প্রত্যেককেই রমণীসুলভ মৃদুমন্দ স্বরে বলিতেন—"তোমরা প্রত্যেকেই আমাকে 'বড় দিদি' বলিয়া ডাক"—ভক্তগণ তাঁহার আজ্ঞাপালন করিলে তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। তিনি এক একদিন এক একজন গৌর পরিকরের চরিত্র আলোচনা করিতেন। আলোচনাকালে তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইত। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-কীর্ত্তন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। শিষ্যদিগকে শ্রীলোচনদাসের ধামালী নিত্য পাঠ করিতে তিনি আদেশ দিয়াছেন এবং প্রত্যেককে ঐ গ্রন্থ একখানি দিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গল

কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি যেরূপ গৌরাঙ্গের নিভৃত রসলীলা বর্ণনা করিতেন, এমন আর কুত্রাপি শুনা যায় না। নামকীর্ত্তনেও তাঁহার তদ্রূপ প্রীতিই ছিল। তাঁহার হৃদ্‌রোগ ছিল বলিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহাকে উচ্চ কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেও কিন্তু খোলকরতাল-নাদ শুনিলেই তিনি গৃহ হইতে লম্ফ দিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে পড়িতেন এবং অতি সুমধুর নৃত্য করিতেন। কীর্ত্তনকালে গাত্রাচ্ছাদনী ও বহির্বাস কোথায় পড়িয়া যাইত—তাহার কোনই উদ্দেশ থাকিত না। নরহরি-পরিবারভুক্ত ছিলেন বলিয়া নরহরির প্রতি স্বাভাবিক প্রিয়তা ত ছিলই—গৌরাঙ্গনামেও তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে কাহারও মুখে গৌর-নাম শুনিলেই তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতেন।

অধিকাংশ সময়েই তিনি ভাবে বিভোর থাকিতেন। প্রসাদ পাইবার সময় অতি ধীরে ধীরে প্রসাদ মুখে তুলিতেন এবং তন্মধ্যে অর্দ্ধেক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িত। শিষ্যদিগকে স্বসমীপে বসাইয়া নিজ নিজ 'স্বরূপ' চিন্তা করাইতেন এবং কাহার কিরূপ স্ফূর্ত্তি পাইত, তাহা তাহাদের নিকট শ্রবণ করিতেন। তিনি বলিতেন যে নিজ নিজ স্বরূপের অনুভূতি আসিলে রসময় গৌরলীলায় সেবাধিকার লাভ হয়। চলিবার সময় শিষ্যদের মধ্যে যদি কাহারও পদশব্দ হইত, তবে তাহাকে বলিতেন—'এ নিশ্চয় গরু চরাবে!' তাঁহার শিক্ষাই ছিল—খাইতে শুইতে সর্ব্বদা স্বরূপ জাগাইতে হইবে। প্রিয়বস্তুসন্দর্শন-জনিত প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সেই বস্তু যেন হৃদয়ে ধারণ করত ভূমিতে ঢলিয়া পড়িতেন এবং কত ভাবভূষণে ভূষিত হইতেন—তাহা ভাষার অতীত।

সিদ্ধ জগন্নাথ বাবার গণের প্রতি তাঁহার সাতিশয় প্রীতি ছিল। পরম পূজাস্পদ শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজি মহাশয়কে তিনি 'নাতিচেলা'-জ্ঞানে পরমপ্রীতি করিতেন—ক্রোড়ে ধারণ করিয়া চুম্বন

করত শ্রীগৌরাঙ্গের রসতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। তিনি গৌরাঙ্গের রসলীলা চৈতন্যমঙ্গলের সুরে কীর্ত্তন করিতেন এবং শ্রীল রামদাস বাবাজি মহাশয় ধুয়া গাহিতেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। যদি কেহ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, তিনি তাহাকে সর্ব্বাগ্রে মালা চন্দন অর্পণ করত ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক প্রেমে মগ্ন হইতেন। কিছুক্ষণ পরে প্রেম সম্বরণ করত নবদ্বীপ প্রাণনাথ ও তাঁহার দাসদাসীর কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। নবাগত ব্যক্তি তাঁহার প্রেমদর্শনে তাঁহাকে সুস্থ করিবার অভিপ্রায়ে যদি বলিতেন—'আপনার প্রাণনাথ ও তাঁহার দাসদাসীগণ আপনার জন্য উৎকণ্ঠিত আছেন।' তখন তিনি আবার ভাবে বিভোর হইতেন। গৌড়দেশ হইতে কোন ভক্ত তাঁহাকে দেখিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে নবদ্বীপধামে গৌরাঙ্গের দর্শনকথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তদ্বিষয়ে অনুকূল উত্তর না পাইলে তাহাকে অবিলম্বে নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীনিতাই গৌর-সীতানাথের দর্শন করিতে এবং গৌরভক্তের সঙ্গ করিতে পরামর্শ দিতেন।

স্বীয় আশ্রমে অবস্থানকালে ইনি সর্ব্বদাই গোরা-নামসুধারস পান করিতেন। এই রসে তিনি এতই বিভোর হইতেন যে ভাবাবেশে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালিত হইত, আবার কটিদেশের ঈষৎ 'ঢুলানি' বড়ই মধুর লাগিত। আশ্রম হইতে স্থানান্তরে গমনকালে 'রাই জয় জয় রাধে রাধে।' বলিতে বলিতে যেন কি এক অভিমানে চলিতেন এবং মধ্যে মধ্যে গাহিতেন—'রাইঅঙ্গের ছটা লেগে শ্যাম হলো গোরা।'

যৎকালে রাজর্ষি বনমালী রায়বাহাদুর শ্রীকুণ্ডে বাস করেন, তখন ইনিও তথায় শ্রীকুণ্ডতীরে লালাবাবুর কুটীরে অবস্থান করিতেন। একদিন শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের প্রসাদ অন্নজলসহ মাখিয়া পাইতে পাইতেই

একটি অম্ল ও একটি ডাল আঙ্গুলে তুলিয়া কোন লীলাবিশেষ স্ফুরণে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং 'গৌর গৌর' বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গৌরগতপ্রাণ বৃদ্ধ শ্রীমথুরদাস বাবাজি মহাশয় তখন ঐ স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনিও আসিয়া যোগদান করিলেন। পূজনীয়বর্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীব্রজবালা মহাশয়, শ্রীগিরিধারী দাস বাবাজি মহাশয় এবং শ্রীমাধবদাস বাবাজি মহাশয় প্রভৃতি আসিয়া ঐ কীর্ত্তনে যোগদান করায় তুমুল আনন্দ হইয়াছিল। তিনি কীর্ত্তনে যোগদান করিলেই প্রচুরতর আনন্দ হইত।

১৩১৪ সালের ভাদ্রী শুক্লা চতুর্থী দিবসে একপ্রহর বেলা অতীত হইলে তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন—'শ্রীবাসপ্রাঙ্গণে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরগণ বিলাসিনীর ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। আমাকে শীঘ্র তথায় যাইতে হইবে। শীঘ্র আমাকে স্নান ও তিলকাদি করিয়া যাও।' আজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে তিনি নয়ন মুদ্রিত করত ধ্যানে বসিয়াই স্বাভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তি করিলেন।

শ্রীরামানন্দ দাস বাবাজি মহাশয় (শ্রীবৃন্দাবন)

শ্রীহট্ট জিলায় ইঁহার জন্ম—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারে 'বামকৌপীনা' নামক উপসম্প্রদায়ে প্রথমতঃ দীক্ষিত ছিলেন। আকুমার বৈরাগী, পদব্রজে চারি ধাম পরিক্রমা করত ইনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া 'বামকৌপীনা' উপসম্প্রদায় জানিয়া পুনর্ব্বার যথাযথ ডান দিকে গাঁট দিয়া ডোর কৌপীন পরিলেন। নিধুবনে কয়েক বৎসর ভজন করত ইনি শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইয়া রাজর্ষি বাহাদুরের সাহায্যে কিছু দিন শ্যামকুণ্ডতীরে ও কয়েক বৎসর শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণ তীরের কুটীরে অবস্থান করত আবার রাজর্ষি বাহাদুরের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে বিনোদবাগে বাস করেন। ইনি পরম প্রেমবান্ ও মাৎসর্য্য কৌটিল্যাদিশূন্য ছিলেন।

শ্রবণকীর্ত্তনে ইঁহার নিরতিশয় প্রীতি ছিল, শ্রবণে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। রাজর্ষি বাহাদুর ও তৎপত্নীর শ্রীধামলাভের পরে ইনিই শ্রীশ্রীবিনোদের সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

একদিন ইঁহার শরীর সামান্য অসুস্থ হইল। খবর দিয়া ৺মাধব দাসজিকে ও শ্রীস কামিনী কুমার ঘোষ মহাশয়কে বিনোদবাগে আনান হইল। তিনি নিজের দৈনন্দিন কৃত্য করিয়াছেন—শ্রীমদ্ ভাগবত পারায়ণ করাইয়া শ্রবণ করিলেন—রাত্রিতে শ্রীবৃন্দাবনের কীর্ত্তনীয়া শ্রীরামদাস বাবাজি মহাশয়দ্বারা 'রূপাভিসার' কীর্ত্তন করাইয়া শুনিলেন—কীর্ত্তনীয়াদিগকে ভোজন ও দক্ষিণা দিয়া বিদায় করা হইল। শ্রীমাধব দাসজি, কামিনী বাবু ও বিপিন বিহারী দাস —এই তিন জনে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেছেন—ভাদ্রমাস, রাত্রি বারটায় ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল দেখিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি কামিনী বাবুর দিকে তাকাইয়া একটু হাঁসিয়া মুখ ঢাকিলেন। একটার সময় শ্বাস দীর্ঘ হইল এবং দুইটার সময় কোনও সাড়া না পাইয়া মুখের কাপড় তুলিয়া দেখা গেল—তিনি রজঃলাভ করিয়াছেন [ভাদ্রী শুক্লা তৃতীয়া]।

সিদ্ধ শ্রীশ্যামদাস বাবাজি মহাশয় (উৎকলবাসী)

যে সময়ে রাজীবলোচন রায় মহাশয় কাশীমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান ছিলেন, সেই সময় একদিন একটি কাঠের ভেলায় চড়িয়া গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব গুহাবাটীর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঐ ভেলায় সেই বাবাজি-কর্ত্তৃক গঙ্গাগর্ভে প্রাপ্ত শ্রীগোপালবিগ্রহ ছিলেন এবং বিগ্রহসেবোপযোগী যৎসামান্য পাত্রাদিও ছিল। বাবাজি মহাশয়ের ব্যবহারোপযোগী একখানি ছেঁড়া কম্বল ও ভিক্ষার জন্য একটি বেতের ধামা ছিল। ভেলা হইতে ঘাটে নামিয়া

বাবাজি মহাশয় গায়ে কম্বল জড়াইয়া ধামাহস্তে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ঘাটের উপরেই দেওয়ান রাজীব বাবুর বাড়ী। বাবাজি মহাশয় ভিক্ষার জন্য তথায় প্রবেশ করিলে রাজীব বাবু তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সেই বাবাজিকে দেখিয়া কিছু চাউল ও তরকারী প্রভৃতি দিলেন। তিনি সবই পাক করিয়া শ্রীগোপালজির ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইলেন। পরে জানা গেল যে বাবাজি মহাশয়ের নাম— শ্রীশ্যামদাস। দ্বিতীয় দিনে তাঁহার নিকট চারি মূর্ত্তি বিশিষ্ট বৈষ্ণব আসিলে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসাইয়া তিনি ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ঐদিনও প্রথমতঃ রাজীব বাবুর বাড়ীতে গিয়া বলিলেন 'রাজীব বাবু! তোর ভাগ্য ভাল, চারি মূর্ত্তি বৈষ্ণব আসিয়াছেন!' রাজীব বাবু এই কথা শ্রবণমাত্রই তাঁহাকে দশটি টাকা দিতে উদ্যত হইলে তিনি 'অত কি হইবে?' বলিয়া দুই টাকা মাত্র লইলেন। রাজীব বাবুর উদারতা ও দানশীলতা দেশ-প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীশ্যামদাস বাবাজি মহাশয়ের বৈরাগ্য ও (শাস্ত্রানুসারে) অতিথি-বৈষ্ণবে অধোক্ষজ বুদ্ধি এবং তাঁহাদের সেবায় প্রযত্ন দেখিয়া তত্রত্য সদাশয় ব্যক্তিগণ বাবাজি মহাশয়ের জন্য আখড়া ও ঠাকুরের জন্য শ্রীমন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। তিনি কোন অতিথিকে ফিরাইতেন না এবং যেদিন যাহা ভিক্ষায় আসিত, তৎসমস্তই রন্ধন করিয়া ভোগ দিতেন। উপস্থিত বৈষ্ণব অপেক্ষা জিনিষ বেশী হইলেও তিনি মনে করিতেন যে তিনি খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব পাঠাইতে-ছেন। ফলতঃ প্রসাদের উপযুক্ত অতিথিও উপস্থিত হইতেন। ইচ্ছা করিয়া তিনি কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করিতেন না (তাহা রাজীব বাবুর ব্যাপারেই প্রকটিত হইয়াছে)। তাঁহার সেবা পরিপাটীতে লুব্ধ হইয়াই যেন শ্রীনিতাইগৌর, শ্রীরামসীতা ও শ্রীগোপাল গোবিন্দ প্রভৃতি বহু বিগ্রহ আসিয়া শ্রীমন্দিরে সেবিত হইতে লাগিলেন।

কোন সময় অত্যন্ত বৃষ্টিবশতঃ সমস্ত দিনের মধ্যেও ভিক্ষায় বাহির হইবার সুযোগ ঘটিল না। এ দিকে মন্দিরের শ্রীবিগ্রহগণ এবং উপস্থিত অতিথিসকল উপবাসী থাকিবেন জানিয়া বাবাজি মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও হাসিয়া হাসিয়া ঠাকুরদিগকে বলিতেছেন—'পুট্‌কি শুখাক্'। এই বলিয়া প্রচুর পরিমাণে তুলসীপত্র চয়নপূর্ব্বক ঠাকুরদিগকে অর্পণ করত অতিথি বৈষ্ণবগণকেও সেই প্রসাদী তুলসী প্রদান করিয়া বলিলেন —'আজ ত আমার ভাগ্যে এইমাত্রই হইল, ভোগের অতিরিক্ত যদি কিছু আসে, তবে তখন দেখা যাবে'। আশ্চর্য্যের বিষয়—কিয়ৎকাল পরেই বহরমপুরের জমিদার স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের পিতা বাবাজি মহাশয়ের কথা চিন্তা করিয়া ভোগের উপযোগী প্রচুর সামগ্রী যত্ন সহকারে ৪।৫ জন লোকদ্বারা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বাবাজি মহাশয়ও পরমানন্দে তৎসমস্ত রন্ধন পূর্ব্বক ঠাকুরের ভোগ লাগাইলেন এবং প্রসাদ দ্বারা সমাগত অতিথিগণের সৎকার করিলেন। এইরূপ ঘটনা তাঁহার প্রায়ই সঙ্ঘটিত হইত।

কিছুদিন পরে মুরশিদাবাদের কোনও এক ভক্ত যাত্রী শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে যান। এদিকে সিদ্ধ শ্যামদাস বাবাজি মহাশয় শ্রীগঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করেন। আখড়াতেই তাঁহার দেহ সমাহিত হয় এবং যথাযোগ্য সেবাও চলিতে থাকে। শ্রীবৃন্দাবনগামী ভক্ত যাত্রী জানিতেন না যে শ্রীশ্যামদাস বাবাজি মহাশয় অপ্রকট হইয়াছেন। একদিন তিনি হঠাৎ শ্রীবৃন্দাবনের পথে বাবাজিমহাশয়ের দর্শন পাইলেন এবং পরস্পর জিজ্ঞাসা হইল—কে কবে আসিয়াছেন ও কতদিন থাকিবেন? তাহাতে ভক্তযাত্রী বলিলেন—তিনি দেশে শীঘ্রই ফিরিবেন। শ্রীশ্যামদাস বাবাজি মহাশয় বলিলেন—'শ্রীমন্দিরে কাঁশর নাই, আমার যাইতে বিলম্ব হইবে; একখানা কাঁশর কিনিয়া দেই, তোমরা নিয়া মন্দিরে দিও।' এই বলিয়া একখানি কাঁশর কিনিয়া

দিলেন। ভক্তযাত্রী মুরশিদাবাদে ফিরিয়া আসিয়া আখড়ার তাৎকালিক সেবায়েত বাবাজি মহাশয়কে কাঁশরখানি দিয়া সিদ্ধ বাবাজি মহাশয়ের কথা নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া তিনিও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'বাবাজি মহাশয় ত অনেকদিন দেহরক্ষা করিয়াছেন—এই ত তাঁহার সমাধি!' তখন সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং কাঁশরখানি শ্রীমন্দিরে রাখিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। অদ্যাপিও চন্দন-লিপ্ত কাঁশরখানি দেখিতে পাওয়া যায়। অহো! ভক্তদেহ চিন্ময়, কখনই নষ্ট হয় না!!

শ্রীসীতানাথ দাস বাবাজি মহারাজ

(শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, গোবর্দ্ধন) *

পূর্ব্বাশ্রমে ইনি উৎকলবাসী গোপ ছিলেন—অতিসরল ও উদার প্রকৃতি। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিতেন না—তবে আজীবন আপনার ভাষা ত্যাগ করেন নাই। শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে শ্রীনাথজির মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে একটি কুটীরে ইনি বাস করিতেন। তাঁহার ভজন ছিল—ক্রন্দনের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন। তিনি শেষরাত্রে স্নানান্তে শ্রীগিরিধারীর সেবা সারিয়া তাহার অগ্রে পাঁচ ঘণ্টা যাবৎ নৃত্য কীর্ত্তন করিতেন। তারপরে বাহির হইয়া তুলসীর স্নান পূজা ও সেবা করিয়া শ্রীনাথজির সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎপূর্ব্বক নিজ উৎকল ভাষাতে প্রার্থনাদি করত কাঁদিতেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি কোমর বাঁধিয়া মাধুকরীতে যাইতেন—জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর সূর্য্যকিরণে গিরিরাজতটের বালি অতিশয় তপ্ত হইয়া যাইত। ছত্র-পাদুকাশূন্য এই বৃদ্ধ বাবাজি ঘরে ঘরে মাধুকরী করিয়া ফিরিবার সময় বৈষ্ণবদের কুটীরে কুটীরে কিছু কিছু দিয়া তবে নিজ ভজনকুটীরে ফিরিতেন।

* শ্রীল অদ্বৈতদাস বাবাজি মহারাজের মুখাশ্রিত।

গোপগীতি কতকগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল—তাহাই অধিকাংশ সময়ে এত মধুর ভাবে গান করিতেন যে তাহা শুনিয়া সকলেরই মনপ্রাণ হরণ হইত। নিয়মপূর্ব্বক দুই বার করিয়া তিনি শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে স্নান করিতেন—রাত্রি দুইটায় উঠিয়া তিনটাতে প্রথম স্নান হইত। শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজি বলিলেন—'এই সময় স্নান ঠিক নহে—উহা আসুরিক কাল।' তিনি বলিলেন—'আমার স্বাতন্ত্র্য-লেশ নাই—শ্রীনাথজি যখন আমাকে উঠাইয়া দেন, তখনই উঠিয়া স্নান করি।' এই কথাটি যে সত্য তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষিতও হইয়াছে। যে দিন তিনি অপ্রকট হইয়াছেন, তাহার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সান্নিপাতিক জ্বরাতিসার হইয়াছিল। তাহাতেও স্নানের নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই। শেষদিন অবশ হইয়া পড়িয়া আছেন—তখন মাঘ মাস, শীতকাল। শ্রীল অদ্বৈতদাস বাবাজি মহাশয় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন—ঠিক তিনটা বাজিল কুণ্ডমধ্যে তাঁহার স্নানের শব্দ হইল—তিনি উঠিয়া দেখিলেন যে বৃদ্ধ বাবাজি স্নানই করিতেছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজি মহাশয় বলিতেছেন—"এক বৎসর পর্য্যন্ত আমার জ্বর লাগিয়াছিল—তিনি প্রতিদিন আমাকে মাধুকরী করিয়া খাওয়াইতেন। সেই এক বৎসরের পর আমার সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত বাহির হইয়াছিল। কেহ বলেন—'পিত্ত বাহির হইয়াছে।' তিনি বলেন-'তোমার মাতা হইয়াছে।' আমি তখন মনে করিলাম—মাতা কৃষ্ণের ভগিনী, তবে আমারও গুরুভগ্নী হইবে। এই ভাবিয়া মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম করিতেছি—এমন সময় চক্ষু নিমীলিত হওয়ায় দেখিতেছি—আমি যেন শ্রীগোবিন্দকুণ্ড পরিক্রমা করিতেছি। তটের চারিদিকে কত কত মহাপুরুষ ভজন করিতেছেন—এক এক জনের মূর্ত্তি ২০।২২ হাত লম্বা, কিন্তু শুষ্ককায়। শ্রীনাথজির সামনে যে বৃহৎ স্থূল তেঁতুল বৃক্ষটি আছে, তাহাতে দেখিলাম—সুবিস্তীর্ণ জটাজুট বিকিরণ করিয়া

এক মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। সেই সব মূর্ত্তি অতিতেজস্বী এবং জ্যোতির্ম্ময় হইলেও আমার কোন ভয় হইতেছে না—স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের চরণের নিকট গিয়া প্রণাম করিলাম। তাঁহারা কিছু বলিলেন না—কেহ বা হস্ত উত্তোলিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করার ন্যায় ভঙ্গী করিলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করিয়া আসিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর আসনের পার্শ্বে প্রাচীরের সুবিস্তৃত বেষ্টনীর মধ্যে কতকগুলি জীর্ণ ভগ্ন কুটীর দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে মনুষ্য নাই; অথচ এক কোণে অতিজীর্ণ শীর্ণকায় একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছেন দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার গুরুভগ্নী বুদ্ধি হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কিরূপে এখানে আসিলে?' তিনি আমাকে কিছুই বলিলেন না। আবেশ ভঙ্গ হইলে আমি বুঝিলাম সত্যই আমার মাতা (বসন্ত) হইয়াছে। মাতার মূর্ত্তি দেখিলাম বটে, কিন্তু কবে যাইবেন জিজ্ঞাসা ত করিলাম না। কতক্ষণ আবার স্থিরভাবে থাকিলে সেই রূপ স্ফূর্ত্তি হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তিনি একাদশীতে যাইবেন। সত্যই পনর দিন পরে একাদশীতে বসন্ত তিরোহিত হইল, কিন্তু এতাবৎকাল আমি বেদনার লেশও বুঝিতে পারি নাই, স্বাভাবিক স্নান আহারাদি করিয়াছিলাম।'

যে দিন তিনি অপ্রকট হইলেন, সেদিন বেলা বারটার সময় শ্রীল অদ্বৈত দাসজিকে বলিলেন—'অদ্বৈতদাস! তুমি আমাকে শ্রীনাথজির সাম্‌নে লইয়া চল।' তিনি বলিলেন—'আমি একা কি করিয়া লইয়া যাইব?' বাবাজি বলিলেন—'হস্ত অবলম্বন ত দিতে পারিবে?' তখন শ্রীল অদ্বৈত দাসজি তাঁহার হাত ধরিয়া শ্রীনাথজির সাম্‌নে লইয়া গেলেন। শ্রীনাথজির সম্মুখে বরুণ গাছের তলে বেদীর উপরে বসাইলে তিনি বলিলেন—'কুণ্ডের জল আনিয়া আমাকে স্নান করাইয়া দাও।' তাহাই করিলে আবার বলিলেন—'তিলক করিয়া দাও।'

তাহাও করা হইলে বলিলেন—'তুলসী স্নান করাইয়া কিছু স্নানীয় জল আমাকে পান করাও।' শ্রীনাথজির ভোগ হইয়াছে কিনা, সকলের প্রসাদ পাওয়া হইয়াছে কিনা বল।' শ্রীঅদ্বৈত দাসজি 'হাঁ' বলিয়া যেমনই তুলসীর স্নানজল হাতে করিয়া তাঁহার মুখে দিলেন, অমনি তিনিও অপ্রকট হইলেন। এই ঘটনার আর একটি বিশেষ কারণ আছে—তিনি তুলসীর সেবা করিয়া শ্রীবৃন্দাজির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি শ্রীঅদ্বৈত দাসজিকে বলিয়াছিলেন—'বৃন্দাদেবীর মাধুরী কিছু বর্ণন কর দেখি।' তিনি বলিলেন—'আমি কি জানি?' তখন বাবাজি মহাশয় বলিলেন 'তবে শুন।' এই বলিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর রূপমাধুরী এমনভাবে তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে সেই বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাদেবীর মূর্ত্তি হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে পাগিল। তিনি উৎকল ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা গান ও শ্রীবৃন্দাদেবীর মাধুরী শুনাইতেন। আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই—যে তুলসী বৃক্ষটিকে পোকায় একেবারে খাইয়া ফেলিয়াছে, শুষ্ক হইবার অবস্থা হইয়াছে—তিনি সেই বৃক্ষটিকে স্নান করাইয়া দিলে তারপর দিন হইতে উহা প্রফুল্লিত হইত।

শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজি মহারাজ (পুরী)

পুরী শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মঠের নিকটবর্ত্তী সাতাসন মঠ। এ স্থানে নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণই ভজন করিতেন। প্রাচীনকালে ঐ মঠে শ্রীস্বরূপদাসজি ছিলেন—তিনি সমস্ত দিনই কুটীরের মধ্যে ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নামগান করিতেন ও নাচিতেন। ঐ সময়ে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বহু বৈষ্ণব সমবেত হইতেন। কেহ কেহ একমুষ্টি মহাপ্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্য্যন্ত

তাহা গ্রহণ করিতেন—তদধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থপাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজি মহাশয় রাত্রি ১০টায় আবার নিজের কুটীতে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া স্নানাদি কৃত্য শেষ করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করে—এই আশঙ্কায় তিনি একাকী সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষুই অন্ধ ছিল, অথচ কি প্রকারে অন্ধকার রাত্রিতে সমুদ্র-স্নানাদি করিতেন, শ্রীমহাপ্রভুই জানেন। তিনি বিন্দুমাত্রও বিষয়-চিন্তা করিতেন না। বড় মিষ্টবাক্যে আগন্তুক লোকদের সহিত তিনি কথোপকথন করিতেন। সকলকে উপদেশ করিতেন—'কৃষ্ণনাম ভুলিবে না।' অনেকে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতেন। *

শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজি মহাশয়

(শ্রীবৃন্দাবন, কুসুমসরোবর)

শ্রীগৌরশিরোমণি মহাশয় দেহরক্ষা করিলে ইনি শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া ভজন করিতে থাকেন। তৎপরে কুসুমসরোবরের ছত্রিতেও বাস করিয়াছিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত বাবাজি মহাশয় শ্যাম কুটীতে ভজন করিতেন। এই সময়ে গোয়ালিয়র মহারাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীবলবন্তরাও ভাইয়া সাহেব কোনও কৃপায় ভক্তিবীজ লাভ করিয়া পণ্ডিত বাবার নিকট ভজন সাধন শিখিতে আসিলেন। পণ্ডিত বাবা ঈদৃশ লোকদিগকে শিক্ষাদান-বিষয়ে শ্রীহরিচরণ দাসজিকেই যোগ্য পাত্র মনে করিয়া ভাইয়া সাহেবকে তাঁহার নিকট

* শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'স্বহস্ত লিখিত জীবনীর' ছায়া (১৪২ পৃঃ)।

পাঠাইলেন। ভাইয়া সাহেব তাঁহার নিকটেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে কুসুমসরোবরের নিকটে একটি শ্রীমন্দির ও বাগান প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল বৈষ্ণব ব্রজের গ্রামে দূরে দূরে আছেন, তাঁহাদের জন্য মাসিক বৃত্তির নির্ধারণ করত তাহা চিরকাল চলিবার জন্য গভর্ণমেণ্টে 'রাধাকান্ত ফণ্ড' নাম দিয়া অনেক টাকা জমা করিয়া দিলেন এবং একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠনপূর্ব্বক সেবা তত্ত্বাবধান করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মথুরার কালেক্টর উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সব কার্য্য এখনও সুন্দররূপেই চলিতেছে।

ইনি শ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার ব্রজবাসকালে বহু লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন।

শ্রীহরিদাস বাবাজি মহারাজ
(শ্রীগোবর্দ্ধন, গোবিন্দকুণ্ড)

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ শ্রীদয়াল দাস বাবাজি মহাশয়ের শিষ্য—ইনি প্রথমতঃ আরিট্গ্রামে ৭।৮ বৎসর ভজন করিয়া গোবর্দ্ধনে গোবিন্দ-কুণ্ডে দশ বৎসর বাস করেন, পরে পৈঠো গ্রামে পাঁচ বৎসর, শেষে যতিপুরায় ছয় বৎসর বাস করিয়া অপ্রকট হইয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ডে বাসকালে শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজি মহারাজ তাঁহার আন্তর ও বাহ্য দশার নিম্নলিখিত বিবৃতি দিতেছেন—

শ্রীহরিদাস বাবাজি মহাশয় 'ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিঃ' ইত্যাদি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের স্বনিয়ম দশকের (৯) পদ্যানু-যায়ী আচরণ করিতেন। 'আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।' সর্বসঙ্গ-বিনির্মুক্ত হইয়া তিনি থাকিতেন—'সঙ্গাদ্ভুজঙ্গাদিব' "সুক্ষীণধমনী জরৎকন্থা"। অতি সাবধানে ভীতভীতভাবে নীচাতিনীচ মনে করিয়া

ইনি দূরে দূরে অবস্থান করিতেন। জীর্ণ কন্থা একখানি সর্ব্বদাই গায়ে থাকিত—পথে চলিবার সময়ে তাহা ভূমিতে লুটিয়া যাইত, তাহার কারণ—স্বপদচিহ্ন পাছে কেহ দেখে।

তিনি ব্রজের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন অন্বেষণ করিতেন। কেহ মিষ্টান্নাদি প্রসাদ লইয়া আসিলে তাহা অত্যাদরে গ্রহণ করিয়া কুটীরের ভিতরে লইয়া গিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া আহার এক রক লইতেন এবং শুষ্ক মাধুকরী কিছু খাইয়া বাহির হইতেন। যিনি প্রসাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি জানাইতেন—'আমি আপনার প্রদত্ত সমস্ত প্রসাদ পাইলাম।' তাঁহার কুটীরের ভিতরে আলোক যাইত না—অন্ধকারময় ছিল। তাহাতে বহু রজের পাত্র ছিল—সেই সকল পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন মহাপুরুষের চরণামৃত ও অধরামৃতাদি থাকিত। পূর্ব্বোক্ত মিষ্টান্নাদি যাহা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা রাত্রিকালে বনমধ্যে বৃক্ষতলে রাখিয়া আসিতেন—যেহেতু সাক্ষাতে কোনও জীবকে তাহা দিলে তাহাতে ঐকান্তিক ভজনের বিঘ্ন আসিবে।

তত্রত্য শ্রীসীতানাথ দাসজি একদিন বলিলেন—'হরিদাসজি! তুমি ত শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছ, আমার জন্য একখানি উণবস্ত্র আনিবে।' এই বলিয়া একটি টাকা দিলেন। এদিকে শ্রীহরিদাসজি কখনও ধাতুস্পর্শ কি পরদেশীয় জিনিষ স্পর্শ করিতেন না। বৈষ্ণবের আদেশ প্রতি-পালন করিবার জন্য তিনি নিজের বস্ত্রে জড়াইয়া টাকাটি লইয়া গেলেন। শ্রীল অদ্বৈতদাস বাবাজি মহাশয় তাঁহার সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। শ্রীহরিদাসজি পৃথক্ ভাবে টাকাটি দোকানে দিয়া উণবস্ত্রটিও পৃথক্-ভাবে কাপড়ে জড়াইয়া আনিয়া শ্রীসীতানাথ দাসজিকে দিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে তিন দিন মাত্র ছিলেন—অতি সাবধানে ভীতভাবে অন্যের স্পর্শ হইতে বাঁচিয়া যমুনায় স্নান ও সাত দেবালয় দর্শন করিয়া আবার চলিয়া আসেন।

তিনি জনসঙ্গ-ভয়ে রাত্রিতে গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা করিতেন। একবার রাত্রিতে পরিক্রমা করিতে করিতে প্রাতঃকাল হইয়া গেল—কুটীর পৌছিতে পারেন নাই। পথে আসিতে আসিতে মনে হইতেছে—একটি বৃহৎ মন্দির ও বৈষ্ণবসেবা হইলে ভাল হইত। মনোবৃত্তি হৃদয়ে উদিত হওয়ামাত্রই তিনি তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—পশ্চাদ্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে একটি শেঠ (ধনবান্ ব্যক্তি) আসিতেছে। তখন সশঙ্কিতভাবে পথ ছাড়িয়া অন্যপথে তিনি চলিয়া গেলেন। এই হইল **সঙ্গ-জনিত মনোবৃত্তি**।

গোবিন্দকুণ্ডে এলাহাবাদের জনৈক বড় ডাক্তারের একটি ছত্র ছিল—সেখানকার রুটি লইয়া ব্রজবাসী পূজারি তাঁহাকে মাধুকরী দিয়াছিল। সেই মাধুকরী খাইয়া সেই রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন—"একটা মানুষকে একজন কাটিতেছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গের চামড়া উঠাইয়া দিয়াছে" —তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজি মহাশয়কে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন—'এই ছত্রের পূজারির ঘরে মাধুকরীতে যাইবে না, এই দেখ, তাহার ফলে আমি নরকভোগ করিতেছি।' এই হইল **—অন্নজনিত মনোবৃত্তি**।

একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নকালে প্রতপ্ত তপন-কিরণে উত্তপ্ত গিরিতটে বাহির হওয়া যাইতেছিল না; তিনি সেই সময় বাহির হইয়া বহুদূরে শৌচে গেলেন। সেই সময় তাঁহাকে শৌচে যাইতে দেখিয়া শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজি মহারাজ অন্তরে দুঃখিত হইলেন—দুই ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল—তিনি ফিরিলেন না দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতদাসজি তথায় একটি বৃক্ষমূলে গিয়া দেখিলেন যে বাবাজি মহাশয় রৌদ্রের মধ্যে অস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহার চিত্ত কোন ভাবে আক্রান্ত হইয়া আছে—শরীর এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছিল—অশ্রুনির্গমও হইতেছিল। শ্রীঅদ্বৈত দাসজি তখন তাঁহার কাছে না গিয়া ফিরিয়া

আসিলেন। বাবাজি মহাশয় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীঅদ্বৈত দাসজি শৌচে গিয়া এত বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন—'কি আর বলিব? এতদিন পর্য্যন্ত গিরিরাজ চরণে আশ্রয় দিয়া রাখিলেন, কিন্তু স্বাশ্রিত গর্দ্দভের ভাবের কণাও দান করিলেন না। চল, তোমাকে দেখাইব।' এই বলিয়া তিনি শ্রীঅদ্বৈত দাসজিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখাইলেন যে একটি গর্দ্দভ খাতজলে কাদায় লুটিতেছে। দেখাইয়া বলিলেন—'দেখিলে ত?' শ্রীঅদ্বৈত দাসজি বলিলেন—'গাধা একটা কাদায় লুটিতেছে, দেখিলাম।' তিনি তখন প্রেমাবেশে চাপড় মারিবার মত উদ্যম করিয়া শ্রীঅদ্বৈতদাসজির মস্তকে মৃদু হস্তার্পণ করিলেন—তখন শ্রীঅদ্বৈতদাসজি তাঁহার ভাব বুঝিলেন—'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণধূলি বলিয়া প্রেমাবেশে গর্দ্দভটি রজে লুণ্ঠিত হইতেছে।'

শ্রীহরিদাসজি যখন ঐরাবত কুণ্ডের দক্ষিণ দিকে কদম খণ্ডীতে বাস করিয়াছিলেন, তখন একবার রাত্রে যতিপুরা হইতে মাধুকরী করিয়া ফিরিবার কালে পথে একটি বাঘ বসিয়াছিল। তিনি পথে চলিবার সময় মৃদুমন্দস্বরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম করিতেন। সেই বাঘটি যেন সেই নাম শুনিয়া আবিষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল; তিনি কিন্তু বাঘের সম্মুখ দিয়া নাম করিতে করিতে চলিয়া আসিলেন। সেখানে যে বাঘ থাকে, আগেই জানিতেন—অতএব ফিরিয়া দেখিবার কৌতুক জন্মিল। প্রথমতঃ তিনি বাঘ বলিয়া জানিতে পারেন নাই; তখন দেখিলেন যে সত্যই বাঘের নিকট দিয়াই আসিয়াছেন। বাঘটি পথের প্রান্তে আধ হাত দূরে বসিয়া আছে।

তাঁহার শেষ জীবনের ছয় বৎসর যতিপুরাতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে বাসের সময় গোবর্দ্ধনের এক ব্রজবাসী পঞ্চবিংশ-বর্ষ ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার একান্ত শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীহরিদাসজির

কিন্তু ব্রজবাসিমাত্রেই একান্ত গুরুবুদ্ধি। তিনি ব্রাহ্মণকে কি প্রকারে শিষ্য করিবেন? সেই ব্রাহ্মণ কিন্তু একান্ত শরণ লইয়া পড়িয়া থাকিলে শ্রীহরিদাসজি তখন গুরুসেবাবুদ্ধিতে তাঁহাকে সর্ব্বোপদেশ, দীক্ষা ও ভেক প্রদান করিলেন। কোন দিন ইঁহার সেবা তিনি গ্রহণ করেন নাই। শিষ্যের নামটি হইল—**শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস**। শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসজি নিজগুরুর অপ্রকটের পর তাঁহার আসনের নীচে আসন করিয়া এক বৎসর যাবৎ একই নিয়মে ভজন করত যাজ্ঞিক পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণচরণ-লাভের ভাব অনুকরণে যেন অপ্রকট হইলেন। ঐ গুরুশিষ্যের সমাধি ষতিপুরায় হয়জি-কুণ্ডের উপর ঐরাবত কুণ্ডের পশ্চিম দিকে একই স্থানে বিদ্যমান।

শ্রীহরিসুন্দর ভৌমিক [ভুঞা] মহাশয় (পাবনা)

পাবনা জিলায় সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কয়ড়াগ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন ভৌমিক। ইঁহারা বংশ-পরম্পরায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার। ইনি অল্প দিন মাত্র বিষয়কার্য্য করিয়া সংসার-নির্ব্বাহোপযোগী বিষয় সংগ্রহ করিতে করিতেই মহৎকৃপায় ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হন। প্রবেশ মাত্রই এত তীব্র উৎকণ্ঠালাভ করিয়াছিলেন যে ভক্তসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে তিনি দেহ গেহ, দিবারাত্রি প্রভৃতি ভুলিয়া যাইতেন। শারীরিক নিয়মের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে ইনি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। অহো! ভগবৎকৃপা হইলে বিপদ্‌ও ভক্তির সহায়তা করিয়া থাকে। বিষয় ত্যাগ করিয়া ইনি উৎকট ব্যাধির ব্যপদেশে ভজনই করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিনেই ভাব-ভক্তি লাভ করিলেন। ১২৯৭ সনে রাজর্ষি বাহাদুরের শ্রীবৃন্দাবনে আগমন-কালে ইনিও সপরিবারে শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। পরস্পরের পরিচয়ে মহা-

নন্দিত হইলেন। রাজর্ষি বাহাদুর ভৌমিক মহাশয়কে শিক্ষাগুরুর আসন দিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের ও একত্র বাসের প্রার্থনা করিলেন। উভয়েই কিছুদিন ব্রজে বাস করত শ্রীধাম নবদ্বীপ হইয়া আপন আপন বাড়ীতে গেলেন; কিন্তু কয়েকদিন পরেই রাজর্ষি বাহাদুর ভৌমিক মহাশয়কে সপরিবারে রাজধানী বনওয়ারীনগরে আনাইলেন —ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে রাজর্ষি বাহাদুরও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ সহ সপরিবারে ভৌমিক মহাশয়ের কয়ড়াগ্রামে গিয়া দর্শন দিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি নিজবাড়ী ও বনওয়ারী-নগরে প্রায়ই যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

১৩০১ সনের কার্ত্তিক মাসে রাজর্ষি বাহাদুর শ্রীরাধাবিনোদ, নিজের পরিবারবর্গ ও সপরিবার ভৌমিক মহাশয়কে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। তদবধি তিনি ১৩১১ সনের আশ্বিন মাস পর্যন্ত রাজর্ষি বাহাদুরের সঙ্গে একত্র বাস করেন। ইনি সর্ব্বদাই ভাবাবিষ্ট থাকিতেন, কদাচ শ্রীরাধারাণীর চরণ বিস্মৃত হইতেন না—শ্রীরাধারাণীর স্ফূর্ত্তি ব্যতীত বাহ্যদেহে আহার, নিদ্রা, চলন, কথন, প্রাণমন প্রভৃতি কোন কাজই তিনি করিতেন না এবং নিজগণকেও শিখাইতেন—'শ্রীরাধারাণীর ভাবানুসরণ ও অনুমোদন ব্যতীত কোন কাজই করিবে না।' কতদিন তাঁহার আহারও হইত না। ইহার শরীরে মাঝে মাঝে উৎকট রোগ উপস্থিত হইত, কিন্তু তিনি এত কষ্টেও ইষ্টবস্তুতে মনঃ স্থির রাখিতেন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ১৩১১ সনের আষাঢ় মাসে রাজর্ষি বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র-সঙ্গে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ মহাশয় বাংলায় আসিবার প্রাক্‌কালে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—'যাবেই ত' শীঘ্রই এসো; আমার আর বেশী দিন বাকী নাই। একবার সাক্ষাৎ দর্শনের অপেক্ষা থাকে, সে কৃপাও করিয়াছেন।' ১৭ই আশ্বিন কামিনী বাবু শ্রীবৃন্দাবনে

ফিরিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন—'এসেছ, ভালই হইয়াছে।' চারি পাঁচ দিন পরে তাঁহার সামান্য জ্বর হইল। ৬৫ বৎসর বয়সে কার্ত্তিকী কৃষ্ণা একাদশীতে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিলেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহাশয়

শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুরাগী জন কিরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করিবেন—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই মহাপুরুষের জীবনে দৃষ্ট হইয়াছে। ইনি নানাস্থানে থাকিয়াই ভজন করিয়াছেন, কিন্তু বাহ্য দেহের সব কাজ ছুটাছুটি করিয়াই করিতেন। শেষরাত্রে উঠিয়াই ইনি মালা রাখিয়া রজের করোয়া লইয়া ছুটিলেন—শৌচাদি ও স্নান করিয়া কোন রকমে তিলক করিয়া ভজন করিতে বসিতেন। আবার মধ্যাহ্ন হইলেই তিনি সেই করোয়াটি লইয়া ছুটিলেন—শৌচ স্নানাদি করিয়া আসিয়া একটি ভাঙ্গা দর্পণের সাহায্যে তিলক করিলেন—তুলসীতলায় গিরিরাজকে দু'পাত তুলসী দিয়া মাধুকরীর ঝোলা লইয়া ছুটিতেন। অল্পক্ষণেই ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হস্তলিখিত চাটুপুষ্পাঞ্জলির ভাষানুবাদের কয়েকপত্র পাঠ করিয়া তিনি মাধুকরী পাইয়া আবার ভজন করিতে বসিলেন। সন্ধ্যাকালে আবার করোয়াটি লইয়া ছুটিয়া যাইয়া শৌচ স্নানাদি করিয়া ভজন করিতে বসিতেন। রাত্রিতে আর আহার করিতেন না—নিদ্রা যাইতেন কিনা, তাহাও প্রায় কেহই জানিত না। বৃদ্ধাবস্থায় শ্রীরাধাকুণ্ডে নূতন ঘেরায় বাস করিতেন—এই সময়ে রাজর্ষি বাহাদুরের সেবিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের প্রসাদ দ্বারা তাঁহার ভজনানুকূল্য করা হইত। তাঁহার তীব্রে অনুরাগ দেখিয়া শুনিয়া একবার শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন—'আমি আশৈশব নিদ্রাতুর, ভজনাদি করিতে পারি না, আমাকে কৃপা করুন।' তিনি বলিলেন—'নব দম্পতীর

যখন মিলন হয়, তখন কি তাহাদের নিদ্রা আসে? প্রাণে অনুরাগ জন্মিলেই নিদ্রা আপনিই চলিয়া যাইবে। সিদ্ধদেহের কোন্ অঙ্গে কি অলঙ্কার আছে, তাহাই ধ্যান করিবে।' কামিনী বাবু মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ দর্শন করিতে আসিতে পারিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'এসো, তবে অনেকক্ষণ থেকো না।' ইহার কয়েক মাস পরে শারদ পূর্ণিমার রাত্রিতে বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকুণ্ড-পরিক্রমা করিবার সময়ে তাঁহাকে ডাকিলেন। বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রিতে পায়স ভোগ লাগিল—পায়স প্রসাদ তাঁহাকে দিতে যাইয়া দেখিলেন যে বাবাজি মহাশয় আসীনাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

প্রথম পর্য্যায় সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পর্য্যায়

শ্রীঅতুলচন্দ্র চম্পটী (কলিকাতা)

উত্তর কলিকাতা ১নং মদন মিত্রের লেইনে ইহার বাড়ী ; ইনি ইংরেজী, সংস্কৃত ও অঙ্ক তিন বিষয়ে সম্মানের সহিত (অনার্স) লইয়া বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিৎ গৌরীশঙ্কর বাবুর প্রিয়তম ছাত্র। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভগিনী দিগম্বরী দেবীর একমাত্র কন্যা ক্ষীরোদাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ-বাসরেই ইনি বন্ধুর সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার রূপ-লাবণ্য, স্বভাব-সারল্য ও ব্যবহার-মাধুর্য্য চম্পটীর হৃদয়খানিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। একবার বন্ধু ব্রাহ্মণকান্দা হইতে হঠাৎ উধাও হইয়া মদনমিত্রের লেনে ইঁহার বাড়ীতে আসেন—তখনও অতুল তাঁহার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশেন নাই।

উত্তরকালে অতুলচন্দ্র আরা হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলেন—বন্ধুসুন্দর অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানেও একবার পদার্পণ করিয়া ক্ষীরোদার কন্যা সরযুর পরলোকগমনের জন্য খেদ দূর করিয়াছিলেন। অতুলচন্দ্র বন্ধুকে মটকার কাপড় ও উড়নি দিলে প্রভু তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রার পূর্ব্বে বন্ধু চম্পটীকে নির্জ্জনে কহিলেন—'দেখুন, দুঃখময় মায়ার সংসারে একমাত্র কৃষ্ণভজনই সার; আপনি মায়ায় আবদ্ধ থাকিবেন না, আপনার দ্বারা আমার অনেক কাজ আছে।' তদবধি অতুলের ভাব-পরিবর্ত্তন দেখা গেল।

চম্পটীর হৃদয়ে মহা তুফান উঠিল—তাঁহার মামা শ্বশুর জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য ভগবান্ কিনা—এ কথাটি তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে চাহেন। একবার তাঁহার সহিত সহকারী শিক্ষকের বিদ্যালয়ের পরিচালনা-সম্পর্কে মতান্তর হইল—কয়েকদিন যাবৎ উভয়ের মধ্যে খট্‌মট্টি চলিল। এমন সময়ে ডাহাপাড়া হইতে বন্ধুর এক চিঠি গেল—'তোমরা কলহ করিও না, তোমরা পাগল হও।' বহু দূরে থাকিয়া বন্ধু কি প্রকারে ইঁহাদের কলহ-কথা জানিলেন এবং ঠিক কলহকালেই কেন চিঠিখানা চম্পটীর হাতে আসিল ইত্যাদি ভাবিয়া তাঁহার মস্তক ঘুর্ণিত হইল। এই ঘটনা তাঁহাকে অত্যধিক চঞ্চল করিয়া তুলিল—নিশিদিন ভাবিতে লাগিলেন—তবে কি ছোট মামা সত্যই ভগবান্?' উদাস প্রাণে পাঁচ সাত দিন ভাবিয়া অবশেষে তিনি এক দারুণ উপায় উদ্ভাবন করিয়া সকল দুশ্চিন্তার অবসান করিতে প্রস্তুত হইলেন। ঘোরতর অন্ধকার রাত্রিতে তিনি একাকী নিকটবর্ত্তী রেলপথের টানেল্ (সুড়ঙ্গ) মধ্যে রেলে মাথা দিয়া শুইলেন, যদি প্রভু জগদ্বন্ধু সত্যসত্যই ভগবান্ হয়েন, তবে বোম্বাই মেইল পাঁচ হাত দূরে দাঁড়াইবে, আর তাহা না হয় ত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত!! অহো! বন্ধুর করুণার বলিহারি!! পাঁচ হাত দূরে বোম্বাই মেইল আসিয়াই কলকব্জা খারাপ হইয়া আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিল!! চম্পটী ওখান হইতে উঠিয়াই 'জয় প্রভু জগবন্ধু' বলিয়া একেবারেই বন্ধুর উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। শিক্ষকতা এখানেই সমাপ্ত হইল।*

কথিত আছে যে ইতঃপূর্ব্বে প্রভু বন্ধু আর একবার ইঁহার সহিত আরায় দেখা করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় মিলনের ইঙ্গিত দিয়া পশ্চিমে গিয়াছিলেন। বন্ধু-হস্তে প্রাপ্ত মোড়কের মধ্যে কয়েকটি ঘৃতান্ন পাইয়া অতুল পরমাদরে মস্তকে ধরিয়া গ্রহণ করিলেন এবং

† এই ঘটনাটি চম্পটী মহাশয় এ দীনহীনকে স্বমুখেই বলিয়াছিলেন।

প্রাণের আবেগে পাতার টুকরাটিও চিবাইয়া খাইয়া ফেলিলেন। তদবধি ইঁহার অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও মুখে সঘন 'হরিবোল' ধ্বনি স্বতঃই স্ফুরিত হইতেছিল।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি যেন পাগল হইলেন—গৈরিক বস্ত্র ও আলখেল্লা পরিয়া ইনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতঃস্তত নাম করিয়া ঘুরিতেছেন—কবে প্রাণারাধ্য বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকার হইবে এই ভাবনায় তাঁহার দেহ মলিন হইলেও প্রাণে আনন্দ পাইতেছিলেন। বিপুল ব্যগ্রতা লইয়া তিনি বন্ধুসুন্দরের অন্বেষণে চলিতে চলিতে একদিন ষ্ট্রাণ্ড্ রোডের মোড়ে একখানি জানালা-বন্ধ ঘোড়ার গাড়ী হইতে সেই পরিচিত কণ্ঠধ্বনি পাইলেন—'হরেকৃষ্ণ! এদিকে।' বন্ধুর আগ্রহে তিনি গাড়ীর উপরে চাপিয়া হরিবোল ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া ৬৭নং চাষাধোপাপাড়া লেনে আসিলেন। এই শুভক্ষণ হইতে চম্পটী মহাশয় প্রভুর একতান ভক্ত হইলেন। প্রভুর হাবভাব, চালচলন, বাক্যভঙ্গী প্রভৃতি সবই অতুলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। বন্ধু অতুলের হাতে দুইটি টাকা দিয়া একখানি কাপড়, উত্তরীয় এবং এক জোড়া করতাল কিনাইয়া আনিলেন। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বন্ধু ধীরে ধীরে বলিলেন—"কাল প্রত্যূষে জগন্নাথ ঘাটে গিয়া ডুব দিয়া গৈরিক ফেলিয়া এই নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় গ্রহণ করিবেন। করতাল-সংযোগে 'কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম' নাম গাহিয়া টহল দিবেন। জগন্নাথ ঘাট হইতে বরাবর কালীঘাটে যাইবেন। কালীঘাটের গঙ্গায় একটি ডুব দিয়া পুনরায় জগন্নাথ ঘাটে আসিয়া একটি ডুব দিবেন। এইভাবে একবার কালীঘাট একবার জগন্নাথ ঘাট দিনরাতে যতবার পারেন করিবেন। সর্ব্বদা নাম চলিবে। খাওয়া দাওয়া গোবিন্দের ইচ্ছার উপর নির্ভর রহিবে। এর পর আমি আপনাকে মহাপুরুষ দর্শন করাইব।" বলা

বাহুল্য তৎপর দিন হইতে চম্পটী মহাশয় নির্দ্দেশমত আদেশ-পালনে ব্রতী হইলেন—বহুদিন যাবৎ এইভাবে কঠোর তপস্যা চলিয়াছিল—প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তিনি দেহগেহ, দারাসুত, আত্মীয় পরিজন, আভিজাত্য ও পদমর্য্যাদাদি সবই ভুলিয়া গেলেন। এই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতে তাঁহাকে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতেও হইয়াছিল—আত্মবিস্মৃত চম্পটী প্রভুবন্ধুর বাক্যে জীবনোৎসর্গ করিয়া ধন্যধন্য হইলেন। রামবাগানে ডোমদের কুটীরে বন্ধুপ্রভুর আগমনে আনন্দোৎসব চলিয়াছে—চম্পটী প্রভুর আকর্ষণে হঠাৎ 'হরিবোল' ধ্বনি করিতে করিতে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া মহামহোৎসবের ঘটা দেখিয়া সকলকেই প্রেমালিঙ্গন করিলেন। বন্ধু স্বহস্তে চম্পটীকে মহাপ্রসাদ দিলেন—তৎপরে অতুলকে লইয়া তিনি পাবনায় গেলেন—তত্রত্য সহরের প্রান্তে একজন মহাপুরুষ থাকিতেন—তাঁহার হাব ভাব, রীতি নীতি প্রভৃতি সবই অদ্ভুত, দেখিলে পাগল বলিয়াই মনে হয়—নামটিও হারাণ ক্ষেপা। বন্ধু অতুলকে ঐ পাগলের হাতে সমর্পণ করত অন্তর্ধান করিলে চম্পটী ক্ষেপার অনুগমন করিলেন এবং তাঁহারই আদেশমত বক্স্ মণ্ডলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আসিলে ক্ষেপা তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া মুখে চুম্বন করিলেন। ক্ষেপা চম্পটিকে প্রভু জগদ্বন্ধু-সম্বন্ধে সংশয়হীন করিয়া মহাশক্তির সঞ্চার পূর্ব্বক কলিকাতায় পাঠাইলেন।*

কলিকাতায় আসিয়া চম্পটি আবার বন্ধুর প্রেমসেবায় নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে যে ইনি একবার বন্ধুর স্বমুখারবিন্দনিসৃতঃ এবং তাৎকালীন নর্দ্দমায় নিঃক্ষিপ্ত কফ তুলিয়া অধরামৃত-বুদ্ধিতে খাইতেছিলেন। বন্ধু এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'অতুল!

† এই পর্য্যন্ত শ্রীবন্ধুলীলাতরঙ্গিনী'-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ইতঃপর লেখকের চাক্ষুষ ঘটনাগুলির যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

তুই করলি কি রে! যা, আজ হতে তুই যা' ইচ্ছা তাই কর, আমি তোকে 'Magna Carta' সনদ দিলাম, আমি তোর জন্য জামিন রইলাম!!' তদবধি চম্পটী কলিকাতার মদ্যালয় ও বেশ্যালয়ের নিকট দিয়া প্রাণভরে 'হরিবোল' করিয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বেড়াইতে লাগিলেন। মহাপতিতপাবন অতুল স্বনাম সার্থক করিয়া বুঝি তখন পতিত-উদ্ধারণ-লীলা গ্রহণ করিলেন। হরিবোল-রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া—পতিতের সাজে দ্বারে দ্বারে গিয়া—নিরভিমানের চূড়ান্ত দেখাইয়া দিবানিশি ঘুরিতে লাগিলেন।

বন্ধুপ্রভু-কর্ত্তৃক ফরিদপুরে গোয়ালচামটে শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ১৩১৭ সন হইতে ১৩১৯ সন পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই বৎসর চম্পটী মহাশয় শ্রীঅঙ্গনের সেবা কার্য্য চালনা করিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী ক্ষীরোদা নিকটবর্ত্তী মাতুলালয় হইতে প্রত্যহ আসিয়া মৌনব্রতাবলম্বনে ও নাকে কাপড় বাঁধিয়া নৈষ্ঠিকভাবে ভোগ রান্না করিয়া আবার মাতুলালয়ে চলিয়া যাইতেন।

১৩২৮ সনের ১লা আশ্বিন বন্ধু অন্তর্ধান করিলে পর ইনি প্রায়শঃ কলিকাতাতেই থাকিতেন। তাৎকালীন বিরহ-বিধুর বেশ, অনিকেতন যত্র-তত্র-বাস, যদৃচ্ছাক্রমে আগত দ্রব্যের উদরসাৎকরণ, সর্বোপরি মুখে অনবরত 'হরিবোল' নাম ইত্যাদি কলিকাতা মহানগরীর মহাকোলাহল-চঞ্চল জনতাকেও আকর্ষণ করিত। মাকড়দহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় মুন্সেফ্ মহাশয় ইঁহার সহাধ্যায়ী ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। বিপিন বাবুর কৃপায় আমরা চম্পটী মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার আভ্যন্তরীণ স্বরূপের যৎসামান্য পরিচয় পাইয়া ধন্যধন্য হইয়াছি। চম্পটী মহাশয়ের এত বাহ্যিক আবরণ ছিল যে তাহা ভেদ করা দুরূহ ব্যাপারই ছিল। বিপিন বাবু ইঁহাকে বহুবার মাকড়দহে লইয়া গিয়াছেন—বহু আবদার রক্ষা করিয়াছেন—দুই বন্ধুতে

মিলন হইলে প্রণয়-কলহ, কথা কাটাকাটি, অপরূপ নৃত্য, কীর্ত্তনাদি আমরা দেখিয়াছি। বিপিন বাবু একবার কাশী যাইতে ইঁহাকে সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন। দুই বন্ধুতে একদিন ভীষণ ঝগড়া উপস্থিত অথচ কারণ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বিপিন বাবু নাপিত ডাকিয়া চম্পটী মহাশয়ের চুল, গোঁফ ও দাঁড়ির অর্দ্ধেক করিয়া কামাইয়া দিলেন—চম্পটী মহাশয় কিন্তু সর্বাবস্থাতেই নির্বিকার—যথাসময়ে রাস্তায় গিয়া তিনি হরিবোল করিতে করিতে ইতস্তত: ঘুরিতে লাগিলেন—বিকট চোহারা দেখিয়া কত লোক ঠাট্টা করিল, উপহাস করিল, হাসিল, ধূলি দিল, পাগল বলিল, ভণ্ড বলিল—কিন্তু নিরভিমান মহাপুরুষ মনের আনন্দে 'হরিবোল' করিয়াই চলিয়াছেন। এইভাবে নাম বিতরণ করত ইনি সন্ধ্যাসময়ে নিকটে আসিলে বিপিন বাবু অনুগত গিরিধারী দাসকে ডাকিয়া বলিলেন—'এই দেখ—নিরভিমান কাহাকে বলে; এই অবস্থা নইলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না।' পরে দুই বন্ধুতে কোলাকুলি করিয়া আনন্দ-কীর্ত্তন করিলেন। বিপিন বাবু ইঁহারই কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন—তাহা বিপিন বাবুর প্রসঙ্গে বিবৃত হইবে।

ইনি কখনও কাহারও ধর্ম্মে আঘাত দিয়া কিছু বলিতেন না। একবার শ্রীহরিবাসরের দিন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি, তিনি প্রসাদ পাইতেছেন—আমার মুখ ম্লান দেখিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোরা ত একাদশীর দিন কিছু খাস্ না।' আমি নীরব রহিলাম—এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিলেন—চম্পটী মহাশয় তাঁহার নিকট পয়সা চাহিলেন—তিনি হাতে পয়সা নাই বলিয়া খাবারের দোকান হইতে রাব্‌ড়ি আনিয়া দিলেন—তাহা আমাকে দিবার জন্য এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী করিলেন যে আমার অন্তস্থল পর্য্যন্ত যেন সুশীতল হইয়া গেল। আহারান্তে আমাকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন এবং

বলিলেন—'আমি যা' বলিব, তা' কেবল শুন্‌বি কোথাও কিছু বলিস্ নি'। কুমারটুলিতে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া বলিলেন—'দেখ, এই ব্রাহ্মণ-সন্তান আজ কিছুই খায় নি, আমার আশ্রয় নিয়েছে, অন্ততঃ আট গণ্ডা পয়সা দিলে ইঁহাকে খাওয়াতে পারি।' তিনি অনেক কথার পরে ইঁহাকে দুই আনা পয়সা দিলে ইনি তথা হইতে সোণাগাছি বেশ্যাপাড়ায় ঢুকিয়া তাঁহাদের দ্বারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ গড়াগড়ি দিতে দিতে 'হরিবোল, জয় প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের জয়, জয় সুন্দরা বাঈজির জয়' ইত্যাদি বলিতেছেন—আর চারিদিক হইতে বেশ্যামাতারা মুখ বাড়াইয়া ইঁহাকে দেখিয়া অবাচ্য কুবাচ্য কত কি বলিলেন। ইনি কিন্তু পরমানন্দে নাম করিতে করিতে বীডন পার্কের দিকে যাইতেছেন—এ দীন হীন পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে মনে ভাবিল—'এ পাগলের সঙ্গে ঘুরছি, কিন্তু ভক্তি কিসে হয় তা'ত বুঝলাম না।' তৎক্ষণাৎ তিনি পেছন ঘুরিয়া দুই একবার মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—'শ্যালা, ভক্তি কিসে হয়? ভিক্ষা করলে ভক্তি হয়।' এই কথা বলিয়াই তিনি রামবাগানে ডোমেদের প্রতি কুটীরের সম্মুখে যাইয়া গলায় কাপড় দিয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বলিতেছেন—'ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী মাসকল!' ডোমদের মত দীন দরিদ্র আর কেহই নাই—তাঁহারা চম্পটি মহাশয়ের হরিবোল শুনিয়া পরমানন্দকে একটি অর্দ্ধপয়সা করিয়া দিতে দিতে তাঁহার প্রায় পাঁচ আনা পয়সা হইল। ছলচাতুরী করিয়া পয়সা সংগ্রহ করিতেছেন দেখিয়া আমার মনে খট্‌কা লাগিল এবং বলিয়াও ফেলিলাম—'দাদা! তুমি মিথ্যা বলিতেছ কেন?' ইহাতে তিনি দুই একবার মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—'প্রভু জগদ্বন্ধু বলেছেন—এক হরিনামই সত্য, আর সব মিথ্যা; সুতরাং মিথ্যার আবার সত্য মিথ্যা কিরে শ্যালা!!' পানাশক্তির কারণ পৃষ্ঠ হইয়া তিনি বলিলেন—'প্রভু জগদ্বন্ধু চ'লে

গেছেন ; এখন কোন রকমে ভুলে থাকা, বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে।' বাহ্যিক আবরণের জন্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'ওরে, এসব না থাক্‌লে লোকে যে আমাকে মন্নুমেণ্টে তুলে দেবেরে।'

প্রভু বন্ধুতে অকপট নিষ্ঠাভক্তি দ্বারা ইনি বিশ্বজয়ী হইয়াছিলেন। সর্ব্বাবস্থার ভিতর দিয়া গুরু বন্ধুর বাণী শুনিবার জন্য ইনি যে উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহা বর্ণনাতীত। রাস্তায় চলিতে চলিতে কাহারও বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়া, গরু বা মহিষের কাণ নড়িল দেখিয়া, গাছের পাতা এধার থেকে ওধারে গেল দেখিয়া, দরজায় ঠক্ করিয়া শব্দ হইলে বা হাঁচি বাধা ইত্যাদিতে তিনি আরব্ধ কার্য্য হইতে বিরত হইতেন এবং বলিতেন যে 'প্রভু বারণ করিলেন, এখন আর এ কার্য্য করা হইবে না' ইত্যাদি।

দেখা হইলেই তিনি টাকা পয়সা, কাপড় জামা ইত্যাদি টানিয়া নিতেন। একবার মেডিকেল কলেজ্ হইতে তাঁহাকে রিক্‌স করিয়া তাঁহার মদন মিত্র লেইনের বাড়ীতে আনিতেছি। রাস্তায় বলিলাম—'দাদা! আমার ভাবী জীবনের কল্যাণ কর।' তিনি বলিলেন—'হাঁ পারি, তুই আমাকে ষোল আনা দে,' আমি বলিলাম—'আমার আর কি আছে? কতগুলি মান অভিমান আছে।' এই কথা শুনিয়াই তিনি বলিলেন—'শালা! প্রস্রাবে জন্ম, শ্বাসে প্রাণ; মানুষের আবার অভিমান!!' ইত্যাদি।

অপ্রকটের পূর্ব্বে এ অভাগাকে বহু আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে গিয়া একদিনও দেখা পাইলাম না। তথাপি স্বপ্নে দর্শন দিয়া নারীজাতি হইতে সাবধান থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া তিনি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন।

———

শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজি মহাশয় (শ্রীবৃন্দাবন)

ইনি পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জের অনতিদূরে চড়িয়াগ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীর কোন দরিদ্র কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বাশ্রমের নাম —ভীমকিশোর রক্ষিত। অল্পবয়সে পিতামাতার দেহত্যাগ হইলে একটী বিধবা ভগ্নী ব্যতীত ইঁহার সংসারে সহায়ক আর কেহই ছিল না। বাল্যকালে ইনি বিশেষ লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই—জমিদারী সংক্রান্ত আমিনের কার্য্য সামান্যতঃ শিখিয়াছিলেন। সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সলপ্ গ্রামের জমিদার সান্যাল গোষ্ঠীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন নাগ মহাশয় পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ইনি তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার অধীনে জমিদারী কাজ করিতে আসিলেন।

মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া এই চারি জেলার মধ্যবর্ত্তী সোণারঙ্গী গ্রামের তাঁতি-জমিদার পরম ভক্তিমান্ ছিলেন। সিরাজুদ্দৌল্লার সঙ্গে ইংরাজের যখন যুদ্ধ হয়, তখন একবার ইংরাজ-সেনাধ্যক্ষ আহত হন পরে তাঁহার অভিপ্রায়মতে তাঁহারই প্রধান কর্ম্মচারী ঐ সেনাধ্যক্ষের পোষাক লইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া জয়লাভ করেন। ইংরাজেরা তখন ঐ প্রধান কর্ম্মচারীকে পারিতোষিকরূপে কয়েকখানি গ্রাম দিয়াছিলেন—তিনিই ঐ সোণারঙ্গী জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা ছিল। ঢাকা জেলার চক্-নামক স্থানের কোনও বসু মহাশয় এখানকার প্রথম দেওয়ান হন এবং ইঁহাদের সৎসঙ্গপ্রভাবে তিনিও ভক্তিমান্ হইলেন। এই পদ্মলোচন নাগ মহাশয়ের বাড়ী পূর্ব্বে ঢাকা জেলার মাইলানি গ্রামে ছিল। তিনিও কিছুদিন বসু মহাশয়ের সঙ্গপ্রভাবেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্তিসম্পত্তিতে ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। শ্রীনাগ মহাশয়ের পুত্র সন্তানাদি

ছিল না বলিয়া তিনি এই বাবাজি মহাশয়কে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিবীজ রোপণ করেন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে তিনি শ্রীঅদ্বৈত-সন্তানের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তৎপরে বিবাহ করেন। একবার নাগ মহাশয় বাড়ী গেলে জনৈক শ্রীনিত্যানন্দ-সন্তান তথায় আগমন করেন—তাঁহার সহিত পরামার্থ-গোষ্ঠীতে ইঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইলে ইনি তাঁহার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ আসিলেন। নাগ মহাশয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেও পরে তাঁহার ভক্তির আগ্রহ দেখিয়া চিত্তে সমাধান করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। বাবাজি মহাশয় সেই প্রভুর বাড়ীতেই থাকিলেন। যেখানে ভক্ত আছে জানেন, সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন—উহার টীকায় 'কুর্বন্,' 'সন্' প্রভৃতি শব্দ বুঝিতে না পারিয়া কোন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহাদের অর্থ কি?' তিনি বলিলেন—'ইহা সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িলে এই সব বুঝিতে পারা যায়।' বাবাজি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় সংস্কৃত শিখা যায়?' তিনি অনতিদূরবর্ত্তী এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোল দেখাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তথায় যাইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট লঘু-হরিনামামৃত পড়িতে লাগিলেন। কিছুদিন পড়াইয়া সেই পণ্ডিত বলিলেন—'এ বৈরাগ্যের জিনিষ, বৈরাগ্য ব্যতীত এ শাস্ত্রে সুষ্ঠু প্রবেশ হয় না।' বাবাজি মহাশয় তখন ২৭ বৎসর বয়স্ক। গৃহে কয়েক বিঘা জমিমাত্র ইঁহার সম্পত্তি—অজাতপুত্রা যুবতী ভার্য্যা ও বিধবা ভগ্নীর কিরূপে জীবিকানির্ব্বাহ হইবে বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করিয়া ইনি বেশাশ্রয় করিলেন। যে প্রভুর সহিত তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন, তিনি তখন অন্যত্র; ভেক গ্রহণ করত তিনি সেই বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তত্রত্য স্ত্রীগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। বাবাজি মহাশয় এখন বৈরাগী

—ভালরূপে গ্রন্থপাঠ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত। পূর্ব্ব অধ্যাপকের নিকট তৃপ্ত না হইয়া তিনি এবার বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপে আসিলেন, এখানে কোনও অধ্যাপক না পাইয়া পুরীতে গেলেন—তথায় চারি মাস অবস্থানের পর সংবাদ পাইলেন যে শ্রীরাধাকুণ্ডের শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়ান। বর্ষাত্যয়ে তিনি পদব্রজে সম্বলপুর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। রাস্তায় বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন —শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামিগণ পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন —এইটি মনে করিয়া তিনি দুঃখের মধ্যে সুখই বোধ করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে দিনকতক থাকিয়া শ্রীকুণ্ডে গিয়া পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ দাসজির নিকট শ্রীহরিনামামৃত অধ্যয়নও করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বাবাজির নিকট বহু বৈষ্ণবের যাতায়াতে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হইতেছিল দেখিয়া তিনি শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতবংশ শ্রীশ্রীরাম শিরোমণি গোস্বামি প্রভুর নিকট আবার ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। এখানেও কয়েক বৎসর থাকিয়া দেখিলেন যে টোলবাড়ীতে পাঠের সময় ব্যতীত বহু গোলযোগে সময় নষ্ট হইতেছে। তখন আবার শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীজগদানন্দ দাসজির নিকট কয়েক বৎসর পড়িয়া সমগ্র শ্রীহরিনামামৃত আয়ত্ত করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর। শ্রীকুণ্ডে তখন শ্রীগোপীদাস নামক জনৈক বড় কীর্ত্তনীয়া ছিলেন—ইনি পদকল্পতরুর [সংগ্রাহক শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস] প্রসিদ্ধ গায়কের শিরদোহার ; শ্রীকুণ্ডে বাস করায় তাঁহার নিকট ইনি কীর্ত্তন শিখিয়াছিলেন। তিনি যখন যখন গানকীর্ত্তন করিতেন—শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজি মহাশয় স্বরবান্ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও সঙ্গে বসাইতেন ; বাবাজি মহাশয়ের কিন্তু তাহাতে বিশেষ অভিরুচি ছিল না, পড়ার দিকেই আগ্রহ ছিল। শ্রীজাহ্নবা মাতার উৎসবে প্রতিবর্ষেই ব্রজের সমস্ত বৈষ্ণব উপস্থিত হইয়া থাকেন—তিন দিন কীর্ত্তন হয়, চতুর্থ দিবস কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকুণ্ড-পরিক্রমা হয়। সেই

সময় একবার কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোপীদাসজি গানখানি গাহিয়া ছাড়িয়া দেওয়ামাত্রই শ্রীঅদ্বৈত দাসজি তাঁহার দোঁহার-রূপে কীর্ত্তনটী আবার গাহিলেন। তাহাতে কুঞ্জরার সিদ্ধ শ্রীগৌরচরণ দাস বাবাজি মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীকুণ্ডে আর একজন গায়ক হইলেন বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত দাসজি তাঁহার চরণে পড়িয়া দণ্ডবৎ করিলেন এবং তিনিও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন হইতেই ইনি শ্রীগোপীদাস বাবাজির নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। শ্রীগোপীদাসজির নিকট কীর্ত্তন গান শিক্ষা করিয়া তিনি রাঢ়দেশীয় পাঁচথুপী গ্রামের কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র মহাশয়ের নিকট আসিয়া বিবিধ গান শিখিলেন এবং বহু স্থানে গিয়া যত সুগায়ক পাইলেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও কীর্ত্তনগান শিক্ষা করিলেন। ইহাদের কিছুকাল পূর্ব্বে মহানন্দ বসাক নামে এক বড় কীর্ত্তনীয়া বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র বৈষ্ণবচরণ ও কন্যা ভাল কীর্ত্তন জানিতেন—শ্রীঅদ্বৈত দাসজি তাঁহাদের নিকটও কীর্ত্তন শিখিলেন। এই সময়ে শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য শ্রীপাদ নীলমণি প্রভুও তাঁহার সহিত মিশিয়া কীর্ত্তণ শিক্ষা করিতেন—কোথাও ভাল গায়ক আছে শুনিলেই প্রভু নিজের খরচে ইহাকে তথায় পাঠাইয়া কীর্ত্তন শিক্ষা করাইতেন এবং পরে তাঁহার নিকট নিজেই শিখিতেন। তৎপরে ইহার নিকটে ক্রমে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ ব্রজবাসী, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীগদাধর দাস বাবাজি, শ্রীভক্তিচরণ দাস বাবাজি প্রভৃতিও গান শিখিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত পদ্মলোচন নাগ মহাশয় শেষজীবনে সপরিবারে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে সর্ব্বথা গুরুবুদ্ধি এবং তাঁহার পত্নীকেও গুরুপত্নী-বুদ্ধি করিতেন। তাঁহার দুই কন্যাকেও তিনি নিজ-সহোদরাবৎ জ্ঞান করিতেন। নাগ মহাশয়ের পত্নী অতি বৃদ্ধ বয়সে

দেহত্যাগ করিলে বাবাজি মহাশয় তাঁহার সংকার এবং বৈষ্ণবোচিত উৎসবাদি গান-কীর্ত্তন সহযোগে সমাধা করিয়াছিলেন।

ইনি যখন বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করত গান শিক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় একবার কিছুদিনের জন্য তিনি কাটোয়ায় ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার ধর্মপত্নী ও বিধবা ভগ্নী ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই কালে কাটোয়ার (শ্রীঅদ্বৈত-বংশ্য) বড় প্রভু, ছোট প্রভু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায়েত বেণীমাধব ঠাকুর প্রভৃতি মহানুভব বৈষ্ণবগণ তাঁহার ধর্মপত্নী ও বিধবা ভগ্নীর দুরবস্থাদর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহার পত্নীকে পুনরায় অঙ্গীকার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁহাদের আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না—তখন হইতে আবার শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন—তাঁহার একটি কন্যা জন্মিল—গৃহস্থধর্মানুসারে বারেন্দ্র-কায়স্থ কুলে তাহাকে বিবাহ দিলেন—তাহারই গর্ভে বিমান বিহারী মজুমদার এম, এ, মহাশয়ের জন্ম হয়। কন্যা ও জামাতকে শ্রীনবদ্বীপের বাড়ী দান করত ইনি সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া রাজর্ষি বাহাদুরের সাহায্যে বাস করিতে লাগিলেন। অল্প দিন মধ্যে তাঁহার পত্নী ধাম লাভ করায় বাবাজি মহাশয় 'কাঙ্গালের মহাপ্রভু' নামক বৈষ্ণব-ঠৌরে আশ্রয় লইলেন। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ: ক্ষীণ হইলে এ সময়ে মথুরায় গিয়া একটি চক্ষু কাটাইলেন, তাহা কিন্তু ভাল হইল না। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া অবধি তিনি তাঁহার বহুপ্রয়াসে সংগৃহীত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং নিজেও ন্যায় বেদান্ত পড়িতে লাগিলেন। অবসরমত শ্রীভক্তিগ্রন্থাদিও তিনি আলোচনা করিতে লাগিলেন। এখানে ন্যায়ের ভাল শিক্ষা হয় না দেখিয়া তিনি প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে ন্যায় পড়িতে আবার শ্রীনবদ্বীপে আসিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় শরীরের অবস্থা-বিবেচনায় শেষ সময়ে দুহিতা ও দৌহিত্রের সাহায্য প্রার্থনা

করিয়া এবং ডান চক্ষুটী ও কাটাইবার ইচ্ছায় স্বসংগৃহীত গ্রন্থাদিসহ তিনি নবদ্বীপে আসিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে দুহিতার পরলোক হইলে আবার তিনি শ্রীবৃন্দাবনে 'বাঙ্গালের মহাপ্রভুর' ঠৌরে আসিলেন।

রাজর্ষি বাহাদুরের সহায়তায় শ্রীবৃন্দাবনে বাস করার কিছুদিন পুর্বে কাশিমবাজারের স্বনামধন্য রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাঁহাকে নিজের রাজধানীতে রাখিয়া ছাত্রদিগকে কীর্ত্তন শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাবাজি মহাশয় সাধারণ ছাত্রের ন্যায় কীর্ত্তন শিখেন নাই—তাঁহার গানশিক্ষা গুরুপরম্পরায় ঠিক মুদ্রিত বস্তুর ন্যায় অক্ষুন্ন ছিল—বলিতে কি, তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্তই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গরাণহাটী কীর্ত্তন ছিল। কাশিমবাজারের মহারাজা দেখিলেন যে কোনও ছাত্রই তাঁহার গান শিখিতে পারিতেছে না, তখন তিনি কীর্ত্তনের স্বরলিপি করাইতে চেষ্টা করিলেন। সেই সময়ে বনবিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীল রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী—জনৈক প্রসিদ্ধ কালোয়াতী গায়ক—মহারাজের নিকট ছিলেন। মহারাজ তাঁহা দ্বারাই স্বরলিপি করাইতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। গোস্বামিজি বলিলেন '—অতিবিলম্বিত গান এবং অনেক স্থানেই স্বরলিপির আয়ত্ত নহে।'

কীর্ত্তনে তাঁহার যে জাতীয় আগ্রহ ছিল, তাহা বিরল-প্রচার। তিনি একবার শ্রীল রাধিকা নাথ গোস্বামিপ্রভুর বাড়ীতে সকাল বেলা নয়টা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত একাসনে বসিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার গানের ছাত্রের যেমন অভাব ছিল, তদ্রূপ দোহারের অপেক্ষাশূন্য হইয়া কীর্ত্তন করিবারও যথেষ্ট শক্তি ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামী (ভাজনঘাট, নদীয়া)

শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীসদাশিব কবিরাজের বংশে শ্রীকানুঠাকুরের সপ্তম অধস্তন-রূপে নদীয়া জেলার ভাজনঘাটে ১৭৩২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তমবর্ষ বয়সে ইনি পিতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ব্যাকরণ পাঠ করেন এবং ত্রয়োদশ বর্ষে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করত নবদ্বীপের টোলে বিদ্যাভাস করিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর ইনি ঢাকায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দান—সর্বজন-প্রশংসিত। তিনি যাত্রার পালাহিসাবে আটখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন। **নন্দহরণ, স্বপ্নবিলাস, দিব্যোন্মাদ, বিচিত্রবিলাস, ভরতমিলন, গন্ধর্ব্বমিলন, কালীয়দমন** ও **নিমাইসন্ন্যাস**—এই গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটিতে অপূর্বত্ব ও রসালত্ব বিদ্যমান। এই সব গ্রন্থের শ্রবণে শত সহস্র নরনারী অশ্রুপাত করিয়া দিবারাত্র এক অভিনব ভাববিহ্বলতা ও রসতন্ময়তা প্রাপ্তি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকমলে একাধারে পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিতার সহিত তাঁহার সর্বজনপ্রিয় ব্যবহার-কুশলতা মিশিয়া তাঁহাকে চির অমর করিয়াছে। তাঁহার অনুপ্রাস-প্রিয়তা সময়-বিশেষে শ্রুতিকটুতা আনয়ন করিলেও তাহাই আবার সময়-বিশেষে বিভিন্নার্থের দ্যোতক হইয়া সুরসতাও দান করে—একথাও স্বীকার্য্য। ১৮৮৮ খৃঃ ১২ই মাঘ ইনি চুঁচুড়ার নিকটে গঙ্গাতীরে অপ্রকট হন।

———

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর *

আদিশূর-কর্ত্তৃক আনীত পুরুষোত্তম দত্তের বংশে পঞ্চদশ পর্য্যায়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন; তাহার পরে আবার নবম পর্য্যায়ে আনন্দচন্দ্র পরম ধার্ম্মিক, সরলহৃদয় ও বিষয়-বিরক্ত মহাজন ছিলেন। আনন্দচন্দ্রের পুত্রই—কেদারনাথ। আনন্দ চন্দ্রের শ্বশুর ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী তৎকালে নদীয়া জিলার উলা (বীরনগর) গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। আনন্দচন্দ্র কলিকাতার বাস-ভবন ত্যাগ করত স্বপত্নী জগন্মোহিনীর সহিত উলাতেই বাস করিতেন এবং এই উলাতেই ১২৪৫ বঙ্গাব্দে ১৮ই ভাদ্র কেদারনাথের জন্ম হয়।

ষষ্ঠ বর্ষকালে ইনি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করত তথ্য সংগ্রহ করিতেন। তান্ত্রিক উপাসনার রহস্য জানিবার জন্য তিনি তত্রত্য ব্রহ্মচারীর গৃহে যাইতেন। নয় বৎসর কালে জগৎ ভট্টাচার্য্যের নিকট জ্যোতিষ পড়িতে গেলেন। এগার বছরে আনন্দচন্দ্রের পরলোক হইলে ইঁহার জীবন বিবিধ অভাব ও অসুবিধার মধ্য দিয়া চালিত হইতে থাকে। এ সময়ে তিনি 'উলাচণ্ডী-মাহাত্ম্য' লিখেন। ভগবানের অস্তিত্বাদি-সম্বন্ধে তখন হইতেই তাঁহার জিজ্ঞাসা চলিল। উলাতে কর্ত্তাভজাদলের আড্ডা ছিল বলিয়া ইনি সেই সময়ে তাহাদের সহিত মিশিয়া ঐ মতের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কলিকাতা হিন্দু চেরিটেবল্ ইন্‌ষ্টিটিউসানে চার বছর অধ্যয়ন করেন—এই সময়ে তিনি 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন, ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিতেন, ইঁহার তাৎকালিক সাহিত্য-প্রতিভা কেশবচন্দ্র সেনকেও আকর্ষণ করিল। শ্রীযুক্ত

* 'স্বলিখিত জীবনী'র ছায়া।

দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার পরম বান্ধব ছিলেন, তাঁহার নিকট ইনি সংস্কৃত ভাষা ও পাশ্চাত্য দর্শনাদি পড়িয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। ইনি বাঘ্‌নাপাড়ার শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামিজির নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

১৮৫৮ খৃঃ গ্রীষ্মকালে কেদারনাথ পদব্রজে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন—পথে যাজপুরে দুই তিন দিন কাটাইয়া ইনি ছুটিগ্রামে স্বপিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করেন—তিনি সাধক ও দৈবজ্ঞ ছিলেন—তাঁহার গৃহে শ্রীরাধামাধব ও শ্রীজগন্নাথের সেবা ছিল। পিতামহ অন্তিমকালে ইঁহাকে 'তুমি বড় বৈষ্ণব হইবে' বলিয়া কৃপা-ইঙ্গিত করিলেন। ইনি তৎপরে কটক, ভদ্রক ও মেদিনীপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। তৎপরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বহুদেশে ঘুরিয়াছেন—সর্বত্র শ্রীহরিকথা-প্রচার, নির্ভীকভাবে উপধর্ম্মের নিরসন এবং বিবিধ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লেখা ব্যতীতও ইনি কতকগুলি মৌলিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া চিরযশস্বী হইয়া গিয়াছেন—প্রতি গ্রন্থেই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বটি স্ফুটতর-রূপে সাধক পাঠকের নয়ন-সম্মুখে উপস্থাপিত করাই ইঁহার গ্রন্থের বিশেষত্ব। গীতি-সাহিত্যেও ইঁহার অনেক দান আছে—প্রতিপদই বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্বের সুষ্ঠ নিদর্শন—অরুণোদয়-কীর্ত্তন; নগর-কীর্ত্তন, বাউলসঙ্গীত, কার্পণ্যপঞ্জিকা প্রভৃতির প্রত্যেকটিই আস্বাদ্য ও উপভোগ্য।

ইনি 'স্বলিখিত জীবনীতে' লিখিয়াছেন যে একবার ১৮৮৭ ইং সালে তারকেশ্বরে অবস্থানকালে এই স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন—'প্রভু বলিতেছেন—তুমি বৃন্দাবনে যাইবে, কিন্তু তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপধামে যে সমস্ত কার্য্য আছে, তাহা কে করিবে?' অবশ্য এ ঘটনার পূর্বে তাঁহার মথুরা মণ্ডলে বাসের সঙ্কল্প আসিয়াছিল। তৎপরে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান অন্বেষণ

করিতে করিতে বর্ত্তমান গঙ্গার উত্তর পূর্ব্বদিকে উজ্জ্বল আলোক দেখিলেন এবং ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থের সাহায্যে প্রাচীন মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। এ সম্বন্ধে নবদ্বীপে ও অন্যান্য বহুস্থলে তুমুল বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল। শ্রীল সিদ্ধ গৌরকিশোর বাবার সহিত ইঁহার হৃদ্যতা ছিল এবং ইঁহার আগ্রহে তিনি বহুবার গোদ্রুমদ্বীপের আশ্রমে গিয়াছেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে ৯ই আষাঢ় ইনি স্বধামে গমন করেন।

তৎপ্রকাশিত ও প্রণীত গ্রন্থাবলির কয়েকটি ঃ—শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা, কল্যাণকল্পতরু, শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত টীকাসহ শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্যসহ শ্রীমদ্গীতা ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ, আম্নায়-সূত্র, শরণাগতি, শোকশাতন, জৈবধর্ম্ম, তত্ত্বসূত্র, শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-মঙ্গলস্তোত্র, হরিনামচিন্তামণি, দত্তবংশমালা, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা এবং দত্তকৌস্তুভ প্রভৃতি।

আত্মনিবেদন, লালসাময়ী প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির বহু বহু সুরসাল, সুমধুর পদাবলী থাকিলেও একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ভোজন শয়নে, দেহের যতন, ছাড়িব বিরক্ত হঞা॥
নবদ্বীপধামে, নগরে নগরে, অভিমান পরিহরি।
ধামবাসীঘরে, মাধুকরী ল'ব, খাইব উদর ভরি'॥
নদীতটে গিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি, পিব প্রভু-পদজল।
তরুতলে পড়ি, আলস্য ত্যজিব, পাইব শরীরে বল॥
কাকুতি করিয়া, 'গৌর-গদাধর' 'শ্রীরাধামাধব'-নাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ডাকি' উচ্চ রবে, ভ্রমিব সকল ধাম॥
বৈষ্ণব দেখিয়া, পড়িব চরণে, হৃদয়ের বন্ধু জানি।
বৈষ্ণব ঠাকুর, 'প্রভুর কীর্ত্তন' দেখাইবে দাস মানি॥

শ্রীগিরিধারী দাস বাবাজি মহারাজ

(শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর)

যশোহর জিলায় নড়াইল সাবডিভিসনের অনতিদূরে মহিষখোলা পল্লী—চিত্রা নদীটির তীরে তত্রত্য বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার ঘোষ-বাবুদের বাড়ী। এই ঘোষ-বংশ সুপ্রসিদ্ধ মকরন্দ ঘোষের সন্তান এবং কুলমর্যাদায় মহামহীয়ান্। এই ঘোষবংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—**শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস দেব**। ইনি শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের অনুজ। শ্রীল বরদা বাবুর ঔরসে শশিমুখী দেবীর গর্ভে মহেন্দ্র, গিরিন্দ্র, নগেন্দ্র ও হেমেন্দ্র—এই চারি ভাই জন্মগ্রহণ করেন।

১৩০১ বঙ্গাব্দে ৬ই মাঘ কৃষ্ণা নবমী তিথিতে শ্রীগিরীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। জন্মকালে নাকি ইঁহার সর্বাঙ্গ নাড়ীমালায় বেষ্টিত ছিল। আবাল্য ইনি রুগ্ন ছিলেন—অথচ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে স্বভাব-সুলভ শ্রদ্ধা-ভক্তি বহন করিতেন। জ্বরাতিসাররোগে ভুগিতে ভুগিতে একবার মৃতপ্রায় হইলে ইনি ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট খাইয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। লেখাপড়ায় ইঁহার মনোযোগ না থাকিলেও রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণের আখ্যায়িকা শুনিতে বাল্যকাল হইতে প্রীতিলাভ করিতেন। নৃত্যগীতে স্বভাবতঃই প্রবণতা ছিল—সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনতা ইঁহার শেষ জীবন পর্যন্তই লক্ষিত হইয়াছে। শ্রীতুলসী-সেবা ইঁহার বাল্যকাল হইতে অতিপ্রিয় ছিল এবং এই সেবাতেই তিনি বহু অপার্থিব বস্তু লাভ করিয়াছেন।

শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন নড়াইলে মুন্সেফ্ হইয়া যান, তখন গিরীন্দ্রনাথ নড়াইল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

বিপিন বাবু সকাল সন্ধ্যায় রীতিমত উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিতেন—নামের আকর্ষণে তত্রত্য বালকগণ প্রায়ই কীর্ত্তনে যোগ দিতেন, গিরীন্দ্রনাথও নাম-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া অল্প কালের মধ্যেই লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া বিপিন বাবুর সহিত কীর্ত্তনানন্দ করিতে লাগিলেন। বিপিন বাবুর নিয়ম ছিল—কোনও ভক্তকে কিছু দিতে হইলে কীর্ত্তনে চোখে চোখ দিয়া নাম করিতেন—তখন সেই চোখ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অথবা বিদ্যুৎকণা বাহির হইয়া ভাগ্যবান্ ভক্তের অন্তরের অন্তরতম স্থলটি স্পর্শ করিত। একদিন এই ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দ-ভাবে বিভোর বিপিন বাবু গিরীন্দ্রনাথের স্বভাব-সুলভ ভক্তিময়তা দেখিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন। গিরীন্দ্র তদবধি ইহার প্রিয়ভক্ত হইলেন—নিয়মিতভাবে কীর্ত্তনে আসিতেন, তজ্জন্য গুরুজনের গুরুতর গঞ্জনা, তাড়ন, ভর্ৎসনাদি যথেষ্ট সহিতেন। তিন বৎসর পরে বিপিন বাবু বদলি হইয়া বাঁকুড়ায় গেলেন—গিরীন্দ্রনাথ বিরহে অধীর হইয়া একটি গেলাসমাত্র হাতে লইয়া একাকী ঘরের বাহির হইলেন—অনেক কষ্টে বিপিন বাবুর সঙ্গ ধরিলেন। উভয়ের নির্বাধ মিলনে প্রেমের পাথার বহিল—তৎকালীন নামকীর্ত্তনে উল্লাস, হুঙ্কার, গর্জন, লম্ফঝম্প, আস্ফোটনাদি আর বর্ণনীয় নহে! গিরীন্দ্রকে পুত্রভৃত্যবৎ নিত্য বুকে বুকে চোখে চোখে রাখিয়া বিপিনবাবু প্রতি সেবাকার্য্য শিখাইতে লাগিলেন—নিজে আচরণ করিয়া বৈরাগ্য-ধর্ম্ম শিখাইতেন; শ্রীহরিবোল ঠাকুরের নির্দিষ্ট পন্থাটি সতত পালন করিতে উপদেশ দিতেন। গিরীন্দ্র এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল হইলে ইনি পলকে প্রলয় গণিতেন—শিষ্যের প্রতি এত বাৎসল্য, এত প্রিয়তা অন্যে কি সম্ভবে? গিরীন্দ্র ইঁহার প্রতিনিয়ত আলিঙ্গন-চুম্বনাদি পাইয়া দেহে ও মনে-প্রাণে পরিপুষ্ট হইলেন। তাঁহার তৎকালীন দেহের শ্যামলতা, প্রত্যঙ্গের সুস্নিগ্ধ সুবলনী, নয়নপ্রান্তের আরক্তিমা,

মুখমণ্ডলের গাম্ভীর্য্য-জড়িত স্মিত-কণিকা এবং প্রতিকার্য্যে উদ্দামভাব প্রভৃতি সকলেরই নয়ন-মন আকর্ষণ করিত। কোনও কোনও ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে অনেক সময় ইঁহাকে বিপিন বাবুর 'অভিন্ন তনু' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বাহির বাড়ীতে ও ভিতর বাড়ীতে গিরীন্দ্রনাথের অপ্রতিহত গতি ছিল। বিপিন বাবুর তাৎকালীন সকল লীলার সাথী ও সাক্ষী ছিলেন—গিরীন্দ্র। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে বিপিন বাবুর গিরীন্দ্রকে না হইলে চলিত না। চারি বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হইলে একদিন বিপিন বাবু গিরীন্দ্রকে ডাকিয়া অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজে দীক্ষিত করিলেন।

বিপিন বাবু যখন যে স্থলে মুন্সেফ্ হইয়া যাইতেন, ইনিও তৎসঙ্গে থাকিতেন; সকাল বেলা গিরীন্দ্র সহরে বাহির হইতেন—বিভিন্ন পথে পর্য্যটন করিতে করিতে উচ্চ কণ্ঠে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া 'হরিবোল' ধ্বনি করিয়া কত বদ্ধ জীবের মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন —তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনও বা শ্রীগুরুদেবের আদেশে ইনি ভিক্ষায় যাইতেন—তিন চার ক্রোশ পথ হাটিয়া নাম করিতে করিতে যাইতেছেন—অথচ কাহারও বাড়ীতে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না; অযাচিতভাবে কেহ কিছু দিলে তাহাই গ্রহণ করিয়া দিনান্তে গৃহে ফিরিয়া তাহাই সিদ্ধ করিয়া উদরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। চিরকাল গ্রহণীরোগী ছিলেন বলিয়া ক্ষুধা সহ্য করিতে অনভ্যস্ত ছিলেন এবং তজ্জন্য গোপনে বাজারের জিনিষ বা গৃহস্থিত সেবার দ্রব্য খাইয়া বহুশঃ নিগৃহীতও হইয়াছেন।

গিরীন্দ্র স্বভাবতঃই কৌতুকপ্রিয়, আবদারী ও সোহাগী ছিলেন—অথচ প্রতি কার্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহার শ্রীগুরুনিষ্ঠা দেদীপ্যমান ছিল। স্বভাব-সুলভ চপলতাবশতঃ ইনি একবার শ্রীগুরু-গৃহে একটি অন্যায় কার্য্য করিয়া বসিলেন, তাহাতে কুমিল্লায় অবস্থানকালে বিপিন

বাবু ইঁহাকে পনর দিনের জন্য গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি অনাহারে, অনিদ্রায় ও আত্মগ্লানিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেন—পঞ্চদশ দিবসে ইনি মরণোন্মুখী হইলে করুণাময় প্রভু ডাকিয়া আবার চরণে স্থান দিলেন—এখন হইতে ইঁহার প্রতি তীব্র শাসন চলিতে লাগিল—কথায় কথায় পাদপ্রহার, সামান্য ত্রুটিতে জুতা, খড়ম, লাঠি, গড়গড়ার নল চলিতে লাগিল—ইনিও অম্লানবদনে সকল শাসন সহিতে লাগিলেন—প্রিয় ভক্তকে সর্বপ্রকারে নিরভিমান করাই ছিল বিপিন বাবুর অভিপ্রেত—তাহা অশেষ বিশেষে প্রতিপাদন করিয়া ১৩৩০ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে বিপিন বাবু অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিলেন।

তখন হইতে গিরীন্দ্র অনাথা বিরহিণী নারীবৎ শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীনবদ্বীপে মুহুর্মুহু গতাগতি করিতে লাগিলেন—সর্বত্র উদাসীন, সর্বত্র বীতস্পৃহ, সর্বত্র অধীর হইয়া কাহার খোঁজে জীবন ব্যাপৃত করিলেন। আহারে, বিহারে, কথাবার্ত্তায় কোথাও তাঁহার স্বস্তি ছিল না। নিরাশ্রয় হইয়া শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে, কখনও বা ঘাটের চাঁদনীতে, কখনও কাহারও বারান্দায় থাকিতেন; রাত্রি তিনটার কালে শয্যাতাগ করতঃ সমগ্র সহরে উচ্চকণ্ঠে 'হরিবোল' করিয়া বেড়াইতেন। বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রাভাতিক কীর্ত্তন সমাপন করত গঙ্গাস্নান, তৎপরে ছুটিতে ছুটিতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মন্দিরে গিয়া মঙ্গলারাত্রিক দর্শন, তৎপরে অন্যান্য বিগ্রহাদি দর্শন কবতঃ বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন, বিগ্রহ-সেবা, ভিক্ষাটন ইত্যাদি করিয়া ভোগরান্না করিয়া প্রসাদ পাইতেন। এই ছিল তখনকার দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ।

একবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়া ইনি শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে কিছুদিন ছিলেন। তৎকালে ঐ মন্দিরে মহান্ত ছিলেন—শ্রীশ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজি মহারাজ; ইনি তত্রত্য নারায়ণ ছাতার সিদ্ধ কর্ত্তা

বাবাজির (শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাসজির) ভেকাশ্রিত ছিলেন। মহান্তজির ন্যায় এমন অকপট, দীনমূর্ত্তি, শ্রীগুরুনিষ্ঠ, সেবারসিক বৈষ্ণব অধুনাতন জগতে বিরল-প্রচার। তাঁহার সাদ্‌গুণ্য ও অহৈতুকী কৃপায় সমাকৃষ্ট হইয়া গিরীন্দ্র মহান্তজির নিকট বেশাশ্রয় করিয়া **'শ্রীগিরিধারী দাস'** নাম ধরিলেন। বেশাশ্রয়ের পর হইতে ইনি শান্ত ও ধীর হইলেন; ইতস্ততঃ ভ্রমণের স্পৃহা বর্জন করত শ্রীধাম নবদ্বীপে কুটীর নির্মাণ পূর্বক বাসনিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ভক্তবৃন্দের অর্থানুকূল্যে ও বজ্‌বজ্‌নিবাসী (অধুনা নবদ্বীপবাসী) শ্রীযুক্ত ননীলাল ভক্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ভূমিতে ইনি 'শ্রীশ্রীহরিবোল কুটীর' প্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্চিত মনে ভজন করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ইঁহার নিত্য পাঠ্য ছিল—পাঠাবসরে ইনি অনুগত ভক্তগণের দৈনন্দিন ত্রুটি বিচ্যুতির ঘটনাগুলি ব্যঙ্গোক্তি ও তীব্র কটুতার সহিত দেখাইয়া দিতেন, যাহাতে সমবেত জনগণেরও সকলেরই চিত্তশোধন হয়। কুটীর-প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইনি দুই চার জনকে দীক্ষা দিয়াছেন—দীন হীন কাঙ্গালের প্রতি বিশেষ করুণ ছিলেন বলিয়া উত্তরপাড়া, বালি, লিলুয়া এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কতিপয় ভক্তকে শ্রীহরিনাম দিয়াছিলেন। একান্ত ভজননিষ্ঠ শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভর দাস ও ক্ষুদ্রতম দাস হরিদাস—এই দুই জনকেই ইনি বেশাশ্রয় দিয়াছিলেন।

১৩৫০ সাল হইতে ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকে। ১৩৫১ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ ইনি হিতৈষী বৈষ্ণবগণের প্রেরণায় নীলাচলে স্বর্গদ্বারে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরের আশ্রয় করেন এবং ২০শে আশ্বিন কার্ত্তিকী গৌণী কৃষ্ণাসপ্তমীতে মুহুর্মুহু শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নাম স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারই শ্রীচরণে চিরবিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন।

মহান্ত শ্রীগোবিন্দ দাস বাবাজি মহারাজ

(শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠ, পুরী)

নোয়াখালী জিলার দালাল বাজারের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে শ্রীগৌরচরণ চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। ইনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বাল্য-কালেই মাতার পরলোক হইলে পিতা ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া সর্বত্র গতাগতি করিতেন। কয়েকদিন পরে তিনিও গত হইলে ইনি অসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে সত্য, সরলতা ও পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সদ্গুণ-রাজি ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। দাদালবাজারে তৎকালে বহু বৈষ্ণবের বাস ছিল—ইঁহার স্বভাব-সিদ্ধ গুণে আকৃষ্ট হইয়া তত্রত্য অধিকারীজি ইঁহাকে বাৎসল্যভরে আশ্রয় দান করত বৈষ্ণব ধর্মের রীতি নীতি শিখাইয়াছিলেন।

একবার ইনি সীতাকুণ্ডে বিশ্বনাথের দর্শনে গিয়াছেন—নিকটবর্ত্তী সহস্রধারা দেখিয়া ইঁহার মনে কৌতূহল জন্মে। বহু উচ্চস্থান হইতে অনবরত জলপ্রপাত হইতেছে—অথচ হরিধ্বনি বা উলুধ্বনি হইলে দ্রুতবেগে দ্বিগুণ জল পড়িতেছে। সহস্রধারার উৎপত্তিস্থান দেখিবার জন্য ইনি দুই একজন সাধুর সহিত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া এমন একস্থানে গিয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহাতে শীতার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও কোথাও আশ্রয় পাওয়ার উপায় ছিল না। নির্ভীক যুবক গৌরচরণ তখন ভগবন্নাম শরণ করত অতিকষ্টে সেই যাত্রা প্রাণ লইয়া বিপৎ-সঙ্কুল বনানী হইতে গৃহে ফিরিলেন; কিন্তু তদবধি গৃহে তাঁহার মনোনিবেশ হইল না; সদাই যেন উদাসীনতা, সর্বত্রই যেন অনাসক্তি দেখা দিল। তখন তিনি অজ্ঞাত প্রেরণায় তীর্থদর্শনোপলক্ষে গৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে কপর্দকহীন অবস্থায় শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন।

শ্রীজগন্নাথাদি দর্শন করত পরে দাক্ষিণাত্যের তীর্থরাজি দর্শনাশায় বহু দূর গিয়াছিলেন—তখন তিনি তরুতলে বাস করিতেন, অযাচিত ভাবে কিছু পাইলে আহার করিতেন, নতুবা উপবাসী থাকিতেন। এরূপভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে হঠাৎ তাঁহার মতি-পরিবর্ত্তন হইল; তীর্থদর্শনাপেক্ষাও প্রবলতর কিছুর আকর্ষণ অনুভব করিয়া ইনি পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্ববৎ যথারীতি দিনান্তে ছত্রে ভোজন ও যথেচ্ছ জগন্নাথ-দর্শনাদি করিয়া পথে ঘাটে বা তরুতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পুরীধামে তৎকালে শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেব সদলবলে নাম-প্রেম বিতরণ করিতেছিলেন—একদিন তিনি সিংহদ্বারে কীর্ত্তন করিতে করিতে এই গৌরচরণকে আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন, ইনিও বহুদিন পরে অভীষ্ট বস্তুর দর্শন-স্পর্শন পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। স্বাভাবিক প্রেম-সূত্রে উভয়েরই অন্তর গ্রথিত হইল—গৌরচরণ শ্রীরাধারমণ বিনা স্বপ্নেও অন্য চিন্তা করিতেন না—প্রতি সেবাকার্য্যে ইনি অগ্রণী ও প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেও অকুণ্ঠ ছিলেন। একদিন শ্রীরাধারমণ ইঁহাকে নারায়ণ ছাতার কর্ত্তাবাবাজী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া বেশাশ্রয় করিতে আদেশ করিলেন—গৌরচরণ অনেক আপত্তির পর অগত্যা ইঁহার আদেশ পালন করিলেন। তাঁহার ভেকের নাম হইল—**শ্রীগোবিন্দ দাস**।

শ্রীগোবিন্দ দাস কর্ত্তাবাবাজীর আজ্ঞানুসারে তখন হইতে শ্রীরাধা-রমণের প্রেমসেবায় কায়মনোবাক্য নিয়োগ করিলেন। মুষ্টিভিক্ষা করিয়া বৈষ্ণবসেবার ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হইল—নিজের কিন্তু বৈষ্ণবাধরামৃত একরত্তি ছাড়া মঠে প্রসাদ পাওয়ার অধিকার রহিল না; ছত্রে ছত্রে মাগিয়া যথাকথঞ্চিৎ উদর-পূর্ত্তি করিয়া ইনি অক্লান্ত-ভাবে অনলসে শ্রীরাধারমণের যাবতীয় সেবাকার্য্য করিতেন। 'কর-

পাত্র ও উদরঝোলা' শ্রীগোবিন্দ দাস কিন্তু মহানন্দেই দিন কাটাইতেন! মঠে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়াছে, তদুপরি মহাপ্রসাদও প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে—নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহু লোকের প্রসাদ পাওয়া হইয়াছে, তখন দেখা গেল যে কোনও হাঁড়িতে যৎসামান্য অম্বল, কোথাও বা যৎকিঞ্চিৎ পরমান্ন অবশিষ্ট আছে—কৌতুকী সহচরগণ গোবিন্দ দাসের মাথায় সেই অম্বলটুকু বা পরমান্নটুকু ঢালিয়া দিয়া পরমানন্দে 'হরিবোল' করিয়া তাঁহার গাত্র চাটিতে লাগিলেন—তখন তাঁহার রঙ্গভঙ্গ ও সকৌতুক সুমিষ্ট ভৎর্সনার আড়ম্বর দেখিয়া সঙ্গিগণের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হইল—বিনা ভোজনে সকলের পেট ভরিয়া যাইত। এই ব্যাপার শুধ্ একদিনের বা দুইদিনের ঘটনা নহে, প্রায়ই এতাদৃশ লীলাকৌতুক সঙ্ঘটিত হইত। বস্তুতঃ শ্রীনবদ্বীপ দাদা ও শ্রীগোবিন্দ দাদা অভিন্নহৃদয় ছিলেন এবং বড় বাবাজি মহাশয়ের দুই হস্তস্বরূপে সদা সর্বত্র সর্ব্বকার্য্যে সহায়ক হইলেন।

মাঝে মাঝে গোবিন্দ দাসকে দারুণ পরীক্ষা দিতে হইত। আজ্ঞা হইল—'গোবিন্দ দাস! নীলাচলবাসিদের প্রস্রাব-স্থান বা পায়খানাগুলি দেখিলেই সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির পর্য্যন্ত যাও।' আজ্ঞাবহ ভৃত্য তৎক্ষণাৎ অবিচারে শত সহস্র লোকের বিবিধ উপহাস-বাক্য উপেক্ষা করত দণ্ডবৎ করিতে করিতে চলিলেন। গোবিন্দ দাস দারুণ জ্বরে উত্থানশক্তি রহিত হইলেন; আজ্ঞা হইল—'এক্ষণই নরেন্দ্র-সরোবরে গিয়া ১০৮ ডুব দিয়া আস।' যথারীতি আজ্ঞা-পালন হইল। এইভাবে অবিচারে আনন্দমনে আজ্ঞাপালন করিতে করিতে ইহার চিত্তে শ্রীরাধারমণের অভিপ্রায়গুলির প্রতিবিম্ব পড়িত—শ্রীরাধারমণ কোন্ সময়ে কোন্ জিনিষটি আহার করিতে ইচ্ছা করিবেন, ইনি তৎপূর্ব্ব হইতেই তাহার

সংগ্রহ ও রন্ধনাদি করত প্রস্তুত করাইয়া রাখিতেন। দেবদুর্ল্ভ রন্ধন প্রক্রিয়া, যাবতীয় সেবা-পরিপাটী, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অসাধারণ প্রিয়তা এবং দীন দুঃখী কাঙ্গাল পতিতের প্রতি ইঁহার সুস্নিগ্ধ ব্যবহার-কৌশল প্রভৃতি দেখিয়া আমরা সত্যসত্যই বিমুগ্ধ হইয়াছি। দাস্যসখ্যভাবে বিভোর এই মহাপ্রাণ মহাজন যখন শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীগোকুল, শ্রীরামদাস এবং শ্রীজয়গোপালাদি সহচরগণ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে মাতিয়া খঞ্জননৃত্য করিতেন—তখন যে কি আনন্দোৎসবের অবতার হইত, তাহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণেরই দর্শনীয়, আস্বাদনীয় ও অনুভবনীয় ছিল !! অকিঞ্চন দাসের লেখনী এস্থলে অচলা, বাণী মূকা !!

পট পরিবর্ত্তন হইল। একদিন প্রাতঃকালে বড় বাবাজি মহাশয় মহাগম্ভীরভাবে শ্যামসুন্দর বাবুর কাছারী বাড়ীতে বসিয়া একখানি পত্র লিখিয়া গোবিন্দ দাসের হস্তে দিবার জন্য একটি বালককে অনুমতি করিলেন এবং পঠপাঠ করিয়া সে কি বলে, তাহাও শুনিয়া আসিতে বলিলেন। পত্রখানি এই—

"ভাই গোবিন্দ! পত্রপাঠ মাত্র বিনা ওজরে হাঁটা পথে শ্রীধাম বৃন্দাবন্ রওনা হইবে। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস, ঝাড়ু গিরিসেবা এবং মাধুকরীবৃত্তি-অবলম্বনে জীবনযাপন করিবে। সম্প্রতি আর আমার সঙ্গে দেখা হইবে না। শ্রীনিতাইচাঁদের ইচ্ছায় সময়মত স্থানান্তরে দেখা শুনা হইবে।" ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীরাধারমণ চরণ দাস

পত্রখানি শুনিয়া সমবেত সকলের ব্যাকুলতা হইলেও কিন্তু গোবিন্দ দাদা ধীরচিত্তে বলিলেন—'আচ্ছা, তাহাই হইবে। তাঁহার চরণে আমার দণ্ডবৎ। তিনি সুখে থাকুন।' ছেলেটী ফিরিয়া আসিয়া

এই কথাগুলি বলিলে বড় বাবাজি নীরবে প্রাতঃকৃত্য করিতে গেলেন। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্যামানন্দ দাস ও নিতাইদাস পরে ইঁহার অনুমতি লইয়া গোবিন্দ দাদার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া দর্শনাদি করত ইনি শ্রীগিরিরাজ পরিক্রর্ম্মাপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিলেন এবং একাদিক্রমে ছয়টি বৎসর শ্রীকুণ্ডের ঝাড়ুসেবা করিলেন। এই সময়মধ্যে তিনি নির্দিষ্ট সেবা ছাড়িয়া একদিনের জন্যও কোথাও যান নাই; কদাচিৎ শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমায় বা শ্রীবৃন্দাবনে গেলেও সেইদিনই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ লীলাস্থলী বর্ষাণে বা নন্দগ্রামেও ইনি তখন যান নাই। এইভাবে একনিষ্ঠচিত্তে ছয় বৎসর যাবৎ শ্রীকুণ্ডের সেবা করত ইনি বহু অলৌকিক ভাব-সম্পদের অধিকারী হইলেন; শ্রীরাধা-রমণ ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবনে গেলে তখন আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, আবার তাঁহার আজ্ঞাক্রমে নীলাচলে আগমন করত কীর্ত্তনানন্দ করিলেন। শ্রীরাধারমণ-সঙ্গে তৎপরে শ্রীধাম নব-দ্বীপে আসিয়া সেবানন্দে দিন কাটাইতেছিলেন—এমন সময় হঠাৎ শ্রীরাধারমণ অন্তর্ধান করিলেন। তৎকালে ইঁহার বিরহ-যন্ত্রণা ভাষায় বর্ণনা হয় না—নিশিদিন হা হুতাশ করিয়া দুর্বিষহ জীবনভার বহন করিতে করিতে প্রত্যাদেশ পাইলেন—'পুরীতে গিয়া শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ কর।' পুরীতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরটি বহু প্রাচীন—নিকটেই শ্রীশ্রীনিতাইগৌরসীতানাথ উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানমগ্ন আছেন। এ স্থানের সেবার মহাদুরবস্থা হইতেছে—ঋণের দায়ে মঠটিও কোনও পাদ্রির নিকটে নিলামে যাইতে বসিয়াছিল!! এরূপ দুরবস্থা হইলে মহাপুরুষের প্রাণে দারুণ ধাক্কা লাগিয়াছিল—তারই জন্য তিনি নিজ প্রিয়সেবক গোবিন্দ দাসের হস্তে সেবাভার দিলেন। গোবিন্দ দাসও প্রাণপণে 'সেবা করিতে

লাগিলেন—সেবাদ্রব্য মস্তকে বহিয়া আনিতেন—প্রীতিভরে ভোগ লাগাইয়া প্রথমতঃ সমবেত অকিঞ্চন কাঙ্গালী সকলকে খাওয়াইয়া—পশুপক্ষীকেও মাধুকরী দিয়া—তবে নিজগণ লইয়া প্রসাদ পাইতেন। আদোষদর্শী, অনাথ-জীবন, পতিত-শরণ গোবিন্দ দাস একাদিক্রমে বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত বিবিধ ঝঞ্ঝাবাদ সহিয়াও মন্দিরের সেবাকার্য্য পরিচালনা করিলেন। ইনি নবাগত সেবককে প্রতি সেবাকার্য্য নিজ হস্তে করিয়া শিখাইতেন—তত্ত্ব ও লীলাটি যুগপৎ মুর্ত্তিমান্ করিয়া সেবকের চক্ষুর সম্মুখে ধরিতেন যেন কদাপি তাঁহার সেবা-ত্রুটি না হয়। সমাজ যাহাকে ঘৃণাক রিত, সংসার যাহাকে উপেক্ষা করিত, ইনি তাহাকে সমধিক প্রীতি করিয়া নিজের অমৃত-মধুর সঙ্গ দিয়া শ্রীশ্রীরাধারমণের বার্ত্তাসুধা পান করাইয়া ধন্যধন্য করিতেন। একদিনের জন্যও যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইহার সঙ্গ পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার গুণ-গরিমা মুক্তকণ্ঠে গাহিতেছে ও ঝুরিতেছে।

শেষ বয়সে ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরাধারমণ বাগের নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে অবস্থান করিতেন—সেখানেও বৈষ্ণবসেবা, সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়মিতরূপে চলিত। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুই গ্রন্থে ইহার যৎপরোনাস্তি আবেশ ছিল। ১৩৩৭ সালে ১৩ই বৈশাখ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ইনি শ্রীশ্রীরাধারমণ-চরণ স্মরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধারমণের নিত্য নিকুঞ্জলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

———

শ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবত-স্বামী মহারাজ

যশোহর জিলায় কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম হয়। অতিশৈশবেই মাতৃবিয়োগ হয় এবং জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই পিতৃদেবও অন্তর্ধান করেন—সুতরাং তদীয় মাতামহ সান্যাল মহাশয় তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সান্যাল মহাশয় জনৈক খ্যাতনামা অধ্যাপক ও মধ্যবিত্ত লোক ছিলেন। সান্যাল মহাশয় অতিথি-পরায়ণ ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে নিত্য অতিথি-সেবা হইত—এজন্য বিশেষ ব্যবস্থাও ছিল। সান্যাল মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে একদিন দ্বিপ্রহরে জনৈক রৌদ্র-ক্লিষ্ট অভ্যাগত ব্রহ্মচারী গৃহদ্বারে আসিয়া বিশ্রাম-স্থান প্রার্থনা করিলেন। তখন বালক (স্বামিজি) ছুটিয়া আসিয়া আগন্তুকের পুটলিটি স্বহস্তে লইয়া তাঁহাকে গৃহ-মধ্যে বিস্তারিত ফরাসের উপর বসিতে বলিলেন এবং পুটলিটি নিকটেই রাখিয়া ভিতর বাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া এক ঘটী জল আনিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন—'আপনাকে পাখা দিতে ভুল করেছি, দাদা মহাশয় বাড়ীতে থাকলে খুব বক্‌তেন।' এই বলিয়া পাখা আনিয়া তাঁহাকে বীজন করিতে থাকিলে অভ্যাগত নিজের হাতে পাখাটি টানিয়া লইলেন। অভ্যাগত কিন্তু এতাবৎকাল বালকের রূপ-মাধুরী পান করিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন আর বালকটিও তাঁহার সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি, গললম্বি রুদ্রাক্ষ ও, তুলসীর সুন্দর মালা এবং শুভ্র কেশকলাপ দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দিত হইতেছিলেন। বালক অনেক যত্ন করিয়াও পথিককে ভোজন করাইতে পারিলেন না, তবে স্বহস্তে তামাক সাজিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তামাক সেবন করিয়াই তিনি রওনা হইলেন—বালক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পরে দৌড়িতে দৌড়িতে বলিলেন—'ঠাকুর! ঠাকুর!! একটু দাঁড়ান, দাঁড়ান।'

বালকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ অতিথি দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—'একি বাবা? এমন করে কেন রৌদ্রে ছুটে এলে?' বালক বলিলেন—'চলে এলেন, আপনাকে যে প্রণাম করা হয় নাই।' বৃদ্ধ আদরে বালকটিকে বক্ষে চাপিয়া বলিলেন—'প্রণামের চেয়ে ঢের বেশী জিনিষ যে আমায় দিলে। তোমার দাদা মহাশয় উদ্বিগ্ন হবেন, সত্বর বাড়ী যাও।' বালক বলিলেন—'মন কেমন করছে।' এই বলিয়া বৃদ্ধের স্কন্ধদেশে নিজ শির রাখিলে বৃদ্ধ স্নেহালিঙ্গনে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শির নামাইয়া 'এখন ঘরে যাও বাবা, পরে হয়ত কখনও ....', বলিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। বালক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সান্যাল মহাশয় খবর পাইলেন যে সেদিন বালকটি তিন চারি ক্রোশ-দূরবর্ত্তী পরিচিত হরিচরণ বৈরাগীর সহিত তত্রত্য স্কুলঘরে উপবাসী থাকিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছেন—তিনি বালকটিকে গৃহে আনাইলেন, তদবধি জানিলেন যে এই বালকটিকে গৃহে রাখা যাইবে না। ইহার কিছুদিন পরেই আবার সান্যাল মহাশয়ের পরলোক গমন হয়।

অতঃপর তিনি আবার জনৈক ব্রহ্মচারীর সহিত মিলিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন—এই সময় তাঁহার বয়স তের কি চৌদ্দ। দীক্ষা না হইলেও তিনি বৈষ্ণব-বেশী ছিলেন। ব্রহ্মচারীজি কোনও এক শহরে তাঁহাকে লইয়া তদীয় গুরুদেবের আশ্রমে উপনীত হইলেন—গুরুদেব অজ্ঞাতকুলশীল অথচ স্নিগ্ধগম্ভীর-মূর্ত্তি ইঁহাকে দেখিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীর মুখে ইঁহার মাতামহের কথা ও ইঁহার আবাল্য ভগবৎপ্রিয়তাদির কথা জানিয়া উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—"আমার মনে হয় বুকটা উজাড় করে আমার যা আছে, সব তোমায় ঢেলে দিই।' সংসারে সব কিছু তোমার প্রচুর ছিল, তাতেও নাকি তুমি বিরক্ত হয়েছ। ভিক্ষান্নে তোমার পরমানন্দ;

আমার মনে হচ্ছে যে তোমাকে বাবাজি হ'তে উপদেশ দিই। তোমার যেমন সুতীক্ষ্ণ মেধা, এই বয়সে এতখানি শাস্ত্রজ্ঞান, তার উপর তীব্র বৈরাগ্য। আমার মনে হয় তোমাকে কষায়বস্ত্রপরা, মাথা-মুড়ানো যতির বেশে দেখি!" ইত্যাদি। সন্ধ্যার পরে তিনি বাদ্যযন্ত্র সহকারে শ্যামাসঙ্গীত গাহিলেন—নাদব্রহ্মের সাধনায় তিনি সিদ্ধ ছিলেন; যন্ত্রে গভীর ওঁকারধ্বনি পরিস্ফুট হইয়া সমবেত সকলকেই মোহিত করিল। মূর্চ্ছনাদির পরে তিনি (ব্রহ্মচারীর গুরুদেব) উঠিয়া সেই তরুণ (স্বামিজি) মহাপুরুষকে গাঢ় আলিঙ্গন করত বলিলেন— "তোমায় যিনি পথ দেখাবেন, তিনি এখনো তোমাকে খুঁজে পান নি, তিনি তোমার অপেক্ষাতেই আছেন—নিজেই তিনি খুঁজে নিবেন। তুমি নিজের মনে কেবল অগ্রসর হয়ে চল।"

অতঃপর নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী আশ্রম-কল্প কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে তিনি বিদ্যার্থী হইয়া কিছুদিন ছিলেন। গৃহস্বামী ছিলেন ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণব—সে স্থানে ভক্তিশাস্ত্রেরই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। গেরুয়াধারী ইনি (স্বামীজি) এখানে আসিয়াও সকলেরই মনপ্রাণ আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রতিভাদি দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইল। এস্থানে কয়েকদিন অধ্যয়নের পর এক বিধবা রমণী তাঁহার অলোক-সামান্য রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে জাহ্নবীর তীরে একদৃষ্টে ইঁহার পানে তাকাইয়া ছিলেন—ইনি সক্ষোভ গর্জনে বলিয়া উঠিলেন—'আবার! পালাবার পথও বন্ধ'!! রমণী বলিল—'দোষ কি? চোখের দেখা দেখ্‌তেও কি অপরাধ?' ইনি বলিলেন—'আপনিই আমাকে আশ্রম হইতে তাড়াবেন।' তাহাই হইল—তাঁহার অনিন্দ্য কান্তিই প্রতিবন্ধক হইয়া সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যাঘাত করিল; তিনি আবাল্য কামিনী কাঞ্চনকে বিষবৎ দূরে পরিহার করিয়াছেন, এবারও তাহাই করিলেন।

উদাসীন হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট তান্ত্রিক ব্রহ্মচারী সাধুর সহিত দুই বৎসর পরে আবার মিলন হইল। উভয়ের অভাবনীয় মিলনে উভয়েরই আনন্দ হইল; উভয়েই ছিলেন অভুক্ত, তরুণ কাশী যাইতে ইচ্ছা করিলেও কিন্তু তখন আশ্রয়প্রার্থী হইয়া রাত্রিযোগে নিকটবর্ত্তী আশ্রমে উপনীত হইলেন। আশ্রমটি ছিল —সেই তান্ত্রিকের বৈষ্ণব গুরুর আখ্‌ড়া। আশ্রমে প্রবেশ করিলেই তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর সতীর্থ আসিয়া ব্যগ্রতার সহিত জানাইলেন যে তাঁহাদের গুরুদেব বার্দ্ধক্যবশতঃ দুই তিন দিন যাবৎ বিশেষ অসুস্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার জন্য সকলেই চিন্তিত ছিলেন। একটি তৃণ-শয্যায় ক্ষীণদেহ হইলেও জনৈক স্নিগ্ধ-দর্শন বৃদ্ধ বৈষ্ণব বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন—তান্ত্রিক ব্রহ্মচারী তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব তরুণ স্বামিজিকে সাদর অভ্যর্থনা করত ভিতরে লইয়া গেলেন এবং তদীয় শিষ্য ব্রহ্মচারীর মুখে ইঁহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন—'অহো! সেই তিনি? আ একি গৌরচন্দ্র' বলিতে বলিতে তিনি কম্পিত-কলেবরে পতনোন্মুখ হইলে ব্রহ্মচারী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অস্ফুটস্বরে আরও দুই একটি কথা তিনি উচ্চারণ করিতে করিতে কণ্ঠমধ্য হইতে শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড় শব্দ উঠিল। তিন জনে মিলিয়া তাঁহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। তত্রত্য সেবক উচ্চকণ্ঠে তাঁহার কর্ণে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী নাড়ী-পরীক্ষায় দেখিলেন যে উহা খুবই দুর্ব্বল।' কিয়ৎকাল পরে বৃদ্ধ বাবাজি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন —'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ।' আবার উদাসীন তরুণকে (স্বামিজিকে) লক্ষ্য করত বলিলেন—'আমার গৌরচন্দ্র কই?' তরুণ লজ্জায় কুটীরের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। আশ্রমের সেবক তাঁহাকে আবার ভিতরে যাইতে আহ্বান করত বলিলেন—'বাবাজি মহাশয় এবার প্রকৃতিস্থ

হইয়া আপনাকে না দেখে কাতর হচ্ছেন, আপনি ভিতরে চলুন।' বৃদ্ধ বাবাজি ব্রহ্মচারীর বুকে ঠেস্ দিয়া বসিয়া জপমালায় হরেকৃষ্ণ নাম করিতেছেন—উদাসীন এই তরুণকে দেখিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—'এস বাবা, আমার অপরাধ মার্জনা কর, এখানে আসন নিয়ে বস; তোমার কথা আমাকে নিতাই দাস বলেছিল; আমার ভাগ্য যে এমন সময়েও তোমার দেখা পেলাম। দেখ্‌বার সাধ হয়েছিল—সেদিন ওঁর মুখে শুনে। গৌরচন্দ্র তা পূর্ণ করলেন। আতিথ্য স্বীকার কর বাবা আমাদের এই কুটিরে!' নিতাই দাসকে বলিলেন—'যাও, একে বিশ্রাম করিয়ে আহারের যোগাড় কর।' গলায় শ্লেষ্মার প্রকোপ দেখিয়া ব্রহ্মচারী তাঁহার বক্ষে ও পৃষ্ঠে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ব্রহ্মচারীর সহিত নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে গিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন—'ভাই! আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হইবে। তুমি দুই চারি দিন এখানে থেকে বাবাজি মহারাজের সেবা কর; আমি বিশেষ প্রয়োজনে দুই তিন দিনের জন্য স্থানান্তরে যেতে চাই।' কারণ-সম্বন্ধে পৃষ্ট হইয়া আবার বলিলেন—'বাবাজি মহাশয়ের গৃহস্থাশ্রমের ধর্মপত্নী—আজীবন ব্রহ্মচারিণী ও শুদ্ধসত্ত্বময়ী বৃদ্ধ বয়সেও কঠোর ভজনে নিযুক্তা আছেন। এই বাবাজি মহারাজ তরুণ বয়সেই গৃহ-ত্যাগ করিলে তিনিও তদবধি গৃহস্থাশ্রমে থেকেই সর্বত্যাগিনী হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে তাঁহার গুণপনার কথা শুনে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম—আমি তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে সেবার বিশেষ দরকার মনে হইলে গিয়ে তাঁহাকে সংবাদ দিব। উদাসীন (স্বামিজি) এই কথায় একটু কিন্তু করিলেও কিন্তু ব্রহ্মচারীর আগ্রহে স্বীকৃত হইলেন।

গভীর রাত্রে কুটীর-মধ্যে অতন্দ্রভাবে বৃদ্ধ সাধুকে প্রায় কোলে করিয়াই তরুণ (স্বামীজি) বসিয়া আছেন—বারে বারে ঔষধ সেবা

করাইতেছেন—পুরাতন ঘৃত বক্ষে, পৃষ্ঠে ও পদতলে মালিশ করিতেছেন—বৃদ্ধের আর আপত্তি নাই, তিনি এক একবার চক্ষু উন্মীলন করত ইহাকে দেখিতেছেন, মুখে অস্ফুট 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ,' কখনো বা 'গৌর' শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। কয়েকদিন পরে ব্রহ্মচারীর সহিত বৃদ্ধা (বৃদ্ধ বৈষ্ণবের ধর্মপত্নী) আসিয়া সব সেবাই করিতে লাগিলেন—বৃদ্ধা তপস্বিনীর সর্বাঙ্গে উদাসীনতার ছাপ দেখিয়া তরুণ (স্বামীজি) ভয়-মুক্ত হইলেন। এই সময়ে একদিন এই তরুণ সাধুটী নিকটবর্ত্তী পুকুরে স্নান করিতে গিয়া ঘাটে স্ত্রীলোকের ভিড় দেখিয়া সে দিকে না গিয়া অঘাটায় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া জলে নামিলেন—সে স্থান বহু জলজলতাদি-বেষ্টিত ছিল। তিনি নামিয়াই ডুব দিয়া কিছু দূর গিয়া মাথা তুলিতেই মনে করিলেন যেন মোটা একটা কি জিনিষ তাঁহার গলায় জড়াইয়া গিয়াছে। এদিকে ঘাট হইতে সঘন চিৎকার উঠিল—'সাপ, সাপ, ও সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমার গলায় যে মস্ত সাপ!! কি সর্ব্বনাশ!!!' বৈষ্ণবগণ তাহা দেখিয়া 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া চিৎকার করিলেন। আর ইনিও 'জয় নিতাই' বলিয়া সজোরে ডুব দিয়া কিছুক্ষণ পরে আবার উঠিতেই ধ্বনি হইল—'ছেড়ে গেছে, ছেড়ে গেছে! পালিয়ে এস সন্ন্যাসী ঠাকুর এবার। আমরা এই ঘাট ছেড়ে যাচ্ছি!!' ব্রহ্মচারিণী সেই মাতাও তখন কলসী কক্ষে করিয়া জলের কাছে নামিতেই ইনি তাঁহার হাত হইতে কলসী নিয়া দূর হইতে পরিষ্কার জল তুলিয়া দিলেন। তখন মাতা ধীরে ধীরে বলিলেন—'বাবা! অভয়ের সাধন করছ' কাকে তোমার ভয়? ভয় আপনিই ভয়ে পালিয়ে যাবে। সাপ, বাঘ যার পথ ছেড়ে দেয়, মানুষকে তার ভয়? যে মানুষ তার মা ভগিনী?' তরুণ আরক্ত মুখে তাঁহার চরণধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন। বর্ষীয়সী মাতা স্নিগ্ধ প্রসন্ন নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেইদিন মধ্যরাত্রে তপস্বিনী মাতা সকলকে ডাকিলেন—'তোমরা উঠো, সময় আগত।' ব্রহ্মচারী ও উদাসীন ছুটিয়া বৃদ্ধের নিকটে গেলেন। উদাসীন দণ্ডাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন যে বাবাজি যখন সুস্থ হইতেছেন, তখন প্রভাতে বিদায় নিয়া কাশীর পথে যাত্রা করিবেন; বৃদ্ধ বাবাজী ব্রহ্মচারীর অঙ্গে ঠেস দিয়া বসিলেন, তপস্বিনী মাতা স্থিরভাবে সম্মুখে উপবিষ্টা। তরুণ উদাসীনের দিকে চাহিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—'এ সময় দূরে কেন বাবা গোরাচাঁদ! আমার নিতাই চাঁদের কাছে এস। জন্মান্তরের সম্বন্ধ না থাকলে কি এমন সময়ে এমন মিলন হয়? সঙ্কোচ কিসের? কাছে এস।' উদাসীন তাঁহার আকর্ষণে ব্রহ্মচারীর পাশে বসিয়া পড়িলেন।

ধর্মপত্নীর দিকে চাহিয়া সহসা বৃদ্ধ বলিলেন—'জগতের যে মায়িক সম্বন্ধ, তাতে আমি তোমায় অনেক দুঃখ দিয়াছি, কিন্তু অমায়িক সম্বন্ধে তুমি আমায় পরম সুখ দিয়াছ। উাদসীন বলিলেন—'এতদিন পরে কেন আবার অতীতের কথা স্মৃতিপথে আনছেন প্রভো!' তিনি বলিলেন—'নইলে সাধ্বীর কাছে যে অপরাধ থেকে যায়; তার মার্জনা ভিক্ষার এই সময়। জাগতিক ঋণ রেখে যেতে নাই, সেও এক বন্ধন। দেনা পাওনা শোধ হয়ে যাক্।' সাধ্বী তখন যোড়হস্তে উত্তর দিলেন—'প্রভো! শুনেছি আপনাদের কোন ঋণ থাকে না, আপনারা সংসারের ঋণমুক্ত, স্ত্রীর কাছে ঋণ ত তুচ্ছ কথা।"

কতক্ষণ পরে সহসা বৃদ্ধ বৈষ্ণব তরুণ উদাসীনকে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমার ঋণ ত শোধ হল না! হঠাৎ এ সময়ে এত আনন্দ কেন দিলে? এ কি জন্মান্তরেরই সম্বন্ধ নয়? আমার এই নিতাই দাসের মুখে তোমার কথা শুনে তখন একেবার তোমার

কাছে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তা' যে এতখানি বন্ধন তা' তখন জানিনি। এস বাবা, আমার কাছে তোমার কি প্রাপ্য আছে, তা ত বুঝ্‌ছি না, তুমি নিজে নাও এসে। উদাসীন ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার চরণ-ধূলি নিতেই তিনি উভয়পদ একেবারে প্রসারণ করিয়া দিলেন এবং পরমাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—'নাও সব নাও, যা আছে আমার এতকাল ধরে সঞ্চিত সব নাও, তোমাকে দিয়ে যাবার জন্যই বুঝি এতকাল সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। নিতাই দাসও নিতে পারেনি, তোমার জন্যই ছিল বুঝি !!' উদাসীনের নয়ন হইতে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।...প্রভাতে আশ্রমবাসিগণ সমবেত হইয়া তাঁহার চরণ-ধূলি নিতেছিল, সকলের মুখেই অবিশ্রান্ত নাম চলিতেছিল। সাধু তখন তরুণকে বলিলেন 'আমায় ধর।' সকলে পূর্ণ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—সেই শুষ্ক দেহটি ফুলিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার চক্ষু ঈষদুন্মুক্ত, তারকা—দৃষ্টিশূন্য ; একখানি হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ভাবে প্রসারিত হইতেই উদাসীন উভয় হস্তে সেই মুষ্টি ধারণ করিয়াই অনুভব করিলেন যে কিসের একটা বেগ তাঁহার (উদাসীনের) সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত যেন তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া দিল। সংজ্ঞা ফিরিলে তিনি দেখিলেন যে সকলেই নামোচ্চারণ করিতেছে এবং সেই বাবাজির জ্যোতির্ময় দেহ স্থির ও উন্নত, ব্রহ্মচারীর বক্ষে অবলম্বন না থাকিলেও তাহা নিজ বলে মেরুদণ্ডেরই উপর দাঁড়াইয়াছে। তপস্বিনী মাতা এবার তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছেন—মহাত্মা মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন !

তাঁহার দেহের শেষকৃত্য সমাধান হইলে একদিন সকলের অলক্ষিতে তরুণ সে আশ্রম ত্যাগ করিলেন। চলিতে গিয়াই সেই তপস্বিনী মাতার একটি কথা তাঁহার কাণে বাজিল—'বাবা, মহাত্মার নিকট যা' পেয়েছ, তার যত্ন করো। তা' রাখতে জানা আর তার ব্যবহার

জানা চাই।' তপস্বিনীর উদ্দেশ্যে মস্তক নত করিয়া তিনি গন্তব্য-পথে যাত্রা করিলেন।*

এ সম্বন্ধে ময়মনসিংহ জিলার বাণীগ্রামের শ্রীযুক্ত নিখিলানন্দ গোস্বামিপাদের অনুভূত কাহিনীও এ স্থলে দেওয়া হইতেছে। নবদ্বীপের নূতন চড়ায় স্বামিজির অবস্থানকালে শ্রীগোস্বামিজি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন—স্বামিজির অসীম শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, প্রশ্নের উত্তর তর্কের অবসর দেয় না, উত্তরের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া মন তাহা গ্রহণ করিয়া ফেলে। বহু প্রশ্নোত্তরের পরে গোস্বামিজি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার শাস্ত্রাধ্যয়ন কোথায় হইয়াছিল?' প্রশ্ন করামাত্রই ইঁহার আরক্তিম ও বিস্ফারিত লোচনকমলদ্বয় কি যেন এক ভাবে বিভোর হইল, কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া ইনি জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন? আমি কোথাও শাস্ত্রাধ্যয়ন করি নাই বলিলেই হয়। শৈশবে স্বগৃহে কিছুটা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়েছিলাম, পরে কাশীতে কিছুদিন বেদান্ত শ্রবণ করেছিলাম—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সমীপে শ্রীএকাদশ স্কন্ধ অধ্যয়ন করেছিলাম আর মাঝে মাঝে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দুই একটি পয়ারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম। আর আমার জীবনে পড়াশুনা কিছু ঘটে নাই। তবে এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাকে কৃপা করেছিলেন। আমি ভজন-জ্ঞানার্থী হইয়া তাঁহার কাছে যাই—তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁর সেবাশুশ্রূষাই কিছুদিন করি। তত্ত্বোপদেশ পাওয়ার আর সুযোগ ঘটিল না। তাঁহার দেহরক্ষাকালে তিনি আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন—'আমার

* শ্রীভাগবত-স্বামিজির শ্রীবৃন্দাবনে বাসকালে এই তপস্বিনী তাঁহার নিকটে শ্রীঅভিরাম গোপালের কুঞ্জে বাস করিয়া সারারাত্রি নাম করিতেন আর মাধুকরী করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।

নিকট কিছু পাবে বলে আশা করে এসেছিলে, কিন্তু আমি অপারক হয়ে পড়লাম, আমার অন্তিম আশীর্ব্বাদে তোমার সব কিছুই হয়ে যাবে। এই বৈষ্ণবেরই কৃপার ফলে আমার নিকট শাস্ত্রসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে লাগিলেন। রাত্রিকালে স্বপ্নাবেশে রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ হইতেছে, প্রভাতে দেখি—সবই কণ্ঠস্থ। এইরূপে সমগ্র ভাগবত ও টীকা আপনিই স্ফুরিত হইয়াছিল।'' অহো! পরম ভাগবতের কৃপায় অনধ্যয়নেও সর্ব্বশাস্ত্রই ইহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল!! সরহস্য দশোপনিষৎ, ন্যায়, মীমাংসা পাতঞ্জল, বেদান্ত দর্শনের অনেক নিগূঢ় কথাও সময়ে সময়ে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে স্ফুরিত হইয়া তত্তৎশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিত।

১৩১০ সালে কি তৎসমীপবর্ত্তী কালে ইনি ৺কাশীধামে শ্রীমৎ পরমানন্দ তীর্থ মহারাজের অন্তেবাসী হইয়া বেদান্তাধ্যয়ন করিতেন। এই তীর্থ মহারাজ ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ ঠাকুর-সন্তান—একাধারে পাণ্ডিত্য-প্রভা ও বিষয়বিরাগ তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল—বৃদ্ধ বয়সেও ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান; মধ্যাহ্নপর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন ও জপধ্যানাদি-সাধন এবং তৎপরে বিপ্রগৃহে মাধুকরীভিক্ষা তাঁহার অপতিত নিয়ম ছিল। এসময়ে স্বামিজি ব্রহ্মচারীর বেশে থাকিতেন—নিত্য শ্রীকৃষ্ণার্চন ও তদঙ্গীয় সাধন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও তুলসীমাল্য ধারণ ইত্যাদি ছিল।

১৩১২ কি ১৩ সালে ইনি নিয়মিত ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক মথুরা বাস সঙ্কল্প লইয়া কৃষ্ণগঙ্গার উপরি এক আশ্রমে এক মাস অবস্থান করেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ জনৈক হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ সাধু ইহাকে আদরের সহিত একটি নির্জন কুটীর দিয়াছিলেন। তৎসন্নিহিত কুটীরেই স্নিগ্ধ, শান্ত ও প্রসন্নোজ্জ্বল জনৈক বৃদ্ধ পরমহংস বাস করিতেন। স্বামিজি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করত বলিতেন—''বাচ্চাকো পর কৃপা কীজিয়ে।'' সাধু মৃদু হাস্যে বলিতেন—'কৃপা, কৃপা, ক্যা কৃপা আচ্ছা দেখ্

যায়গা।' তাঁহাকে প্রণাম করিলেই তিনি এইরূপ বলিতেন। সেই আশ্রমে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব বাস করিতেন। তখন চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ছিল—হঠাৎ ইঁহার মনে (ভাগ ১।৫।২৫) 'উচ্ছিষ্টলেপানন্বমোদিতো দ্বিজৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি জাগিলে ইনি উক্ত আশ্রমবাসী সাধুগণের উচ্ছিষ্ট পত্রাদির অপনয়ন ও স্থান মার্জনাদি করিতে লাগিলেন। মহাত্মারা কখনও প্রতিবাদ করিলেও ইনি কাতর প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। এইভাবে ৪।৫ দিন গত হইলে যখন তিনি উচ্ছিষ্ট পত্রের স্তূপ করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ পশ্চাদ্দেশ হইতে মৃদুস্বরে পরমহংসজি বলিলেন—তোম্ য়্যারছা কাঁহা শিখা হ্যায়?' তিনি—'আপ্ সব মহাত্মন্‌কো কৃপা-গুরুই মুঝ্‌কো শিখলায়া হ্যায়।' পরমহংসজি—'নেহি, সাধন-সংস্কার তোম্‌কো শিখলায়া হ্যায়।' তিনি—'হাম্ ঐছা সম্ঝ্‌তাহুঁ যো কুছ সৎসংস্কার হো ওহি সব মহাপুরুষকো হি কৃপা-প্রভাব হি হ্যায়'। আর কথা হইল না—তার পর দিন পরমহংসজির আদেশে আশ্রমের অধ্যক্ষ তাঁহাকে উচ্ছিষ্টপত্র উঠাইতে নিষেধ করিলেন, তিনি পরমহংসজির কুটীরের দ্বারে লুণ্ঠিত কলেবরে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই স্নিগ্ধ মধুর স্বর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল—(ভা ১।৫।২৪), 'চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ' ইত্যাদি। গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরমহংসজির চরণতলে লুণ্ঠিত হইলে তাঁহার দীন-পাবনী করুণা স্বামিজি-মহারাজকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিল। পরমহংসজি বলিলেন—'আজ হইতে তুমি আমাকে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কিছু কথা শুনাইবে।' তিনি অযোগ্যতা নিবেদন করিলেও তাঁহার অকুণ্ঠ কৃপা বারণ মানিল না। শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠকালে শ্রীল পরমহংসজির অপূর্ব্ব ভাবাবেশ ও অদ্ভুত প্রেমবিকার হইত। তিনি 'কৃপা, কৃপা' শব্দ উচ্চারণ করত বিহ্বল হইতেন। পরমহংসজি বলিলেন—'লেও লেও ব্যাটা, কৃপা লে লেও।'

এই বলিয়া স্বামিজির মস্তকে চরণ ন্যস্ত করিলেন। একমাস ব্রত পূর্ণ হইলে পর পরমহংসজি আদেশ করিলেন—'শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্দর্শন করত তদীয় আজ্ঞা লইয়া গোবর্দ্ধনতীর্থে গিয়া এক বৎসর মৌনব্রতাবলম্বনে নির্জ্জনে ভজন কর—শ্রীমদ্‌ভাগবতের আস্বাদন কর—কৃপা পূর্ণতা লাভ করিবে।' তাঁহার আদেশে এক-বৎসর কাল ইনি গোবর্দ্ধনে বাস করিয়া পূর্ণ কৃপাফলও লাভ করিয়াছিলেন। এই পরমহংসজি কাশীর প্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ স্বামিজির গুরুভ্রাতা, তাঁহার নাম—দেবগিরি মুনি।

স্বামিজি-লিখিত কৃপাকুসুমাঞ্জলির কৃতজ্ঞতা-প্রবন্ধে তিনি এই ঘটনার সহিত অন্যান্য সাধু মহাজনদিগের কৃপাপ্রাপ্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কাশীর বেদান্তাধ্যাপক শ্রীমৎপরমানন্দ তীর্থ স্বামী, হরিদ্বারবাসী শ্রীমৎভোলানন্দ গিরি মহারাজ, শ্রীবৃন্দাবনবাসী (গুধ্‌ড়ী-বাবা) শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস বাবাজি মহারাজ, সিদ্ধ শ্রীজগদীশ বাবা, শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়া বাবা প্রভৃতির নাম তিনি সগৌরবে উট্টঙ্কন করিয়াছেন।

১৩৪২ সালে 'কৃপাকুসুমাঞ্জলি', ৪৩ সালে 'সাধনকুসুমাঞ্জলি, ৪৭ সালে 'শ্রীগুরুবৈষ্ণবভক্তিকুসুমাঞ্জলি' ও শ্রীগুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলি এবং ৪৮ সালের বসন্তপঞ্চমী তিথিতে তিনি 'শ্রীলীলাতত্ত্ব-কুসুমাঞ্জলি, নামে অপূর্ব সিদ্ধরত্ন-সম্পূটিত গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে কাম্যবনে এক অন্ধকার গুহায় ইনি সাত বৎসর থাকিয়া কঠোর ভজন করিতেন—প্রত্যহ বেলা দুইটায় বাহির হইয়া মাধুকরী করিতেন—বাজরার মোটা রুটি দুইখানা হইলে যথেষ্ট—অর্দ্ধাশনে বহুদিন থাকিয়া শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইলে এবং নাক দিয়া রক্তস্রাব হইলে ইনি বাধ্য হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসেন, তৎপরে নিজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজ্ঞত প্রেরণায় শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, শিলচর, ঢাকা,

ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে শুভ বিজয় করিয়া বহু জীবের উদ্ধার সাধন করিলেন। কাম্যবনে থাকিতে তাঁহার লীলা স্ফূর্তি হইত, অশ্রুকম্পাদি-ভাবভূষণে অঙ্গ সুশোভিত হইত।

একবার নবদ্বীপে রোগাক্রান্ত হইয়া জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, নিকটে শুশ্রূষাকারী কেহই ছিল না—অত্যধিক জ্বরে বাঁচিবার আশা গেল! তদবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে নবদ্বীপের দিকে চরণ দিয়া গঙ্গা-জলের সমীপে শয়ন করিয়াছেন এবং মৃত্যু উপস্থিত। তখন মনে মনে বলিলেন—'হে শ্রীগৌরাঙ্গ! মৃত্যুকালে একবার শ্রীচরণকমল-দর্শন দাও।' তখন শ্রীগৌরাঙ্গনিত্যানন্দ চলিতে চলিতে আসিয়া সুহাস্যমুখে মস্তকে চরণ দিয়া বলিলেন 'তোর মৃত্যু হবে না।' জাগিয়া দেখেন জ্বর নাই, অথচ সাত্ত্বিক স্বেদে শরীর আর্দ্র।

ভক্তবৃন্দের আগ্রহে কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলেও ইনি প্রণামী নিতেন না। সকলের কাছে করযোড়ে কথা বলিতেন। মর্যাদালঙ্ঘন কখনও সহ্য করিতেন না—জনৈক শিষ্য অধ্যাপকের নাম উচ্চারণ করায় একবার তিনি তাঁহাকে আরক্তিম নয়নে ভীষণ শাসন করিয়া বলিলেন—'আগে ভদ্র হও, পরে ভক্ত হইবে। ভক্তত্ব ভদ্রতা-বিরহিত হয় না, মর্যাদা-লঙ্ঘনে শুধু ভক্তি প্রকাশ পায় না, অভদ্রতাও প্রকাশ পায়। ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখা ভাল, কিন্তু বড় জিনিষ কখনও ছোট করিও না, উহা মহা অপরাধ জনক।' কখনও কাহারও প্রতি হেয় ভাষা প্রয়োগ করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই।

১৩৪৯ সনের ৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তিনি লীলা সম্বরণ করেন। *

---

* শ্রীপাদ নিখিলানন্দ গোস্বামী-প্রভুকর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধের ছায়া।

শ্রীচৈতন্যদাস (শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীপুরী)

কাছাড় জিলায় ইহার জন্ম—ইঁহার পিতা মাতা দীর্ঘ দিন আরাধনা করিয়াও সন্তানের মুখ দেখেন নাই—অবশেষে শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে মহাপ্রভুর মন্দিরে যাইয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করেন—'প্রভু হে! যদি এবার আমরা একটি পুত্রসন্তান পাই, তবে তোমার দাস করিয়া এস্থানে পাঠাইব।' প্রভু প্রার্থনা শুনিলেন—অচিরাৎ একটি পুত্রসন্তান হইল, নাম রাখিলেন—শ্রীচৈতন্যদাস। বহু সাধ্যসাধনায় পুত্র পাইয়া স্নেহময় পিতা মাতা ইহাকে আর পূর্বপ্রতিজ্ঞামত ঢাকাদক্ষিণে পাঠাইতে পারিলেন না; ছেলে বড় হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী কোন স্কুলে চাকরিতেও নিযুক্ত হইলেন। প্রথম মাসের টাকা হাতে পাইয়া ইহার মনে যেন একটি অশান্তি আসিল। তিনি প্রতিবেশীর নিকট স্বজন্মবৃত্তান্ত ও পিতামাতার প্রতিজ্ঞার কথা অবগত হইয়া কৌশলে অনুমতি গ্রহণ করত পিতামাতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঢাকাদক্ষিণে আসিলেন। সেখানে আসিয়া শ্রীধামে নবদ্বীপের সংবাদ জানিয়া পদব্রজে বহু কষ্ট করিয়া শ্রীধামে আসিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রাঙ্গণে যাইয়া শ্রীবিগ্রহের দিকে তাকাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন এবং বলিতেছেন—'হে গৌর! তুমি না আমায় বাল্যকাল হইতে অঙ্গীকার করিয়াছ? তুমি না আমায় সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ? আমি ত চিরজীবনের জন্য তোমারই চরণে বিক্রীত। এখন কি কিছু ব্যবস্থা করিবে না। আমি কোথায় যাব? কে আমায় চরণে স্থান দিয়া চিরদাস করিবে?' মঙ্গলারতিকালে প্রাঙ্গণে বহুলোক সমবেত হইয়াছেন, ইহার কাতর ক্রন্দনে সকলেরই প্রাণ দ্রবীভূত হইল; ইনি কিন্তু কাহারও দিকে দৃক্‌পাতও করেন না, কাহারও প্রার্থনায়

কর্ণপাতও করেন না। মহাপ্রভুর কি ইঙ্গিত হইল! ইনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে স্তম্ভ-হেলান দিয়া জনৈক মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন—দেখামাত্রই ইনি তাঁহার চরণে পড়িলেন এবং তিনিও ইহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া চিরতরে অঙ্গীকার করিলেন। এই মহাপুরুষই—শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস দেব। যথাসময় ইহার দীক্ষা হইল—ইনি গোপীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনে তৎপর ছিলেন। ইহার শ্রীগুরুনিষ্ঠা মহা অদ্ভুত ছিল। পীড়িতাবস্থায় ইনি পুরীতে হরিশ বাবুর পুরাতন ডাকঘরের এক কুঠরীতে ছিলেন—শ্রীরথযাত্রার দিন শ্রীধাম আনন্দে ভরপুর; শ্রীনবদ্বীপ দাদা জয়গোপালকে চৈতন্যদাসের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতে লাগিল—জয়গোপালের চিন্তা দেখিয়া চৈতন্য দাস বলিলেন—"তোমার কোনও ভয় নাই। একবার প্রাণ-প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করাইয়া পরম বন্ধুর কার্য্য কর। অন্তিম সময়ে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে করিতে এ দেহত্যাগ করিব। প্রভুর চরণে প্রার্থনা করি—অচিরে তোমাকে তোমার স্বপ্নেরও অগোচর অপ্রাকৃত বস্তু প্রদান করুন। আমি আর তোমাকে কি দিব? গুরুদেব কৃপা করিয়া আমাকে যে ভাবরত্নটুকু দিয়াছিলেন, আমি অকপট হৃদয়ে তাহা তোমাকে অর্পণ করিলাম।"

শ্রীনবদ্বীপ দাদা অনেক অন্বেষণের পরে দেখিলেন যে শ্রীরাধারমণ গোপাল বাবুর বারান্দায় উদাসীন ভাবে বসিয়া আছেন। চৈতন্য-দাসের অবস্থা নিবেদন করিলেও ইনি নিরুত্তর ছিলেন দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপ দাদা এবার জয়গোপালকেই পাঠাইলেন। জয়গোপাল তাঁহাকে লইয়া গেলে চৈতন্য দাসের ইঙ্গিতে তিনি তাঁহার পায়ের কাছে দাঁড়াইলেন। চৈতন্য দাস আকর্ণ-বিস্ফারি নয়নে ইহার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন—শ্রীনবদ্বীপ দাদা বাবাজি মহাশয়ের

দক্ষিণ চরণ লইয়া চৈতন্যের বুকের উপর দিতে গিয়া দেখেন যে কয়েকখানা কাগজ চাদর-ঢাকা রহিয়াছে। কাগজ সরাইয়া বুকের উপর চরণ দিলে বাবাজি মহাশয় গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'চৈতন্য রে! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিধামে যাইতেছিস্। তোর জন্মজন্মার্জিত পাপ তাপ অপরাধাদি সমস্তই আমি গ্রহণ করিলাম। তুই নির্মল ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে পরম দয়াল নিতাই চাঁদের গণে গণ্য হইয়া অভিলষিত বস্তু আস্বাদন কর।' শ্রীযুক্ত শ্যামদাস বাবাজি মহাশয় আসিয়া নাম ধরিলেন—হঠাৎ চৈতন্যের সর্বশরীর কম্পিত হইল—নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল—মুখের মৃদু হাসি উজ্জ্বলতর হইল, ক্রমে সব নিস্পন্দ হইয়া আসিল। শ্রীনবদ্বীপ দাদা চৈতন্যের বুকের চাদর সরাইয়া দেখিলেন—দুইখানা কাগজে শ্রীগুরুবন্দনা ও শ্রীগুরুপ্রণাম এবং লক্ষগুরুর নাম রহিয়াছেন। বাবাজি মহাশয় ইহার গুণরাজির কথা বিনাইয়া বিনাইয়া কীর্ত্তন করত একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। যথাসময়ে চৈতন্যকে সমুদ্র-জলে বাবাজি মহাশয় নিজ হস্তে স্নান করাইলেন—প্রসাদী ডোর কোপীন ও বহির্বাস পরাইয়া তাঁহাকে বুকে ধরিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন—বহুক্ষণ পরে তাঁহাকে সংকার করিয়া সাশ্রুমুখে সকলে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু প্রভু (মুর্শিদাবাদ, ডাহাপাড়া)

১৭৯৩ শকের ১৭ই বৈশাখ সীতানবমী তিথিতে মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী ডাহাপাড়া-গ্রামে দীননাথ ন্যায়রত্নের পত্নী বামাসুন্দরীর গর্ভে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাব হয়। অসামান্য রূপ-গুণে, সর্ববিধ সুলক্ষণে, সর্বচিত্তরঞ্জনে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি হরিনাম-প্রিয়। এক বৎসর বয়সে মাতৃদেবী ও সাত বৎসরে পিতৃদেবের পরলোক হয়। তদবধি ফরিদপুরে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অগ্রজ ভৈরব চক্রবর্ত্তীর গৃহে পালিত হইতে থাকেন। ফরিদপুরে বঙ্গবিদ্যালয়ে ও জিলা স্কুলে কিছু দিন পাঠাভ্যাস করেন। বাল্যাবধি নতদৃষ্টি, সুবিনয়ী, নৈষ্ঠিক, স্বল্পভাষী ও দেবদ্বিজপ্রিয় হইলেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, আহ্নিক, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ইঁহার আজীবন ছিল। ভোগ-বিলাসে চির-বিমুখ, উদাস-ভাব নির্জনে বাস, সরল সুন্দর, মধুরভাষী। ফরিদপুর জিলা স্কুল হইতে রাঁচি স্কুলে যান এবং তথা হইতে পাবনা জিলা স্কুলে গিয়া প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়েন। এ সময়ে যাত্রাগানে প্রহ্লাদ, ধ্রুবচরিতাভিনয়-দর্শনে বাহ্যদশা হারাইতেন—কেলিকদম্বতলা, জয়কালার মন্দির প্রভৃতিতে উদাসীন হইয়া পড়িয়া থাকিতেন—হরিসংকীর্ত্তনে বিবিধ সাত্ত্বিক বিকার পরিলক্ষিত হইতেছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি হরিনাম-দানে ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদ্বারা অসংযত ও পতিত বহু জীবের পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেও একদল লোক তাঁহাকে গুরুতর ভাবে আক্রমণ ও যথেষ্ট অত্যাচার করে। পক্ষান্তরে তাঁহার অসামান্য তেজঃপুঞ্জ ও ভাবাবেশাদি দেখিয়া বহু গণ্যমান্য লোকও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেছিলেন।

প্রভু পাবনা হইতে শ্রীবৃন্দাবন, কলিকাতা ও ফরিদপুরে ব্রাহ্মণকান্দায় গমন করেন। ইনি কখনও স্বর্ণতারে গ্রথিত রুদ্রাক্ষমালা কখনও বা তুলসীমালা পরিতেন। রবারের পাদুকা পরিতেন এবং লোকসম্মুখে সর্বাঙ্গ আবৃত অবস্থায় থাকিতেন। ব্রাহ্মণকান্দায় আসিয়া ইনি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় গঠন করেন—ভক্তগণকে লইয়া নবদ্বীপে গিয়া ইনি স্বরচিত পদাবলী কীর্ত্তন করাইতেন। ১২৯৬ সনে বাকচর শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি কয়েক বৎসর এখানে থাকিয়া বহু

লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকান্দা হইতে তিনি প্রতি বৎসর সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দমাদল নগর-সংকীর্ত্তন বাহির করিতেন। তদ্ব্যতীত নিত্য টহল, নগর ও নিশাকীর্ত্তনাদিও চলিত। ১৩০৬ সনে ফরিদপুরের গোয়ালচামট অঙ্গন স্থাপিত হইলে ইনি অলৌকিক শক্তি-প্রকটনে শ্রীহরিনামে আম্লেচ্ছ চণ্ডালবিপ্রাদিকে মাতাইয়াছিলেন। সর্দার রজনী বাগ্‌দিকে হরিদাস পাশা (মোহন্ত) নামে অভিহিত করিয়া ঐ দলকে 'মোহন্ত-সম্প্রদায়' বলেন—ইহাদের দ্বারা যশোহর খুলনা প্রভৃতি স্থানের বুনাগণকে ভক্ত করেন। কলিকাতার চাষাধোপাপাড়া ও রামবাগানের ডোমদিগকেও ইনি হরিনামকীর্ত্তনে অধিকারী করিয়াছিলেন! প্রতাপ ভৌমিক, রমেশ চক্রবর্ত্তী, রাধিকা গুপ্ত, অতুল চম্পটী, জয়নিতাই (দেবেন চক্রবর্ত্তী), তারক গাঙ্গুলী (কোলাঘাট), ডাঃ উষা মজুমদার, নবদ্বীপ দাস প্রভৃতি ভক্তগণই মুখ্য।

সন ১৩০৩—৪ হইতে ফরিদপুরের ছাত্রগণ প্রভু বন্ধুর কৃপায় ও শিক্ষায় বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনামনিষ্ঠাদিতে ধন্যাধন্য হন। শ্রীঅঙ্গনে অবস্থানকালে তাঁহার দান ও বিতরণ লীলা এক অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। জীবনে বহু দুঃসাধ্য কঠোরতা সাধন করিয়াছেন—কখনও বা মৌনী হইয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছেন। ১৩০৯ সনের মধ্যভাগ হইতে ১৩২৫ সনের ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত তিনি গোয়ালচামটেই ছিলেন—অসূর্য্যম্পশ্য হইয়া মৌনীভাবে ইনি বহুদিন কাটাইয়াছেন। পরে ভক্তগণের সাহায্যে দোলায় বা যানবাহনে চাপিয়া ভ্রমণ করিতেন—১৩২৮ সনে ১লা আশ্বিন ইনি অপ্রকট লীলায় প্রবিষ্ট হন।

স্বরচিত গ্রন্থাবলী—(১) চন্দ্রপাত, (২) হরিকথা, (৩) শ্রীমতি-সংকীর্ত্তন, (৪) শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন, (৫) পদাবলী, (৬) বিবিধ সঙ্গীত ও (৭) ত্রিকালগ্রন্থ। ভক্তগণ রচিত—(৮) বন্ধুকথা, (১০) বন্ধুস্মৃতি-দীপিকা (১১) মহানামমালা, (১২) Jagadbandhu, (১৩) A

Massage of Hope, (১৪) আদেশ-উপদেশ, (১৫) মাসিক মহাউদ্ধারণ-পত্রিকা প্রভৃতি।

প্রচারিত মহানাম—হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহা উদ্ধারণ।
চারিহস্ত, চন্দ্রপুত্র, হা কীটপতন॥
(প্রভু প্রভু প্রভু হে অনন্তানন্তময়।)

ইনি সদা সর্ব্বদা হরিনাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 'মনঃপ্রাণে হরিনাম নিষ্ঠা করিও'। তারকব্রহ্ম হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র। পঞ্চ গ্রন্থ অধ্যয়নীয়—শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। 'কখনও কোনো প্রকৃতির মুখের দিকে চাইবে না।' প্রকৃতি দর্শন স্পর্শনই পতন। কাম-রিপুর কথা-প্রসঙ্গে বন্ধু চম্পটী মহাশয়কে বলিয়াছেন—"কীটপতঙ্গ হ'তে উচ্চ উচ্চ দেবলোক ঋষিলোক একমাত্র মৈথুনে উন্মত্ত। একান্ত চৈতন্যদাস ভিন্ন কামজয় করিতে দেবতারাও অসমর্থ। দেখ্—মহা-প্রভুর অবতারের পূর্ব্বে যত কিছু শাস্ত্র হয়েছে, সকলেতেই দেবতা ও ঋষিদের ব্যভিচার বর্ণনা আছে; কিন্তু মহাপ্রভুর অবতারে তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ হয়েছে; ব্যভিচার দূরের কথা—প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা অধ্যায় বা প্যারাগ্রাফ্ বা পেজ নাই। নির্ম্মল শুভ্র বেদমার্গ—নিবৃত্তিমার্গ।"

ভোজন-ব্যাপারেও তাঁহার স্বাস্থ্যকর হিতোপদেশ আছে—'কেহ আমিষ খাইও না,' 'ভোজনই ব্যাধি', 'গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন-সম্পূর্ণ-রূপে নিষিদ্ধ'। 'খাদ্যগ্রাসে তর্জ্জনীস্পর্শ করিতে নিষেধ'। 'আহার-কালীন জলপান নিষিদ্ধ।' একাদশী, সীতানবমী, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদি উপবাসে সংযম, পারণ ও জাগরণাদি পালন করা কর্ত্তব্য।

এই সম্প্রদায়ের মতে ইনি স্বয়ং ভগবান্—"The Lila-com-

bination of all things' ইঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন এবং সঙ্গ করিয়াছেন—তাঁহারা ইঁহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যে, সুমধুর ব্যবহারে ও চিত্তচমৎকারী প্রিয়তায় সমাকৃষ্ট হইয়া ইঁহাকে 'ভগবান্' বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

শ্রীজিওর নৃসিংহ বরাট

বর্দ্ধমান জেলায় বৈদ্যবংশে জন্ম। ইনি বর্দ্ধমান জজকোর্টে উচ্চ চাকুরী করিতেন, বিষয়-সম্পত্তিও প্রচুর ছিল। রামতনু মুখোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ যখন জিরাট বলাগড়ে গৌরমাহাত্ম্য প্রচার করিতেছিলেন —তখন ইনি বর্দ্ধমানে নিজবাটীতে নিজ গোষ্ঠীর সহিত গৌরভজন করিতেন। ভাগবতভূষণ উঁহার গৌরপ্রেমের কথা শুনিয়া ইঁহার বাটীতে আসেন এবং উভয়ে গৌরকথায় ভজনানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। উত্তরকালে ইঁহার সহিত নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজের সহিত ও মিলন হয় এবং বাবাজি মহারাজের গুণে আকৃষ্ট হইয়া নৃসিংহ ইঁহাকে গৌরমন্ত্রে দীক্ষা দেন। শ্রীচৈতন্যদাস ও জিওড় নৃসিংহ উভয়ের কান্তভাবে গৌর উপাসনা, কিন্তু ভাগবতভূষণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে পূর্ণতম অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও—ইঁহাদের উপাসনা নিগূঢ় এবং গুপ্ত জানিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রভুভাবেই ভজন করিতেন। এই ব্যাপারে জিওড় নৃসিংহের সহিত ভাগবতভূষণের মতানৈক্য হওয়ার ভাগবতভূষণ ইঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন।*

---

* শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ পত্রিকার ছায়া।

শ্রীত্রিভঙ্গদাস বাবাজি মহারাজ

মুর্শিদাবাদ জিলার কীর্ত্তিপুর গ্রামে সৎশূদ্র-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম—ছবিলাল ও মাতা—গরবিণী। বাল্যকাল হইতেই ইনি ভক্তি-প্রবণ ছিলেন। মাঠে চাষের কার্য্য করিতে যাইবার কালে তিনি ক্ষুদ্র ভাণ্ডে স্থাপিত বৃন্দাদেবীকে লইতেন এবং অবসরমত তাঁহাকে জল দিয়া তবে তিনি প্রাতঃকালীন জলখাবার পাইতেন। তৎকালে রাঢ়দেশে দুই জন মহাপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল ও শ্রীবনমালী লাল সিংহজি (পাঁচথুপী)। বাল্যকাল হইতেই ইনি ইঁহাদের সঙ্গলাভ করত স্বজীবনের উন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। শ্রীল মণ্ডল মহাশয় ভক্তমুখে বালক ত্রিভঙ্গদাসের ভক্তির কথা শুনিয়া একদিন নিজেই কীর্ত্তিপুরে গিয়া তাঁহাকে অভিভাবকগণের নিকট হইতে আনিয়া তাঁহার শ্রীগুরুপাট টাঁঠাগ্রামে পাঠাইয়া শ্রীজাহ্নবা-পরিবারে দীক্ষিত করাইলেন। দীক্ষিত ত্রিভঙ্গদাস তখন মণ্ডলজি মহাশয়ের হরিবাসরে সমবেত গোস্বামী, ঠাকুর, বৈষ্ণব ও ভক্তগণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে মণ্ডলজি তাঁহাকে মনোহরসাহী সঙ্গীতে অভিজ্ঞ মূল গায়ন শ্রীদীনুদাসের নিকট লীলাগান-শিক্ষার নিযুক্ত করিলেন। কয়েক বৎসর পরে আবার সিংহজি মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার পাঁচথুপীর হরিবাসরে বৈষ্ণবসেবায় নিয়োগ করিলেন। এই সময় হইতে তিনি সিংহজি মহাশয়ের জীবনকাল পর্য্যন্ত পাঁচথুপীতেই থাকিতেন, লীলাগান শিখিতেন এবং অবসরমত মণ্ডলজির হরিবাসরেও যাইতেন।

একবার তিনি সিংহজি মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে চারি আনা পয়সা মাত্র সঙ্গে লইয়া পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া আবার হাঁটাপথেই ফিরিয়া পাঁচথুপীতে আসেন। তিনি একবার শ্রীধাম নীলাচলেও তাঁহার অনুমতি লইয়া গিয়াছিলেন—সেখানে তিনি শ্রীশ্রীরাধারমণ

চরণ দাস বাবাজি মহাশয়ের নিকট বেশাশ্রয় করেন এবং নাম ধরেন —শ্রীবনোয়ারী লাল দাস, কিন্তু ভেকাশ্রয়ের পরেও সকলে তাঁহাকে 'ত্রিভঙ্গ দাস' বলিয়াই ডাকিতেন। তৎকালে ৪।৫ মাস যাবৎ ইনি ঝাঁজপিটা মঠে বড় বাবাজি মহাশয়ের নিকট থাকিয়া তাঁহার আদেশে পাঁচথুপীতে আসিলেন। বড় বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে সিংহজি মহাশয়ের কায়মনোবাক্যে সেবা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। সিংহজি মহাশয়ের অপ্রকটেও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীবিজয়কিশোর সিংহ ইঁহাকে পরম যত্নে ঐ হরিবাসরের সম্যক্ ভারার্পণ করিয়াছিলেন। ইনি লীলাগানে বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন—ইঁহার মুখে রাসলীলা শুনিয়া বহু ভক্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। পাচথুপীতে থাকার সময়ে ইনি রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত মনোহরসাহী গানশিক্ষার টোলে শ্রীল অদ্বৈত দাস বাবাজি মহারাজের নিকট কয়েক বৎসর যাবৎ শিক্ষা করিয়াছেন।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দ হইতে ইনি শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর প্রত্যাদেশ পাইয়া শ্রীধাম একচক্রা গর্ভবাসের মন্দিরাদি ও নিত্যসেবার সংস্কার ও ব্যবস্থাদি-বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অকাতরে অনলসে শ্রীপ্রভুদের সেবাকার্য্যই করিয়াছেন। দেশ বিদেশে ঘুরিয়া শ্রীনিত্যানন্দের সেবার জন্য অর্থাদি ও সামগ্রী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন। ১৩৩৬ সাল হইতে শ্রীনিত্যানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে নবরাত্রি অখণ্ড সঙ্কীর্ত্তন এবং সমাগত ভক্তমণ্ডলীর জাতি-ধর্ম্মবর্ণ-নির্বিবশেষে প্রসাদাদির ব্যবস্থা করিতে থাকেন। ১৩৫১ সালের ১৩ই মাঘ শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব যথারীতি সমাধান হইলে ইনি শ্রীনিত্যানন্দকে সম্বোধন করত বলিলেন—'নিতাই! টিকেট করে দাও।' এই বলিয়াই তিনি নয়ন নিমীলন করিলেন। জয় শ্রীনিত্যানন্দ!!!

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র দাস

পূর্ব্ব নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজি মহাশয়ের প্রথম অবস্থানের কালে ইনি নিকটবর্ত্তী শ্রীনৃসিংহ দেবের আখড়ায় ছিলেন—উহা তাঁহার শ্রীগুরুপাট। জনৈক বৈষ্ণবীর মুখে বাবাজি মহাশয়ের সন্ধান জানিয়া ইনি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই পূর্ব্বসিদ্ধ প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন—উভয়েই উভয়কে দর্শনমাত্র চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় আত্মহারা হইয়া কাঁদিলেন—গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে উভয়েই বদ্ধ হইলেন—শেষে উন্মত্ত হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন চলিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে হাতে তালি দিয়া দুই জনই 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ' গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে গেলেন। তদবধি দুই জনে অবিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে গ্রথিত হইলেন। একের অদর্শনে অন্য ম্রিয়মাণ হইতেন। অহো! এই মহাশক্তিধর প্রেমিক-প্রবর কত যে হীনচরিত্র, মদ্যপ, বেশ্যাশক্ত, পাষণ্ড ও উচ্চ-শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিকে ভক্তিপথের পথিক করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। দীনতার আদর্শ নবদ্বীপ দাদার সহিত যাহার একটীমাত্র কথা হইত; সেই চিরতরে তাঁহার চরণে বিক্রীত হইত! ইনি শ্রীরাধারমণের যাবতীয় মনের কথা জানিতে পারিতেন, অন্যের পক্ষে অসম্ভব কার্য্যগুলিও অনায়াসে সাধন করিতেন। শ্রীরাধারমণের অলৌকিক লীলাবলীর সহায়, সাক্ষী ও মর্ম্মজ্ঞ নবদ্বীপ দাদা তৎকর্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আদিষ্ট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন এবং ১৯০২ খৃঃ আষাঢ়ী অমাবস্যায় ভ্রমরঘাটে স্বাভীষ্টমূর্ত্তির দর্শন-স্পর্শনাদি লাভ করিয়া মন্ত্রমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের শ্রীচরণে চরম বিশ্রান্তি লাভ করেন।

(সাধু) নিত্যানন্দ দাস

কলিকাতা কলুটোলায় ইঁহার জন্ম—পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুলিনবিহারী মল্লিক। ১৩০৩ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে অযাচিতভাবে ইঁহার গৃহে শ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেব সদলবলে সঙ্কীর্ত্তন-সমাযোগে উপস্থিত হইয়া ইঁহাদের গোষ্ঠীকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীগুরুদেবের আদেশে ১৩১৮ সালে নবদ্বীপে 'শ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম' ও 'মাতৃমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার সেবাকার্য্যে প্রবল উৎসাহ দেখিয়া সকলে ইঁহাকে 'সাধু' আখ্যা দান করেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব-কর্তৃক পরিত্যক্ত, জগতের উপেক্ষ্য জীবগণের ইনি পরম বান্ধব ছিলেন। ইঁহার পরহিতৈষণায় ও অমায়িক ব্যবহারে শ্মশানঘাটের যাত্রীও মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলিয়া হরিনাম গ্রহণ করিত। ১৩২০ সালে নবদ্বীপে ধুলোট উৎসবের সময় কলেরার ভীষণ আক্রমণ হয়—তখন এই সাধু নিত্যানন্দ বহুদিন যাবৎ অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্র রোগীর সেবাশুশ্রূষায় রত থাকিয়া ২রা ফাল্গুন স্বয়ংও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ইষ্টনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। 'জীবে দয়ার' আদর্শ ইঁহাতেই প্রকটিত হইয়াছিল।

পাগল হরনাথ

১২৭২ সালের আষাঢ় মাসে বাঁকুড়া জেলায় সোণামুখী গ্রামে জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔরসে ও ভগবতী সুন্দরীর গর্ভে আবির্ভাব হয়। দুই বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৮৪—৫ ইং কুচিয়াকোল স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৮৮৭ খৃঃ এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেট্রোপলিটান কলেজে বি, এ পড়িতে থাকেন। এই সময়ে দারুণ কাশরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনবার পরীক্ষা

দিয়াও বি-এ পাশ করিতে পারেন নাই। দুই বৎসর চাকরির অনুসন্ধান করিয়া পরে ১৩০০ সালে কাশ্মীরের মহারাজার অধীনে কর্ম্মস্বীকার করেন। স্বর্গীয় অটলবিহারী নন্দী এই সময়ে ইঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্য হন এবং তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করেন। ইঁহার সবিস্তার জীবনী প্রভৃতি **'পাগল হরনাথ'** * গ্রন্থের দ্রষ্টব্য। ইঁহার লিখিত পত্রসমূহেও বহু উপাদেয় উপদেশ বর্ত্তমান (ঠাকুর হরনাথের পত্রাবলি দ্রষ্টব্য)।

প্রেমানন্দ ভারতী

১৭৭৯ শকে কলিকাতায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ইনি ১৮২৪ শকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করত প্রেমানন্দ ভারতী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক পাশ্চাত্যদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীগণের নিকট শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আমেরিকার পাঁচ সহস্র নরনারীকে ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নিউইয়র্কে স্থাপিত 'শ্রীকৃষ্ণসমাজ' ইঁহারই কীর্ত্তি—শ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তিও সর্ব্বপ্রথম ইনিই পাশ্চাত্যদেশে স্থাপনা করেন। ১৯০৯ খৃঃ ইনি চারিজন আমেরিকা-বাসী শিষ্যের সঙ্গে কলিকাতায় আগমন করিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন। ইঁহার পাঞ্জাবী শিষ্য কৃষ্ণগোপাল দুগ্‌গুল উর্দ্দু ভাষায় ছয় হাজার পৃষ্ঠায় **"শ্রীনিমাইচাঁদ"** গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি ১৮৩৬ শকে ১৯১৪ খৃঃ জুন মাসে তিরোহিত হন।

---

* ভাগবতচন্দ্র মিত্র, অকিঞ্চন নন্দী ও ক্ষীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পৃথকভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

শ্রীবংশীদাস বাবাজি মহারাজ (নবদ্বীপ)

ময়মনসিংহ জিলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় মজিৎপুর গ্রামে আবির্ভাব হয়। পিতার নাম—সনাতন মালোব্রহ্ম ; পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল—ভৈরবচন্দ্র। দেশীয় রীতি অনুসারে অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ইঁহার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না। মাতার পুনঃ পুনঃ প্রেরণায় একদিন মাত্র স্ত্রীসহবাস করিয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারে দীক্ষিত ছিলেন এবং স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে বেশাশ্রয় করিয়াছিলেন। ঐ দেশে তখন কালাচাঁদী মতেরই প্রাবল্য ছিল, ইনিও সেইমতেই ভজন করিতে করিতে অবশেষে বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ শ্রীগৌরকিশোর বাবার সময়ে ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন—ইঁহার তাৎকালীন প্রবল বৈরাগ্য ও সেবানিষ্ঠা দেখিয়া সিদ্ধবাবা বলিয়াছিলেন—'গৌরকিশোর দাসের পরে ইনি একজন হবেন। তবে মতটা ভিন্ন রকমের।' শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া ইনি প্রথমতঃ বড় আখড়ার নাট্যমন্দিরে কিছুদিন থাকিয়া মাধুকরীদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতের। পরে শ্রীগৌরের সেবা আসিতে মাধুকরী ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। বড় গোস্বামির বাড়ীর নিকটবর্ত্তী চৌমুহনীতে সামান্য একটা ঝোঁপড়া বাঁধিয়া কিছুদিন ছিলেন। এই সময়ে তিনি শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহের সেবা করিতেন। ভিক্ষায় যাইবার সময়ের কখনও বিগ্রহকে কোলে করিয়া চলিতেন, কখনও বা ঝোঁপড়ায় রাখিয়া যাইতেন। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ব্যতীত কদাচিৎ অন্য দ্রব্য ভোগে লাগাইতেন। দ্বারে কখনও তালাচাবি দিতেন না ; পুনঃ পুনঃ জিনিষপত্র অপহৃত হইলেও—ভক্তগণ কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি দরজা খোলাই রাখিতেন এবং পৃষ্ঠ হইয়া বলিতেন—'যাদের ঘর তারা না দেখলে

বংশীদাস কি করবে?' অথবা ঠাকুরদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন— 'স্বদেশবাসিকে এরা দিয়া দেয়, বংশীদাসত বিদেশী!' ঘরে বিগ্রহ রাখিয়া ভিক্ষায় বা গঙ্গায় গেলে গরু ঢুকিয়া জিনিষপত্র নষ্ট করিলে বা বিগ্রহদিগকে উল্টাইয়া ফেলিলে ইনি দেখিয়া বিগ্রহদের প্রতিই মান করিতেন. শাসন করিতেন, গালাগালি দিয়া আবার ভিক্ষায় যাইতেন। একবার কোনও ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে একটি স্বর্ণহার দিয়াছিলেন—বাবাজি মহাশয় ভিক্ষায় গেলে জনৈক চৌর তাহা অপহরণ করে—ভিক্ষা হইতে আসিয়া তিনি দুই তিন ঘণ্টা যাবৎ প্রশ্ন করিলেন 'কারে হার দিলি বল্'—সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কিছু ইঙ্গিত পাইয়া ইনি হারের উদ্দেশ্যে সেই চৌরের বাড়ীতে গিয়া বলিলেন—গৌরের হার দাও।' পুনঃ পুনঃ বলায় সেই ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইয়া ইহাকে উচ্চ রোয়াক হইতে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিয়া—তিনি কিছুই না বলিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—তদবধি তি৷ ৷ খঞ্জ হইয়া গেলেন। বলিতে কি, সেই চৌরের বংশে বাতি দেওয়ার আর কেহই ছিল না!! মিউনিসিপ্যালিটির অত্যাচারে ইনি এই ঝোঁপড়া ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী সমাজবাড়ীর ঝাউতলায় কয়েকদিন ছিলেন। একবার মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে—ইনি নিতাইগৌরের উপরে একখানি জীর্ণ কন্থা চাপা দিয়া স্বয়ং ভিজিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে ন্যাক্‌ড়া দ্বারা শ্রীমুখারবিন্দ হইতে জলধারা মুছিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্তা ললিতা সখী দাসী বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে নাট্যমন্দিরে নিতে পারিলেন না অথবা উপরে একটা চালি বাঁধাইয়া আবরণ দিতেও স্বীকৃত করাইতে পারিলেন না; অধিকন্তু ইনি আনন্দিত মনে তাঁহাকে বলিলেন— 'দেখুন, এই যে ভিজা দেখছেন, এই ভিজা ভিজা নয়, বংশীদাসকে এরই মধ্যে উমে (গরমে) রাখে।'

এই স্থানে ইহার যথেচ্ছ আচরণের অসুবিধা হওয়ায় ইনি তৎপরে

শ্রীবাসাঙ্গনের ঘাটের ধারেও দিনকতক টুঙ্গি বাঁধিয়া ছিলেন। ঠাকুরের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত—একবার ভক্ত ঈশান সাহার বাড়ীতে কলিকাতা হইতে কাঁচামিঠা আম গিয়াছে। নবদ্বীপের বাজারে তখনও আম উঠে নাই—ছেলেরা নূতন আম পাইয়া প্রায় সবগুলিই খাইয়া ফেলিয়াছে। একদিন সকাল বেলা বাবাজি মহাশয় ঠাকুর কোলে করিয়া তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া কাঁচা মিঠা আম ভিক্ষা করিলেন। নারীগণ বলিলেন 'ছেলেরা ত সেই আম খাইয়া ফেলিয়াছে।' তখন বাবাজি মহাশয় বলিলেন—'এরা বলছে যে দুইটী হাঁড়ির নীচের হাঁড়িতে চাপা দেওয়া দুইটি আম এখনও আছে।' নির্দ্দিষ্ট স্থানে আম দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়সহকারে আম দুইটি আনিয়া ইঁহাকে ভিক্ষা দিলেন।

একবার তিনি কেন্দুবিল্বে (জয়দেবে) এবং একবার খেতুরীতে ঠাকুর-সহ গমন করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া ১০।১৫ বৎসর যাবৎ অন্য কুত্রাপি যান নাই। শেষকালে কেবল তাঁহার আসন নড়িয়াছিল। বড়াল ঘাটের উত্তর দিকে একটি কোঠাঘর করিয়া তিনি বহুদিন কাটাইয়াছিলেন। এস্থানে তিনি শ্রীনিতাই-গৌর-গদাধরের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগোপালের সেবা করিতেন। দিবানিশি ইনি অবিশ্রান্তভাবে কিছু না কিছু সেবা নিয়াই থাকিতেন। এক মুহূর্ত্ত সময়ও তিনি বৃথা নষ্ট করিতেন না। প্রীতিপূর্বক নিষ্ঠা সহকারে স্বহস্তে সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আপ্রয়াণ তাহাই করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত জগতের সময়ের হিসাব তাঁহার নিকটে ছিলই না। সকালবেলা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিলেন, তৎপরে ভিক্ষায় গেলেন, বেলা বারটা কি একটার সময় ঘরে আসিলেন, মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হয়ত চারিটাই বাজিল, তৎপরে তরকারী আমানিয়া করিতে বসিলেন—অতি ধীরে সুন্দরভাবে নিপুণ-

তার সহিত প্রতিটী তরকারী প্রস্তুত করিলেন—অল্প অল্প জল দিয়া বারংবার ধৌত করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আবার চাউল বাছিতে বসিলেন—একটি একটি করিয়া চাউল বাছিতেছেন—কখনও মনের আনন্দে গান করিতেছেন—কখনও মনে মনে কি বলিতেছেন—দুই একটি কথা বা অন্যকে লক্ষ্য করিয়াও হইতেছে—এই ভাবে হয়ত সন্ধ্যা হইয়া গেল। আগে দেখিয়াছি যে ইনি কুলায় (শূর্প) লইয়া চাউল ঝাড়িতেন, পরে দেখিয়াছি হাতে লইয়া একটি একটি চাউল বাছিতেন—ধান দেখিলে খুঁটিয়া তাহার মধ্য হইতে চাউল বাহির করিতেন—প্রতিটি সেবাতে তিনি যে মন প্রাণ সর্বেন্দ্রিয় সমর্পণ করিতেন—ইহা স্পষ্টতঃই ভাগ্যবান্ দ্রষ্টার নয়নগোচর হইত। সামান্য দ্রব্যটিও তিনি অযথা নষ্ট হইতে দিতেন না—পোড়া দেশলাইর কাঠিটীও তিনি এক জায়গায় রাখিয়া দিতেন। গৃহস্থগণ-কর্তৃক পথের ধারে পরিত্যক্ত কাঠের কুঁচোগুলি তিনি ঝোলায় বাঁধিয়া আনিতেন—তাহাদ্বারা মহাপ্রভুর ভোগ রান্না হইত। ভোগরাগের সময় বা নির্দিষ্ট নিয়ম কিছুই ছিল না, তবে যেটুকু করিতেন, তাহা ঠাকুরের আদেশে এবং মনপ্রাণে—একথা নিশ্চিত।

শ্রীঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ইহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ভোরের বেলা ঢোল বাজাইয়া যদি কখনও প্রার্থনা গান করিতেন, তবে মনে হইত যে পিক-বিনিন্দি কণ্ঠ হইতে অমৃতবর্ষাই হইতেছে! এ অবস্থায় কখনও চোখের ধারায় মুখ বুক ভাসাইয়া দিতেন। কখনও বা দেহতত্ত্বের গান করিতেন—কখনও বা স্বরচিত দুই এক পদও গাহিতেন। শ্রীরূপসনাতনের বৈরাগ্য-কথা স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে আকুলপ্রাণে ক্রন্দনও করিতেন। অনুভব না করিয়া কেহ পদাবলি গান করিলে তিনি সাতিশয় দুঃখ পাইতেন—একদিন বাজার হইতে আসিবার পথে শুনিতে পাইলেন যে একজনে গান

করিতেছেন—'পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।' ঘরে আসিয়া ঠাকুরদিগকে লক্ষ্য করিয়া তর্জন গর্জন সহকারে কেবল বলিতেছেন—'পদ গাওয়ায় কেবল, 'পাষাণে কুটীব মাথা ; কুট দেখিনি, কুট্, কুট্, কু-উ-ট্,' ইত্যাদি—এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা বকাবকি করিলেন।

তিনি কোনও প্রাকৃত জীবনকে রাগ করিয়া কিছু বলিতেন না—যদি কিছু বলিতে হইত, তবে ঠাকুরদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন। কখনও 'আমি, আমার' শব্দ তাঁহার মুখে শুনা যায় নাই—সর্বদাই বংশীদাস' বলিতেন। স্বহস্তে প্রস্তুত দ্রব্য ব্যতীত ভোগও দিতেন না. প্রসাদও পাইতেন না—অসুস্থ হইয়া পাঁচ সাত দিনও অনাহারে কাটাইয়াছেন, তথাপি অন্য কাহারও হাতে সেবা করান নাই। শেষ জীবনে গঙ্গায় যাতায়াতে দুই মিনিটের পথ তিনি দুই ঘণ্টা ধরিয়া হামাগুড়ি দিয়াও গিয়াছেন, তথাপি সেবা ছাড়েন নাই।

বড় গোস্বামির বাড়ীতে দোতালা সমান উচ্চ একটি চাঁপা গাছ ছিল। এই বৃদ্ধাবস্থায় তিনি প্রত্যহ চাঁপাফুল আনিতে যাইতেন। তাঁহার ভজনকুটীর হইতে ঐ স্থানটি দুই মিনিটের পথ হইলেও তিনি বসিয়া বসিয়া এক ঘণ্টায় যাইতেন ; কিন্তু চাঁপা গাছে যখন উঠিতেন, তখন মনে হইত যেন একটি যুবক। বলা বাহুল্য যে এই বৃক্ষে নিত্য দুইটি করিয়া তাঁহার জন্য চাঁপা ফুটিত। একদিন এই গাছের উপর হইতে পড়িয়া গেলেন—দারুণ আঘাতও পাইলেন—শ্রীনবগৌরাঙ্গ দাস বাবাজি প্রমুখ বৈষ্ণবগণ কাঠের উপর শোয়াইয়া তাঁহাকে ভজন-কুটীরে আনিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু আর ঘরের বাহির হইতেন না। এই সময় মনোহর দাস, গোবিন্দ দাস এবং জগবন্ধু দাস প্রভৃতি তাঁহার সেবার আনুকূল্য করিতেন। কেহ ভিক্ষা করিয়া আনিতেন, কেহ বাসন মাজিতেন, কেহ বা অন্যান্য পরিচর্য্যা করিতেন। ইতঃপূর্বে ইঁহার আশ্রম হইতে

তিনবার গোপালবিগ্রহ চুরি হয়—তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধে বজ্‌বজ্‌ নিবাসী (সংপ্রতি নবদ্বীপবাসী) শ্রীযুক্ত ননীলাল ভঞ্জকে পাঠাইয়া ক্রমশ: বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও নেপাল হইতে তিন মূর্ত্তি গোপাল আনাইয়াছিলেন। একবার ইঁহার সাহায্যে জয়পুর হইতেও শ্রীযুগল-কিশোর আনাইয়া সেবাপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ ভক্ত জুটিতে লাগিল, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবু তাঁহার কুটীরের সম্মুখে তিনটী ছোট কুটীর করিয়া দিলেন, পশ্চিমদিকে কলিকাতা ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটির বড় বাবু ঘর করিলেন—তিনি নিজে তাহার মধ্যদেশে পিলার (স্তম্ভ) গাঁথিয়া একটি নাট্যমন্দির এবং দক্ষিণ দিকে একটি গোলাকৃতি গুম্বজবৎ প্রাসাদ করিতে করিতে কাজ বন্ধ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ইঙ্গিতে ভাঁটা হইতে ইট আসিত, কাঠগুদাম হইতে কাঠ এবং এই ভাবে লোহা লক্কড় এবং চূণ, সিমেণ্ট বালি প্রভৃতি আসিত। এই সব দ্রব্যের মূল্য চাহিতে আসিলে তিনি বলিতেন—'বংশীদাস টাকা পয়সার কথা জানে না, রাধারাণী দিব; কাল্‌কে কিন্তু সোজা ইট দুই গাড়ী ও বাঁকা ইট এক গাড়ী চাইই ইত্যাদি।' একদিন এই সব ঘর দুয়ার ছাড়িয়া ননীবাবুকে ডাকাইয়া কয়েকমূর্ত্তি বিগ্রহ সহ একেবারে স্বজন্মভূমি মজিৎ-পুরে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে ঠাকুরগণকে সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন, গন্তব্যস্থানে পৌছিবার পূর্বে আহার, নিদ্রা, প্রস্রাবাদি কিছুই করিলেন না। গ্রামের প্রান্তে একটি ভগ্ন পতিত মন্দিরে আশ্রয় করিলেন—কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে তদ্দেশীয় বহুলোককে কৃপা করিয়া আবার নবদ্বীপে আসেন; পরে আবার পুরী বৃন্দাবনাদি গমন করিয়াছিলেন—সর্বত্রই তিনি *মন্দিরের বাহিরে থাকিতেন* কখনও মন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করিতেন না। রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, বিবিধ কষ্ট বরণ করিয়াও তিনি কোনও লোকালয়ের আশ্রয়ে

স্থান নাই—পুরীতে নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে, রথের রাস্তায় এবং শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতটে পুলিনে পড়িয়া থাকিতেন। নৌকায় চাপিয়া আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—এই ভ্রমণ-কালে সর্বদার তরে গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ অকাতরে অনলসে তাঁহার বিবিধ সেবাসাহায্য করিয়াছেন।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থীতে তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীবনোয়ারী লাল সিংহ মহাশয়

মুর্শিদাবাদ জিলায় কান্দী মহকুমার পাঁচথুপী গ্রামে সম্ভ্রান্ত উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ-বংশে ১৭৬০ শকে ইনি জন্মগ্রহন করেন। বাল্যকালেই ইঁহার বৈরাগ্যোদয় হইলে স্বগ্রামবাসী একনিষ্ঠ ভক্ত, সুপণ্ডিত ও মনোহরসাহী কীর্ত্তনের সুগায়ক শ্রীকৃষ্ণদয়াল চন্দ্রজি মহাশয়ের সুসঙ্গে ইনি আত্মনিক্ষেপ করেন। ক্রমশঃ বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—ইনিও নিজালায়ে শ্রীহরিবাসর প্রতিষ্ঠা করত কতিপয় গ্রামের শুদ্ধ ভক্তগণের এক সম্মিলনী গঠন করিয়া রাঢ়দেশে প্রেম-তরঙ্গ উঠাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবসেবা ও অতিথি-সৎকারে ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রকটকালে ব্রজ, ক্ষেত্র ও গৌড়মণ্ডলের অগণিত উদাসীন বৈষ্ণব তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন। শ্রীশ্যামাদাসঠাকুর-বংশ্য শ্রীনন্দদুলাল মহান্ত ঠাকুরের সহিত ইঁহার এমনই যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল যে সিংহজির অপ্রকটের নয় বৎসর পরেও মহান্ত মহাশয় তদীয় হরিবাসরে অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী কৃষ্ণা তৃতীয়ায় সিংহজি মহাশয় অপ্রকট হন। পাঁচথুপীতে সিংহজি মহাশয়ের আলয় অদ্যাপি বৈষ্ণবের তীর্থস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু (জটিয়া বাবা)

১২৪৮ সালে ১৯শে শ্রাবণ ঝুলন-পূর্ণিমার নদীয়া জেলার শিকারপুর গ্রামে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সপ্তম অধস্তন আনন্দচন্দ্র গোস্বামির গৃহে শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীর গর্ভে ইনি আবির্ভূত হন। ইঁহার পিতা ছিলেন—শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ, কথিত আছে যে ইনি স্বহস্তে শ্রীশ্যামসুন্দরের ভোগরন্ধন করিতেন এবং ভোগরন্ধনের কাষ্ঠাদিও গঙ্গাজলে ধৌত করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'ধড়িধোয়া' গোঁসাই বলিত। তাঁহার কণ্ঠদেশে নিত্য দামোদর শালগ্রাম বিরাজ করিত। স্বর্ণময়ী দেবীও দয়াবতী এবং অসামান্য ভক্তিমতী ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকালে অতিচঞ্চল ও দুরন্ত ছিলেন। বাল্যকালে ইঁহার বহু দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু অলৌকিক উপায়ে সবগুলি হইতেই তিনি রক্ষা পাইয়াছেন। লেখাপড়াতে ইনি উন্নত ছিলেন—অসাধারণ প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি ছিল। শান্তিপুর টোলে প্রবিষ্ট হইয়া অল্পকালেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি আয়ত্ত করিলেন। উপনীত হইয়া কুলপ্রথানুসারে স্বীয় জননীর নিকট দীক্ষিত হন। সকলের প্রতি তাঁহার সদয় ব্যবহার, নারীজাতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রভৃতি আজীবন দৃষ্ট হইত। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন-কালে ইঁহার বিবাহ হয়। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য পড়িয়া ইনি অদ্বৈতবাদী হইয়া পূজা অর্চ্চনাদি ত্যাগ করিলেন। রংপুর জেলায় আমলগাছি গ্রামে শিষ্য-বাড়ীতে যাইয়া তিনি শিষ্যার সনির্ব্বেদ কাহিনী শুনিয়া নিজেকে মায়াবদ্ধ মানিয়া সেইদিন হইতে গুরুগিরি ছাড়িয়া দিলেন। দৈববাণী শুনিলেন 'পরলোক চিন্তা কর'—কিন্তু বক্তার অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে না পাইয়া ভয়ে জ্বর হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত মতের ভিত্তিও টলিয়া গেল।

১২৬৭ সালে ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন এবং ১২৭০ সাল হইতে প্রচারকপদ গ্রহণ করত বাগ্‌আঁচড়া, সাঁতরাগাছি, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিলেন। ১২৭১ সালে ইনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যপদ অলঙ্কৃত করেন। শান্তিপুরে গিয়া হরিমোহন প্রামাণিক-নামক ভক্তের অনুরোধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠারম্ভ করিয়া তিনি প্রাণে শান্তি পাইলেন। সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজি ও শ্রীভগবান্ দাস বাবাজি মহারাজের সহিত দেখা করিতে গেলে ইনি তাঁহাদের সুমিষ্ট ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় আপ্যায়িত হইলেন। স্বাগ্রজ ব্রজগোপাল প্রভুর মুখে 'কানু পরশমণি' কীর্ত্তন শুনিয়া ইনি ব্রাহ্মসমাজেও কীর্ত্তন-প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিলেন। ১২৭২ সনে ঢাকায় থাকিয়া ইনি বরিশাল, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে প্রচার ও চিকিৎসা করিতেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিলেও কিন্তু তাহাতে অধিক সময় নষ্ট হয়, সুতরাং প্রচারে ব্যাঘাত দেখিয়া তিনি ব্যবসা ছাড়িয়া কেবল প্রচারেই মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশে জ্বলন্ত বিশ্বাস, অকপট ঈশ্বরানুরাগ ও অকৃত্রিম ভগবৎপ্রীতি এবং নিজের আদর্শ জীবন ও ত্যাগবৈরাগ্যাদি দেখিয়া বহুলোক তখন ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় করিয়াছিল। শ্রীকেশবসেনাদি ইঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন—'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত', 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার প্রচারকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে তিনি চিকিৎসা, অধ্যাপনা ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লিখিবার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে করিতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং স্বপ্নাদেশে জগন্নাথ ঘাটে জনৈক সাধুর নিকট গিয়া তাঁহার ঔষধে যৎসামান্য আরোগ্যলাভ করেন। একবার অমৃতসর গুরুদোয়ারার গ্রন্থসাহেবের সায়ং আরতি দেখিয়া

পরমানন্দ লাভ করিলেন। লাহোরে গিয়া তত্রত্য জনৈক সুন্দরী যুবতির দর্শনে মনে বিকার উপস্থিত হইলে ইনি আত্মগ্লানিতে কটিদেশে প্রস্তরবন্ধনপূর্বক রাবীনদীতে মরণোন্মুখ হইলে জনৈক ফকির আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আশ্বস্ত করিলেন। ১২৭৭ সালে ফাল্গুন মাসে কেশব বাবু ইঁহার সাহায্যে ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, কতকগুলি ব্রাহ্ম-পরিবারকে একসঙ্গে রাখিয়া দৈনিক উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, আহার-বিহারাদির নিয়ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন—ইহাতে নানারূপ বাদ প্রতিবাদ হইতে থাকিলে ইনি সুস্পষ্ট ভাষায় এক পত্র লিখিয়া ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎপরে ইনি উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশে ধর্মপ্রচার করেন। কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীমৎ-ত্রৈলঙ্গস্বামী ইঁহাকে বরুণার দিকে লইয়া নির্জন স্থানে দীক্ষা দেন। তৎপরে তিনি ভক্তি-সাধনায় ব্রতী হইলেন এবং কেশব বাবুর সহিত মতানৈক্যে এবং কোচবিহারের বিবাহ-আন্দোলনে ইনি বাগআঁচড়ায় প্রার্থনাকালে দৈববাণী শুনিলেন—'তুই আর দলে আবদ্ধ থাকিস্ 'না। গণ্ডির ভিতরে থাকিলে ধর্ম হয় না।' সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তিনি যোগদান করিলে তাঁহার প্রাণহানি করিতে ষড়যন্ত্র হয়, তাহাতেও তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে রক্ষা পান। বহুস্থানে গুরুর অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়া ইনি গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ১২৯০ সালের আষাঢ় মাসে মানস-সরোবরবাসী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট দীক্ষা ও সাধনা লাভ করেন। এই কালের অবস্থাটি তিনি স্বকৃত 'আশাবতীর উপাখ্যানে' বর্ণনা করিয়াছেন। কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলে একদিন সেই পরমহংসজি আসিয়া তাঁহাকে কাশীতে হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে আদেশ করেন। তিনিও আবার যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করত বিরজা হোমাদিপূর্বক চতুর্থাশ্রম স্বীকার করিলেন, কিন্তু গুরু-আজ্ঞায় আবার স্ত্রীর সহিত বসবাস করিতে

থাকিলেন। ঢাকার অবস্থানকালে তাঁহার প্রাণে দারুণ শুষ্কতা আসিল—সাধনা ত্যাগ করিলেন, আবার গুরু-আজ্ঞায় তিনি জ্বালামুখী গিয়া শান্তি পাইলেন এবং পুনরায় সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় অবস্থানকালে ইনি উৎকট সাধনায় সিদ্ধ হন এবং বহুস্থানে ভগবৎপ্রকাশ দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হন। অতঃপর তিনি দীক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন। তিনি সাধন দিতেন—কেবল **শ্বাসে শ্বাসে গুরুদত্ত নামের জপ**। সাধনের অঙ্গস্বরূপে একপ্রকার প্রাণায়ামও করিতে হইত। পরে স্থানান্তরে ঘুরিয়া ইনি বারদীর ব্রহ্মচারীর সহিত মিলিত হইলে উভয়ের আনন্দ আর ধরিল না। গোস্বামীপাদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক ভাব দেখিয়া এবার তিনি ঐ সমাজ ত্যাগ করিলেন। পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করত আবার মতভেদ হওয়ায় তাহাও ত্যাগ করিলেন

দ্বারভাঙ্গায় একবার তাঁহার উৎকট বেদনা উপস্থিত হইল—বহু ডাক্তার অকৃতকার্য্য হইলে একদিন পরমহংসজি আসিলে তাঁহার রোগ দূর হইল। সকলের পরামর্শে তিনি একসময় পদ্মানদীতে নৌকাবাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একবার শান্তিসুধা ও প্রেমসখী (কন্যাদ্বয়) পিতার নিকট গল্প শুনিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন জনৈক পরিচারিকার হস্তে প্রেরিত উপহার গঙ্গাদেবী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাহিনী শুনিয়া তাঁহারা ঐরূপ প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য নিবেদন করিলে তৎপরদিন তিনি তাঁহাদিগকে পদ্মাদেবীর হস্ত দেখাইয়াছিলেন।

১২৯৫ সালে ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীতে ইনি গেণ্ডারিয়ার আশ্রম স্থাপন করত সপরিবারে বাস করিলেন। এই সময়ে তিনি নিয়মবদ্ধ হইয়া দৈনন্দিন কার্য্যাদি করিতেন—একবার শাস্ত্রসমূহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে গূঢ় রহস্য ও প্রকৃত তথ্য তাঁহার হৃদয়ে

স্বতঃই প্রকাশিত হইল। কাশী প্রভৃতি বিবিধ স্থানে বহু সাধুসঙ্গ করত ইনি পরমহংসজির আদেশে ১২৯৭ সালে বৃন্দাবনে গোপীনাথ-বাগের দাউজির মন্দিরে এক বৎসর বাস করেন। এই সময়ে শ্রীগৌর শিরোমণির সহিত তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী হইত—বহুবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা দৈনন্দিন তাঁহার নয়নগোচর হইত—তিনি সাধুগণের সঙ্গে সূক্ষ্মদেহে মুক্তিনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন—তৎপরে ১২৯৭ সালে ১০ই ফাল্গুন যোগমায়া দেবীর অন্তর্ধান হইলে ইনি হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গেলেন এবং বহু সাধুসঙ্গ করেন। ১৩০০ সালে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যান এবং ঐ ফাল্গুন মাসে প্রেমসখীর বিবাহ হয় এবং ১৩০১ সালে উহার দেহত্যাগ হয়। ১৩০১ ফাল্গুন হইতে ১৩০২ সাল শ্রাবণ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে পুনর্বাস করিয়া গেণ্ডারিয়ার আসেন এবং ১৩০৪ সালে ২৪শে ফাল্গুন পুরীধামে যাত্রা করেন।

গেণ্ডারিয়ায় অবস্থানকালে আশানন্দ বাউল এবং কলিকাতা কম্বলীটোলায় অবস্থানকালেও কতিপয় ব্রাহ্ম ইঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছিল—কিন্তু প্রভুপাদ অল্পদিন পরেই সুস্থ হইয়াছিলেন। ঢাকায় ধুলোটে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জন্মতিথি-উপলক্ষে ইনি যখন উদ্দণ্ড নৃত্যান্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখন জটা একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল—কিছুক্ষণ খাড়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল। সময় সময় ইঁহার আসনে, পরিধেয় বস্ত্রে বা দেহে হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি নামের অক্ষরগুলি ফুটিয়া উঠিত।

গোস্বামিমহাশয় পুরীতে যাইয়া প্রথমতঃ বহু কষ্টে বানরমারা বন্ধ করেন। ইনি একবার কল্পতরু হইয়া উড়িষ্যাবাসী বহুলোকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। অর্থীরা টাকা পয়সা, কাপড়, ঘটী ইত্যাদি প্রার্থিত বস্তু পাইয়া আনন্দলাভ করিয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈত-তিথি-আরাধনার সময় ইনি বহু ব্রাহ্মণকে কাপড় বিতরণ করেন।

১৩০৫ সালের ২৯শে ফাল্গুন এমার মঠে ইনি প্রায় দশ হাজার ব্রাহ্মণকে কাপড় দেন—ঐ উপলক্ষে টিকেট করা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন আশ্রমেও প্রতি দিন বহু লোককে টাকা, কাপড় ও ঘটী ইত্যাদি দিয়াছিলেন। আবার ২০শে চৈত্র বড় আখড়ায় ইনি মহাপ্রসাদ দিয়া সাত আট হাজার বৈষ্ণবের সেবা করাইলেন। ভোজনান্তে প্রত্যেক সাধুকে বস্ত্র ও ঘটী দেওয়া হইয়াছিল। পুরীর কোন শ্রীসম্প্রদায়ী মঠের মোহন্ত স্ব-প্রভাব-প্রতিপত্তির লাঘব দেখিয়া অন্য কয়েকটি পাণ্ডার সহিত মিলিয়া ইহাকে বিষযুক্ত মগজলাড়ু খাওয়াইলে ইহাতে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ দুর্বল ও নিস্তেজ হইতে হইতে ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ ইনি অপ্রকট হইয়াছেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু-বিষয়ক গ্রন্থাবলী :—

১। বক্তৃতা ও উপদেশ } নিজকৃত
২। আশাবতীর উপাখ্যান } নিজকৃত
৩। করুণাকণা (জগবন্ধু মৈত্র)
৪। বিজয়কৃষ্ণ-জীবন (ঐ)
৫। বালক বিজয়কৃষ্ণ (সীতানাথ গোস্বামী)
৬। বিজয়কৃষ্ণ-জীবনবৃত্তান্ত (বঙ্কুবিহারী কর)
৭। সাধনা ও উপদেশ (অমৃতলাল সেন)
৮। উপদেশ-সংগ্রহ ,,
৯। যোগমায়া ঠাকুরাণী ,,
১০। শ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ (কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী) ৫ খণ্ড
১১। শ্রীবিজয়কথামৃত (নবকুমার বাগচি) ২ খণ্ড
১২। আচার্য্য-প্রসঙ্গ (সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)
১৩। শ্রীবিজয়-মঙ্গল (বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় (মাকড়দহ, হাওড়া)

হাওড়াজিলায় প্রাচীন সরস্বতীর তীরে মাকড়দহ (মাপুরদহ) গ্রাম—গ্রামটিতে বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ সজ্জনগণেরই প্রধানতঃ বাস। অত্রত্য মাকড়চণ্ডী প্রসিদ্ধ ঠাকুর; শুনা যায় এই দেবী সরস্বতীর তীরে বহু প্রাচীনকাল হইতে সেবিত হইতেছেন; ইনি অতি উচ্চাকৃতি ছিলেন, কিন্তু কাল-প্রভাবে ক্রমশঃ মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। অনতিদূরে রাঢ়ীশ্রেণীর কাশ্যপগোত্রীয় নৈকষ্য কুলীন শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের গৃহ। ইনি অতিসুসজ্জন, সদাচার-পরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি শ্রীহট্ট প্রদেশে পোষ্টঅফিস সমূহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং ঐ দেশে স্বগৃহে নিত্য শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। কথিত আছে যে উহার সঙ্গী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জয় নিতাই)-সহ তিনি যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন উভয়ই ভাবে আবিষ্ট ও অচেতন হইয়া তিন চারি ঘণ্টাও পড়িয়া থাকিতেন। তত্রত্য দুষ্ট লোকগণ একবার ইহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য টিকায় আগুণ ধরাইয়া ইহাদের গায়ে লাগাইয়া যখন দেখিতে পাইল যে তাহাতে ইহাদের কোনই হানি হইল না, অথচ ইহারা চাঞ্চল্য বা বিকারগ্রস্তও হইলেন না, তখন তাহারা ইহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়াছিল।

শ্রীশ্যামচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদার বাবু। ১২৭৬ সালের পৌষ মাসে শ্যাম বাবুর ঔরসে রত্নগর্ভা তরঙ্গিণী দেবীর গর্ভে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিপিন বাবুর আবির্ভাব হয়। ইনি সাংসারিক অস্বচ্ছলতার জন্য বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিতে কষ্ট পাইয়াছিলেন। অধ্যবসায় ও সাধনবলে তিনি অল্পকালেই কৃতিত্বের সহিত বি, এ, পাশ করিয়া ওকালতী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে হাওড়া ও হুগলি

একই জেলা ছিল, এই জন্য তিনি হুগলিকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতে ইনি ধর্মপ্রিয় ছিলেন। উপনয়ন-কালে সাবিত্রী-দাতা কুলগুরুকে জিজ্ঞাসা করেন—'বাবা, আমার মন্ত্রচৈতন্য করিয়া দিন।' তিনি বলিলেন—'আমার ত সেই ক্ষমতা নাই। তুমি সাধুসঙ্গ কর।' প্রশ্ন হইল—'সাধু চিনিব কি প্রকারে?' উত্তর হইল—'যাঁহাকে দেখিয়া তোমার মনে সাধু বলিয়া ধারণা আসিবে, তিনিই সাধু।' এই বাক্য তিনি সরলভাবে গ্রহণ করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যকালে খেলার ছলে স্বগৃহ-নিকটবর্ত্তী গঙ্গা নাপিতের ডাঙ্গায় গিয়া সমবয়স্ক বালক-বালিকাগণকে লইয়া রাসলীলাদি রচনা করিতেন; কখনও বা চক্ষু বুঁজিয়া ধ্যানস্থ হইতেন—তন্ময় হইয়া যাইতেন। সদা সত্য সরল ব্যবহারই ইঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং এজন্য সকলের কথাই অবিচারে গ্রহণ করিয়া তিনি বহুবার নিজ জীবনকেও বিপন্ন করিয়াছেন। গুরূপদিষ্ট মার্গে সাধুসঙ্গ করিতে গিয়া কতবার যে প্রতারিত হইয়াছেন, জীবন-সঙ্কট রোগে মহাক্লিষ্ট হইয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। যখনই যে সাধুর সঙ্গ করিতেন, তখনই তাঁহার উপদেশটিকে মন্ত্রবৎ মানিয়া যথাযথ ভাবে ও অবিচারে পালন করিয়াছেন—কোনও সাধু বলিলেন 'গঞ্জিকা-সেবন করিতে হইবে'; তিনি তখন হইতেই অনভ্যস্ত হইলেও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াও গঞ্জিকাসেবনে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সাধুবেশী পুরুষটিও সুযোগমত কিছু গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিত হইতেন। এইভাবে বহুশঃ প্রতারিত হইলেও তিনি সাধুসঙ্গ-স্পৃহা কখনও ছাড়িতে পারেন নাই। একবার মাকড়দহে এক সাধু আসিয়া বলিলেন যে ২১ দিন যাবৎ দিবাভাগে অনাহারে থাকিয়া ও রাত্রিবেলা সাধনান্তে একমাত্র ভাবের জল পান করিয়া কর্ণপিশাচীর সাধন করিলে নিশ্চয়ই দেবী-সাক্ষাৎকার হইবে। তখনই তাঁহা হইতে মন্ত্রটি শিখিয়া যথোপদেশ

সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন—উপবাসী থাকিয়া শরীরটিকে কৃশ ও দুর্ব্বল করিলেও তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত না করিয়া—আত্মীয়স্বজনের হিতকর বাক্যও অহিতকর মনে ভাবিয়া ক্রমাগত সাধন করিতেই থাকিলেন। বিংশ দিবসের রাত্রিতে একটি অস্পষ্ট সরস্বতী-মূর্ত্তি যেন দেখিলেন—কিন্তু কি জানি কেন শরীরটা চমকিয়া উঠিল। সেই-জন্য তাহার পরের রাত্রিতে তাঁহার বাল্যবন্ধু মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকে পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিলেন এবং বলিলেন যে যদি ভয়-গ্রস্ত হইয়া শব্দ বা চিৎকার করেন, তখন যেন তিনি আসিয়া তাঁহাকে সন্তর্পণ করেন। যথারীতি সাধন হইতে থাকিলে নিশার্দ্ধ-কালে বিল্বপত্র দ্বারা আহুতি করিতেছেন—এমন সময় তিনি দেখিলেন যে আহুত বিল্বপত্রগুলি যেন স্বতঃই সরিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়াই তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া মন্ত্রের বীজোচ্চারণে ভুল করিয়া বসিলেন—তাহাতে কর্ণপিশাচী তাঁহাকে ধরিয়া টানিতে লাগিলে তিনি দারুণ উৎকণ্ঠায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ সান্ত্বনা ও সন্তর্পণ করিয়া সুস্থ করিলেন; কিন্তু তাহার পর হইতেই ইঁহার জ্বর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ জ্বর বাড়িল, বিকার উপস্থিত হইল, পেটজোড়া প্লীহা ও যকৃৎ হইল, দন্তপংক্তি হইতে স্বতঃই রক্তোদ্‌গম হইতে লাগিল—শয্যাশায়ী হইয়া বহুদিন কাটিল ডাক্তার বৈদ্যগণ জবাব দিলেন সম্পত্তির উইলপত্র হইয়া গেল। শিয়রে বসিয়া মাতা ঠাকুরাণী অনবরত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিপিন বাবু কথা বলিতে পারেন না—মনের ভাব মুখে ব্যক্ত করিতে পারেন না—মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকিতে থাকিতে একদিন মনে ভাবিতেছেন—'হায়রে! মৃত্যুত জীবের হইবেই, কিন্তু সাধুসঙ্গ করিতে গিয়া আমি মরণ বরণ করিতেছি; এই কথা সাধারণ লোক জানিতে পারিয়া যদি কখনও সাধুসঙ্গ হইতে বিরত

হয়, তবে মহাঅনর্থপাত হইল। হা হরি!!' কথাটি হৃদয়মন্দিরে উদিত হইয়া তাঁহাকে ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলিল। এমন সময়ে শ্রীহরিবোলানন্দ ঠাকুরের প্রেরিত তিন চারি জন বৈষ্ণব গৃহদ্বারে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন—'প্রেমদাতা নিতাই বলেন গৌরহরি হরিবোল। নিতাই এনেছে নাম গৌরহরি হরিবোল॥' নামের ধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিপিন বাবুর সমস্ত দেহটাকে অদ্ভুতপূর্ব্ব উন্মাদনা ও আনন্দাতিশয্যে আলোড়িত করিল—মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত অন্যলোক অনেক কষ্টে যাঁহার পাশ ফিরাইতেন, তিনি কোনও অজ্ঞাত তাড়িচ্ছক্তি-প্রবাহে প্রভাবান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন—যিনি বহুদিন যাবৎ মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারেন নাই, তিনি তখন জননীকে আহ্বান করত বলিলেন—'মা! যাঁরা গান করিতেছেন, তাঁদিগকে এখানে নিয়ে এস।' পুত্রবৎসলা জননী তরঙ্গিণী স্বনাম স্বার্থক করিয়াই তখন দ্রুতপদবিক্ষেপে দুই তিনটী করিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করত তাঁহাদের নিকটে গিয়া কাকুতি মিনতি পূর্বক সুমধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া তাঁহাদিগকে বিপিন বাবুর শয্যাপার্শ্বে আনিলেন—বিপিন বাবু তাঁহাদিগকে দেখিয়া হৃদয়ের বন্ধু জানিয়া চরণে লোটাইয়া পড়িলেন, চরণরজে সর্ব্বাঙ্গ অভিষেক করিলেন—সাধ্যসাধনা করিয়া চরণজল লইয়া পান করিলেন—নিজের বাড়ীতে তিন দিন রাখিয়া যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদের অধরামৃত পাইয়া রোগমুক্ত হইলেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি জানিলেন যে ঐ বৈষ্ণবদের মধ্যে একজন তাঁহারই মাসতুতো ভাই—ভুপাল হরিবোল। তাঁহাদের মুখে হরিকথা শুনিয়া ইনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা ছিল না। তাঁহাদিগকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বান্ধবগণ! তোমাদের মুখে হরিনাম—এত মিষ্ট, এত উন্মাদক—না জানি তোমাদের গুরুদেব কি অমৃতবিনিন্দী কণ্ঠে হরিবোল করেন,

তিনি কে এবং কোথায় থাকেন ?" তাঁহারা বলিলেন—'তিনি হরিবোল ঠাকুর, কাশীতে থাকেন, তিনি আর বাঙ্গালায় আসিবেন না।' নামটি শুনিয়াই ত ইঁহার মনপ্রাণ নাচিয়া উঠিল—কি প্রকারে তাঁহার সহিত মিলন হয়, তদ্বিষয়ে দিবানিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন। শরীর ক্রমশঃ সুস্থ ও সবল হইতে লাগিল—তিনি ঠাকুরের সঙ্গলোভে স্বাস্থ্যভঙ্গচ্ছলে বৈদ্যনাথ যাইবেন বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীতে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী আছে। শ্বশুরের মূল বাড়ী চন্দননগরে গোন্দলপাড়ায়—ইনি এক জন বিশিষ্ট জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। নয় কন্যার পরে ইঁহার একমাত্র পুত্র ছিলেন পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপিন বাবু শ্বশুরালয়ে থাকিয়া নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া শ্রীহরিবোল ঠাকুরের দর্শন পাইলেন। পনর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে যাতায়াত করিলেন, তাঁহার মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা শুনিয়া কর্ণমনের তৃপ্তি সাধন হইতেছে ইহা অনুভব করিলেও কিন্তু সম্যক্প্রকারে কথা গ্রহণ করিতে না পারিয়া ঠাকুরকে বলিলেন 'বাবা! আমি ত তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।' তখন ঠাকুর বলিলেন—'হ বাবা হ'; সেই দিন হইতে তিনি ঠাকুরের কথা সব বুঝিতে পারিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি বাক্যই চিরজীবনের তরে হৃদয়পটে সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ দিয়া নিত্যানন্দ-নামকরণ করত সর্ব্বশক্তি সমর্পণ করিলেন। একদিন পরীক্ষা করত ঠাকুর বলিলেন—'বাবা, আমার বড়ই অর্থকষ্ট উপস্থিত, তুমি যদি অন্নপূর্ণার মন্দিরের সামনে কাপড় পাতিয়া বসিয়া দিনান্তে যাহা পাও, আমাকে আনিয়া দিতে পার, তবেই ভাল হয়।' নিত্যানন্দ (বিপিন বাবু) 'যে আজ্ঞে' বলিয়া তখনই নির্দিষ্ট স্থলে গিয়া কাপড় পাতিয়া বসিয়া রহিলেন—সেই রাস্তা দিয়া তাঁহার শ্বশুর বাড়ীর যত লোক অন্নপূর্ণাবিশ্বেশ্বর' দর্শন

করিতে গিয়া তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া কত ওলাহন দিলেন—কত কটু কথা বলিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ গুরুবাক্যে দৃঢ় আস্থাস্থাপন করত অন্য সকল বিষয়ই উপেক্ষা করিলেন—সন্ধ্যাকালে কাপড়, পৈতা পয়সা, চাউল যাহা যাহা পাইয়াছিলেন সবই আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিলে ঠাকুর মাথায় নিয়া নাচিতে লাগিলেন। যথাযথভাবে ঠাকুরের প্রতি আদেশ ইনি যথাসময়ে অকপটে ক্ষিপ্রতাসহ প্রাণপণে পালন করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন চিত্তে ইঁহাকে সর্ব্বশিষ্যের মুখ্যতম নায়ক করিলেন এবং ইনিও তিনমাস ঠাকুরের চরণ-সান্নিধ্যে থাকিয়া সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। তিন মাস পরে ঠাকুর ইঁহাকে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলে ইনি বলিলেন যে ইনি আর ওকালতি করিতে প্রস্তুত নহেন, যেহেতু তাহাতে অনেক মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে হয়। ঠাকুর বলিলেন—'সাত দিনের মধ্যেই তুমি মুন্সেফ হইবে।' নিত্যনন্দ দেশে ফিরিলেন এবং সাতদিন মধ্যেই মুন্সেফ্ পদ পাইয়া কার্য্যে যোগদান করিলেন। তিনি যে যে স্থানে মুন্সেফ হইয়া গিয়াছেন, তত্তৎ স্থানের সকল ভক্তকেই এমন আকর্ষণ করিতেন যে কেহই আর তাঁহার নিকটে না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না। যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই নিত্য দুইবেলা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, কীর্ত্তনে বাহিরের লোক প্রায়শঃই থাকিতেন না—নিজের স্ত্রীপুত্র-কন্যাদি ও দাস-দাসীরাই সঙ্গে থাকিয়া কীর্ত্তন করিতেন—তাঁহার মুখে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি একটিবার হরিবোল শুনিয়াছেন, তিনিই চির-তরে সেই সুধানিঃস্যন্দী কণ্ঠের স্বর ভুলিতে পারেন নাই—সেই স্বর 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' তাঁহাকে নিশ্চয়ই অপার্থিব জগতের সন্ধান জাগাইয়া দিয়াছে—কোনও কোনও অতিভাগ্যবান্ জনকে আবার সংসার-বন্ধন ছিন্ন করাইয়া উদাসীনমার্গের অনুবর্ত্তী করাইয়াছে। কীর্ত্তনের সেই উদ্দাম ভাব, সেই 'বেড়া নৃত্য,' সেই হুঙ্কার গর্জন,

প্রেমাবেশে কাহারও গণ্ডে চপেটাঘাত, কাহারও স্কন্ধে আরোহণ ইত্যাদি দেখিয়া অতবড় পাষণ্ডীও তাঁহার চরণে চিরবিক্রীত হইয়াছে।

একবার চট্টগ্রাম জেলায় রাউজানে তিনি মুন্সেফ ছিলেন—রথযাত্রার প্রাক্কালে কতিপয় ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনি যদি কৃপা করিয়া রথের আগে কীর্ত্তন করেন, তবে সকলের আনন্দ হয়।' তিনি বলিলেন—'হ্যাঁ, তা' হইতে পারে, যদি সকল সম্প্রদায় একসঙ্গে কীর্ত্তন করে।' যথাযথ ব্যবস্থা হইলে ইনি রথের সম্মুখে কীর্ত্তন ধরিলেন—'বোল হরিবোল, গৌর হরিবোল।' কীর্ত্তন এত মধুর, এত উন্মাদক হইয়াছিল যে বহুলোক রথোপরি সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, বহুলোকের ভাব-সমাধি হইয়াছিল—আনন্দের পাথার বহিয়া গিয়াছিল। এই সময় তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিবোল ধ্বনি করিতেন, তাহা শুনিয়া বহুদূর হইতে ভক্তগণ আসিয়া প্রাভাতিক কীর্ত্তনে যোগ দিতেন ভোর চারিটা হইতে সকাল সাতটা পর্যন্ত কীর্ত্তনানন্দ চলিত, তৎপরে আহ্নিকাদি সারিয়া ইনি 'রায়' লিখিতে বসিতেন; তৎপরে স্নান, তিলকসেবা শ্রীবিগ্রহারাধনা ইত্যাদি নিত্য নিয়মিতভাবে সমাধা করিয়া প্রসাদ পাইয়া কোর্টে যাইতেন। বিচার-আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার মস্তক অবনত করত সকলকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিতেন। বিকাল বেলা কোর্ট হইতে ফিরিবার কালে আবার উচ্চকণ্ঠে হরিবোল করিতেন—ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন; তিনিও স্নানাদি সারিয়া সমবেত ভক্তবৃন্দের সহিত কীর্ত্তনানন্দে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত কাটাইয়া শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ দিয়া বিদায় করিতেন, স্বয়ংও প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেন। শ্রীহরিবাসর-দিনেও তাঁহার নিয়ম-ব্যত্যয় হইত না—সারাদিন নির্জলা ব্রত করিয়াও সারারাত্রি অনলসে বসিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন ও শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া কাটাইয়া

দিতেন। তাঁহার প্রতি কথার ভিতর দিয়া—প্রতি আচরণের ভিতর দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় নিষ্ঠাভক্তি ঝলক দিত। শ্রীহরিবোল ঠাকুরের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিগাঢ় ভাবাদি ইঁহার হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্তি হইত। বস্তুতঃ ঠাকুরকে পাইয়া ইনি যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, ঠাকুরও ইহার মত অতুলনীয় গুরুনিষ্ঠ শিষ্যকে পাইয়া মহানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। নিয়ত কালের জন্য ইঁহার মনে মুখে 'হরিবোল' ছিল—ঠাকুর দূর দেশে অবস্থান করিলেও ইনি যেন তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন বলিয়া সকলের মনে হইত।

একবার শ্রীচৈতন্যভাগবতের কাজিদমন-লীলা পাঠ করিবার সময় ইনি এতই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে দেওয়ালের গাত্রে কাজিদমনে গমনোন্মুখ সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গের ছবি প্রতিভাত হইয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নয়নপথেও কিয়ৎকালের জন্য বিদ্যোতমান ছিল। কুমিল্লায় অবস্থান কালে একবার ইনি ভুবনপাবন শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের দর্শন পান এবং অন্যত্র বাসকালে আবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনাবেশে ইঁহার বাহুর হেলন-দোলনে মুখে উচ্চারিত লীলাটি অনভিজ্ঞ শ্রোতারাও হৃদয়পটে যেন অঙ্কিত হইয়া যাইত।

ইনি কখনও স্ত্রীজাতিকে শাসন করিতেন না—নিজের পুত্রদ্বয়কে ও শিষ্যকে যথেষ্ট তাড়ন ভৎসর্না করিলেও কখন কন্যাগণকে ত্রুটি করিলেও কিছুই বলিতেন না। নিজের পরিবারকে এমন প্রকারে ভক্তিময় করিয়া গঠন করিয়াছিলেন যে সদাকালের তরে তাহাতে নামকীর্ত্তন, স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগ্রন্থচর্চা এবং হরি-পরায়ণতা বিদ্যমান ছিল। কঠিন কঠিন ব্যাধিতেও ইনি কখনও দুই বেলা উচ্চকীর্ত্তন ছাড়েন নাই—বরং তাহাতে অধিকতর উল্লাসে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত দেখিলে জাতিধর্ম্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তাঁহাকে সর্বথা আশ্রয় দিয়া

নিজের কাছে রাখিতেন—তাঁহার পরিবার-পোষণের ভারপর্য্যন্ত স্বয়ং লইয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে ভজন করিবার সুযোগ দিয়াছেন।

নড়াইলে অবস্থানকালে ইনি বহু বালককে আকর্ষণ করিয়া কীর্ত্তন করিতেন—তন্মধ্যে দুই জনই অগ্রণী ছিলেন---কিরণচন্দ্র মিত্র ও গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ। নিকটবর্ত্তী মহিসখোলা পল্লীতেই ইঁহারা থাকিতেন এবং কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়াই বহু বাধাবিঘ্ন, গুরুগঞ্জনাদি সব উপেক্ষা করত সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। নিত্যনন্দ গিরীন্দ্রকে কীর্ত্তন করিতে করিতে একেবারে চিরতরে প্রিয়সেবক করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং গিরীন্দ্রও লেখাপড়ার তিলাঞ্জলি দিয়া (ইনি নড়াইল হইতে বাঁকুড়ায় বদলি হইয়া গেলে) পশ্চাদনুসরণক্রমে ইঁহার চিরসাথী হইয়া বিংশতি বৎসর যাবৎ বিবিধ লীলাবিনোদের সহায়ক হইয়াছিলেন। পরস্পরের স্বাভাবিক প্রেমে পরস্পর এতই সংস্বক্ত হইয়াছিলেন যে একের বিরহে অন্য মুহ্যমান হইতেন---পুত্র-ভৃত্য নির্বিশেষে পরম স্নেহশীলতা, পুত্রাধিক বাৎসল্য এবং প্রাণাধিক প্রিয়তা প্রভৃতি কল্যাণগুণরাজি আমরা এই দুইয়ের মিলনে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্যধন্য হইয়াছি। অপত্য-নির্বিশেষে শিষ্যকেও ক্রোড়ে-বক্ষে রাখিয়া পোষণ পালন করিতে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? আবার ভক্তিপথে তাহার ত্রুটি, বিচ্যুতি দেখিয়া নির্ম্মম নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাড়ন ভৎর্সন-বর্জনাদি চরম কঠোরতাও যুগপৎ কেহ প্রকট করিতে পারেন কি? সেই শিষ্য আবার মরণোন্মুখী হইলে তাঁহাকে কেশে ধরিয়া আনিয়া পুনঃ স্বচরণান্তিকে শোধন-ক্ষালনক্রমে সংস্থাপনাদিও কি অপূর্ব ব্যাপারই ঘটে! তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের আনুগত্যে বলি-(চৈ-চ অন্ত্য ৪।৪৭,৪৬)

দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই প্রভু ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥

আবার—সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন॥

কুমিল্লায় (বিষ্ণুপুরে) অবস্থানকালে একবার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের আয়োজনে ঐ স্থানে বিরাট বৈষ্ণব সম্মিলনী হইয়াছিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া ঐ সভায় ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার শ্রীপাট আড়িয়ালের সুপ্রসিদ্ধ গৌরভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামিপ্রভুও উপস্থিত ছিলেন। কয়েকদিন আগে হইতেই নিত্যানন্দের ভাবাবেশে তিলক-সেবা করিতে বিপর্যয় দেখা গেল—তিনি পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবারের তিলক করিতেন; কিন্তু অজ্ঞাত প্রেরণায় কেন যে শ্রীগদাধর-পরিবারের তিলক আরম্ভ করিলেন, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। কয়েকদিন পরেই বিনা আহ্বানে ও বিনা পরিচয়ে উক্ত শিরোমণি প্রভু তাঁহার বিষ্ণুপুরস্থ বাসায় পদার্পণ করিলেন এবং উভয়ের তাৎকালিক মিলনে যে কি এক অভূতপূর্ব রসপ্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দ্রষ্টাগণই জানেন। শিরোমণি প্রভুর শ্রীগৌর-নিষ্ঠা দেখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহার নিকট হইতে শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এবার শ্রীগদাধর-পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হইলেন এবং পরবর্ত্তী পূজাবকাশে তাঁহাকে তাঁহার মাকড়দহ-ভবনে আনাইয়া সভৃত্য পরিকরগণকেও শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। শ্রীহরিবোলানন্দ ঠাকুরের শ্রীচরণ-রজে অভিষিক্ত মাকড়দহ-ভবন আবার শিরোমণি প্রভুপাদের চরণরজ চুম্বন করিয়া মহাতীর্থে পরিণত হইল। তখনকার কীর্ত্তনের রোল, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের রসাল ব্যাখ্যা ও ভক্ত্যুৎসবাদির বিবরণ অনুভববেদ্যই বটে।

বগুড়াতে অবস্থানকালে নিত্যানন্দ স্বভাব সুলভ বিশ্বাসে জনৈক ভৈরবীর হস্তে ঔষধ সেবন করিতে গিয়া আবার জীবন বিপন্ন করিলেন। সামান্য কাশরোগে আক্রান্ত হইয়া কর্মস্থল হইতে

ছুটি নিয়া তিনি কাশীধামে যান, পরে ভ্রাতুষ্পুত্র ও পরিকরগণের পরামর্শে কলিকাতায় তাৎকালীন হোগলকুঁড়ে গলিতে (বর্ত্তমান নাম—সাহিত্যপরিষৎ ষ্ট্রীট্) স্ববাল্যবন্ধু বিপিন দত্তের বাড়ীতে অবস্থান করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চিকীৎসাধীন থাকিয়া ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া তিনি পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিতেও সক্ষম হইলেন। প্রিয় শিষ্য গিরিন্দ্র পদতলে শয়ন করিয়াছেন, একদিন, রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে নিত্যানন্দ দুই দিন পরে মহাপ্রয়াণ করিবেন—স্বপ্ন দেখিয়াই গিরিন্দ্র ক্রন্দন করিতে করিতে চরণে পড়িলেন; নিত্যানন্দ আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেও কিন্তু ইহার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল। দুই দিন পরে নিত্যানন্দের প্রিয় বালাবান্ধব শ্রীঅতুল চম্পটি মহাশয় বেলা প্রায় তিনটার সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন—দুই বন্ধুতে বেশ কথাবার্ত্তা হইতেছে; নিত্যানন্দের হাতে গড়গড়ার নল। চম্পটী বলিলেন—দেখ্ বিপিন! তোর মরবার ভাবনা নাই।' নিত্যানন্দ—'কেন রে! একথা বলছিস্?' চম্পটী—'তোর স্ত্রী-পুত্র আছে, মরবার সময়ে মুখে জল দিবে। আর আমার ত কেউ নেই, মরবার সময় জলও পাব না।' এই কথা শুনিয়াই তিনি হাত হইতে গড়গড়ার নল ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—'বলিস্ কিরে চম্পটী? নিত্যানন্দদাসেরা হরি বলবে আর মরবে।' এই কথা বলিয়াই তিনি দেহ ছাড়িয়া দিলনে। চম্পটী ঘরের বাহির হইয়া তুলসীর টব্ (ভাণ্ড) খুঁজিতে গেলেন।·········ইতঃপর চম্পটী মহাশয় প্রায়ই বলিতেন—'বিপিন আমার গালে চড় মারিয়া কেমন করে মরতে হয় দেখাইয়া গেল।'

অপ্রকট বাসর—১৩৩০ বঙ্গাব্দ মাঘী গৌণী কৃষ্ণাষ্টমী।

শ্রীশ্রীরাধারমণচরণ দাস দেব

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল সব্‌ডিভিসনের নিকটবর্ত্তী মহিষখোলা গ্রামে শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া পত্নী কনকসুন্দরীর গর্ভে ১২৬০ সালের ২৯শে চৈত্র সংক্রান্তিতে শ্রীযুক্ত রাইচরণ ঘোষ মহাশয়ের আবির্ভাব হয়। বাল্যকালে ইনি নড়াইল স্কুলে পড়িতেন, চঞ্চল-প্রকৃতি হইলেও কিন্তু প্রতিশ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। উদ্ধত হইলেও সর্ব্বদা পরহিতে রত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ইনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন—ভিখারী বৈষ্ণবদের গান শুনিতে আগ্রহ থাকিলেও কিন্তু তাহাদিগকে ঠাট্টাও করিতেন। পরের অনিষ্টচেষ্টা, কোনও ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ, গল্পচ্ছলেও পরের কুৎসারটনা ইত্যাদি আবাল্য তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। সপ্তদশ বর্ষকালে ইনি শ্রীমতি স্বর্ণময়ীর পাণিগ্রহণ করেন—ইহার গর্ভে একটি পুত্র হইয়া ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমে পরলোক প্রাপ্তি করেন। ক্রমশঃ তিনবার দারপরিগ্রহ হইল। ঘোড়াখালী নিবাসী-বদন সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা ত্রৈলোক্যতারিণীকে বিবাহ করিয়া তত্রত্য জমিদারীর কার্য্য-পরিচালনা-উপলক্ষে ইনি মহিষখোলার বাড়ী ছাড়িয়া ওখানেই বাস করিলেন এবং খুলনা জেলার মুলঘর-নিবাসী শ্রীযোগেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইলেন। তখন তিনি জলাভাব দূরীকরণের জন্য পুষ্করিণী খনন, বালকগণের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়-স্থাপন, নিজগৃহে দোল, রাস, ঝুলন, চড়ক ইত্যাদি পর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি-ভোজন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানও করিতেন। মার্জ্জিত বুদ্ধি, নিরপেক্ষতা ও কার্য্য-দক্ষতা দেখিয়া মামুদপুর কাছারীর নায়েব এই রাইচরণ বাবুকে জমিদার মহাশয় সাতর পরগণায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করিলেন। তিনি কিন্তু এই সময় উদাসীন পথ ধরিতেই উন্মুখ হইলেন—জমিদারী

কার্য্যে ক্রমশঃ শৈথিল্য আসিল ; তথাপি জমিদারের বিশেষ অনুরোধে একবার প্রজাবিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া ইনি হুকুম দিয়া বিপক্ষের জমি হইতে আশুধান্য কাটিবার ব্যবস্থা করিলেন। ধান্য কাটা হইলে তিনি তাহা দেখিয়া প্রজাদের ভাবী কষ্টের কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সেই দিনই গৃহত্যাগ করত বগুড়া জেলার ভবানীপুর কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সূর্যগ্রহণোপলক্ষে মন্ত্রপুরশ্চরণ করিলেন। কালীমাতা প্রত্যক্ষ হইয়া ইহার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্বক আশীর্ব্বাদ করত বলিলেন—'তোর মনোভীষ্টপূরক গুরু তুই সরযুতীরে পাইবি—সেইখানেই যা, সে তোর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।' দেবীর মুখে তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি শুনিয়া ইনি দিবারাত্র পথ চলিয়া অযোধ্যায় সরযুতীরে সেই গুরুর সাক্ষাৎকার ও তাঁহা হইতে স্বাভীষ্ট মন্ত্র লাভ করিলেন। শ্রীগুরুদেব উপদেশ করিলেন—"নিন্দাশূন্য হৃদয়ে নম্রভাবে স্থাবর জঙ্গল সকলকে প্রণাম ও বন্দনা করিবে। জগতে দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থনিচয় শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ জানিবে। নিজেকে তৃণ হইতেও নীচ মনে করিয়া সর্বসাধারণ জীবকে উচ্চজ্ঞানে সম্মান করিবে। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবাই প্রধান ধর্ম মনে করিয়া আচরণ করিবে। শাস্ত্রে, শ্রীমূর্ত্তি, নাম, গুরু এবং বৈষ্ণব---ইহাদিগকে এক বস্তু জানিতে হইবে। কৃষ্ণে অর্পিত বস্তু মহাপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিবে। মহাপ্রসাদ স্পর্শদোষে নষ্ট হয় না। কায়মনোবাক্যে প্রাণি-মাত্রে উদ্বেগ দিবে না। অবিচারে নিরপেক্ষভাবে নিজ ভক্তিযাজন করা প্রয়োজন। লোকাপেক্ষা করিলে প্রকৃত ধর্মযাজন হয় না। যথালাভে সন্তুষ্ট হইবে। মর্কট বৈরাগ্য করিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করিবে না। নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু। কলিকালে উচ্চসংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণারাধনাই শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা" এইভাবে শ্রীগুরুদেবের নিকট যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ইনি অবগত হইয়া

তদাজ্ঞানুসারে তীর্থপর্যটনপূর্বক শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিলেন। তাঁহার নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ তখন হইলেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মনঃশিক্ষা, প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

নবদ্বীপে আসিয়া তিনি মণিপুর রোডে শ্রীজগদানন্দ দাস বাবাজীর বাটীতে আশ্রয় লইলেন। বাবাজি মহাশয় তাঁহার নাম 'রাইচরণ' শুনিতে রাজেন শুনিলেন—তদবধি তিনি 'রাজেন বাবু' নামেই পরিচিত হইলেন। এই সময়ে শ্রীনৃসিংহদেবের আখড়ায় শ্রীনবদ্বীপ দাস-নামক জনৈক ভক্তের আগমন হয়, তিনি রাজেন বাবুর সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় দুইজনে প্রেমানন্দে আত্মহারা ও প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া অশ্রুকম্পাদি ভাব-ভূষণে ভূষিত হইলেন। তৎপরে উভয়ে একত্র 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ' ইত্যাদি গান করিতে করিতে শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে ছুটিলেন—দ্বিপ্রহর-কালে পরিক্রমাদি করিয়া দুই জনে ধূলিধূসরিত অঙ্গে বাসায় আসিলেন এবং স্নানাদি সারিয়া রন্ধন করত প্রসাদ পাইলেন। নবদ্বীপ দাস রাজেন বাবুর প্রেমে বন্দী হইয়া গেলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু লোকের অনুরোধে তিনি সাত দিনের জন্য ছুটি নিয়া দেশে গিয়া কার্য্যস্থল হইতে অবসর হইয়া একেবারে নবদ্বীপে আসিলেন। তৎপরে আবার কৃষ্ণগোবিন্দ ও রাসমোহন আসিয়া ইঁহাদের সহিত মিলিলেন।

রাজেন বাবু বড়ই সখ্যভাবপ্রিয় ছিলেন—'দাদা' ভাই' সম্বোধন করা ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। গুরুবুদ্ধিতে তাঁহার নিকট গেলেও কেহ দাদা ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন না। রাজেন বাবু মুখে মুখে পদরচনা করিতে সিদ্ধ ছিলেন। মনে ভাব আসিল, আর মুখে পদগুলি স্বরে তালে গীত হইতে থাকিল। ইঁহার মুখে গান শুনিয়া নবদ্বীপে বহুলোক ইঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

রাজেন বাবু অজ্ঞাত প্রেরণায় শ্রীনীলাচলে যাত্রা করিলেন—সঙ্গে

নবদ্বীপ দাস, কৃষ্ণগোবিন্দ ও রাসমোহন। সর্ব্বপথে কীর্ত্তনানন্দ চলিতে লাগিল—যখন ইনি শ্রীসাক্ষীগোপালে উপস্থিত হইলেন, নিশীথকালে স্বপ্নাবেশে দুইজন মহাপুরুষের দর্শন পান এবং তন্মধ্যে কাশ্মীরগৌরবর্ণ পুরুষ ইঁহার কর্ণে দ্বাবিংশাক্ষর সিদ্ধ গৌরমন্ত্র দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন ইনি 'হা নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—ইঁহার তাৎকালীন প্রেমোন্মত্ত অবস্থা ভাষায় বর্ণনা হয় না। ক্রমে শ্রীনীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনানন্দ লাভ করিয়া ইনি পরে অযাচিতভাবে সমানীত মহাপ্রসাদের সম্মান করিলেন—তত্রত্য যাবতীয় উৎসবাদি প্রেমভরে দর্শন করিলেন, তাহাতে কীর্ত্তনোৎসব, নৃত্যোৎসবাদি অবিরত চলিতেছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথের জগমোহনে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন ছিল, তাহাতে জনতার চলাচল দেখিয়া ইঁহার প্রাণে দারুণ কষ্ট হয় এবং তত্রত্য রাজাকে বলিয়া ঐ পাদপীঠখানি ইনি উত্তর দরজার নব নির্মিত ক্ষুদ্র মন্দিরে স্থানান্তরিত করিয়া স্বসেবক শীতল দাসকে সেবায় নিযুক্ত করিলেন। একদিন সিংহদ্বারে কীর্ত্তনাবসরে নোয়াখালী জিলার জনৈক শ্রীগৌরচরণ চক্রবর্ত্তী-নামক ব্রাহ্মণযুবক আসিয়া ইঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন—ইনি কিছুদিন তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া নারায়ণ ছাতার কর্ত্তা বাবাজির নিকট পাঠাইয়া ভেকাশ্রিত করাইলেন। তাঁহার বেশাশ্রয়ের পরে নাম হইল—শ্রীগোবিন্দ দাস।

বড় বাবাজি মহাশয় ও তাঁহার অনুগত ভক্তগণের নামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীজগন্নাথ-দর্শন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর গুণগান ও তাঁহার লীলানুশীলন ভিন্ন অন্য কাজ ছিল না। এই সময়ে আচারী সম্প্রদায়ের সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাসের সহিত ইঁহার আলাপ পরিচয় হয় এবং তখন হইতে বাসুদেব বাবা ইঁহার অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ইঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতে থাকেন।

কিছুদিন পরে ইনি কৃষ্ণগোবিন্দ দাসকে ডাকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—'দেখ ভাই, তুমি অবিলম্বে পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর। সময়মত আমার সঙ্গে দেখা হইবে।' কৃষ্ণগোবিন্দও শ্রীচরণধূলি লইয়া যাত্রা করিলেন, আর ইনিও শতমুখে তাঁহার গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আবার ইনি ২৫ জন সঙ্গী লইয়া গৌড়-দেশে আসিবার পথে ভুবনেশ্বরে রামবেহারা-নামক জনৈক দরিদ্র গোপকে সগণে দীক্ষা দিলেন। খণ্ডগিরিস্থিত ভগ্ন দেবদেবীমূর্ত্তি দেখিয়া ইহার আর্ত্তনাদে দারুণ ক্রন্দন, ভূমিতে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন হইতে থাকিলে জনৈক মহাপুরুষ আসিয়া সান্ত্বনা দেন এবং বিকলাঙ্গ দেবদেবীর চিত্র বা শ্রীমূর্ত্তিতেও তৎসান্নিধ্যসম্পর্কে বিচার করেন। যাজপুরে বিরজা-দেবীর দর্শন করিয়া পথে এক মত্তপকে উদ্ধার করত; রেমুণায় শ্রীগোপী-নাথের দর্শন করিলেন। তৎপরে ময়ূরভঞ্জ হইতে শ্রীপাট গোপী-বল্লভপুরে আসিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিলকপরিবর্ত্তনের কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। যথাসময়ে আবার মেদিনীপুর হইয়া ইনি কলিকাতায় আসিলেন—ইনি গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে উঠিলেন—সঙ্গীরাও স্নান করিতে জলে নামিলে ইনি একখানি গাড়ী ডাকিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিলেন—ইহারা ব্যতিব্যস্ত হইলে জনৈক ভদ্রলোক বলি-লেন—'তিনি কোনও অনির্দিষ্ট স্থানে গিয়াছেন, নবদ্বীপধামে সময়মত দেখা হইবে।' ইনি এই সময়ে আবার সরযূতীরে শ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ করেন এবং জীবনের বহু সমস্যা তদুপদেশে মিটাইয়া শ্রীবৃন্দাবনাদি পর্য্যটন করত আবার নবদ্বীপে আসেন। এইবার তিনি শ্রীপাদ গৌরহরি দাস মহান্ত মহারাজের নিকট বেশাশ্রয় করেন এবং নাম হইল—শ্রীরাধারমণ চরণ দাস। কয়েকদিন পরে আবার ইহার সহিত চৈতন্যদাসের মিলন হয়, শ্রীমহাপ্রভুর ইঙ্গিতে ইনি তাঁহাকে দীক্ষা

দিয়া আত্মসাৎ করেন। ক্রমে রাধাবিনোদ ও কিশোরীগোপাল দাস প্রভৃতি আসিয়া ইঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

একদিন মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে কীর্ত্তন লইয়া ইনি বাহির হইলে একটি মেয়ে কুকুর ইঁহার সঙ্গ ধরিল—কুকুরটি কীর্ত্তন-স্থানে গড়াগড়ি দিতে দিতে ইঁহার সঙ্গেই চলিল—ইনি তাহাকে 'ভক্তি মা' বলিয়া ডাকিতেন—বাস্তবিকই উহা ভক্তিমতী ছিল—কিছুদিন পরে কুকুরটি অন্তিমদশা প্রাপ্ত হইলে সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—ভক্তিমা নাম শুনিতে শুনিতে রজঃলাভ করিলে জাহ্নবী-জলে সমাহিত করা হইল। চতুর্থ দিবসে ভক্তিমার চিঁড়ামহোৎসব হইল—চতুর্দশ দিবসে যথারীতি বৈষ্ণবসেবার আয়োজন হইলে পর দিন বড় আখড়ার বৈষ্ণবগণকে মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ করা হইল। ইঁহার ইঙ্গিতে নবদ্বীপ দাস ধামের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভক্তিমার সজাতীয় কুকুর দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ হইয়া গলায় কাপড় দিয়া মহোৎসবের নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। তৎপরদিন প্রাতঃকাল হইতে মহোৎসবের রান্না হইতে লাগিল—বেলা দ্বিপ্রহর হইলে বৈষ্ণবগণ কুকুরের মহোৎসব জানিতে পারিয়া কেহ আসিলেন না—অনেক সাধ্যসাধনাও ব্যর্থ হইল, বিরুদ্ধে বহু সমালোচনাও চলিল। বেলা অবসান হইতে থাকিলে দলবদ্ধ হইয়া কুকুর আসিতে লাগিল—কুকুরদের ঝগড়া নাই, অথচ সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়া গেল। বাবাজি মহাশয় গললগ্নীকৃতবাসে বিনীতভাবে কুকুরদিগকে অনুমতি করাইয়া পাতা দেওয়াইলেন—বড় গামলায় ডাল, তরকারী, অন্ন, দধি ইত্যাদি একত্র মাখিয়া পরিবেশন হইল। হরিধ্বনি ও উলুধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইল—কুকুরগুলি বসিয়া রহিল, কেহই পাতায় মুখ দিল না—পরিবেশন শেষ হইলে বাবাজি মহাশয় করযোড়ে বলিলেন—'তবে আপনাদের বসিতে আজ্ঞা হউক।' তখনই একটা কাল কুকুর আসিয়া সকলের পাতার মহাপ্রসাদের আঘ্রাণ

লইয়া গেল—তৎপরে সকলেই মহাপ্রসাদ পাইতে লাগিল। নূতন কুকুরের জন্য নূতন পাতা হইতে লাগিল—কুকুরদের মুখে শব্দ নাই। পরিবেশকগণ প্রত্যেকের সম্মুখে মহাপ্রসাদ যাচিয়া বেড়াইতেছেন; যাহার ভোজন শেষ হইল, সেই মুখ ফিরাইয়া রহিল। ইহারা মাটির গ্লাসে জল পান করিল, বাবাজি মহাশয় সকলের অধরামৃত তুলিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং নবদ্বীপ দাস উঁহাদের চরণামৃত নিলেন। বাবাজি মহাশয়ের ইঙ্গিতে আবার তাহারা স্বস্বস্থানে চলিয়া গেল। এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারে কেহই স্থির থাকিতে না পারিয়া উঁহাদের চরণামৃত ও অধরামৃত পাইয়া উচ্ছিষ্ট পাতার উপরেই গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

এইরূপ লীলাবিনোদ করিতে করিতে ইনি নবদ্বীপবাসী বহু ভদ্রলোককে আকৃষ্ট করিলেন—তত্ত্বকথায়, উপদেশ, সস্নেহ ব্যবহারে সকলের মন প্রাণ হরণ করিলেন। এইভাবে কৃষ্ণনগরে যোগেশ বাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তনাবেশে ইঁহার দুটি চরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া শানের উপর পড়িয়াছিল—দিগ্‌নগরে কল্পবৃক্ষের নৃত্য হইয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল। ইনি অসংখ্য লোকের দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি নিজে লইয়া তাহাদিগকে নীরোগ করিতেন। প্লেগের সময় ইনি কলিকাতায় উপস্থিত থাকিয়া মহাসঙ্কীর্ত্তন বাহির করিয়াছিলেন—তখনকার উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনে আবালবৃদ্ধ-বনিতা, জাতি ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে মাতিয়াছিল।

এইভাবে ইনি ১৩১২ সাল পর্যন্ত ভারতের নানা দেশে পর্য্যটন করত শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নামগুণ-লীলাগানে অসংখ্য ভগবদ্‌বিমুখী, নাস্তিক, অসচ্চরিত্র, মদ্যপায়ী, জীবহিংসক, দেবদ্বিজ-গুরুবৈষ্ণবদ্বেষী, মায়ামুগ্ধ ঘোর পাষণ্ড জীবাধমগণকে ভগবদুন্মুখী এবং বিশুদ্ধ পথের পথিক ও ধার্মিক করিয়াছেন। ইঁহার ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যমণ্ডিত রসাল চরিত্র পরমপূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি মহোদয় ছয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ তাহা আস্বাদন করিবেন।

সূচক-কীর্ত্তন

জয় রে ! জয় রে ! জয়, শ্রীরাধারমণ জয় !
প্রেমদাতা রসের সদন।
কিবা সে কোমল তনু, শিরীষ কুসুম জনু,
প্রেমে ঢরঢর দু নয়ন ॥
পিরীত মূরতি মানি, শ্যামল বরণখানি,
পুলক-কদম্ব অঙ্গে শোভা।
সাত্ত্বিক বিকার যত, ক্ষণে ক্ষণে সুবেকত,
ভাবাবলী জগমন-লোভা ॥
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
নাম গানে সদাই বিভোর।
সুমধুর নৃত্য রঙ্গ, আবেশে অবশ অঙ্গ,
সবাকারে ধরি দেয় কোর ॥
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,
আর যত যত ভক্তিগ্রন্থ।
সকল ভকত সঙ্গে, আলাপ করয়ে রঙ্গে,
লীলাকথা ভকতি-সিদ্ধান্ত ॥
রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন, সঙ্গে পারিষদগণ,
প্রাণনাথ পাইনু বলি কাঁদে।
যত নীলাচলবাসী, কিবা গৃহী কি উদাসী,—
যে হেরে সে পড়ে প্রেম-ফাঁদে ॥
কি সুন্দর রূপঠাম, নীলাচলবাসী-প্রাণ,
সদাই বিহরে নীলাচলে।

কভু নদীয়া নগরে, কথনও বা ব্রজপুরে,
সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে সদা ফিরে ॥
গৌরাঙ্গ-বিলাসস্থান, যত যত তীর্থ ধাম,
ভারতের নানা স্থানে বুলে।
করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন, মাতাইল জগজন,
ডুবাইল প্রেমের সাগরে ॥
সুখ ভোগ তেয়াগিয়ে, পথের ভিখারী হ'য়ে,
ফিরে প্রভু নগরে নগরে।
আচণ্ডালে দিয়ে কোল, বলে নিতাই গৌর বোল,
বিকাইয়া যাব বিনা মূলে ॥
অসাধনে গুণনিধি, আনি মিলাওল বিধি,
জীব লাগি কাঁদয়ে সদাই।
মহাপাপী তাপী দেখি, সদা সকরুণ আঁখি,
কোল দিয়ে বলে ভয় নাই ॥
কেন জ্বালায় জ্বলে মর, মোর নিবেদন ধর,
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
সকল সন্তাপ যাবে, ব্রজে যুগল সেবা পাবে,
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥
প্রভু মোর নিজ গুণে, পতিত পাষণ্ড জনে,
অবিচারে প্রেম দান করে।
কি বলিব অদভূত, পশু পাখী শিশু কত,
নাচাইলা প্রেমের হিল্লোলে ॥
বৈষ্ণব কি অবৈষ্ণব' কি নিন্দুক কি বান্ধব,
কিবা যোগী জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত।

কি ভিখারী কিবা ধনী, মুরখ বিদ্বান্ মানী,
গৃহী কিম্বা বিষয়-বিরক্ত ॥
কি হিন্দু, ম্লেচ্ছ, যবন, কি ভক্ত, অভক্তাধম,
সবা প্রতি সম ব্যবহার।
সুমধুর সম্ভাষণে, তোষে সদা প্রতি জনে,
প্রভু মোর দয়ার আধার ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে নিরূপণ, কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন,
বিনা জীবের অন্ত গতি নাই।
ইহা দেখাবার তরে, ব্রজের কৃষ্ণ হলধরে,
নদেয় হ'ল গৌরাঙ্গ নিতাই ॥
জীবত্রাণ-কারণ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
জীবে বুঝাইতে গৌরহরি।
আপনি সন্ন্যাসী বেশে, ফিরে প্রভু দেশে দেশে,
ভাই নিত্যানন্দ সঙ্গে করি ॥
সেই হরি সঙ্কীর্ত্তন, ভুলেছিল জগজ্জন,
নানা মতে মুগধ হইয়া।
প্রভু মোর রাধারমণ, সদাই দুঃখিত মন,
জীবের ঐ দুর্দ্দশা দেখিয়া ॥
তাই প্রভু কাঙ্গাল বেশে, ফিরি ফিরি দেশে দেশে,
নাম প্রচার কৈলা ঘরে ঘরে।
কীর্ত্তনে অদ্ভুত শক্তি, যাতে মিলে প্রেমভক্তি,
সাক্ষাৎ দেখাইলা এ সংসারে ॥
কিবা অপরূপ লীলা, সঙ্কীর্ত্তনে গলে শিলা,
পদ-চিহ্ন তাহে পড়িয়াছে।

কৃষ্ণনগরেতে যাই, প্রত্যক্ষ দেখহ ভাই,
সাক্ষী লোক বিদ্যমান আছে ॥
দিগ্‌নগরে সঙ্কীর্ত্তনে, বৃক্ষ পঞ্চবটী বনে,
ডাল পালা পুলকেতে নাচে।
সঞ্চারিলা নিজ শক্তি, স্থাবরে দিলা প্রেমভক্তি,
দেখি লোক কৃপাকণা যাচে ॥
নরোত্তমের প্রাণকান্ত, শ্রীশ্রীরাধা রাধাকান্ত,
ঝাঁজপিঠায় পুনঃ সংস্থাপন।
আনি বন্দী-ঘর হ'তে, সেবা করে কতমতে,
যাহা দেখি মুগ্ধ সর্ব্বজন ॥
আর এক অপরূপ, রসময় রসভূপ,
শ্রীলরাধাবিনোদ ঠাকুর।
ব'লেছিলা স্বপ্নছলে, ল'য়ে চল নীলাচলে,
সেবা-সুখ ভুঞ্জিব প্রচুর ॥
আমার হৃদয়ের ধন, প্রাণ রাধারমণ,
সর্ব্বদা থাকিব তাঁর কাছে।
করিবে সে নিতি নিতি, প্রেম-সেবা পরিপাটী,
বহু দিন এই সাধ আছে ॥
স্বপ্নাদেশে ব্রহ্মচারী, অনেক যতন করি,
নীলাচলে কৈল উপনীত।
এ সমস্ত বিবরণ, শুনি প্রভু রাধারমণ,
বিনোদ-সেবা করিল স্থাপিত ॥
শ্রীটোটা গোপীনাথে, হরিদাস-সমাধিতে,
কৈলা বহু সেবার বিধান।

জগতের হিতকারী, জগজন-তাপহারী,
প্রভু মোর জগতের প্রাণ ॥
কটক নগরে যেবা, শ্রীরাসবিহারী সেবা,
দীন ভাবে ছিল অবিদিত।
নিজে প্রভু সেবা দ্বারে, জানাইলা এ সংসারে,
সেবা রীত যাহে ভক্ত হিত ॥
নদীয়ার হরিসভা, যথা জগজন-লোভা,
প্রেমে নাচে গৌর নটরাজ।
ভেট প্রথা করি নাশ, পুরাল সবার আশ,
তুষ্ট কৈলা ভকত-সমাজ ॥
হিতব্রতী দানবীর, কৃপালু বিনয়ী ধীর,
গুণ যত কি বলিতে পারি।
বিষয় সংকুল ছিল, জীব লাগি তেয়াগিল,
ভ্রমে পথে হইয়া ভিখারী ॥
রাধারমণ দাসে কয়, সাধ যেন পূর্ণ হয়,
সবার চরণে নিবেদন।
আমার অন্তিমকালে, হা রাধারমণ! ব'লে,
সুখে যেন যায় এ জীবন ॥

—•—

শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি মহারাজ

(শ্রীরাধারমণবাগ, শ্রীনবদ্বীপ)

ফরিদপুর জিলায় পালং থানার অধীন কোঁয়ারপুর নামক বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রামে শ্রীরামকানাই গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্তের বাস। ইঁহার গৃহে দোল, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজাদি প্রতি বৎসর আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইত, তদ্ব্যতীত শ্রীঅনন্তদেব শালগ্রামের নিত্য পূজার ব্যবস্থাও ছিল। দুর্গাচরণ বাবু ফরিদপুর সহরে আবগারী দারগা ছিলেন, তজ্জন্য এখানেও একটি বাসাবাড়ী ছিল। দুর্গাবাবুর ঔরসে ও সত্যভামা দেবীর অষ্টম গর্ভে এই ফরিদপুরের বাড়ীতে ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ২২শে চৈত্র কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে শ্রীরাধিকাচরণ গুপ্তের আবির্ভাব হয়। কথিত আছে যে ইঁহার জন্মকালে পদদ্বয় অগ্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। বহুদিন হইতে এই পরিবারে লালিত পালিত ধাইমা ও তৎকন্যা শ্যামা ইঁহাকে ও অন্যান্য ভ্রাতা ভগ্নীকে লালন পালন করিতেন। তাঁহারা ধাইমাকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন এবং ইঁহার দেহরক্ষার পরে এই বালকগণ রীতিমত একমাস অশৌচ পালন করিয়া বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই রাধিকা সঙ্গীতপ্রিয়, গান-বাদ্যধ্বনি শুনিলেই তিনি শ্যামার কোলে চাপিয়া সেই স্থানে যাইতেন এবং অনন্যভাবে শ্রবণ করিতেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও তিনি এ স্বভাব ছাড়িলেন না।

যথাসময়ে হাতে খড়ি হইলে ইনি তত্রত্য হিতৈষী বঙ্গবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া প্রতিবৎসর সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিতেন—শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়া একবার শুনিলেই তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। জীবের কষ্ট দেখিলে ইনি প্রাণে দারুণ ব্যথিত হইতেন এজন্য দেবীর সম্মুখে ছাগবলি বা মহিষবলির সময় ইঁহাকে অন্যত্র রাখা

হইত, একবার ইনি বলির পরে রক্তাক্ত স্থান দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্ছিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে বলি বন্ধ হইয়া যায় এবং ১২৯৮ সাল হইতে দুর্গোৎসবাদি উঠিয়া যায়।

ইঁহার তৃতীয় ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন সহপাঠীদের সঙ্গে একটি কীর্ত্তনের দল গঠন করিয়াছিলেন। ইনিও তাহাতে যোগদান করিতেন এতদ্-ব্যতীত পাড়ায় কোথাও যাত্রা, থিয়েটার কি নৃত্য গীত হইলে ইনি আগাগোড়া অনন্যভাবে শুনিতেন। বাল্যকালেই ইনি ফিকির চাঁদ ফকিরের শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানগুলি শুনিয়া শুনিয়া আয়ত্ত করিয়া আবার নিজেই গান করিতেন। মতিরায়ের যাত্রার লক্ষ্মণবর্জন-প্রসঙ্গে ঊর্মিলার একখানি গান শুনিয়াই তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া তৎপর-দিন আপন মনে গাহিতে থাকিলে গোপালচন্দ্র দাস চমৎকৃত হইয়া বলিলেন 'একেবারে ফটো তুলে এনেছিস্ !!' একবার ইনি স্বগ্রামে থিয়েটারে 'নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা' ইত্যাদি গান গাহিয়া সমবেত জনতার মনোমোহন করিয়াছিলেন। ইঁহার চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীবীরেশ্বর গুপ্ত নামকীর্ত্তন করিতে থাকিলে, ইনিও তাঁহার সহিত যোগদান করিতেন।

১২৯৬ সালের আষাঢ় মাসের দারুণ ঝড়ে ইঁহার জ্যেঠামহাশয় ঘর-চাপা পড়েন—ইনি অসীম সাহসে একাকী সেই ঘর হইতে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া অন্য ঘরে আনিয়া প্রাণে বাঁচাইয়াছিলেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু তখন ফরিদপুরে ছিলেন। যে দিন রাধিকা থিয়েটারে গান করেন, সেইদিন প্রভু তাঁহার কণ্ঠে গান শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তদবধি এই বালকের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। একদিন বঙ্গবিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী বটতলায় তিনি বসিয়া রহিলেন প্রায় সাড়ে নয়টায় বিদ্যালয়ের পাশে ছেলেরা খেলিতে থাকিলে প্রভুর আকর্ষণে ইনি

তাঁহার নিকটে গেলেন এবং বন্ধুর অপ্রাকৃত রূপলাবণ্যে ও বাক্য-ভঙ্গীতে অলক্ষিতভাবে তাঁহাকে যথাসর্বস্ব সমর্পন করিয়া শূন্যমনে বিদ্যালয়ে আসিলেন। দর্শনাবধি বন্ধু তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন এবং পুনর্দর্শনাশায় তীব্র উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইহার পরে প্রভুর সহিত দুই তিনবার দেখা সাক্ষাৎ হয়, প্রভুর মুখে ধ্রুব প্রহ্লাদাদির চরিত-কীর্ত্তন শুনিয়াছেন। প্রভু নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থতলায় বসিয়া বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন, আবার বামনকান্দায় কীর্ত্তনে প্রভুকে আবেশে খোল বাজাইতে দেখিলেন। প্রভুর খোলবাদ্যে এমন এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে নেটা হাতে বাজাইলেও দশখানা খোলের শব্দ হইত।

একবার বাঁকচরে প্রভু স্নানে যাইতে ইঁহাকে তাঁহার কাপড় লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং ঘাটে উপস্থিত হইয়া প্রভু বলিলেন—'এই স্থানে দাঁড়ায়ে থাক, আমি স্নান করিয়া উঠিলে তুমি যেন আমার চোখের দিকে চাহিও না।' প্রভু সবস্ত্র জলে নামিয়া কিছুক্ষণ জলে দাঁড়াইয়া আবার নিষেধ করিলেন—'খবরদার আমার চোখের দিকে চাহিও না।' এ কথা শুনিয়া তিনি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধু না উঠাতে ইনি চিন্তিত হইয়া ঐ দিকে তাকাইলে প্রভু উঠিলেন। ইনি তাঁহার চোখের দিকে চাহিবামাত্রই তাহা হইতে যেন একটি অগ্নিগোলক বাহির হইয়া ইঁহার দিকে আসিতে আসিতে সেই জ্যোতিতে ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বাহ্যস্মৃতিরহিত হইলেন। প্রভু তীরে উঠিয়া কাপড় পরিয়া ইঁহাকে গৃহে নিয়া গেলেন এবং আবার দুইজনে ফরিদপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১২৯৭ সালের পৌষমাসে রাধিকাচরণ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলে অভিভাবকগণ পরামর্শ করিয়া লোন আফিসের নিকট একটি টোলে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে ভর্ত্তি করাইলেন। ইনি

কিন্তু টৌলে না গিয়া প্রত্যহ প্রভু জগদ্বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তনাদি করিতেন এবং অপরাহ্নকালে গৃহে ফিরিতেন। এই সময় হইতে তিনি স্নানান্তে ধ্যান করিতেন, প্রত্যহ এক ছটাক নালিতা পাতার রস ও এক তোলা গোময় খাইতেন। ভোজ্যদ্রব্য নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করিতেন না। এইভাবে প্রভুর উপদেশমত চলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় প্রভু বন্ধু তাহাকে 'সারিকা' বলিয়া ডাকিতেন, পরে বৃন্দাবনে গেলে 'রামা, বা 'রামী' বলিতেন। [কথিত আছে যে প্রভু বন্ধু 'রাধিকা' নাম উচ্চারণ করিতেন না।]

তদবধি বন্ধুর নামপ্রেমবিতরণ-কার্য্যে ইনি সহায়ক হইলেন—সকালবেলা টহল কীর্ত্তন করিতেন, পাড়ার প্রতি ঠাকুরকে নিত্য দণ্ডবৎ প্রণতি করিতেন—তুলসীকে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করিতেন রীতিমত সাধন-ভজনে আবেশ আসিল। বুনোদের উদ্ধার-প্রসঙ্গে এই মহাপুরুষকে প্রভু বন্ধুর সহায়করূপে দেখা গিয়াছে। ইহার মুখে কীর্ত্তন শুনিয়াই উহারা প্রথমতঃ আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমে ক্রমে নিজেদের যাবতীয় অনাচার, মদ্যপান ইত্যাদি ছাড়িয়াছিল—খৃষ্টানদের প্রলোভনেও আর স্বধর্মচ্যুত হইল না—প্রভুর সাদর নিমন্ত্রণে ও প্রেমময় ব্যবহারে তাহারা বন্ধুভক্ত হইয়া চিরজীবনের তরে ঐ চরণে বিক্রীত হইল। ১২৯৮ সালে ফরিদপুরে যে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল—যাহাতে স্কুল কলেজের ছেলেরা, অফিসের বাবুরা, দোকানীরা, এক কথায় আবালবৃদ্ধবনিতা যোগদান করিয়াছিল—যাহাতে ৭২ খানা খোল ও ৭২ জোড়া করতালি বাজিতেছিল এবং এক মাইল ব্যাপী সংকীর্ত্তনদলের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনসহ শোভাযাত্রা চলিতেছিল, সেই সময়ে বন্ধুর প্রধান সহায়ক ছিলেন—এই রাধিকাচরণ। ইনি প্রভুর ইঙ্গিতে অবিশ্রান্তভাবে গান করিতেছিলেন আর সহস্রকণ্ঠে তাঁহার প্রতিধ্বনি হইতেছিল। এদিকে পিতা ও ভ্রাতারা

ইঁহার লেখাপড়ায় অমনোযোগ এবং প্রহার, তিরস্কারাদি সহিয়াও প্রভুর সহিত অবাধ মিলন দেখিয়া ইঁহাকে বরিশালের এক টোলে পাঠাইয়া দিলেন। অনিচ্ছাসত্বেও ইনি বরিশালে গেলেন বটে, কিন্তু বন্ধুর বিরহে ইনি সামান্য জ্বরের ছলে ফরিদপুরে আসিয়া আবার সেই টোলে পড়িতে গেলেন। প্রভু তখন শ্রীবৃন্দাবনে; বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে ইনি আবার প্রভুর সহিত মিলিয়া পাবনায় গেলেন—দীনবন্ধু বাবাজির আশ্রমে থাকিয়া দুইজনে সহরের মধ্যে নামপ্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি তত্রত্য হারাণ ক্ষেপার সহিত মিলিত হইলেন। এই ক্ষেপা একজন সিদ্ধ পুরুষ—বন্ধু ইঁহাকে 'বুড়ো শিব' বলিতেন। এইরূপে বাকৃচরেও প্রভুর বিবিধ লীলার সাথী ও সাক্ষী ছিলেন—এই রাধিকাচরণ।

১৩০০ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গ্রহণোপলক্ষে বন্ধুসহ ইনিও শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিলেন। তখনকার বৈষ্ণবগণ প্রায় সকলেই শ্রীধামে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী, শ্রীব্রজবালা, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, শ্রীহরিবোলানন্দ স্বামী প্রভৃতি বহু ভক্তের সমাগমে ও কীর্ত্তনে নবদ্বীপ আনন্দে মাতিয়াছিল।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের পূর্বদিন রাত্রে বন্ধুর ইঙ্গিতে ইনি তিন জন ভক্তসহ পোড়ামার তলায় গিয়া অলক্ষিতে দেবদেবীগণের নৃত্যগান দর্শন শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাৎকালীন নবদ্বীপের আনন্দোৎসব আর ভাষায় বর্ণনা হয় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মতিথি, বার, নক্ষত্রাদির যেমন মহাসম্মিলন ঘটিয়াছিল, তদ্রূপ তদানীন্তন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গগনের যত যত উজ্জল জ্যোতিষ্ক ছিলেন, সকলেই সমবেত হইয়া দিবানিশি কীর্ত্তনানন্দ, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতির মহামহোৎসব চালাইয়াছিলেন। বুঝি বা সুযোগ বুঝিয়া অন্তরীক্ষ হইতে দেবদেবীগণও আবার জন্মতিথি পূজা করিতে অবতরণ করিয়াছিলেন !!

বহু দিন পরে আবার গৃহে অবস্থানকালে প্রভু বন্ধু প্রতাপচন্দ্র ভৌমিকের হস্তে ১০৲ টাকা পাঠাইয়া পত্রে লিখিলেন—'শ্রীধাম নবদ্বীপ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবে। আমিও শীঘ্রই যাইতেছি। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দিরে থাকিবে ও মাধুকরী করিবে।' অভিভাবকগণ এ বিষয়ে গোপন করিলেও কিন্তু ইনি সকলের অলক্ষিতে ১৩০১ সালে ঝুলনের আগে গৃহত্যাগ করিলেন। সঙ্গে ছিল কেবল—পরিধানে একখানি বস্ত্র ও চাদর, একজোড়া করতালি, শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা। দারুণ রৌদ্রে ১৮ মাইল পদব্রজে দ্রুতগতিতে অতিক্রম করত রাজবাড়ী ষ্টেশনে গাড়ী ধরিয়া কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে গেলেন এবং যথাসময়ে নবদ্বীপে হরিসভায় গিয়া ৩।৪ দিন থাকিয়া একেবারে শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। জনৈক বৃদ্ধা মাতার সহায়তায় শ্রীগোবিন্দের পুরাণ মন্দিরে গেলেন, কিন্তু তাঁহাকে পৌঁছাইয়াই বৃদ্ধা অন্তর্হিতা হইলেন। মনের মানুষের খোঁজ করিতে করিতে একদিন কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীব্রজবালার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। পতিতপাবন কুঞ্জে শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতীর সঙ্গী নৃত্যগোপাল, গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র ও হরিদাস প্রভৃতির সহিত পরে দেখা হইল। তারপরে হাতরাসে যাইয়া সপ্তমী পূজার দিন প্রভু জগবন্ধু আসিলে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় রাধাবাগে ছত্রিশগড় রাজবাড়ীতে থাকিলেন।

এই সময়কার কার্য্যক্রম—প্রত্যহ রাত্রি ৩ টায় গাত্রোত্থান করত শৌচাদি, যমুনাস্নান, একগ্লাস সিউলি পাতার রস পান, ৪ টায় আহ্নিকে উপবেশন, দ্বিপ্রহরে মাধুকরী, পরে আহার। ভোজনকালে সপ্ সপ্ শব্দ হইলে প্রভু বলিতেন—'লালসা হচ্ছে'। একদিন প্রভুর অলক্ষিতে গুড় খাইয়াছিলেন জানিয়া প্রভু শাসন করিলেন। তদবধি মিষ্টদ্রব্য ত্যাগ হইয়াছিল। এই সময়ে নারিকেলের চাটাইতে শয়ন করিতে

হইত, উপুড় হইয়া বা ঠেস দিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইতে হইত। ইট বা কাঠ ছাড়া বালিশাদি ব্যবহারের উপায় ছিল না। এক কথায় ভোজন, শয়নাদি সর্বাবস্থায় ইহাকে কঠোর সংযমের ভিতর দিয়া চলিতে হইত। একদিন কেশীঘাট হইতে ফিরিবার কালে এক বৃদ্ধা মাতা ইহার হাতে পাকা প্রসাদ দিলে প্রভু তাঁহার হাতের সেই প্রসাদকে দণ্ডবৎ করিয়া যমুনাজলে ভাসাইয়া দিলেন। এইভাবে দিবারাত্র তীব্র শাসনাধীন রাখিয়া বন্ধু বঙ্গদেশে আসার প্রাক্কালে ইহাকে আদেশ করিলেন 'বৃন্দাবনে থাক, মঙ্গল হবে'; ইনি কিন্তু তাঁহার সঙ্গ-লালসায় বলিয়া ফেলিলেন 'তবে থাকি।' চিরবান্ধবের মুখে 'তবে' কথাটা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—'ছি! চাঁদে কলঙ্ক!!' প্রভু বলিয়া দিলেন 'আমার চিঠি ছাড়া আর কারো চিঠি পড়ো না, অন্য চিঠি এলে দণ্ডবৎ করে যমুনায় ভাসিয়ে দেবে।' ইনিও আজ্ঞানুযায়ী আচরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে থাকাকালে এই সময়ে একবার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ৫০।৬০ মূর্ত্তি সহচর লইয়া সাহাজির মন্দিরের সম্মুখে আসিলেন—কীর্ত্তনে উল্লাস নাই দেখিয়া গোস্বামিপ্রভু দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি উত্তোলন করিয়া যেই মৃদুমন্দস্বরে 'হরিবোল' করিলেন, অমনি বৈষ্ণবগণ মত্তহস্তিবৎ আবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; এক ঘণ্টা মাতামাতি কীর্ত্তনের পরে আবার ঐভাবে অঙ্গুলিটি ঘুরাইয়া দিলে সকলের আবেশ কমিয়া গেল।

মাতা পিতা ইহাকে বানরে কামড়াইয়াছে খবর পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া ধরিলেন এবং ইনিও কয়েকদিন পরে কাশীধামে তাঁহাদিগকে লইয়া আসিলেন। দশ বার দিন পরেই আবার বৃন্দাবনে গেলেন। শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামিপ্রভুর গৃহে তখন অবস্থান করিতেন, ভজনে গাঢ়তর আবেশ আসিল—এই সময়ে গোপালচন্দ্র দাস গুপ্তের মুখে

প্রভু তাঁহার কাশীতে মাতাপিতাসহ অবস্থানের কথা জানিয়া দশ বার দিন উপবাস করেন, পরে বন্ধুর টাকা সহিত পত্র আসিল—'শীঘ্র কলিকাতা আসিবে। আমিও কলিকাতায় যাইতেছি।' পত্র পাইয়া তিনি আলমবাজারে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়ীতে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিলেন। আবার আনন্দের পাথার বহিল। কিছুদিন জোঁড়াসাকো থাকিয়া বন্ধুর সহিত ফরিদপুরে গেলেন এবং টহল দিতে দিয়া ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক গৃহে আবার বন্দী হইলেন। তখন সংসারে যেন বাহ্যাবেশ দেখা গেল এবং কয়েকদিন পরে আবার সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করত কলিকাতা চাষাধোপা পাড়ায় আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে বন্ধুভক্তগণের সহিত ইঁহার মতান্তর হওয়ায় ইনি বন্ধুর ইঙ্গিতে ওখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। ১৩০২ সালে কি তৎসম-সাময়িককালে ইনি পৌষমাসে কুলিয়ার পাটে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীরাধারমণের দর্শন পাইলেও তাঁহার সহিত সঙ্গ প্রসঙ্গাদি হয় নাই। তৎপরে কলিকাতার বিডন্ ষ্ট্রীটে মুকুন্দ ঘোষের দোকানে সাক্ষাৎকার হয়। তৎপরে আবার নবদ্বীপে পালগোবিন্দ বাবাজির বাড়ীর ছাতে **বড় বাবাজি মহাশয়**, জয় নিতাই, কিশোরী গোপাল, রাধাবিনোদ, গোবিন্দ দাদা প্রভৃতি সহ বিশ্রাম করত নীচে রাস্তায় নামিয়া মোড়ে দাঁড়াইয়া ইঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—'রাম ভাই! একটি নাম ধর।' তিনি সুললিত কণ্ঠে গান ধরিলেন—'হরি বলরে ভাই, গদাধর গৌরাঙ্গ বসু জাহ্নবা নিতাই' ইত্যাদি। অনুরাগমাখা প্রেমকণ্ঠের গান শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইলেন। সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া সকলে নৃত্য করিতে করিতে হরিসভায় গেলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর বড় বাবাজি মহাশয় মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করত বাসস্থানে আসিলেন। প্রেমকণ্ঠ রাম দাস তখন তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে তিনি প্রেমার্দ্রহৃদয়ে

তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন—'ভাই! আজ বড়ই সুখী করিলে। নিতাইচাঁদের চরণে প্রার্থনা করি—দিন দিন তোমাকে প্রেমধনে ধনী করুন।'' তৎপরে আবার কলুটোলায় পুলিন বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীরাধা-রমণের সহিত তাঁহার রীতিমত সঙ্গ হয়। ইতঃপূর্বে রামবাগানে থাকিতে বন্ধুর ইঙ্গিতে ইনি সিঙ্গুরের শ্রীভৈরবচন্দ্র গোস্বামিপ্রভু হইতে সবীজ শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীবড় বাবাজি ইহাকে আত্মসাৎ করিয়া শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর হইতে বিদায় আনিতে আদেশ করেন; বন্ধু তৎকালে 'কেমনে বিদায় দিব' ইত্যাদি সন্তাপীর আত্ম-নিবেদন'-শীর্ষক পদ্য লিখিয়াছিলেন।

কটকে অবস্থানকালে শ্রীরাধারমণ ইহাকে শ্রীগৌরমন্ত্রাদিতে দীক্ষিত করত সর্বশক্তি সঞ্চার করিয়া নামকীর্ত্তনে উন্মত্ত করেন। ১৩১২ সালে ফাল্গুনমাসে শ্রীশ্রীরাধারমণের অপ্রকট হইলে তদবধি সম্প্রদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব ইহারই স্কন্ধে আপতিত হয়। সগণ 'রাঘবের ঝালি'-বহন, রথাগ্রে নর্ত্তন-কীর্ত্তন, পাণিহাটি বৃক্ষমূলে কীর্ত্তন এবং শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভুর আগমনী উৎসবাদি ব্যতীত কত দেশে যে ইনি নাম প্রচার করিয়া কত বদ্ধ জীবকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রেমাবেশে 'নিতাই গৌর' বলিয়া বলাইতে, কাঁদিয়া কাঁদাইতে, ভজিয়া ভজাইতে এমনটি ত এ যুগে আর দেখাই যায় না। বস্তুতঃ 'অমানী মানদ' হইয়া নামযাজনে ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রেমভক্তি-বিনম্রচিত্তে যাবতীয় লীলাস্থলীর রজোগ্রহণ, তীর্থবারি স্পর্শন এবং দৃষ্টশ্রুতি বৈষ্ণবগণের কৃপাদানের অকুণ্ঠ স্মরণই ইহার সাধন-ভজন।

সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের সম্পর্কে ইনি শ্রীশ্রীরামহরি দাস বাবাজি মহাশয়ের 'নাতিচেলা' হন—এই জন্য তিনি ইহাকে পরম প্রীতি করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বা শ্রীগৌরপদাবলী গান করিতে থাকিলে ইনি তাঁহার 'দোহারকি' করিতেন। একবার

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রাজর্ষি বাহাদুরের প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে শ্রীমাধবদাস বাবাজি, শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজি, শ্রীরসিকদাস পণ্ডিত বাবাজি, শ্রীরামহরি দাস বাবাজি, শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধারমণ প্রভৃতির গোষ্ঠীতে ইনি তাঁহাদের কৃপাকর্ষণে প্রবিষ্ট হইয়া অনুমতিক্রমে তাঁহাদের আস্বাদ্য ও উন্মাদকর আখর-সম্বলিত 'যদি গৌরাঙ্গ না হইত' ইত্যাদি পদখানি গাহিয়াছিলেন—তাহাতে ভাবের প্রস্রবণ ছুটিয়াছিল—আনন্দের পাথার বহিয়াছিল। শ্রীরামহরি বাবা ইহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—'ভাই এই আমাদের প্রাপ্তি, যদি স্থায়ী কয়তে পারিস্, তবে মেরে নিয়েছিস্। [ব্রজবালা-প্রসঙ্গ ৩৯৭-৯৮ পৃঃ]।

১৩১৪ সালে শ্রীধাম পুরীতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠ নিলামে যাইতে থাকিলে ইনি তিন হাজার টাকা দিয়া উহার উদ্ধার করিয়া সেবা চালাইতে থাকেন। ১৩১৮ সালে নবদ্বীপে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে অনাথ, বৃদ্ধ, আতুর প্রভৃতির সেবাশুশ্রূষাদির যথাযথ ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৩২১ সাল হইতে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে পাণিহাটিতে শ্রীমহাপ্রভুর আগমনী উৎসব আরম্ভ হয়। ১৩২৮ সালে দর্ম্মাহাটার বাড়ী ভাড়া হয় এবং স্বাধীনভাবে কলিকাতায় নামপ্রচারের সুব্যবস্থা হয়। বরাহনগর পাটবাড়ীর সেবা আসার পূরে ১৩৪০ সালে শ্রীগ্রন্থমন্দিরের পত্তন হয়—ইহাতে বহু দুর্লভ পুঁথির সঙ্কলন হয়, তদ্ব্যতীত প্রাচীন চিত্র-পট, ইষ্টকাদি ভাস্কর্য্য, তীর্থবারি এবং শ্রীপাটরেণু প্রভৃতির সমাবেশ হইয়াছে। নামাশ্রয়ে সুষ্ঠু সেবাপ্রবণতাই এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্টত্ব। দেব, দ্বিজ, বৈষ্ণব, ধামবাসী প্রভৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মানদান, অকাতরে অযথা তিরস্কারাদি-সহন, অথচ স্বয়ং অনিন্দুক হইয়া সম-ভাবে সকলের সমাদর-দানাদি বৈশিষ্ট্য এই বাবাজি মহাশয়ে আমরা দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। যেখানে প্রাচীন বিগ্রহের সেবা হইতেছে না, যেখানে প্রাচীন মন্দিরাদি ধ্বংসোন্মুখ হইতেছে, যেখানে কোন

বৃদ্ধ বা আতুর বৈষ্ণবের কৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইতেছে—(শুনিতে পাইলে) সেই সেইখানেই ইঁহার মুক্তহস্তে দানাদি চিরপ্রশংসনীয়। অবিচারে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে, কেইবা অচণ্ডালকে কোল দিতে পারে? স্নেহপূত দৃষ্টিতে, সুমধুর বাক্যবিন্যাসে এবং ব্যবহার-কৌশলে কেই বা আপামর সর্বসাধারণের মনঃপ্রাণ-নায়ক হইতে পারে? কীর্ত্তনকালে অশ্রুকম্পাদি-ভূষিত কলেবরে ইঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি কত কত পামরকেও যে আকর্ষণ করিয়াছে—তাহার সংখ্যা নাই। ভাবাবেশে তৎকালে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত 'আখর'-সম্বলিত কীর্ত্তনগানে ইঁহাকে সিদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাল মান ঠিক রাখিয়া ছন্দোবন্ধে—সিদ্ধান্ত, ভাব এবং রসাদি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কীর্ত্তন করা যে কত সুকঠিন ব্যাপার—তাহা ভুক্তভোগীগণই বুঝিবেন। এই ভাবে কীর্ত্তন করিয়া কত মহাজনের চরণরজে ইঁহার মস্তক অভিষিক্ত হইয়াছে—কত বৈষ্ণবের প্রেমালিঙ্গন লাভ হইয়াছে—তাহার গণনা হয় না। ছয় খণ্ডে শ্রীশ্রীরাধারমণের পূত জীবনকাহিনী ইনি **'চরিত-সুধা'** নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। বহু প্রাচীন আস্থান ইঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। সর্বত্রই নাম ও সেবার পরিপাটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জীয়াচ্ছতং সমাঃ শ্রীমান্ রামদাসো মহাসুধীঃ।
নামগান-সদারুচির্বন্ধুস্নেহৈকজীবিতঃ॥
অমানী মানদঃ শ্রীমদ্রাধারমণ-সেবকঃ।
নিত্যানন্দ-রসোন্মাদী গৌরাঙ্গপ্রিয় এব চ॥

—*—

* ১৩৬০ বাং ১৮ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ২টার সময় ইনি নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীশ্রীললিতা সখী দাসী (সমাজবাড়ী, নবদ্বীপ)

বঙ্গাব্দ ১২৮০ সালে ২৭শে আষাঢ় গুরুবারে শ্রীগুরুপূর্ণিমায় বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত হরিসেনা গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় শ্রীল কালীকান্ত ভট্টাচার্য্যের ঔরসে ও গৌর-সুন্দরী দেবীর গর্ভে শ্রীগোপালকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। ষষ্ঠীপূজার দিন রাত্রিতে তত্রত্য রামচন্দ্র সর্বজ্ঞ জ্যোতিষের গণনাদ্বারা বলিলেন— 'এ ছেলে কখনও ঘরে থাকবে না'।

এই বাড়ীতে নিত্য অতিথি সেবা হইত। একবার চৌদ্দমূর্ত্তি সন্ন্যাসী আসিয়া ইঁহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিলেন। পরদিন প্রভাতে ঐ সন্ন্যাসীদের দলপতি তাঁহার শ্রীগুরুতিথি আরাধনা করিবার জন্য তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন—ইঁহারা যথাশক্তি কার্য্য-সমাধানে তৎপর হইলে ২০০।৩০০ মূর্ত্তির সুচারুরূপে সেবা হইয়াছিল। ঐ দল-পতি যথাকালে বাড়ীর সকলকে ডাকাইয়া আশীর্ব্বাদ-সহকারে বিভূতি দিলেন, কিন্তু স্বমাতৃঃক্রোড়স্থিত গোপালকৃষ্ণকে বিভূতি এবং নিজ-ললাটস্থিত সিন্দুর দিয়া বলিলেন—'তোমার এই ছেলেটী জগত-হিতের জন্য আবির্ভূত হইয়াছে, ভজনে সুপ্রসিদ্ধ হইবে ; ইহাকে কিন্তু ঘরে রাখতে পারবে না, এ কুল-পাবন পুত্র তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে'। বলা বাহুল্য সন্ন্যাসি-দলপতির এই আশীর্ব্বাদ উত্তর কালে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। গোপাল তদবধি সাধু সন্ন্যাসির সেবায় অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, গোপনে তাঁহাদের সহিত ভজন-বিষয়ে আলোচনা করিতেন। খড়ম পায়ে দিতেন—সর্বদা পবিত্র ভাবে পবিত্র আলোচনায় থাকিতে ভালবাসিতেন। ১২৯১ সালে ইনি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেন তৎপর হইতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া গেরুয়া পরিতেন। এ বিষয়ে সামান্য ঘটনাও হয়—মলিন বস্ত্র ধোপাবাড়ীতে দিতে তিনি

কুণ্ঠিত ছিলেন, কেন না তাহাতে মেয়েদের অশুচি বস্ত্রের স্পর্শ হইতে পারে। বারংবার ভৎর্সিত হইয়াও যখন তিনি মলিন বস্ত্র ছাড়িলেন না, তখন তাঁহার মাতৃদেবীই বলিলেন—'তবে তুই গেরুয়া পর, তাহাতে কাপড় ময়লা হইবে না।'

১২৮৪ সালে ইহার প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়—গ্রাম্য পাঠশালায় মহিমচন্দ্র সরকারের নিকট। তৎপরে কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞের নিকট উচ্চ প্রাইমারী পড়িতে পড়িতে ইনি সংস্কৃত টোলে পড়িবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে নিকটবর্ত্তী গৈলা গ্রাম কবীন্দ্রবাড়ীর সংস্কৃত টোলে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতে থাকেন। পরে মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর পরামর্শে খলিশাকোঠায় প্রসন্ন স্মৃতিরত্নের টোলে পড়িয়া ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাব্য পড়িতেছিলেন—এ সময়ে বিবিধ অসুবিধা হইতে থাকিলে ইনি উজিরপুর হইতে বরিশাল প্রভৃতি ঘুরিয়া কলিকাতায় কালীঘাট আসিয়া বরদা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্য পড়িতে থাকেন। ইহাতেও অসুবিধা দেখা গেলে, দুই ভাই তখন কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশের টোলে বেদান্ত পড়িতে লাগিলেন। পরে আবার নবদ্বীপে গিয়া চৈতন্য চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া বেদান্ত পড়িলেন এই সময়ে জনৈক কাশীবাসী ন্যায়াধ্যায়ী ব্রহ্মচারীর সহিত তিনি মিলিত হইয়া ব্রহ্মচারিবেশে থাকিতেন। ব্রহ্মচারী নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলে ইনও পুনরায় বেদান্তবাগীশের নিকটে আসিলেন। ইনি শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়া একেবারে গুরুমুখোচ্চারিত পাঠটি কণ্ঠস্থ করিতেন। এইভাবে লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া ১৩০১ সালে পিতৃদেবের অন্তর্দ্ধানে ইনি একবার দেশে যান। তখন অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে স্বগ্রামে একটি উচ্চপ্রাইমারী পাঠশালা ও একটি দরিদ্রভাণ্ডার স্থাপন করিলেন এবং দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করত এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে চালাইয়াছিলেন।

ইনি যজ্ঞোপবীতের পরে স্বকুলদেবতা কালীমাতার সেবা করিতেছিলেন—এজন্য গ্রামে একটা আন্দোলন চলিতে থাকে যে ইনি অদীক্ষিত হইয়াও দেবীপূজা করিতেছেন। তখন ইঁহার পিতা বলিলেন—'আমাদের এই গোত্রে উপনয়নের পরে কুলদেবীর পূজা করিতে কোনই বাধা নাই যেহেতু দেবীই স্বপ্নাদেশে ইহা বলিয়াছেন। আর অশৌচাদিতেও ইঁহার নিত্য সেবা চলিবে ইহাও তাঁহারই প্রত্যাদেশ।' সেই সময়ে ১২৯৩ সালে কালীপূজার দিনেই ইনি পিতৃদেবের নিকটে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

১৩০৩ সালে আবার কলিকাতায় আসিলেন—১৬।২ দক্ষিণ চক্রবেড়ে রোডে তখন বড় ভাইর সহিত অবস্থান করিতেন এই সময় হইতে তাঁহার ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। গৃহে থাকিতেও ইনি যৌগিক ক্রিয়া ধৌতী প্রভৃতি করিতেন—কিন্তু এ সময়ে তিনি অধিকতর সময়ে গৃহমধ্যে নির্জ্জনে ধ্যানস্থ থাকিতেন, কাহারও সহিত বড় একটা বাক্যালাপ করিতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ তাঁহার ব্যাপার দেখিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলে, ইনি তাঁহার চরণে পড়িয়া কাকুতি-পূর্ব্বক বলিলেন—'বৌদি, তোমার পায়ে পড়ি, বিবাহের কথা বলিও না; সকল স্ত্রীলোককে আমি মাতৃবুদ্ধি করি, বিবাহ করিব কাকে? গৃহে থাকিতে বল, ত আমি তাহাতেই রাজী আছি।' ইতঃপর তিনি যেন অধিকতর মনোযোগে গৃহস্থালীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। একবার এইসময়ে গৃহব্যাপার নিয়া মেজদার সহিত ইঁহার সামান্য তর্ক হয়। মাঘমাসের প্রায় শেষের দিকে দুই জন সাধু আসিলে গোপাল তাঁহাদিগের সেবা করিলেন, তাঁহাদের সহিত কি পরামর্শ করিলেন। তাহার দুইদিন পর কাপড়, গামছা ও কমণ্ডলু লইয়া 'গঙ্গাস্নান করিতে যাই' বলিয়া গোপাল চিরতরে গৃহত্যাগী হইলেন। একটি কাগজে লিখিয়া গেলেন—'অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিদায় নিলাম,

অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইবে না—প্রয়োজনমত আমি নিজেই সংবাদ দিব—ইতি গোপাল।'

তৎপরে ইনি বরাহ নগরে গৌরীমাতার সহিত দেখা করিয়া তারকেশ্বরে গেলেন। পরে কাশীতে যাইয়া টাকা চাহিয়া দাদার কাছে চিঠি দিলেন—একবৎসর পরে আবার টাকা চাহিয়া চিঠি দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যেন অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠান না হয়। দাদা মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকও পাঠাইলেন। টাকা পাইয়াই গোপাল হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন, তাঁহার আর অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। হরিদ্বারে হরিহরানন্দ স্বামীর নিকটে অতি গোপনে থাকিয়া ইনি যোগাভ্যাস করিতেন। তার পরে ১৩০৫ সালে আলখাল্লা পরিয়া গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা দিয়া গোপাল শ্রীধাম পুরীক্ষেত্রে আসিলেন। এখানে তিনি শ্রীশ্রীরাধারমণচরণ দাস দেবের শিষ্যবর্য্য শ্রীনবদ্বীপ দাস ও শ্রীগোবিন্দদাসের সহিত মিলিত হন। গোবিন্দ দাদার সহিত ইঁহার ঘোরতর তর্ক হয়, কিন্তু নবদ্বীপ দাদার প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ইনি চিরতরে তাঁহার প্রেমডোরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। *

যেবার বাবাজি মহাশয় জাহাজে পুরীযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই বারেই জয়গোপাল † শ্রীনবদ্বীপ দাদার সহিত মিলিয়াছিলেন—শ্রীরথ-যাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি কটকের অপর পারে বারং হইতে রেইলপথে পুরীতে আসিলেন। শ্রীনবদ্বীপ দাদা জয়গোপালের হস্তে সংগৃহীত প্রসাদী মালা ও চরণতুলসী প্রভৃতি দিয়া ষ্টেশনে পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন—'তুমি আড়ালে থাকিবে, তোমাকে নাম ধরিয়া

---

* শ্রীযুক্তা ললিতাসখী দাসীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন মহোদয়ের মুখে শ্রুত ঘটনা। ইতঃপর 'চরিতসুধা' হইতে মাধুকরী।

† গোপালকৃষ্ণকে বাবাজি মহাশয় 'জয়গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন।

থাকিলে তুমি বড় মালাগাছটি দাদার গলায় দিবে এবং অন্যান্য ভক্তগণকে ছোট মালাগুলি দিবে'। জয়গোপাল ইতপূর্ব্বে কখনও বাবাজি মহাশয়কে দেখেন নাই। গাড়ী থামিলে বাবাজি মহাশয় পরিচিত সকলকে আলিঙ্গনাদি করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'জয়গোপাল! তুমিও আসিয়াছ? এস, প্রসাদী মালা দাও' এই কথা বলিলে জয়গোপাল তাঁহার নিকটে গেলে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন। জয়গোপালও মালা দিয়া তাঁহার চরণে চিরজীবনের তরে বিক্রীত হইলেন।

শ্রীশ্রীযুক্ত বড়বাবাজি মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গী শ্রীচৈতন্যদাস সর্ব্বদার তরে নিজেকে দাসী মনে করিয়া গোপীভাবে উপাসনা করিতেন। তাঁহার গুরুসেবাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ইহার অন্তিম-কালে জয়গোপাল যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদাস স্বীয় জীবনের শেষ জানিয়া একবার শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনের অভিলাষ জানাইলেন এবং জয়গোপালের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'আমি প্রভুর চরণে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে তোমার স্বপ্নের অগোচর অপ্রাকৃত বস্তু প্রদান করুন। গুরুদেব কৃপা করিয়া আমাকে যে ভাবরত্নটুকু দিয়াছিলেন, আমি অকপট হৃদয়ে তাহা তোমাকে অর্পণ করিলাম। তুমি এই মধুর ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কিছুদিন প্রাকৃত জগতে থাকিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যের পরম সুখময় বস্তু আস্বাদন কর।' এই চৈতন্যদাসের কৃপাই জয়গোপালের ভাবী জীবনের উন্নততর স্তর-প্রাপ্তির অবলম্বন—এই ঘটনাই তাঁহার সেবাপ্রবণতার প্রধান কারণ। জয়গোপালের উপরে আশ্রমের রান্না, পরিবেশন ও বড় বাবাজি মহাশয়ের যাবতীয় সেবার ভার দেওয়া হয়। শ্রীগোবিন্দ দাদা ও শ্রীনবদ্বীপ দাদা সর্ব্বদা শক্তিসঞ্চার করত সেবাশিক্ষা প্রদান করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেবার আনুকূল্যও করিতেন। শ্রীনবদ্বীপ

দাদা নিজে সেবা গ্রহণ করিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণারাধ্য বাবাজি মহাশয় কিরূপ সেবায় সুখী হইবেন, কোন্ কোন্ সময় তাঁহার কি কি সেবা প্রয়োজন, তিনি কি কি ভাব ভালবাসেন ইত্যাদি হাতে ধরিয়া শিক্ষা দিতেন।

বহুদিন যাবৎ রাত্রিযোগে জয়গোপাল, রাধাবিনোদ, করুণা, শরৎ ও রঘুনাথ দাস—এই পাঁচজনে মিলিয়া কোনও অভূতপূর্ব্ব আবেশে একটি গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। শরৎ কৃষ্ণাবেশে, রাধাবিনোদ রাধাবেশে ও জয়গোপাল ললিতাবেশে রসাস্বাদনে বিভোর থাকিতেন—রাত্রি প্রভাত হইলেও তাঁহাদের সংজ্ঞা ছিল না। একবার সেবকগণের আগ্রহে সকলেই গৃহমধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন, কিন্তু জয়গোপালের আবেশ আর কাটে না—খিল দিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া বিধিকে নিন্দা করিতেছেন—সুখরজনীর দ্রুতগতিতে অন্তর্ধান হইয়াছে বলিয়া উহাকে ধিক্কার দিতেছেন—তিনদিন যাবৎ এভাবে কাটিল—এমন সময় বড় বাবাজি মহাশয় জয়গোপালকে ডাকিয়াও তাঁহার সাড়া না পাইয়া সেই ঘরের দরজার পাশে আসিয়া জোরে ধাক্কা দিয়া কবাট খুলিবার চেষ্টা করিলেন। হঠাৎ তিনি একটি আদেশ শুনিলেন —'উহাকে শাসন করিতেছ কেন? যে ভাব তোমারও লাভ হয় নাই, আজ সেই ভাবেই গোপাল বিভোর হইয়াছে—তাহার ভাবে আঘাত দিও না।' তখন তিনি স্নেহময় কণ্ঠে জয়গোপালকে ডাকিলে তিনি আসিয়া দরজা খুলিয়া একেবারে বাবাজি মহাশয়ের চরণে পড়িয়া ফুৎকার করত কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া সেবায় নিযুক্ত করিলেন। *

---

* এই ঘটনাটি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি মহাশয়ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সমর্থন করিয়াছেন।

পরদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শিঙ্গারী পাণ্ডা মাধব পশুপালক শ্রীচরণ-তুলসী, কণ্ঠমালা ও অবকাশ-জল (স্নানজল) লইয়া রাধারমণকুঞ্জে আসিলেন। পাণ্ডা বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—'দেখুন আমি যখনই ইহাদিগকে (বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গীগণকে) দেখি, তখনই যেন মনে হয়—ইহারা ব্রজের সখী। একদিন জগমোহনে কীর্ত্তনের মধ্যে ইহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছিল, আমি সকাল-ধূপের পূজা করিবার সময় দেখিলাম যে ইহাদের পরণে ঘাঘ্‌রা। মনে ভাবিলাম আজ বাবাজী মহাশয় ইহাদিগকে সখী সাজাইয়া আনিয়াছেন। যেমন মনে করা, অমনই জগন্নাথের কণ্ঠমালা গাছটি খসিয়া পড়িল। সেই দিন ভোগের পর ঐ মালাগাছটি আপনাকে আনিয়া দিলে আপনি কিছু সময় গলায় রাখিয়া এই ছেলেটীকে বা ঠিক এই রকম অন্য একটি ছেলের হাতে দিলেন।' বাবাজী মহাশয় বলিলেন—'আপনারা জগন্নাথদেবের অন্তরঙ্গা সখী। আপনাদের আশীর্ব্বাদে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। আপনি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহাদের মনো-বাসনা পূর্ণ হউক।' জয়গোপাল তাঁহার ইঙ্গিতে পাণ্ডাকে প্রণাম করিলে তিনিও আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেইদিন শ্রীরাধারমণের গোষ্ঠ-বেশ হইলে কুঞ্জবাবু গোষ্ঠ গান ধরিলেন—কীর্ত্তনে যেমন যেমন ভাব প্রকট হইতে লাগিল, জয়গোপালও ঠাকুরের ঠিক তেমনি তেমনি বেশভূষাদি প্রস্তুত করিলেন। ক্রমে রাধাকুণ্ড-মিলন হইল—বাবাজী মহাশয় শ্রীকুণ্ডের বর্ণনা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন—জয়গোপাল কিন্তু শ্রীরাধারমণের ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছেন ও অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। বাবাজি মহাশয় নৃত্যাবেশে মন্দিরে উঁহার নিকটে গিয়া কি একটি মন্ত্রপ্রদান করিতেই জয়গোপাল শশব্যস্তে উঠিয়া মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনে আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে,

এমন সময় একজন লোক আসিয়া একখানা সাড়ী দিয়া চলিয়া গেল। শ্রীনবদ্বীপ দাদা সাড়ীখানি প্রসাদী করিয়া বাবাজি মহাশয়ের মাথায় দিলেন। পরে কীর্ত্তন রাখিয়া ঐ সাড়ীখানি শ্রীনবদ্বীপ দাদার হাতে দিয়া ইঙ্গিত করিলে দাদা আসিয়া জয়গোপালকে সাড়ীখানি পরাইয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে সমর্পণ করিলে তিনি বলিলেন—'রাধারাণীর কৃপাদত্ত বস্ত্র যত্নে রাখিও, আনন্দ পাইবে। আমার ভাগ্যে হইল না; প্রভু তোমাদিগকে কৃপা করিলেন। কেবল বেশ করিলেই হইবে না—বেশোচিত কার্য্য করা চাই। সখীভাব অঙ্গীকার করিতে হইলে সম্পূর্ণ আত্মসুখ-বিবর্জিত নিষ্কাম ব্রজগোপীদের ভাব, স্বভাব, ইচ্ছা ও অহঙ্কারের অনুগত্যে হৃদয় গঠিত করিয়া সাধন করিতে পারিলে তদবস্থা প্রাপ্তি হয়। সর্বদা দাসীভাব হৃদয়ে ধারণা করিয়া কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধরূপে তদ্‌যোগ্য আচরণ করা প্রয়োজন। ভাবানুযায়ী স্বভাব গঠিত করিতে না পারিলে ভাব স্থায়ী হওয়া কঠিন। স্বভাব গঠন করিবার প্রধান উপায়—সেবা অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানে শ্রীমূর্ত্তির কায়িক, বাচিক ও মানসিকরূপে, প্রাণিমাত্রে শ্রীগুরুর প্রকাশ জ্ঞানে, বৈষ্ণব-কৃষ্ণ অভিন্ন-বোধে অবিচারে সেবা করিতে পারিলে অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে।" তখন তাঁহার নাম হইল—ললিতা দাসী। বাবাজী মহাশয়, শ্রীনবদ্বীপ দাদা ও শ্রীগোবিন্দ দাদা প্রভৃতি যাহাতে ইহার ভাবের পুষ্টি হয়, সর্বদা তদনুকূলে কার্য্য করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে ইনি বেশ প্রাপ্তি হইতে আজীবন বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুসারে চলিয়াছেন—বহুবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইলেও কখনও স্বনিষ্ঠা হইতে চ্যুত হন নাই—কুলবধূর ন্যায় মন্দির হইতে কখনও বাহিরে যাইতেন না—চন্দনযাত্রায় তিন দিন কেবল নৌকাবিলাস কীর্ত্তন করিবার জন্য গঙ্গায় যাইতেন ও সারারাত্রি কীর্ত্তনানন্দ করিয়া উষাকালে গৃহে

ফিরিতেন। এই বেশ-ধারণের বিরুদ্ধে শতসহস্র তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ, ব্যঙ্গোক্তি, কটূকথা প্রভৃতি ইনি অকাতরে অম্লানবদনে সহিয়া শেষ পর্য্যন্ত স্বধর্মযাজন করিয়াছেন—স্বগুরুদত্ত বেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহা হইতেই শ্রীনবদ্বীপধামস্থিত শ্রীরাধারমণ বাগে অষ্টকালীন স্মরণোপযোগী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বেশবিন্যাস, আরতি, ভোগরাগ প্রভৃতির যথেষ্ট সুশৃঙ্খলা ও পরিপাটী হয়। কি নৃত্যগীত-বাদ্যে, কি রন্ধন-নৈপুণ্যে, কি শ্রীমূর্ত্তির সেবা-কৌশলে, কি বৈষ্ণব-সেবায় ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শ্রীগ্রন্থের প্রতিপাদ্য দুরূহ স্থলগুলি ইনি এত সহজ সুস্পষ্ট ভাষায় ভাগ্যবান্ শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিফলিত করিয়া দিতেন যে তাহার আর কোনই সন্দেহের অবকাশ থাকিত না।

বড় বাবাজি মহাশয়ের তীব্র কঠোর শাসন যেমন ইনি অকাতরে সহিয়াছেন, উত্তরকালে আবার তেমনি ভাব-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করত বহু অপার্থিব বস্তুর রসাস্বাদন নিজে করিয়া অপরাপর ব্যক্তিকেও আপ্যায়িত করিয়াছেন। এস্থলে দুই একটি কৃপা-শাসনের উল্লেখ করিতেছি—(১) পুরী শ্রীরাধারমণ কুঞ্জে সেই সময়ে এক সের চাউল রান্না হইত—শ্রীরাধারমণের ভোগ হইলে সেই প্রসাদ বাবাজি মহাশয়ের সেবার পর ভক্তগণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইতেন। ঝাঁজপিটা মঠ হইতে আনিত প্রসাদ ললিতা দিদি ও অন্য দুইজন সেবা করিতেন। একদিন রাধারমণ কুঞ্জে তিনবার রান্না হইলেও দিদিকে প্রসাদ দেওয়া হইল না। বাবাজি মহাশয় দিদিকে এরূপ কাজের আদেশ দিতেছেন যে ইচ্ছা থাকিলেও তিনি প্রসাদ পাইতে পারিতেছেন না। বাবাজি মহাশয়ের শয়নের পরে জেনামঠ হইতে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ চিঁড়ে ভাজা ইত্যাদি আসিলে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি বলিয়া উঠিলেন—'ঐ সব বস্তু ঠাকুর জাগিলে ভোগ লাগিবে, এখন এ ঘরে আনিয়া রাখ।' তাহাই হইল। বেলা চারিটায় ভোগ লাগিলে

বাবাজি মহাশয় নিজে হাত মুখ ধুইয়া সে সব প্রসাদ যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করত ভক্তগণকে বাটিয়া দিলেন, অথচ দিদি বাদ পড়িলেন—পরে দিদির দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন—'তাই ত, ইহাকে ত ভুল হইয়া গেল। আচ্ছা, এই বাসনে যাহা লাগিয়া আছে, উহাতেই উহার যথেষ্ট হইবে।' দিদি কিঞ্চিৎ অধরামৃত গ্রহণ করিয়া বাসন পরিষ্কার করিলেন—বলা বাহুল্য যে তাহাতেই তাঁহার পেট ভরিল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ভুবন সাউর বাড়ী হইতে পুরী, কচুরী ইত্যাদি আসিতে দেখিয়া তিনি যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে 'ললিতাদাসীর হাতে দিয়া বলিবি যে আমার অধরামৃত।' প্রসাদ আসিলে দিদি তাহাও তাঁহার ইঙ্গিতমত গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। রাত্রি নয়টার সময় তিনি দর্শন হইতে ফিরিয়া সেই প্রসাদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাহা এখনও ধরা আছে। তখন তিনি ললিতা দিদিকে প্রসাদ পাইতে আদেশ দিলেন। এরূপ অনাহার ইহার ভাগ্যে প্রায়শঃই হইত। (২) একবার দুই তিন শত লোকের ভোজন হইয়া গিয়াছে, আশ্রমের সকলের প্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে দিদির জন্য বিন্দুমাত্রও কিছু নাই। এদিকে তাঁহার ক্ষুধাও পাইল, বড় বাবাজি বিশ্রাম করিতেছেন—এই অবসরে তিনি নিকটস্থ উড়িয়া মাতার নিকট চাহিয়া দুইটি মুড়ি আনিয়া দেখিলেন যে এক ফোঁটা তেল, লঙ্কা বা লবণ ত কিছুই নাই, তখন 'পোলাং' তৈল দিয়াই মুড়ি মাখিলেন এবং তুলসী দিয়া এক গাল মুখে দিয়া আর এক মুষ্টি তুলিতেছেন—এমন সময় বমি করিতে করিতে অন্নপ্রাসনের অন্নও বুঝি উঠিয়া আসিল! 'পোলাং' তেল জগন্নাথের মশালে জ্বলে, ইহা যে খাওয়া যায় না—এ কথা তিনি জানিতেন না। এদিকে বাবাজি মহাশয় শয্যাত্যাগ করত পায়খানায় গিয়া হাতে মাটি দিতেছেন এবং বলিতেছেন—'একটু ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।

দুটি মুড়ি খাইলে হয়, একটু তেল মাখিয়া খাইলে হয়, অবশেষে একটু পোলাং তেল মাখিয়া খাইলে হয়।' বলা বাহুল্য এসব কেবল দিদির প্রতি শাসন !! বিনানুমতিতে পেটের জন্য স্বতন্ত্রতা কেন ? (৩) একবার উৎকট রোগে ললিতা দিদির মুমূর্ষু অবস্থায় বাবাজি মহাশয়ের ইঙ্গিতে সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঠাকুরের সাম্নে শয়ন করাইয়া বৈষ্ণবগণের চরণধুলি ও চরণামৃত অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করাইয়াছিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় ইঁহাকে বলিলেন—'দেখ ঠাকুরের দ্রব্য অপ্রসাদী অবস্থায় তুমি আমাদিগকে দিয়া এই রোগে মরিতেছিলে।' তাঁহাকে সাবধান করিয়া কেবল প্রসাদ ও চরণামৃত সেবা করিতে দেওয়া হইল। দুই একদিন পরে সেই দুর্ব্বল অবস্থাতেই বাবাজি মহাশয় দিদি দ্বারা পঞ্চাশ ষাট্‌জন লোকের রান্না করাইলেন, আবার পরদিনও আড়াই শত মূর্ত্তির রান্না ও পরিবেশনে দিদি অক্লান্ত ভাবে খাটিলেন। (৪) একবার মহাপ্রসাদ-ভোজনে রত বিড়ালকে মারিয়া ইঁহার হাত ফুলিয়া বহু কষ্ট পাইলেন, পরে বাবাজি মহাশয়ের কৃপা-ইঙ্গিতে বিড়ালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিরাময় হইলেন। (৫) আর একবার প্রসাদি বাসনের নিকট চরণ ধুইতে দুই এক ফোঁটা গিয়া বাসনে পড়ায় অপরাধে চরণ ফুলিয়া বহুদিন ভুগিয়া মনে মনে অপরাধের কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে ঐ কথা স্মরণ হইতেই রোগমুক্ত হইলেন। (৬) একবার এক উৎকলীয়া নারী বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া মঠের আশ্রয়ে থাকেন, তিনি রোগমুক্ত হইয়াও সুস্থতালাভের জন্য মঠেই থাকিলেন—দিদি তাঁহার সেবা শুশ্রূষাদির ভার নিলেন—নিজের হাতেই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন, একদিন বুভুক্ষু হইয়া তিনি অজ্ঞাতসারে দিদির একটি অঙ্গুলি কামড়াইয়া দিলেন—তাহাতে ক্ষত হইয়া দিদির দৈনন্দিন সেবাদি বন্ধ হইল।

দিদির বিশেষ দুঃখ এই যে বাবাজি মহাশয়ের আহারে বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল—একদিন তিনি অন্যান্য ভক্তগণসহ বাবাজি মহাশয়ের চরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নানা কথা পাড়িলেন—তাঁহার ক্ষতস্থানটি কিন্তু ছিল বাবাজি মহাশয়ের পালঙ্কের উপরিভাগে—বাবাজি মহাশয় অজ্ঞাতসারেই যেন দিদির সেই ক্ষতস্থানে সজোরে এমন পদাঘাত করিলেন যে দিদি মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং ক্ষতস্থান হইতে পূঁয রক্তাদি বহির্গত হইতে লাগিল—কিয়ৎকাল মধ্যে দিদিও সুস্থ হইয়া যথারীতি আবার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীরাধারমণের অপ্রকটে ইনি শ্রীরাধারমণবাগেই অবস্থান করিতেন, অন্যত্র কুত্রাপি যাইতেন না। সমাগত সকল লোককেই ইনি মধুর সম্ভাষণে চিত্তরে স্নেহডোরে বাঁধিতেন। ইঁহারই করুণায় শ্রীরাধা-রমণের '**চরিত-সুধা**' প্রকটিত হয়। শ্রীসুরতকথামৃত ও শ্রীসঙ্গীত-মাধব—টিপ্পনী এবং বঙ্গানুবাদের সহিত ইনি প্রকাশিত করাইয়াছেন। স্বরচিত পদাবলী ইনি ঝুলন, রাস ও হোলি প্রভৃতি লীলার গান করিয়া কত লোককে আনন্দ দিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। ভাবা-বেশে শ্রীকৃষ্ণকথা আলাপ করিতে করিতে একদিন ইঁহার সম্মুখস্থিত আসনে যুগলপদচিহ্ন পড়িয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল। ইঁহাতে আমরা শ্রীগুরুনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণরতি, বৈষ্ণবসেবায় প্রীতি এবং নাম ও প্রসাদে অতুলনীয় বিশ্বাস দেখিয়া ধন্যধন্য হইয়াছি।

১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ গৌণী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে মিথুন লগ্নে রাত্রি ছয় দণ্ডকালে স্বযূথেশ্বরীর আনুগত্যে ইনি চিরাভীষ্টকুঞ্জে অভিসার করিয়াছেন। লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়াও ইনি যে অদ্যাপি স্বগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন—ইহা একাধিক ভাগ্যবান্ জন অনুভব করিয়াছেন। অধিক কি বলিব—অন্তর্ধানে থাকিয়াও তৎপরবর্ত্তী শ্রীগুরুপূর্ণিমার দিনে ইঁহার বসিবার কাষ্ঠবর্ণের নির্দ্দিষ্ট

আসনে যে ইঁহার পদচিহ্ন পড়িয়াছিল, তাহা মাদৃশ নাস্তিক পাষণ্ড দেখিয়াই শ্রীগুরুকৃপার অসমোর্দ্ধ মহিমার জয় না দিয়া থাকিতে পারে নাই !!

(মহাত্মা) শিশির কুমার ঘোষ (কলিকাতা)

যশোহর জেলায় মাগুরা গ্রামে সম্ভ্রান্ত জমিদার কায়স্থ-বংশে ১৭৬৮ শকে শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষের ঔরসে ও অমৃতময়ীর গর্ভে ইঁহার উদয় হয়। মাতৃদেবীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলিয়া ইনি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য স্বগ্রামে 'অমৃতবাজার' নামে বাজার, ডাকঘর ও দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছেন। ধর্ম্মজীবনের প্রথমভাগে ইনি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তদীয় অগ্রজ হেমন্তবাবুর অহৈতুকী করুণায় ও প্রেরণায় পরে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন।

* একবার হেমন্ত বাবু শিশির বাবুর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য হাঁসখালিতে গিয়াছিলেন। হেমন্ত বাবুকে শিশির বাবু অন্তরে অন্তরে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার বাক্য অভ্রান্ত ও চিরসত্য বলিয়া বুঝিতেন। শিশির বাবুর তদানীন্তন জ্ঞানবাদে ও ব্যবহারে হেমন্ত বাবু ক্ষুব্ধচিত্তে কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহাকে চিঠি দিলেন—'শিশির ! তুই নিকটবর্ত্তী শচী পিসীর ছেলে নিমাইকে চিনলি না ; তবে জানিস্, তুই তাঁর চিহ্নিত দাস এবং তোর দ্বারা তিনি একটি বিশিষ্ট কার্য্য করাবেন।' চিঠিখানা পড়িয়া শিশির বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল এবং তিনি সংজ্ঞাহারাও হইলেন। তিনি যে মহাপ্রভু সম্বন্ধে আদৌ জানেন না, অথচ তাঁহাদ্বারা বিশিষ্ট কার্য্য হইবে—সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা ;

* এই ঘটনাটি শিশির বাবু নিজ মুখে অশ্রুস্নাত-মূর্ত্তিতে সগণ শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি প্রভুকে বহুবাজারের বাড়ীতে বলিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে দাদার বাক্যও ত মিথ্যা হইবে না—ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি দাদাকে চিঠি দিলেন—'দাদা! কিসে নিমাইকে চিনা যায়?' উত্তর হইল—"দুই পয়সা খরচ করিয়া বটতলার 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' পাঠ করিলেই তাকে চিনা যায় ও প্রেমভক্তি হয়।" শিশির বাবু কলিকাতায় আসিয়া বটতলায় ঘুরিয়া 'প্রার্থনা' কিনিলেন, ঘরে গিয়া আগ্রহ-সহকারে খুলিয়া পড়িলেন—"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর॥" এই পর্যান্ত পড়িয়াই তিনি পাঠ বন্ধ করিলেন—ভাবিলেন 'কই গৌরাঙ্গ ত বলিলাম, কিন্তু পুলকাশ্রু ত হইল না; তবে এই সব মিথ্যা কথা।' আবার দাদাকে অমৃত বাজারে চিঠি দিলেন—'কই, গৌরাঙ্গ বলিতে ত আমার প্রেম হইল না।' তখন উত্তর হইল—'তোমার না হইলেও অন্যের হয়।' তদবধি তিনি ভগবানের নামে প্রেমাশ্রুমণ্ডিত বৈষ্ণব দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরাঘুরি করিলেন—বহু সাধু সন্ন্যাসী, পাদরী, ফকির, লামা প্রভৃতির সঙ্গ করিলেন, কিন্তু কোথাও প্রেম-বস্তু দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া আত্মগ্লানি করিতেছিলেন—এমন সময়ে জনৈক বান্ধব আসিয়া খবর দিলেন যে হুগলি জেলায় এক গ্রামে জনৈক বৃদ্ধ জোলার কিন্তু হরিনামে অশ্রুকম্পাদি হয়। শুনিয়াই ত তিনি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ছুটিলেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দূর হইতে দেখিলেন যে বৈষ্ণবটির ভজনকুটীরের দ্বার কণ্টকদ্বারা রুদ্ধ; তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে 'হরিবোল' ধ্বনি করিবামাত্রই সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবটি কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতগতি কণ্টকের উপর দিয়াই লম্ফ দিয়া আসিতেছেন · তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নয়নে প্রেমাশ্রু, গদ্গদ বাণীতে তিনি বলিতেছেন—'কেরে বন্ধু! আমার প্রাণবল্লভের নাম শুনাইলি, কেরে আমার প্রিয়তমের বান্ধব আসিলি'। এই কথা

বলিতে বলিতেই তিনি আসিয়া শিশির বাবুকে পরিসর বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার মস্তকটি অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। আজ শিশির বাবুরও চক্ষে অশ্রু, শরীরে পুলক ও মুখে মৃদুমন্দ 'হরিবোল' ধ্বনি হইল। তদবধি শিশির বাবু পরম ভাগবত হইলেন—স্বভাব-সিদ্ধ গৌরানুরাগ আসিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। বটতলায় দোকানে যত গ্রন্থ পান, তাহাই কিনিয়া মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রু-জলে সিক্ত হইয়া পাঠ করেন; প্রতি পদে, প্রতি অক্ষরে তিনি নূতন শক্তি, অভিনব উন্মাদনা এবং অদৃষ্টচর আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সকলই পরিবর্ত্তিত হইল; প্রেমময়, মধুময় হইয়া তিনি অন্তরে বাহিরে গৌরপ্রেম-সুধার আস্বাদনে মত্ত হইলেন !!

যিনি একদিন বিপুল গৌরবে জননায়ক বিচারক ছিলেন, শ্রীগৌরানু-রাগে তিনি এক্ষণে দীনহীন হইলেন। সকালবেলা নগ্নপদে সামান্য পরিধানে 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ' বলিয়া টহল দিতে লাগিলেন যাহার সহিত দেখা হয়, তাহাকেই মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া গৌরভজনের উপদেশ দিতেন। দিবানিশি তিনি গৌর-ভজনে গৌরা-লাপে মগ্ন থাকিতেন—গৌর-সম্বন্ধে যে যাহা বলিত, তাহাই অবিচারে গ্রহণ করিতেন, তাহাই তাঁহার প্রীতিপ্রদ ও মনোমদ হইত। এই সময় হইতে তিনি বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া শ্রীগৌরভজন শিখাইবার উদ্দেশ্যে **'অমিয় নিমাই চরিত'**-প্রণয়নে ব্রতী হইলেন। তাঁহার সর্ব-প্রথম গ্রন্থ কিন্তু **'কালাচাঁদ গীতা,'** ইহাতে তিনি প্রাকৃত বস্তুর ভিতর দিয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম দেবতার সন্ধানটি যেমন যেমন উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা তাহাই অবিকৃত ভাবে প্রাণের সজীব ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অমিয়নিমাই চরিতে তিনি সরল সুস্পষ্ট ভাষায় শ্রীগৌরসম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য বিন্যাস করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত

মৃণালকান্তি ঘোষ দাদাবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে অমিয়নিমাই-চরিতের পাণ্ডুলিপি-নির্ম্মাণকালে শিশির বাবু একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন—নিজের হাতে একটি অক্ষরও লিখেন নাই। আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া তিনি ছোট একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থল দিয়া অনবরত যাতায়াত করিতেন এবং দুই পার্শ্বে ৫।৬ জন লোক বসিয়া থাকিত—যাতায়াতের কালে তিনি অনবরত বলিয়া যাইতেছেন আর ঐ লোকগুলি যে যাহা পারে লিখিয়া লইত; তাঁহার বলা শেষ হইলে উহারা মিলাইয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিত। এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই অমিয়নিমাই-চরিত পড়িয়া কত নাস্তিক যে আস্তিক হইয়াছে, কত ভণ্ড, পাষণ্ড যে বৈষ্ণব হইয়াছে, কত দুর্বৃত্ত যে সচ্চরিত্র হইয়া সাধুজীবন যাপন করিয়াছে ও করিতেছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজী ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইয়াছে এবং তাহাতে বহু পাশ্চাত্যদেশী শ্রীগৌরসম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিয়াও ধন্য-ধন্য হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকখানা গ্রন্থ তাঁহার রচনা আছে। পদাবলি-রচনাতেও ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

একবার তিনি হুগলিতে কোনও সমব্যবসায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। তত্রত্য কর্ম্মকর্ত্তা শিশির-বাবুকে লইয়া বরের জন্য সজ্জিত যৌতুকাদি দেখাইতেছেন—তাহার মধ্যে একখানি চিত্রপট ছিল, উহাতে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর ও সীতানাথের মনোহর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। শিশির বাবু ঐ চিত্রপট দেখিয়াই ত বালকের মত কাঁদিয়া আকুল হইলেন—উহা পাইবার জন্য আবদার করিতে লাগিলেন—ভদ্রলোক বরাগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিশির বাবুর এতাদৃশ ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়া অতিসাধের চিত্রপটখানি তাঁহাকেই দিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। আনন্দে অধীর হইয়া শিশির বাবু তাহা নিজ গৃহে লইয়া গিয়া নিজ জননী অমৃতময়ীর হস্তে দিয়া

সেবা করিতে বলেন। তদীয় অন্তরঙ্গ শিষ্যের মুখে শুনিয়াছি যে শিশির বাবু কখনও ঐ চিত্রপটের সম্মুখে যাইতে পারিতেন না, যদি বা কখনও উহা দেখিয়াছেন, তখনই অধীর হইয়া মুর্ছিত হইতেন। অদ্যাপি সেই চিত্রপটখানি অমৃতবাজার পত্রিকার অফিসের নব নির্ম্মিত বাড়ীর ষষ্ঠতলে সেবিত হইতেছেন, তাহারই প্রতিবিম্ব শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় চতুর্থ সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত জীবনী অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ ব্রজবালা

ঢাকা জেলায় ধামরাই গ্রামে ১২৬০ সালের ভাদ্রমাসে বামন দ্বাদশী তিথিতে ইহার জন্ম হয়। তাঁহার জনক-জননী বংশরক্ষার জন্য বহু তীর্থাটন করত শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীবলদেবের বরে তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। ইহার নাম ছিল—শ্রীহরিমোহন চৌধুরী। স্বগ্রামের উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে পাঠ শেষ করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজে এফ্, এ পড়িয়াছিলেন। অন্যত্র বি,এ পাশ করিয়া আবার বহুদিন পরে ঐ কলেজে এম, এ ক্লাসেও কয়েকমাস পড়িয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্মজীবনের আরম্ভ হয়। গ্রামের নিকটবর্ত্তী বনে ও নির্জনস্থানে বসিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইতেন। একদিন দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি দৈববাণী শুনিলেন—'বৎস! সংসারে উদাসীন এবং শ্মশানের সংসারী হও।' অন্য দিন স্বপ্নে দেখিলেন যে জনৈক সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবিষ্ট, চৌদিকে সন্ন্যাসীবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। স্বপ্ন দেখিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া বসিলেন—ক্রমশঃ ধর্মোন্মাদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৈশোর অতীত হইলে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে মন বসিল না,

শিক্ষকতাও আর ভাল লাগিল না। এই সময়ে একবার চিন্তামগ্ন অবস্থায় দেখিলেন যে জনৈক অপরিচিত মহাপুরুষ ঠিক তাঁহার মাথার উপরে শূন্যে শায়িত হইয়া নিম্নমুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। তৎপরে শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া উন্মত্তবৎ বনে জঙ্গলে ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন—প্রায়ই গৃহে ফিরিতেন না; আত্মীয়-স্বজনগণ বহু চেষ্টা করিয়া পুনরায় শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন, ঢাকায় বাসা হইল—একটি পুত্রসন্তানও জন্মিল—নাম শ্রীঅশ্বিনীকুমার।

এই সময় ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে শ্রীপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রভুর আগমন-সংবাদ পাইয়া ইনি তাঁহার দর্শনে যাইয়া আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলেন যে শ্রীগোস্বামিপ্রভুই পূর্ব্বকালে স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ। প্রভুপাদের সঙ্গ করিতে করিতে পরে সস্ত্রীক তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিলেন। দীক্ষার পরে সংসারে বিরক্তি বাড়িল, সংকীর্ত্তনের প্রতি আকর্ষণ হইল—বহু দূরবর্ত্তী স্থানে সংকীর্ত্তন হইবে সংবাদ পাইলেই তিনি ছুটিয়া যাইতেন, দুই তিন দিন গৃহে ফিরিতেন না—এই সব কারণে সংসারে বিবিধ দুঃখকষ্টও ছিল—কোনও ভক্ত কোনও দিন চাউল ডাইল দিলে রান্না হইত, নতুবা বেলপাতা ও নিমপাতাই ভরসা ছিল। এইজন্য তাঁহার স্ত্রী তাঁহার আদেশমত পুত্রটিকে স্বপিত্রালয়ে রাখিয়া আসিলেন। ইনি কখনও কখনও বারদীর ব্রহ্মচারীর নিকট সস্ত্রীক যাইয়া তাঁহার উপদেশ লইতেন। শ্রীগোস্বামি-প্রভুর উপদেশে কিছুকাল মনোযোগে শিক্ষকতা করিলেও আবার অবসর গ্রহণ করিলেন।

জীবনে প্রকৃত ধর্মলাভ করিতে পারিলেন না মনে করিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন, এমন কি গোপনে আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত হইলেন। তখন শ্রীগোস্বামিপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। ১২৯৫ সালে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ধুলোট উৎসবের পক্ষে

ইনি গোঁসাইজির নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তীব্র বৈরাগ্য ও উৎকণ্ঠায় বাহির হইয়া বহু তীর্থ পর্যটন করিলেন ও পরে শ্রীবৃন্দাবনে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার অসাধারণ বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে। তখনকার নাম ছিল—স্বামী সচ্চিদানন্দ। তীর্থ ভ্রমণকালে নাসিকে গিয়া তিনি তত্রত্য দণ্ডী দিগম্বর স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ক্রমে দ্বারকা-দর্শনের পর ফিরিয়া ললাটে সন্ন্যাসমাত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন। তৎসহ শ্রীশ্রীগোঁসাইজির নামও অঙ্কিত ছিল। সূচীবিদ্ধ হওয়ায় ললাটে ক্ষত হইল, পূঁয রক্ত পড়িতেছিল—ইনি কিন্তু সেইদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া মনের আনন্দে গোঁসাইজির নিকট আসিলেন। শ্রীগুরুকৃপায় অতি অল্পদিনেই ক্ষতস্থান নিরাময় হইল। ঐ অক্ষরগুলি সম্বন্ধে পৃষ্ট হইয়া তিনি বলিতেন—'আমি অশ্বমেধের ঘোড়া, কপালে জয়পত্র লেখা আছে।' হরিদাস বসু কর্তৃক-প্রণীত 'সদ্‌গুরুলীলা' নামক পুস্তকে স্বামিজির তাৎকালীন তীব্র বৈরাগ্য, কঠোর তপস্যা, উজ্জ্বলতর সাধন ভজন এবং সর্বোপরি শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনে প্রেমোন্মত্ততা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামি-প্রভুর সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া গোপীভাবে সাধনপ্রণালী শিক্ষা করেন। সন্ন্যাসের বেশ ত্যাগ করিয়া তখন ব্রজগোপীদের মত অঙ্গে অলঙ্কার, চরণে নূপুর, দুই হস্তে শাঁখা ও বালা, নাসায় বেশর ও কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল পরিতেন। এই সময়ে এক রাত্রে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে গোপবালক সাজিয়া গভীর বন হইতে তাঁহাকে শ্রীরাধিকা প্রভুর কুঞ্জে আনিয়া দেন। ইনি পথে একটি ফল পাইয়াছিলেন, তাহা ব্রজবালকবেশী শ্রীকৃষ্ণকে খাওয়াইয়াছিলেন।

স্বস্থানে পৌছাইয়া ব্রজবালক চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে শ্রীরাধিকানাথ প্রভু স্বপ্নে দেখিতেছেন যে স্বামিজি শ্রীকৃষ্ণকে ফলটি খাওয়াইতেছেন। কুঞ্জদ্বারে আঘাত করিলে গোঁসাইজি দ্বার খুলিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন এবং সেইখানেই পতিত ফলের খোসা দেখিয়া দুই জনই কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকানাথ প্রভু তখন স্বামিজির নাম রাখিলেন—'শ্রীরাধাদাসী ব্রজবালা'—তদবধি তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজবালা-নামেই সমধিক পরিচিত হইয়াছিলেন।

একবার ব্রজমণ্ডলে অনাবৃষ্টি হইলে শ্রীধামবাসী সকলেই প্রচুর বৃষ্টির জন্য সংকল্প লইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনে নামযজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহারা ব্রজবালাকে একটি সঙ্গীত রচনা করত কীর্ত্তনে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। তাঁহার তাৎকালীন রচিত গানটী গাহিয়াই পরিক্রমা বাহির হইয়াছিল।

'নিতাই গৌরাঙ্গ কহজি ভেইয়া।
(মেরা) নিতাই গৌরাঙ্গ তেরা দাউজি কানাইয়া॥' ইত্যাদি

সারাদিন সংকীর্ত্তনে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া সন্ধ্যায় তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া বসিলেন এবং জ্বরে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন মনে মনে জ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'এস, আজ তোমাকে প্রেমভক্তি প্রদান করি।' এই বলিয়া তিনি শ্রীকুণ্ডে ঝম্প দিলেন। কয়েক দিন পরে সুস্থ হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। এদিকে প্রচুর বর্ষা হইয়া ব্রজবাসিগণের আনন্দ দান করিল।

তৎপরে তিনি ১৩০৪ কি ৫ সালে শ্রীগোপীনাথ-মন্দিরের নিকটেই একটি কুঞ্জ স্থাপন করত নাম দিলেন 'শ্রীযোগমায়া-বিজয়কৃষ্ণ-কুঞ্জ।' এই কুঞ্জ-নির্ম্মাণকালে তিনি স্বয়ং মস্তকে বহিয়া পাথর আনিতেন। তিনি জয়পুর হইতে তত্রত্য দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেনের আনুকুল্যে 'শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজনাগর' মূর্ত্তি আনয়ন করত ঐ কুঞ্জে স্থাপন করেন।

কুঞ্জনির্ম্মাণ ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে তিনি ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অর্থ-সংগ্রহ করিবার ছলে কলিকাতায় আসিলেন—এ সময়ে বহু শিষ্য হইল বটে, কিন্তু ঋণশোধের কোনই ব্যবস্থা হইল না। সাঁতরাগাছি, বেঁটরা, ডায়মণ্ড হারবার, মেদিনীপুর ও হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বহু শিষ্য হইলেও কিন্তু তিনি অযাচক ছিলেন বলিয়া অর্থাগম হইল না, অথচ বৃন্দাবন হইতে ঋণশোধের জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি আসিতে থাকিলে তিনি কুঞ্জসেবার বন্দোবস্ত করিতে আবার শ্রীধামে চলিয়া গেলেন।

হাকোলাতে অবস্থানকালে বিবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে, তত্রত্য এক শিষ্যের পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ দর্শনাদির জন্য কাতরোক্তিতে একবার তিনি তাঁহাকে সামনে বসাইয়া সতেজে এমন শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন যে শিষ্যটি তাহাতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া নানা অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিলেন—সেই বিরাট রূপের দর্শনানন্দে তাঁহার সংজ্ঞালোপ ত হইয়াছিলই, অধিকন্তু তাহার তেজে প্রাণসংশয়ও হইল। এই ঘটনার পর হইতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনও কোন কারণে সতেজে শক্তি সঞ্চারণ করিবেন না।

একদিন শ্রীযুক্ত দীনেশ ভট্টাচার্য্য ভক্তিরত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পত্র শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন—হাওড়াতে একবার ব্রজবালা দুইটি বালিকাকে দুই ক্রোড়ে বসাইয়া একজনকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এবং অপর-জনকে শ্রীরাধারাণীর রূপ বর্ণনা করিতে বলিলে তাহারা প্রেমাবিষ্ট হইয়া এমন সুন্দরভাবে যুগলরূপ বর্ণনা করিল যে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

তদীয় গুরুপুত্র শ্রীমদ্ যোগজীবন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া স্বামিজির প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জে কিছুদিন ছিলেন। ব্রজবালা তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবের অভিন্ন-তনুবোধে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রে শয়নের পূর্বক্ষণ

পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপুত্রের আজ্ঞাপালনের প্রতীক্ষায় করযোড়ে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তের দিন পর্য্যন্ত এইভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি প্লেগরোগে পীড়িত হইয়াও শ্রীগুরুকৃপায় অচিরে আরোগ্যলাভ করিলেন—(১৩১২ সালের ঘটনা)।

শ্রীবৃন্দাবনবাসের সময় মথুরার জনৈক দরিদ্র চৌবে ব্রাহ্মণ কন্যাদায় জানাইলে ব্রজবালা তাঁহার কন্যা জানকীবালাকে (কোকিলা দেবীকে) বিবাহ করেন। যে দিন জুটিল খুব খাও, যে দিন জুটিল না, সেদিন উপবাস চলিল। তখন গাড়ীঘোড়া রাখিলেন—কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—'গৃহস্থালী করিতে গেলে গাড়ীঘোড়া চাই।' শিষ্যরা মাঝে মাঝে টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু টাকা পৌঁছাইলেই ব্রজবাসিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেন এবং ফলতঃ দুই তিন দিনেই টাকা ফুরাইয়া যাইত। সরলপ্রকৃতি জানিয়া তত্রত্য দোকানদারগণও একগুণে তিন গুণ একবারে তিনবার আদায় করিতেন। শিষ্যগণ প্রতিবাদ করিলে তিনি বলিতেন—'তোমরা কুঞ্জের ভার লইও এবং এই কুঞ্জে বাস করিও, তাহা হইলে ইহারা এরূপ করিতে পারিবে না।' আবার দেনার দায়ে তিনি বালানন্দ-নামক শিষ্যের উপর কুঞ্জের সেবা ও কোকিলা মাতার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া বাঙ্গালা দেশে আসেন।

হাওড়াতে অবস্থানকালে এবার বালানন্দজি দেহরক্ষা করিলেন, কোকিলা মাতাকে বঙ্গদেশে আনাইলেন। শ্রীধামের শ্রীব্রজনাগর এবং অন্যান্য বিগ্রহগণকে আনাইয়া প্রথমতঃ মেদিনীপুরে ও পরে স্বজন্মভূমি ধামরাইতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন পুত্র অশ্বিনীকুমার ও প্রথমা পত্নী বিন্দুবাসিনী দেবী সেবা চালাইতে লাগিলেন—(১৩১৯ সনের ঘটনা)।

মেদিনীপুর সহরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজির মন্দিরে শ্রীবকুলকুঞ্জে তিনি

কোকিলামাতার সঙ্গে কয়েক বৎসর ছিলেন। দিবারাত্র শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীতে অতিবাহিত হইত। এস্থানে থাকিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী পাঁচেট, জনকপুর প্রভৃতি স্থানে নামপ্রেম প্রচার করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের ভক্তগণ তাঁহাকে নিকটে রাখিবার জন্ত আশ্রমের ব্যবস্থা করিতেছিলেন আবার হাওড়ার শিষ্যগণও উকিল কেশবচন্দ্র দের উদ্যোগে তাঁহাকে হাওড়ায় রাখিতে চেষ্টা করিলেন। এ সময় তিনি কোকিলাদেবীকে সঙ্গে লইয়া ধামরাই গেলেন এবং গৃহশিক্ষকতা করিয়া এম, এ, ক্লাসে পড়িতে লাগিলেন। কয়েকমাস ধামরাইতে থাকিয়া বিন্দুবাসিনী দেবীর সহিত মতান্তর হইলে কোকিলা মাতা স্বপিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন, আবার স্বামিজিও কলেজ ত্যাগ করিয়া হাওড়া আশ্রমে আসিয়া তন্ত্রোক্ত-শক্তিসাধনে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

বহুবিধ ঘটনা-পারম্পর্য্যের পরে জনৈক দুষ্ট শিষ্য তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করে—এজন্য প্রাণহানি না হইলেও তিনি যথেষ্ট ভুগিয়াছিলেন, অথচ অনেক পীড়াপীড়িতেও সেই শিষ্যটির নাম প্রকাশ করিলেন না। এইরূপে বিবিধ অদ্ভুত দুর্জ্ঞেয় লীলা করিয়া ইনি ১৩৩৫ সালে ৫ই শ্রাবণ স্বধামে গমন করিয়াছেন।

৪২০ গৌরাব্দে শ্রীধাম নবদ্বীপে হরিসভা হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল। ইতঃপূর্ব্বে একমাস কাল সংকীর্ত্তনে প্রায় মাসাবধি কাল উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া ব্রজবালার দক্ষিণ পদের নিম্নস্থ সন্ধিস্থল ভগ্নপ্রায় এবং অস্থিগুলি স্থানচ্যুত হইয়াছিল, তিনি যন্ত্রণায় উত্থানশক্তি-রহিত হইলেন এবং তত্রত্য বিল্বমূলে শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্নের টোল-বাগানে বসিয়াছিলেন। ঐ সময় জয়নিতাই প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'আজ যদি তুমি নগর-কীর্ত্তনে নাচিতে পার, তবে জানিব তুমি ভক্তাবতার।' স্বামিজি বলিলেন—'যন্ত্রণায়

আমার প্রাণ যায়, আমি কিরূপে নৃত্য করিব ? সন্ধ্যাকালে সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় ঐ টোলবাড়ীর দ্বার হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ব্রজবালা মহাপ্রভুর প্রতি অভিমান-ভরে বলিলেন—"গৌর ! তুমি যে বল, আমায় ভালবাস, তুমি আমার দক্ষিণ বাহু, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ইত্যাদি—সে সব ত জানা গেল !!" এইভাবে বলিতে বলিতেই তিনি দেখিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বপ্রভায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। দেখামাত্রই ব্রজবালা মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন এবং শ্রীপ্রভুও তদীয় দেহে আবিষ্ট হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর-পরিক্রমা করিয়া আবার হরিসভায় ফিরিলেন। ব্রজবালা বিল্বমূলে বসিয়া দেখিলেন যে চরণে ব্যথামাত্র নাই। সকল ভক্ত এই ব্যাপারে চমৎকৃত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাশক্তির জয়-ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি তিন চার বৎসর শ্রীনবদ্বীপে ছিলেন। দিবানিশি ইষ্টমন্ত্রজপ, মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নান, অঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপন ইত্যাদি করিতেন, আহারের চেষ্টা নাই—ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল। ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সুরধুনীর কূলে কূলে কীর্ত্তন করিতেন, কখনও বা বালকবৃন্দ-বেষ্টিত হইয়া গলিতে গলিতে 'হরিবোল' বলিয়া মধুর নৃত্য করিতেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল রামদাস বাবাজি মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে বাসকালে ইঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, বহু অপার্থিব ভাবসম্পত্তি দেখিয়াছেন এবং নিত্য তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্মরণও করেন সাঁতরাগাছিতে একবার ব্রজবালা বালকদিগকে বলিলেন—'তোরা কি দেখ্‌বি ? কৃষ্ণ, না কালী, না শিব ?' বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ভাবানুযায়ী দর্শন পাইয়া সমাধিস্থ হইতেছিলেন। একবার স্তন্যপায়ী, শিশু-ক্রোড়ে জননীর দীক্ষাগ্রহণের সময়ে মাতাপুত্র উভয়েই সমাধিস্থ হইয়াছিল। একবার ব্রজবালা শ্রীযুক্ত বাবাজি মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ব্রজ-পরিক্রমায় বাহির

হইয়াছিলেন—লীলাস্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই তাঁহারা তত্রত্য লীলামালার স্ফূর্ত্তিতে দর্শন পাইতেছিলেন। প্রেমসরোবরের নিকটবর্ত্তী বাগান হইতে একটি গোলাপ পুষ্প চয়ন করিয়া ব্রজবালা বাবাজি মহাশয়ের নিকটে রাখিয়া ঐ সরোবরে স্নান করিতেছিলেন—বাবাজি মহাশয়কে বলিয়া গেলেন—'দেখিস্ যেন ফুলটি কেহ না নেয়', কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে কতক্ষণ পরেই এক কিশোরী ব্রজবালিকা তাহার মাতা ও মাতামহীর সহিত আসিয়া ফুলটি লইয়া গেল। আবেশে ব্রজবালা ফুল নিতে বারণ করিলে অভিমানভরে সেই বালিকাটি বলিলেন—'মেরী হি ফুল হ্যায়, মেনে ল্যায়ো'। বাবাজি মহাশয়ের মুখে আর বাক্য নাই, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় ব্রজবালা ও বাবাজি মহাশয় তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণক্রমে যাইতে যাইতে যশোদা কুণ্ডের ধারে গিয়া দেখেন যে তাঁহারা অদৃশ্য হইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন—'রামদাস। যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিস, উহা তোর সিদ্ধদেহ' ইত্যাদি। একবার মেদিনীপুরে অবস্থান-কালে ব্রজবালার বিরুদ্ধে কয়েকজন লোক তাঁহারই পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে থাকিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল। শিষ্যগণ ব্যাপার বুঝিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন এবং কোনও বিপদ আসিলে তাহার প্রতিকার বা প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। এমন সময় ব্রজবালা বলিলেন—'ওরে তোরা হরিনাম কর।' এ কথাতেও শিষ্যগণের চাঞ্চল্য দূর না হইলে তিনি হাতে তিনটি তালি দিয়া বলিলেন—'দেখ্ত ওঘরে ওরা কি করছে ?' একজন সেই ঘরে গিয়া দেখিলেন যে উহারা প্রতিকূলতা ত্যাগ করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিয়া গড়াগড়ি দিতেছে !!

বালকবালিকাগণকে তিনি 'গোপাল-গোপালী' বলিয়া আদর করিতেন। শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কথা তাঁহার মুখে ছিল না। তাঁহার ধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক ছিল। নামকীর্ত্তনে খোল করতাল বা

সুর-তাল-লয়ের অপেক্ষা ছিল না। হাতে তালি দিয়াও 'হরিবোল' বলিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতেন। কীর্ত্তনে খোল বাজিলে তাঁহার নৃত্য আরম্ভ হইত। সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন। একবার তিনি চলন্ত ঘোড়াগাড়ী হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নগরকীর্ত্তনে যোগ দেন। শ্রীহরিনামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইতেন। তিনি বলিতেন—'উচ্চপদস্থ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান দেখাই, আর শ্রীভগবান্‌কে সম্মান দেখাইব না?' *

রচিত গ্রন্থাবলি—(১) চিত্রমোচন কাব্য, (২) প্রীতিকুসুম, (৩) ধ্রুবচরিত্র, (৪) Sri Radhakrishna Gouranga in the Best Indian Pelf. (৫) The Divine Manual, (৬) প্রসূনাঞ্জলি, (৭) লীলাম্বুধি, (৮) গীতি-বৈজয়ন্তী। এতদ্ব্যতীত আরো নয় খানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দৃষ্ট হয়—তাহা তদীয় শিষ্য অমরবাবুর সন্ধানে আছে।

শ্রীশ্রীহরিবোলানন্দ ঠাকুর

যশোহর জিলায় ঝিকরগাছা ঘাট ষ্টেসন হইতে অনতিদূরে গঙ্গানন্দ-পুর-নামক গ্রামে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-দিবসে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। এই গ্রামটি শ্রীপাট বোধখানার নিকটবর্ত্তী। ইঁহার পূর্বাশ্রমের নাম—শ্রীনবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ইঁহার ছোট ভাইর নাম ছিল—শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য। ইনি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন—গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন—বালককাল হইতেই ইনি নির-পেক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সরল ও ব্যবহার-নিপুণ ছিলেন। বিষয়-ব্যাপারে সামান্য গৃহ-বিবাদ ছল করিয়া ইনি জন্মভূমি ত্যাগ করত কলিকাতা কালীঘাটে আসিয়া মাতৃ-মন্দিরের সম্মুখে 'মা, মা' বলিয়া

* তদীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ দেব মহোদয়ের সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত হইল।

'হত্যা' দিয়া পড়েন। তাহাতে আদেশ হইল—'পদব্রজে ভারতবর্ষ পর্য্যটন করত ভারতের যাবতীয় তীর্থ দর্শন কর।' প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি তীর্থাটন করিতে বাহির হইলেন—কপর্দকহীন অবস্থায় একাকী অর্দ্ধাশনে, অনশনে দিবারাত্রি পথ চলিয়া চলিয়া সকল তীর্থই দর্শন করিলেন—ইহাতে তাঁহার বহু বৎসর অতিবাহিতও হইল; কিন্তু প্রাণে শান্তি না পাইয়া তিনি পুনরায় কালীঘাটে আসিয়া মায়ের চরণে নিবেদন করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে তখন শ্রীকালীমাতা প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে শ্রীমুখে বলিলেন—"বাবা, কলিকালে হরি-নামই সত্য ও সারাৎসার। তুমি নিরন্তন **'হরিবোল'** এই নামমন্ত্র কীর্ত্তন কর এবং অবিচারে সকলকে পায়ে ধরিয়া এই হরিবোল-নাম বিতরণ কর।" আদেশ পাইয়া তিনি নিরন্তর হরিবোল-নাম করিতে লাগিলেন, বাগ্‌বাজারে থাকিয়া প্রত্যহ পদব্রজে কালীঘাটে যাইয়া মাতাকে দর্শন করিতেন এবং যাতায়াতের কালে সম্মুখে যাহাকে দেখিতেন তাঁহারই চরণে ধরিয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' করিতেন, তাঁহার মুখে হরিবোল নাম উচ্চারিত হইলেই চরণ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন—পথিকটি যতক্ষণ নামোচ্চারণ না করিতেন, ততক্ষণই ইনি চরণে পড়িয়া থাকিতেন। এইভাবে একবার চৌরঙ্গি রোড দিয়া গমনকালে এক ইংরেজ সাহেবের চরণে ধরিয়া কেবল 'হরিবোল' করিতেছেন, সাহেব কিছু না বুঝিয়া প্রথমতঃ ইঁহাকে সামান্য ভিক্ষুক মনে করত পয়সা দিতে চাহিলেন—কিন্তু ইনি ত আর পয়সা চান নাই, মুখে নামোচ্চারণই ইঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। সাহেব শেষকালে ইঁহাকে পাগল মনে করিয়া চাবুক মারিতে লাগিলেন—পৃষ্ঠে রক্তের স্রোত বহিল—তথাপি কিন্তু এই মহাপুরুষ চরণ ধরিয়াই পড়িয়া রহিলেন। কৌতুক দেখিবার জন্য বহু পথিক সমবেত হইল—ব্যাপার না জানিয়া সকলেই অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। তখন একজন বাঙ্গালী বাবু আসিয়া সাহেবকে বুঝাইয়া দিল যে ইনি টাকা পয়সার প্রার্থী নহেন, ভগবানের নাম করিতে বলিতেছেন। এই কথা শুনিয়াই সেই সাহেব হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক স্বভাষায় (God) ভগবন্নাম করিতেই ইনি চরণ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এইভাবে তিনি শেষ দিন পর্যন্তই জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণনির্বিশেষে উত্তম-অধম; বয়োজ্যেষ্ঠ-বয়ঃকনিষ্ঠ প্রভৃতি কিছুরই বিচার না করিয়া সকলের চরণে ধরিয়া 'হরিবোল' বলিতেন। জগতে ব্যবহার-যোগ্য যত দ্রব্য আছে, তাহাদের নাম করিতে ইনি 'হরিবোল' সংযুক্ত করিয়া বলিতেন; যেমন ভাত হরিবোল, ডাল হরিবোল, তরকারি-হরিবোল ইত্যাদি। 'হরিবোল'-নাম না শুনিলে তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপই করিতেন না। মহানিরপেক্ষ হইয়া তিনি কলিকাতা মহানগরীর প্রতি গলিতে বিচরণ করিয়া অনলসে নাম বিতরণ করিতেন। পরিধানে কটিবেড়া বর্হির্বাস, গাত্রে যৎসামান্য আবরণ, মাথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদের পরিত্যক্ত দোনা-দ্বারা নির্ম্মিত টুপি, স্কন্ধে ক্ষুদ্র ঝোলা এবং হস্তে শঙ্খ ধারণ করিয়া এই মহাপুরুষ নিরন্তর হরিবোল করিয়া বেড়াইতেন। কখনও বা শঙ্খের সাহায্যেও হরিবোল করিতেন অর্থাৎ এমনভাবে শঙ্খধ্বনি করিতেন, যাহাতে কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির সহিত ঐ শঙ্খধ্বনিও মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে হইত, সময় সময় আবার শঙ্খধ্বনিও কণ্ঠধ্বনিবৎ শ্রুত হইত। এখন হইতে ইনি 'হরিবোলানন্দ' ঠাকুর-নামে অভিহিত হইলেন।

ইঁহার অলৌকিক শক্তিতে তৎকালে কলিকাতার বহুলোক সমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন—কলেজ স্কোয়ারের নিকটবর্ত্তী শ্রীরাধানাথ মল্লিক লেইনের শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মল্লিক মহাশয় ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের এক একটি নাম লইয়া ইনি এক এক

শিষ্যের নামকরণ করিতেন এবং তাঁহাতে তজ্জাতীয় শক্তি ও উন্মাদনা দিয়া ইনি তাঁহাকে তদ্ভাবাবিষ্ট করিয়া দিতেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীঅদ্বৈত-নাম কোনও শিষ্যকেই দেন নাই। তদ্‌ব্যতীত তিনি নিত্যানন্দ, রামানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি নামকরণ করিয়া শিষ্যদিগকে ডাকিতেন। সকল শিষ্যই তাঁহার আদর্শে ও আনুগত্যে নিরন্তর 'হরিবোল' করিতেন এবং আগন্তুক ব্যক্তিমাত্রেরই চরণে লোটাইয়া প্রণাম করত কথা বলিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি উচ্চ জাতিকে কদাচিৎ কৃপা করিলেও ইঁহার শিষ্যগণ-মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন—কামার, কুমার, ধোপা, ডোম প্রভৃতি নীচ ও অনুন্নত জাতি।

কলিকাতায় মহামারী প্লেগের সময় ইনি পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র মল্লিক বাবুর সাহায্যে বহু টাকা ব্যয় করিয়া কলিকাতার প্রতি গলিতে হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়াছেন—ট্রামে ট্রামে তখন কীর্ত্তনদল বাহির হইয়াছিল, মহানগরীর সর্ব্বত্র বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়া দিবারাত্রি সঙ্কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—প্রত্যক্ষদর্শী পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি মহারাজ বলেন যে তৎকালে এই মহা-সঙ্কীর্ত্তনে মহানগরী এমনভাবে মাতিয়াছিল যে খৃষ্টানগণও সঙ্কীর্ত্তন দেখিলে টুপি খুলিয়া মাটীতে পড়িয়া দণ্ডবৎ করিত, মুসলমানগণ গললগ্নীকৃতবাসে সঙ্কীর্ত্তনদলকে সম্বর্দ্ধনা করত মসজিদে লইয়া গিয়া নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিত, তাহারাও সঙ্কীর্ত্তনদলের সহিত স্বজাতীয় পতাকাদি উড়াইয়া কোরাণ গান করিতে করিতে পথে পথে বেড়াইত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক সদলবলে সেই মহাসঙ্কীর্ত্তন-লীলাই তখন দর্শক-বৃন্দের সাক্ষাতে পুনঃ প্রকট হইয়াছিল বলিয়াই অনেকের ধারণা। বলা বাহুল্য—শ্রীহরিবোল ঠাকুরই এ জাতীয় মহাসঙ্কীর্ত্তনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। ক্ষেত্র বাবুও যখন ঐ রোগে আক্রান্ত

হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিলেন, তখন ঠাকুর কালীঘাটে যাওয়ার পথে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া জানিলেন যে ক্ষেত্রবাবু মুমূর্ষু হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিরে ক্ষেত্তর! কি বলছিস্?' তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন 'এই শেষ বিদায়।' ঠাকুর তখনই কালীঘাটে গিয়া মায়ের খাঁড়ার জল আনিয়া দিয়া পরিচারকগণকে বলিলেন—'বাবু এক্ষণই ঘুমাইয়া পড়িবে, ঘুম থেকে উঠে যা' খেতে চায়, তাই তাকে অবিচারে দিবি।' অহো! সেই চরণামৃত পান করা মাত্রই ক্ষেত্রবাবু বহু দিন পরে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন এবং চার পাঁচ ঘণ্টা সুনিদ্রার পরে বুভুক্ষু হইয়া মুগের ডাল দিয়া অন্ন খাইতে চাহিলেন। ঠাকুরের আদেশমত যথাসময়ে আহার করিয়া তিনি সম্যক্ প্রকারে সুস্থ হইলেন—এই ব্যাপারে ঠাকুরের খুব প্রতিষ্ঠা হইল। ঠাকুর কিন্তু প্রতিষ্ঠার ভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া একেবারে কাশীবাসী হইলেন। এস্থানে তিনি ব্রহ্মকুণ্ডতীরে গণেশ মহল্লায় ভজন-স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী আগরপাড়ায় বাগানবাড়ীতে অবস্থানকালে ইনি স্বীয় শিষ্যগণদ্বারা গঙ্গা হইতে মাটি তোলাইয়া বাবুদের প্রায় এক বিঘা জমি বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ্ঞাবহ শিষ্যগণ ঠাকুরের আজ্ঞামত মুখে নিরন্তর নাম করিতেন এবং সারাদিন অম্লানবদনে মাটি কাটিতেন। একবার একজন শিষ্য সন্ধ্যাকালে বলিলেন—'ঠাকুর, সারাদিন খাওয়া হয় নাই, এখন ত ক্ষিদে পেয়েছে; কিছু খেতে দিন।' তখন তিনি ক্রোধচ্ছলে গঙ্গামাটির সহিত গোবর গুলিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন—অহো! সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্তটিও তখন মহানন্দে তাহা পান করিয়া বলিলেন—'এমন অমৃত সারাজীবনে কখনও আস্বাদন করি নাই।' ঠাকুর শিষ্যগণকে প্রায়ই বলিতেন—'দেখ! আমি রাজা, কেননা গঙ্গামাটি খাইয়াও থাকিতে পারি।'

উত্তরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ ধাঁড়া-মহাশয়কে ইনি শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া 'গদাধর হরিবোল' নাম দেন। ঠাকুর কখনও কখনও গঙ্গায় ভাসিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন—দুই তিন দিন থাকিতেন এবং বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর প্রভৃতি স্থানে গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরিয়া উচ্চ হরিবোল করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতাকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহার নামের এতই আকর্ষণ, এতই উন্মাদনা, এতই মনোমদতা ও এতই তৃপ্তিপ্রদায়কতা ছিল যে অত্যল্পবয়স্ক বালকগণও তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না—তিনিও তাহাদিগকে নিয়া নাম করিতেন, প্রসাদ খাইতে দিতেন, কত ভালবাসিতেন, কত আদর করিতেন। বালক-জীবন ঠাকুর যে পথ দিয়া হরিবোল ধ্বনি করিয়া যাইতেন, তৎপার্শ্ববর্ত্তী গৃহসমূহ হইতে বালকগণও উচ্চকণ্ঠে হরিবোল করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইত—তিনি তাহাদের চরণে ধরিয়া অত্যুচ্চকণ্ঠে হরিবোল করিতেন, বালকেরাও তাহাতে যোগদান করিলে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-নাট্যের অবতারণা হইত, তাহা কেবল ভাগ্যবান্ শ্রোতাদের ও দ্রষ্টাদেরই আস্বাদ্য এবং অনুভবনীয় ছিল।

ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই সমধিক প্রসিদ্ধ—শ্রীক্ষেত্রনাথ মল্লিক, শ্রীবিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মাকড়দহবাসী), পূর্বোক্ত শ্রীহরিচরণ ধাঁড়া (উত্তরপাড়াবাসী), ভূপাল (কামারহাটিবাসী), রজনীকান্ত দত্ত (মেদিনীপুরবাসী), চারুচন্দ্রপাল (বড়মাণিকপুর মেদিনীপুরবাসী) বিনয় মৈত্র, গদাধর দাস, নিবারণ, শরৎ, রাখাল প্রভৃতি।

শ্রীবিপিনবাবু যখন রাউজানের মুন্সেফ্, তখন ঠাকুর একবার তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া রাউজানে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পরে বিপিনবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঠাকুর! তোমার

স্বরূপের পরিচয় দাও।' ঠাকুর বলিলেন—'বাবা! আমি হরিবোল।' বিপিন বাবু তিন চার ঘণ্টা যাবৎ চেষ্টা করিয়াও যখন ঠাকুরের মুখ হইতে স্বরূপের কথা বাহির করিতে পারিলেন না, রাত্রি এগারটার সময় একটি বন্দুক (Revolver) লইয়া নিজের বুকের উপর ধরিয়া বিপিন বাবু বলিলেন—'দেখ ঠাকুর! পরিচয় দিবে ত দাও, নইলে এক্ষণই তোমাকে ব্রাহ্মণহত্যার দায়ে পড়িতে হইবে।' এই বলিয়া বুকে বন্দুক ছুড়িবার উপক্রম করিলে ঠাকুর বলিলেন—'আমি সাক্ষাৎ শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।' বিপিন বাবু তখনই শ্রীচরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন—'তবে বল যে আমি ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়কে অভয় পাদপদ্ম দিলাম।' প্রথমতঃ ঠাকুর কিছুতেই বলিতে চাহেন না, পরে রামানন্দ (বিনয় মৈত্র) ও বড় মা (বিপিন বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী) প্রভৃতিকে সাক্ষী রাখিয়া তিনি বিপিন বাবুর প্রার্থিত পূর্ণ করিলেন।

মাকড়দহের বাড়ীতে, কালনায় এবং অন্যান্য স্থানে বিপিন বাবুর অবস্থান-কালেও ঠাকুর তাঁহার গৃহে আসিতেন। ঠাকুরের সাক্ষাতে ক্ষুদ্র জিনিষটিও অযথা নষ্ট হইবার উপায় ছিল না—বাগানে সুপারী ও নারিকেলের শুষ্ক ডাল পড়িয়া থাকিলে তিনি সেগুলি কাঁধে বহিয়া বিপিন বাবুর বাড়ীতে আনিতেন—তাহাদ্বারা ঠাকুরের ভোগ-রান্নার সহায়তা হইত। উনুনের ছাই পর্য্যন্ত তিনি ফেলিতেন না—ছাইগুলি উত্তমরূপে ছাঁকিয়া তাহাদ্বারা কাপড় পরিষ্কার করিতেন।

কৃপার্থী হইয়া ইঁহার নিকটে কোন ভক্ত আসিলে ইনি প্রথমতঃ তাহাকে তামাক সাজিতে আদেশ করিতেন—তত্র সমবেত ভক্তগণের তামাক খাওয়া হইলে কলিকাটি ঢালিয়া দেখিতেন তামাকটা সব পুড়িয়াছে কিনা; যদি না পুড়িত, তবে বলিতেন যে ইহাদ্বারা ভগবদ্ভজন হইবে না। শিষ্যগণের প্রতি তাঁহার তীব্র শাসন চলিত—

অথচ যিনি নিরন্তর হরিনাম করিতেন, তাঁহাকে বড়ই আদর করিতেন আর যিনি হরিনামে ত্রুটি করিয়া সর্বসদাচার পালন করিতেন, তাঁহাকে তিনি উপেক্ষাই করিতেন! তাঁহার কথা ছিল—যিনি সদা হরিনাম করেন, অথচ সদাচার করিতে পারেন না, তিনি ৬৩ পয়সা আর যিনি নামে ফাঁকি দিয়া সদাচার-রত তিনি ১ পয়সা। হরিনাম-পরায়ণ জন অন্যায় অত্যাচার করিলেও তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না কিন্তু ভক্তাপরাধ হইলে আর উপায় ছিল না। তদীয় শিষ্য গদাধর এত উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিতেন যে একটি বিশাল গ্রামের সকল লোকই তাঁহার নাম সুস্পষ্ট শুনিতে পাইত, কিন্তু তিনি সদাচার-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন—ঠাকুর তাহা জানিয়াও কিছুই বলিতেন না; কিন্তু একবার গদাধর কোনও ভক্তগৃহে একটি অন্যায় করাতে ভক্তটি ঠাকুরের নিকট অভিযোগ করা মাত্রই ঠাকুর গদাধরকে ডাকিয়া বলিলেন 'আজ তোর সব প্রেম আমি শুষিয়া লইলাম।' বস্তুতঃ গদাধর ঠাকুর-কর্তৃক ত্যাজ্য হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন, তাঁহার কণ্ঠে আর সেই স্বরও ছিল না, যতদিন জীবিত ছিলেন, ম্রিয়মাণ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেম দিতে ও নিতে যে মহাশক্তি ছিল, এই ঘটনাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিনয় বাবুকেও ইনি বাক্য অবহেলা করায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বিপিন বাবুর সেবায় এগার বৎসর ছিলেন বলিয়া পরে ঠাকুর প্রসন্নও হইয়াছিলেন—বিপিন বাবুর নড়াইলে অবস্থান-কালে বিনয় বাবুকে তাঁহার স্ত্রী আসিয়া আবার গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভাষা সহজে বুঝিবার উপায় ছিল না শিষ্যদের মধ্যে কাহাকেও শাসন করিতে হইলে তৎকৃত দোষটি নিজের উপর আনিয়া বলিতেন যে আমি অমুক দোষে সর্ব্বদা দোষী এমনভাবে

বাক্যভঙ্গী চালাইতেন যে তাহাতে দোষী শিশুটির যথেষ্ট শিক্ষা ত হইতই, তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য ভক্তদেরও যথেষ্ট উপকার হইত।

নিম্নে বিপিনবাবু ও অন্যান্য ভক্তদের নিকট শ্রীহরিবোল ঠাকুরের লিখিত পত্রাবলি হইতে চয়ন করিয়া কয়েকটি মূল্যবান্ উপদেশ বিন্যস্ত হইতেছে—

"...আনন্দশক্তির সঙ্গে জীবনীশক্তি যায়। আনন্দই জীবের জীবন-মাত্র।........ আমি নিশ্চয় জানি—শ্রীগৌরাঙ্গহরির একপ্রকার হাওয়া আমি—ইহা ভিন্ন কোনপ্রকার পদার্থ নহি। মূলবস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম সার। ইহার অধিক নাই সংসার-ভিতর........... যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে (তাদের) মধ্যে গৃহী শ্রেষ্ঠ ও সনাতন। কলিতে গৃহ-ধর্ম্মের তুল্য আর ধর্ম্ম নাই।.........যে আমটি পেকে পাতার ভিতর থাকে, সে আমটি অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে কালেতে। আর যেটি বাহিরে থাকে, তাকে সকল পাখীতেই ঠোক্‌রে ঠোক্‌রে... দেয়।.... ...গৃহী জীবের প্রায় গোপনভাবে ভজনা করা ভাল। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন নানাবিধ আছে—তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন। ....রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া খুব পেট ভরে নৃত্যকীর্ত্তন। ....ভক্তের রূপও মনোহর, ভাবও মনোহর, কলিতে ভক্তকৃপা ....ভক্ত ত ভগবান্-বিশেষ।.........মূল বিশ্বাস—পারের কড়ি। ....কামিনীকাঞ্চন-বিষয়ে কলিতে মহাজনগণ গৃহধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন। এখন গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিলে হয়।.. ......কলির তুফান থাকিবে এবং সত্যের আনন্দও থাকিবে। ......তোমরা ছদ্মবেশী মহাপুরুষ; তোমাদের নাম প্রাতঃস্মরণ হইলেই সেদিন শুভ হইবে। তোমরা জগৎকে পবিত্র করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ।......... স্মরণই একপ্রকার দেখা, স্মরণে রূপ মনে হয়, রূপে আত্মায় আত্মায় মিলন হয়।......মনে না হইলে কোনপ্রকার দেখায়

ফল নাই।……তোমাদিগের শ্রীহরিপদে মতিমঙ্গলই আমার মঙ্গল। ইহা ভিন্ন আমার মঙ্গল কি?……হরি সহজ বড় চেনা; কিন্তু ভক্তের আঁখির জলে কেনা। ভক্তের ভগবান্ হরি সত্য, গুরু সত্য। ……যে কর্ম্ম করিয়া পরে আনন্দ-নাশ হয়, এমন কর্ম্ম বৈধ নয়। ……মনের খেদ ভগবান্ মিটাইতে পারেন—ইহা ভিন্ন মনুষ্যের মিটাইবার সাধ্য নাই। হরিনামে সর্ব্বশক্তি—যে নাম সেই হরি, নামী বড় সাহেব, নামে বিশ্বাস। আমি অতিক্ষুদ্র কীট। নাম নিত্যবস্তু হরি, তাহাতে কোন দোষ লাগে না।"

শ্রীহরিবোল ঠাকুর বিপিনবাবুকে কত প্রীতি করিতেন, তাহা নিম্নলিখিত পত্রখানিতে ব্যক্ত হইয়াছে—"……অদ্যাপি কৃষ্ণকথা বলিতে হইলে শ্রীরামনিত্যানন্দ অথবা ব্রজবিপিনে না বলিলে মনের তৃপ্তি ও শান্তিলাভ হয় না। বোল হরিবোল।……কৃষ্ণকথা কাহাকে বলিয়া প্রাণ জুড়াই? সেই লোক ভারতে বহু অন্বেষণের পর শ্রীরামনিত্যানন্দকে পাইয়াছিলাম; তাই প্রাণটা প্রাণে থাকিল, নইলে দম ফুটে যাইত। হা গৌরাঙ্গ!"———

ঠাকুর বলিতেন—"হরিবোল-নামে গুরু গৌর গোপী রাধে শ্যাম সব বর্ত্তমান, শুধু হরিবোল বলিলেই সব নাম বলা হয়। তোরা জঙ্গলের ভিতর আমাকে নিয়ে আমার মুণ্ডটা কেটে ফেল, সেই কাটা মুণ্ড যদি হরিবোল না বলে, তোরা আর হরিবোল বলিস না।'

ঠাকুর বড় মাতৃভক্ত ছিলেন, তাঁহার গর্ভধারিণীর শেষ সময়ে তিনি নিকটে থাকিয়া যাবতীয় সেবা নিজ হাতেই করিতেন। শ্রীগোপাল-বিগ্রহের যখন সেবা করিতেন, তখন নিজ হাতে সব কিছু করিতেন। বৈষ্ণবসেবা করিবার অভিলাষ হইলে এক হাঁড়ি খিঁচুড়ি রাঁধিয়া বাহিরে বসিয়া থাকিতেন—উপস্থিত লোকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেন 'একটু প্রসাদ পাবে?' অনুমতি হইলে প্রসাদ দিতেন—এরূপে

প্রসাদ বিতরণ শেষ হইলে ঘরে চলিয়া আসিতেন, তিনি কখনও নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিতেন না। শিষ্যদিগকে নিয়মিতভাবে তিন বেলা স্নান ও পরিমিত আহার করিতে এবং সদাকালের জন্য মুখে নাম রাখিতে নিত্য উপদেশ করিতেন, ত্রুটি বিচ্যুতিতে কঠোর শাসন করিতেন।

শ্রীবরাহদ্বাদশী তিথিতে ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। পরম পূজ্য ভাগবত-প্রবর শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি মহাশয়কে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। বাবাজি মহাশয় কলুটোলা থাকিতে ঠাকুর অপ্রকটের পরেও একদিন সকালবেলা শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে শীলেদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া শ্রীযুক্ত অদ্বৈতদাস বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'রামদাস কোথায় রে!' তিনি উত্তর দিলেন 'ভিতরে আছেন, একটু বসুন, এই ডাকিয়া দিতেছি।' এই কথা বলিয়া তিনি ভিতরে গেলে ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজি মহাশয় বাহিরে আসিয়া কিছুই না দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সকলেরই স্মরণ হইল যে ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব্বেই অপ্রকট হইয়াছেন !!

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কাষ্ঠকাটা শ্রীজগন্নাথ দাস ঠাকুরের অষ্টম অধস্তন-রূপে শ্রীপাদ শিরোমণি প্রভু ১৭৬৮ শকাব্দায় ২০শে পৌষ অমাবস্যাতিথিতে আবির্ভূত হন। কাষ্ঠকাটা গ্রাম এক্ষণে 'কাঠাদিয়া' নামে অভিহিত হয়। ১৪০৯ শকাব্দে শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীতে ঠাকুর জগন্নাথ আচার্য্য মহারাজ আদিশূর-কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের অন্যতম যজুর্ব্বেদী কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ মহর্ষির ত্রয়োদশ অধস্তনরূপে কাষ্ঠকাটায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশাদি-

মতে ঠাকুর জগন্নাথ স্থচিত্রা সখীর যুথে দ্বিতীয়া সখী তিলকিনীর অবতার।

পূর্ব্বকালে মহারাজ বল্লাল সেন বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনও পরে ঐ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন হলায়ুধ। তিনিও ঐ কাষ্ঠকাটা গ্রামে বাস করিতেন। হলায়ুধের পুত্র চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, তৎপুত্র রত্নাকর মিশ্র; তাঁহার দুই পুত্র সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ (প্রকাশ্য নাম বসন্তরাম)। সর্ব্বানন্দের পুত্রই ঠাকুর জগন্নাথ। ইনি অল্পবয়সেই মাতৃপিতৃহীন হইয়া পিতৃব্যের অধীনে লালিত পালিত হন। অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও ইনি স্বতঃস্ফুরিত শাস্ত্রযুক্তি-সম্মত ভক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ তত্ত্বোপদেশ ও শ্রীহরিকথার প্রচারে তৎকালে পণ্ডিত-গণকে জয় করিতেন। পণ্ডিত-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহানলে অন্তরে অন্তরে দন্দহ্মান হইতেন এবং দৈহিক কৃত্যাদি ভুলিয়া 'হা নাথ' বলিয়া নিদারুণ রোদন করিতেন। একদা ভক্তবৎসল গৌরাঙ্গ স্বপ্নযোগে ইঁহাকে বলিলেন—'তুমি আমার তিলকিনী সখীর অবতার, আমি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন, এক্ষণে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি; শীঘ্রই সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুরে যাইতেছি, তুমি অদ্বৈত-মন্দিরে আমার সহিত মিলিত হও।' প্রত্যাদেশ পাইয়াই ইনি 'হা নাথ' বলিতে বলিতে শান্তিপুরের দিকে ছুটিলেন এবং নির্দ্দিষ্টকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া সপরিকর মহাপ্রভুর দর্শন পান এবং শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের নিকট লুপ্তকাম দশাক্ষর গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কিয়দ্দিন পরে আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করত পূর্ব্বপুরুষের সেবিত শ্রীদামোদর শালগ্রাম না পাইয়া তত্রত্য ঘাসী-পুকুরের তীরে হত্যা দিয়া স্বপ্নাদেশে **শ্রীশ্রীযশোমাধব** বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। পরে ঐ বিগ্রহ কাঠাদিয়া হইতে স্বপ্নাদেশ দিয়া নিকটবর্ত্তী

আড়িয়াল গ্রামে নবাব সরকার হইতে এক জায়গীর তালুক পাইয়া বাস করিতে থাকেন। ঠাকুর জগন্নাথের সন্তানগণ ক্রমে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া আড়িয়াল, কামারখাড়া, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথ—রামনরসিংহ—রামগোপাল—রামচন্দ্র—সনাতন—মুক্তারাম—গোপীনাথ—গোলকচন্দ্র—শ্রীপাদ হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী—গোপাল, রাখাল, গোষ্ঠ, যদু ও রসরাজ। শ্রীশিরোমণি প্রভু আবাল্য মহাদারিদ্র্যের ক্রোড়েই লালিত পালিত হইয়াছিলেন; পুরাপাড়ায় শ্রীজগদ্বন্ধু তর্কবাগীশের নিকট ব্যাকরণ-কাব্যাদি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করত অশেষ কৃতিত্বের সহিত তিনি 'শিরোমণি' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার বক্ষঃস্থলের বামদিকে সরোম তিল ছিল বলিয়া সকলেই ইহাকে কবি ও পণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করিতেন; বাস্তবিক পক্ষেও উত্তরকালে ইনি অতুলনীয় কবিতাশক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসাহিত্যে ১৬৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত **কৌতুকাঙ্কুর-প্রহসন কাব্য** ও **শৃঙ্গারহারাবলী** ব্যতীত ইনি ১৮০০ শকাব্দা হইতে প্রায় প্রতিদিনই দুই চারিটী করিয়া শ্লোক রচনা করিতেন; ঐ শ্লোকগুলি সরল হইলেও ভাবগম্ভীর। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সন্দর্ভ** ও **শ্রীগদাধর-সন্দর্ভ** এবং **বৈষ্ণবব্রত নির্ণয়** গ্রন্থত্রয়ও ইহারই রচনা।

পঞ্চদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে ইনি পিতৃদেবের অপ্রকটে শ্রীগৌরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করেন। যেইদিন শ্রীধামে উপস্থিত হন, সেইদিনই তত্রত্য রাসমণ্ডলে সন্ধ্যাবেলায় গৌরবর্ণা নীলবস্ত্র-পরিধানা কিশোরী শ্রীরাধার দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে ইনি শ্রীরাধারমণের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীসখালাল গোপীলাল গোস্বামীগণের নিকট গিয়া শ্রীগৌরতত্ত্ব জানিতে চাহেন—

তাঁহারা গৌড়ীয়ভাষা বুঝিলেও ভালভাবে বলিতে পারেন না, পক্ষান্তরে ইনিও ভালভাবে ব্রজভাষা জানেন না—এই অসুবিধা নিরাকরণার্থ ইনি তাঁহাদেরই প্রেরণায় শ্রীগৌর শিরোমণিমহাশয়ের নিকট গমন করিলেন। শ্রীগৌরশিরোমণি মহাশয় ইঁহাকে 'আচার্য্য-সন্তান' বুদ্ধিতে সসম্ভ্রম দণ্ডবৎ প্রণতি করিতেন এবং সাধ্যমত শ্রীগৌরতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। পনর দিন যাবৎ এইভাবে গতায়াত হইতে লাগিল, কিন্তু ইনি বিশেষ কিছুই লাভবান্ হইতেছেন না দেখিয়া খেদান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া প্রৌঢ়িভরে বলিলেন—'তোমাতে গুরুবুদ্ধি করিয়া তোমার নিকট গৌরতত্ত্ব জানিতে আসি, কিন্তু আচার্যসন্তান-বোধে তুমি আমায় দণ্ডবৎভক্তি কর—আচ্ছা, যদি তোমার তৃপ্তি হয়, তবে এই চরণে যত পার দণ্ডবৎ প্রণাম কর, আমি না হয় নরকগামী হইব, পঙ্গু হইয়া থাকিব, তবু আমাকে শ্রীগৌরকথা শুনাও।' এই কথা শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় অদ্ভুত প্রেমাবেশে ইঁহাকে আলিঙ্গন-দানে কৃতার্থ করিলেন—উভয়েই তখন কম্পকম্পান্বিত ও অশ্রুস্নাত-মূর্ত্তি হইলেন। তদবধি ইনি শ্রীগৌরকথায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন এবং অভূতপূর্ব স্ফূর্ত্তিও হইতে লাগিল। এইভাবে বহু দিন যাবৎ ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীগৌর শিরোমণি ও শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভু প্রভৃতি মহামনস্বীগণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিলেন। একদিন ভজন-কুটীরে সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজি মহাশয়ের নিকটে গিয়া প্রণত হইলে সিদ্ধ বাবা ইঁহার পৃষ্ঠদেশে কর-পদ্ম বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার জীবনের আনুপূর্বিক ঘটনাগুলি ও শ্রীবৃন্দাবনে গমনের মুখ্য কারণ ইত্যাদি বলিয়া 'শ্রীগৌরতত্ত্ব' হৃদয়ে গোপন রাখিয়া বাহিরে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব উপদেশ করিবার জন্য বাহ্যতঃ বলিলেন—'রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া'। ইনি কিন্তু প্রৌঢ়িবাদের সহিত সিদ্ধ বাবাকে বলিলেন—'আমি শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রকাশ করিতেই

আসিয়াছি, তাহাই করিব।' বালকের মুখে এত বড় কথা শুনিয়া সিদ্ধ বাবা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—'তুমিই পারিবে।' তৎপর দিন দ্বাদশীতে সিদ্ধ বাবার অনুমতি লইয়া ইনি মহাপ্রভুর ভোগরাগের জন্য ওখানে আয়োজন করিয়া দিলেন—বেলা দশটায় পংক্তিভোজনে বসিয়া 'ভজ মন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই সিদ্ধ বাবার প্রেমাবেশ হইল, তাহাতে চারিটা পর্য্যন্ত সকলেই বসিয়া রহিলেন, তৎপরে মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া সিদ্ধ বাবার কৃপাদেশ লইয়া ইনি শ্রীপাট আড়িয়ালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া ইনি অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু হইতে বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্র-সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা দান করিতে লাগিলেন—এজন্য বহুশঃ প্রতিপক্ষমণ্ডলী হইতে অযথা অপমান লাভ করিলেও ইনি কখনও পশ্চাৎপদ হইলেন না! স্মার্ত্ত-প্রধান তদানীন্তন বিক্রমপুর প্রদেশে বৈষ্ণব সদাচার-প্রবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও প্রচুরতর তিরস্কার ও সামাজিক গ্লানিই লব্ধ হইল। দারিদ্র্যের দারুণ নিষ্পেষণও এই সময়ে তাঁহার পরিবারে চলিতে লাগিল, কিন্তু কঠিন কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইলেও ইনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠা হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইলেন না। এক্ষণে তিনি কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন—কবিওয়ালাদের জন্য দধিমঙ্গলাদি যাত্রাপালা রচনা করিতেন—বহুবিধ রসের ও ভাবের গান রচনা করিতেন—এইরূপে দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিলেন।

ফরিদপুর জিলার জনৈক কুষ্ঠরোগী রজক স্ববন্ধুবান্ধব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মনের দুঃখে নীলাচল যাত্রা করেন—পরে তিনি স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীশ্রীশিরোমণি প্রভুর গৃহে আসিলেন এবং কাঙ্গালের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক প্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে করিতে রোগমুক্ত

হইয়া নীলাচলে গঙ্গামাতার মঠে গিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে শিরোমণি প্রভু নীলাচলে গিয়া গঙ্গামাতার মঠে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।

ফরিদপুর জিলার ছয়গাঁও-নিবাসী এবং নোয়াখালী প্রবাসী উচ্চ-শিক্ষিত জ্ঞান মুখার্জি—সম্ভ্রান্ত-বংশের ছেলে, তাঁহার পিতা পরম বৈষ্ণব ও তত্রত্য প্রবীণ ব্যবহারজীবী। সঙ্গ-দোষে জ্ঞানবাবু কিন্তু মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জনক জননী একমাত্র পুত্রের এতাদৃশ ব্যবহারে দারুণ মনঃকষ্টে পড়িয়া তাঁহার চরিত্র-শোধনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইলেন। দৈবক্রমে শিরোমণি প্রভু নোয়াখালী শহরে পদার্পণ করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার পিতা মাতা গিয়া ইঁহার চরণে পড়িয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন—ইনি কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপার জয় দিয়া তৎপর দিবসে তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিলেন। মাতাপিতা অনেক বুঝাইয়া জ্ঞান বাবুকে প্রভুর নিকটে আনিলেন—কর্ণে গৌরমন্ত্র দেওয়া মাত্রই ইঁহার অপূর্ব পরিবর্ত্তন দেখা গেল। বহুদিনের অভ্যস্ত যাবতীয় আসক্তি তৎক্ষণাৎ চির জীবনের তরে চলিয়া গেল—বন্ধু-বান্ধবগণ গৃহের বহির্দেশ হইতে জ্ঞানবাবুকে পুনঃ পুনঃ বাহিরে যাইয়া তাহাদের সহিত আনন্দ করিতে ডাকিলেও ইনি আর বাহিরে গেলেন না, বরং তাহাদিগকে বলিলেন—'ওরে! আমার দীক্ষা হইয়াছে, আমা হইতে আর ওসব কর্ম চলিবে না।' বস্তুতঃ বাবুটি তখন হইতে সাত্ত্বিক আহার বিহার করত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মেরই যাজন করিয়াছেন।

১২৯৪ বঙ্গাব্দে আনন্দ কবিরাজ, ভগবান্ দাস বাবাজি, জ্ঞান মুখার্জি, দ্বিতীয়া পত্নী, এক পুত্র ও জনৈক শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া শিরোমণি প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিয়াছেন। মেদিনীপুর হইতে জগন্নাথ ট্রাঙ্ক রোড্ ধরিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানগুলির

দর্শন-স্পর্শনাদি করিতে করিতে ইনি পদব্রজে কীর্ত্তনানন্দে চলিতেছেন—ক্রমশঃ লোক-সমাবেশ হইতে লাগিল—পথে শিষ্যটির জ্বর হইলে মহানদী পার হওয়ার কালে শিরোমণি প্রভু সেই শিষ্যটিকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে নীলাচলে প্রবিষ্ট হইয়া ইনি তত্রত্য বিগ্রহাদি দর্শন করিলেন। একদিন সন্ধ্যার পরে আনন্দ বাজারে শ্রীমহাপ্রসাদ ক্রয়কালে ইনি আবৃত দেহ দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভ করেন। একদিন রাত্রিকালে স্বপ্নাবেশে দেখিলেন যে পূর্ব্বসিদ্ধ স্বগুরুগণ বিবিধ সেবাদ্রব্য লইয়া নীলাচল-বিভূষণ শ্রীশ্রীগম্ভীরানাথের দর্শনে চলিয়াছেন অথচ তাঁহাদের পশ্চাতে নিজ সিদ্ধদেহের দর্শন করিলেন না—ইহাতে তিনি অভিমানবশতঃ যতদিন ঐ ধামে ছিলেন, শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না।

১৩১২ সালে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া ইনি একদিন প্রাতে তাৎকালীন পূর্ব্বদিক্‌স্থ মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরতত্ত্ব-সূচক গ্রন্থাদির তালিকা জানিবার জন্য 'হত্যা' দিয়াছিলেন—সন্ধ্যাকালে শ্রীপ্রভু দর্শন দিয়া বহু বহু গ্রন্থের নামোল্লেখ-সহকারে তাঁহাকে তদীয় অচনমার্গীয় গ্রন্থ-প্রণয়নে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন—গৃহে আসিয়া যতগুলি গ্রন্থের নাম মনে ছিল, তাহা তাড়াতাড়ি লিখিয়া লইলেন এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদিষ্ট গ্রন্থ-নির্ম্মাণের উপাদান সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি নির্ভীক হইয়া অনর্গল শ্রীগৌরমন্ত্র-প্রচার করিতে লাগিলেন। ১৩১৫ সালে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরেশ্বর সমিতির তৃতীয় অধিবেশনের তৃতীয় দিবসে ইনি সভাপতি হইয়া শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্বন্ধে এক বিরাট সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন—তাহা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে মুদ্রিতও হইয়াছিল।

১৩২১ সালে বৈশাখ মাসে তদীয় মাতৃদেবী অপ্রকট হন—প্রাপ্তির পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে নিকট উপবিষ্টা সেবাপরায়ণা পুত্রবধূ

দেখিলেন যে দুইজন ব্রজবাসী বাহির হইতে ঘরের মধ্যে শরীরের অর্দ্ধাংশ প্রবেশ করাইয়া কি যেন দেখিতেছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গোপালরাজ তাঁহার ইঙ্গিতে সমস্ত বাড়ী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়াও কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরদিন শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদের মাতার নিকট শিরোমণিপ্রভুর মাতা রহস্যটি ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে তাঁহাকে নেওয়ার জন্য রাত্রিতে একটি ভগ্ন নৌকা আসিয়াছিল, তিনি তাহা ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং সেইদিনই তাঁহার রথ আসিবে। 'কোথায় যাইবেন, বৃন্দাবন।' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রৌঢ়ির সহিত বলিলেন—'আমি বৃন্দাবন যাইব কেন? আমি যাইব শ্রীক্ষেত্রধাম!!' আশ্চর্য্যের বিষয়—ঐ দিনই রাত্রি চারিটায় তিনি অভিলষিত ধামে গমন করিয়াছেন!

১৩২১ সালে পৌষ মাসে দ্বাদশী তিথিতে ইঁহার দ্বিতীয়া পত্নী অন্তর্ধান করিয়াছেন—তৎসমকালেই আবার বিক্রমপুর-পরগণার রাজবাড়ী-নিবাসী তৎকালে শ্রীবৃন্দাবন-প্রবাসী শ্রীযুক্ত ভবানন্দ কুণ্ডের সম্মুখে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে গোপীবেশে তিনি দর্শন দিয়াছিলেন। দেহত্যাগ-কালে তদীয় শিষ্যবর্য্য শ্রীযুক্ত শ্যামদাস শ্রীগুরুপত্নীর সেবায় ছিলেন—তাঁহারই ক্রোড়ে মাতাগোস্বামিনী দেহ রাখিয়াছিলেন দেখিয়া শ্যামদাস নিজেকে সাপরাধ মনে করিয়া দুঃখ করিতেছিলেন। শিরোমণি প্রভু তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলেন—"দেখ! তোর মার মহাসদ্গতিই হইয়াছে, তোর দুঃখ করিবার কিছুই নাই—আমি তোকে শব্দব্রহ্ম দান করিয়া জন্ম দিয়াছি, তুইই আমার যথার্থ পুত্র, আর রেতোব্রহ্মে জাত পুত্রগণ এ সময়ে নিকটে থাকিলে তোর মার অধোগতি হইত—শব্দব্রহ্মে আর রেতোব্রহ্মে আকাশ পাতাল পার্থক্য ইত্যাদি।"

ঢাকার হরিমতি বেশ্যা ও বাখরগঞ্জের ঝালকাটি নিবাসী বেশ্যাকে

ইনি অযাচিত কৃপাবিতরণে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে ইটাপরগণার গয়সর-গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দত্ত এবং ষ্টেসন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত রাধামাধব ঘোষ প্রভৃতিও স্বপ্নে ইঁহার নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া পরে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরমন্ত্র-সম্পর্কে যে বিরাট সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম ও শ্রীপাদ দামোদর লাল গোস্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতির সহিত ইনিও যোগদান করত শ্রীগৌরমন্ত্রের স্বতন্ত্রতা ও উপযোগিতা-সম্পর্কে বিচার দেখাইয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বপুরুষক্রমে সেবিত শ্রীযশোমাধব বিগ্রহের পার্শ্বে ইনি আবার শ্রীশ্রীগৌরগদাধর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৃদ্ধ হইয়াও তিনি স্বহস্তে মন্দিরের ক্ষালন-মার্জনাদি করিতেন—মন্দিরের বারান্দায় পায়রা বসিয়া কদর্য্য করিত—একবার তিনি মনে করিলেন যে পায়রা বসিবার স্থানগুলি জাল দিয়া ঘেরিলে আর পায়রা বসিবে না এবং বিগ্রহের সম্মুখ-ভাগও বিশ্রী দেখাইবে না। এই ভাবিয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইয়া ছুতার ডাকিয়া সব ব্যবস্থা করিলে রাত্রিযোগে শ্রীগৌরগদাধর তাঁহাকে স্বপ্নচ্ছলে বলিলেন—"দেখ! পায়রাগুলির 'বকম্ বকম্ আমাদের শ্রুতমধুর হয়, তুমি উহাদিগকে তাড়াইও না।" আদেশ পাইয়া তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন—ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য বশতঃ নিয়মিতভাবে মন্দিরের ক্ষালন করা অসম্ভব হইতে চলিল—নিজের অসামর্থ্য এবং পুত্রভৃত্যাদির ভবিষ্যৎকালে এই কার্য্যে উদাসীনতার সম্ভাবনা করিয়া ইনি পুনর্ব্বার ছুতার ডাকিয়া পায়রা আসিবার পথ বন্ধ করিতে প্রবৃত্তই হইলেন। তখন শ্রীগৌরগদাধর আবার তাহাকে প্রেমরোষে বলিলেন—'তোমাকে নিষেধ করিলেও ত শুন না দেখি!' প্রভু বলিলেন—'আমি আর সেবা করিতে না পারিলে

কি করি?' উত্তর হইল—'যদি সেবাই করিতে না পার, তবে আছ কেন?' উত্তর শুনিয়া যথারীতি মন্দির-সেবা করিতে লাগিলেন এবং যতদিন শক্তি ছিল, ততদিনই প্রেমানন্দে এই সেবা করিয়াছেন।

কাশীমবাজারের রাজর্ষি মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ইনি কুমিল্লাতে হরিসভায় যোগদান করিয়াছিলেন—সভার কার্য্য শেষ হইলে ইনি বিনা পরিচয়ে তদানীন্তন মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষ্ণুপুরস্থিত বাসায় গমন করিলেন। উভয়ের দর্শনে উভয়ে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া বহুদিন যাবৎ ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন এবং মুন্সেফ্ বাবুও সভৃত্য সপরিবার ইঁহার নিকট শ্রীগৌর-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ১৩৩৩ সালে ইনি কলিকাতা বেলগাছিয়া হাসপাতালে চক্ষুচিকিৎসা-ব্যপদেশে কিছুদিন ছিলেন। একদিন নিশীথ-কালে তিনি তাঁহার শিয়রে দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকার কণ্ঠে একটি অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করেন—প্রভাতকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া তত্রত্য রোগি-গণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন যে কেহই সঙ্গীত শ্রবণও করেন নাই অথবা গানও করেন নাই। সঙ্গীতটি এই—

আর যেওনা রাধার কুঞ্জে আমার মন,
ধন্য কলির আগমন ॥ ধ্রু ॥

রাইয়ের কুঞ্জে কলঙ্ক আছে, পতি ফিরেন পাছে পাছে,
ধরতে পারলে ধরে কেশে, নাক কর্‌বেন অপারেশন্ ॥
রাধাকৃষ্ণ দুই এক পুরুষরূপে, গৌর-গদাধর স্বস্বরূপে,
উদয় হলেন নবদ্বীপে, দুয়ের রস দুয়ে করে আস্বাদন ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর-যুগে, যে রস দিতে নারেন কোন যোগে,
সে রস আজ সঙ্কীর্ত্তনের সমাযোগে, স্বভক্তে করলেন সমর্পণ ॥

আরো কতকগুলি কলিকা ছিল, তিনি মনে রাখিতে পারেন নাই। অন্য একবার ঐ হাসপাতালে অবস্থানকালে তিনি রাত্রিবেলা

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের দর্শন লাভ করেন এবং স্বগণকে অনেক প্রেম-কলহের পরে তাঁহাদের চরণতলে সমর্পণ করেন। সেই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ দেখিবার স্বযোগ সৌভাগ্য হইয়াছিল—এই জীবাধম লিখকের।

১৩৩৫—৩৭ সাল মধ্যে ইনি **শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসন্দর্ভ** ও **শ্রীশ্রীগদাধর-সন্দর্ভ** এবং **বৈষ্ণবব্রতদিননির্ণয়** নামক **গ্রন্থ** প্রকাশিত করেন। ১৩৩৮ সালে ২১শে অগ্রহায়ণ অমাবস্যা তিথিতে 'গদাধরের প্রাণ গৌর' নাম বলিতে বলিতে ও শুনিতে শুনিতে ইনি স্বাভীষ্ট শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরচরণে চরম বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন।

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥ ৩

আলোচ্য গ্রন্থাবলী।

বঙ্গভাষায় ঃ—

গৌরাঙ্গ-মাধুরী (মাসিক পত্রিকা), গৌরাঙ্গ-সেবক (মাসিক পত্রিকা), চরিতসুধা (শ্রীরামদাস বাবাজি), দ্বাদশ আলবর (সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ), ভক্তচরিতমালা (শশিভূষণ বসু), ভক্তচরিত্র (প্রাণকিশোর গোস্বামী), ভক্তচরিতামৃত (অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়), ভক্তমাল (শ্রীলালদাস বা কৃষ্ণদাস), ভক্তের জয় (শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী), শ্রীবৈষ্ণব (শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ), সদ্গুরুসঙ্গ, সন্ধানীর সাধুসঙ্গ (প্রাণকিশোর গোস্বামী) ।

উৎকলীয় ভাষায় ঃ—

দার্ঢ্যতাভক্তমাল (বিপ্ররাম দাস-কৃত) ।

হিন্দি ভাষায় ঃ—

আদর্শ ভক্ত, চৌরাশী বৈষ্ণবন্‌কী বার্ত্তা, পুষ্টিমার্গীয় দোসো বাবন বৈষ্ণবন্‌কী বার্ত্তা, প্রাচীন ভক্ত, প্রেমী ভক্ত, প্রেমীভক্ত উদ্ধব, ভক্তকুসুম, ভক্তচন্দ্রিকা, ভক্ত নরসিংহ মেহতা, ভক্তনারী, ভক্তবালক, ভক্তরাজ ধ্রুব, ভক্তরাজ হনুমান, ভক্তসপ্তরত্ন, ভক্ত-সরোজ, মহাত্মা বিদুর, ভক্তসুমন, সত্যপ্রেমী হরিশ্চন্দ্র ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির জলবায়ু, অণুপরমাণুতে কি একটা উপাদান অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যাহা ভোগের মধ্যে ত্যাগের উন্মাদনা আবাহমান কাল হইতেই সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। এ দেশ সম্বন্ধে ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, রাজকুমার, রাজচক্রবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিয়া কত ধনী, মানী, সুধী. যশস্বী ভোগের চরমাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই কি অপরিচিত উদ্দীপনার বশবর্ত্তী হইয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বিত্তহীন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া হরেন্দ্রকুমার নিজ অধ্যবসায় বলে উচ্চ বিদ্যার্জন করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহের একটা সম্মানজনক সংস্থান না করিয়া, ভাবী বৈষয়িক জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়া একবারে নিঃস্ব হইয়া ভিক্ষান্নে জীবন যাপনকেই বরণ করিয়া নিয়াছিলেন। যে উচ্চতর গভীরতর আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তিনি দৈন্যের জীবনকে বাছিয়া নিয়াছিলেন সেই অনুভূতির রাজ্যে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই।

নোয়াখালি জেলার ফেণী মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম মধুগ্রামের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারে ১৩০৫ সনের ৩০শে ভাদ্র হরেন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺গগন চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় ঐ অঞ্চলে একজন খ্যাত নামা পণ্ডিত ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ হরেন্দ্র কুমার এবং কনিষ্ঠ মণীন্দ্র কুমার। মণীন্দ্রকুমার বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে শ্রীমুকুন্দদাস নাম ধারণ করিয়া অগ্রজেরই গুরুভ্রাতা হইয়া একই আশ্রমবাসী হইয়াছেন। হরেন্দ্র কুমার গ্রামের মধ্য ইংরেজী স্কুল হইতে বৃত্তি নিয়া শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া কুমিল্লার ঈশ্বর

পাঠশালায় যোগদান করেন এবং ১৯১৯ সনে বিভাগীয় বৃত্তি নিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ হরেন্দ্র কুমার মুন্সেফ বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় গৃহ শিক্ষকতা করিয়া কুমিল্লা কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।

এই বিপিন বাবুর গৃহেই ভাবী গুরু শিষ্যের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। ধর্মপ্রাণ বিপিন বাবু নড়াইল মহকুমা সহরে মুন্সেফ থাকাকালে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে স্কুলের ছোট বালকদের নিয়া কীর্তন করিতেন। তন্মধ্যে গিরীন্দ্র নাথ ঘোষ নামে একটি বালক কীর্তনে এমন প্রমত্ত হইয়া উঠেন এবং বিপিন বাবুর এমন অনুগত হইয়া পড়েন যে, তিনি গৃহ এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিপিন বাবুর পরিবারেই বাস করিতে থাকেন। পরিণত বয়সে এই যুবক বিপিন বাবুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। উত্তর কালে তিনিই শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোলা বাবাজী নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন শ্রীধাম নবদ্বীপের হরিবোল কুটীরের প্রতিষ্ঠাতা।

বিপিন বাবু কুমিল্লা হইতে বদলী হইয়া গেলে পর হরেন্দ্র কুমার মুন্সেফ বাবুর স্বগ্রাম মাকড়দাহ (হাওড়া জেলায়) চলিয়া আসেন এবং কলিকাতার রিপন কলেজে যোগদান করেন। প্রত্যহ দুই ক্রোশ পথ হাটিয়া তাঁহাকে কলেজ করিতে হইত। রিপন কলেজ হইতে ১৯২১ সনে তিনি আই, এ পরীক্ষা এবং ১৯২৩ সনে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি, এ পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২৫ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে (বেদান্ত শাখায়) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম, এ, পরীক্ষা পাশ করেন এবং স্বুবর্ণ পদক লাভ করেন। যখন তিনি স্নাতকোত্তর বিদ্যার্থী তখনই তাঁহার ধর্ম-স্পৃহা এত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, সুযোগ উপস্থিত হইলেই তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইয়া হরিবোল কুটীরে বাস করিতেন এবং ভাবী বেশ-গুরু হরিবোলা বাবাজীর

সঙ্গে দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে যাইতেন। এরূপে জাত্যভিমান ও পাণ্ডিত্যাভিমান—এই দুই মানের গোড়ায় তিনি ছাই দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বর্ণপদক বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা হরিবোল কুটীরের সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া কুটীরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তরকালে, বেশাশ্রয় করিয়া তিনি এই কুটীরেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাস করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থাবলী এখান হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীল হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামি পাদের নিকট হইতে গৌর-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষার পর তাঁহার ধর্মানুরাগ দিন দিন এমন প্রবলতর হইয়া উঠে যে, তিনি শ্রীগুরুদেব হইতে বৈষ্ণব-সাধন রহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং তীব্র বৈরাগ্যময় জীবন যাপন করিতে থাকেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে একটানা দেড় বৎসর কাল তিনি মাধুকরীর উপর নির্ভর করিয়া বাস করেন। সে সময় শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দিক ঝাড়ু দ্বারা পরিষ্কার করাই ছিল তাঁহার এক-মাত্র দৈনন্দিন কাজ। হঠাৎ তাঁহার শ্রীগুরুদেবের অসুখের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সেবা পরিচর্যার জন্য তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীগুরুদেব রোগ-মুক্ত হইলে পর হরেন্দ্র কুমার শ্রীগুরুদেবকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য কুমিল্লা যাইয়া ঈশ্বর পাঠশালায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই তাঁহার শ্রীগুরুদেব দেহ রক্ষা করেন। তিনিও শ্রীগুরু-দেবের ঋণ পরিশোধ হওয়া মাত্র শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ চলিয়া আসেন এবং হরিবোল কুটীরে বাস করিয়া ভিক্ষান্নে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। এই সময়ে দীর্ঘ দিন ধরিয়া তিনি শেষ রাত্রিতে ৩।৪ মাইল পথ করতাল সংযোগে উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করিয়া নগর পরিক্রমা করিতেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠে—"প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌরহরি হরিবোল" ধ্বনি পুরবাসীর দেহমনে আনন্দ শিহরণ জাগাইত।

এই সময়ে কুমিল্লা কলেজ হইতে আহ্বান আসিলে তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়া আসেন।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে হরেন্দ্র কুমার শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোলা বাবাজীর নিকট বেশাশ্রয় করেন এবং বেশগুরু প্রদত্ত শ্রীহরিদাস দাস নাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি শ্রীধাম পুরী যাইয়া শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পুরী ধাম হইতে হরিবোলা বাবাজীর কৃপা-আদেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবন ধামে বাসকালে তিনি শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডের সিদ্ধ মনোহর দাস বাবার কৃপা লাভ করেন। তাঁহারই নির্দেশে তিনি লুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ উদ্ধারের কাজে ব্রতী হয়েন। কথিত আছে মনোহর দাস বাবা তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, "গ্রন্থ সেবাতেই তোমার সর্ব সিদ্ধি লাভ হইবে।" হরিদাস দাসজী ৬৫ খানা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে (১) পরতত্ত্ব গৌর, (২) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, (৩) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ, (৪) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন ১ম ও ২য় খণ্ড, (৫) মধ্য যুগীয় গৌড়ীয় সাহিত্যের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান এবং (৬) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান তাঁহার স্বরচিত। অন্যান্য গ্রন্থের তিনি টীকা, টিপ্পনী, ব্যাখ্যা, অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশ্বকোষ। ভাষাবিৎ ডাঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি মহাশয় এই অভিধান সম্বন্ধে বলেন "ইহা একটি বিরাট গ্রন্থ (magnus opus)" তিনি আরও বলিয়াছেন, "The name of the compiler, Sri Haridas Das is sufficient guarantee for thoroughness and accuracy ..."—সঙ্কলয়িতা শ্রীহরিদাস দাসের নামই গ্রন্থ সঙ্কলনে পারদর্শিতা ও সুনিপুণতার দ্যোতক।" তিনি প্রায়ই বলিতেন "আমি গর্বিত যে হরিদাস দাস আমার ছাত্র।" এই অভিধান প্রণয়ন কালে হরিদাস দাস দৈনিক ১৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া

নিজের জীবন তিলে তিলে বৈষ্ণব সমাজের সেবায় দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে বলিতেন "বৈষ্ণব অভিধানেরও শেষ, হরিদাস দাসের জীবনও শেষ!" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যরূপে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। অভিধানের শেষ চার ফর্মা যন্ত্রস্থ থাকা কালেই ১৯৫৭ ইং ২২শে সেপ্টেম্বর সকালে তিনি বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া সেদিনই সন্ধ্যায় দেহ রক্ষা করেন।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে হরিবোলা বাবাজী ও হরিদাস দাসজী রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধাম গিয়াছিলেন। অজীর্ণ রোগে গুরুশিষ্য উভয়ই অস্থি-চর্ম-সার হইয়ে পড়িয়াছিলেন। তবুও, নিষ্ঠার সহিত শিষ্য গুরুসেবা করিয়াছেন। কিন্তু হরিবোলাজী এই দুরন্ত ব্যাধির হাত হইতে আর রক্ষা পাইলেন না। সেবারই পুরীধামে ২০শে আশ্বিন কার্তিকী কৃষ্ণা ৭মী তিথিতে তিনি দেহরক্ষা করেন। হরিদাস দাসজী নিত্যসঙ্গী, বন্ধু, উপদেষ্টা, বেশগুরুকে হারাইয়া শোক-সন্তপ্তচিত্তে নবদ্বীপ ধামে ফিরিয়া আসেন এবং হরিবোল কুটীরের সেবা-কার্য একটানা কয়েক বৎসর পরিচালন করেন। এখন হইতে তিনি সিদ্ধ মনোহর দাস বাবার কৃপাদেশে গ্রন্থ সেবায় নিবিষ্টভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার কার্যে ব্রতী হন বটে, কিন্তু তিনি নিজকে এমন গুপ্ত, এমন দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াও কেহ তাঁহাকে এতটুকু বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। শাস্ত্রালোচনা, বাক্‌বিতণ্ডার মধ্য দিয়া আত্ম প্রচার করিতে তিনি একবারে বিরত ছিলেন। তাঁহার একটি মন্ত্র শিষ্যও ছিল না। তাঁহার অপ্রকটের পর জানা গেল তাঁহার সঙ্কলিত কোন কোন গ্রন্থ এম, এ ক্লাশের পাঠ্য এবং অধ্যাপকগণ তাঁহার গ্রন্থ সমূহের সাহায্যে বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তিনি প্রকট থাকিতে ঘুণাক্ষরেও এসব কথা প্রকাশ করেন নাই। উচ্চ শিক্ষিত কেহ কেহ তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করেন নাই।

লোকোত্তর মহাপুরুষদের চরিত্র সাধারণের পক্ষে দুজ্ঞের্য় এবং তাহা ভাষায় প্রকাশ করাও কঠিন। যাঁহারা তাঁহাদের জীবন ধারা পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং জীবনের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু গ্রন্থে লিখিয়া বুঝান এক দুরূহ ব্যাপার। পরমহংসদেব বলিতেন, "ম্যাপে কাশী দর্শন করা আর কাশীতে যাইয়া কাশী দর্শন করা অনেক প্রভেদ।" হরিদাস দাসজী এমন পর্যায়ের মহাপুরুষ ছিলেন যাঁহাকে বুঝা ও বুঝান দুই-ই কঠিন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের একটি ঘটনা আলোচনা করা যাইতে পারে। ভজন কালে হরিদাস দাসজীর সম্মুখে তাঁহার দীক্ষাগুরু, বেশগুরু এবং উপদেষ্টা গুরুর ফটো থাকিত। তিনি ভাবানুরঞ্জিত নয়নে এই ত্রিগুরুর পানে এমন নিবিষ্টভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন যে, মনে হইত, তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহার ইষ্ট-বিগ্রহের চিদ্ ঘন রূপ যেন দেখিতেছেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল হইয়া উঠিত অনুরাগ রঞ্জিত এবং দৃষ্টি থাকিত অন্তর্মুখী। 'ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো' এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন। তাৎকালীন অবস্থা ভাষায় এক প্রকার রূপায়িত হইল বটে, তবুও অনেক কিছু অব্যক্ত রহিয়া গেল। বস্তুতঃ, সাধন বলে মানুষের মনুষ্যত্ব চলিয়া গেলে দেবত্ব আসিয়া যখন ঐ স্থান অধিকার করে, তখন তাঁহার জীবন আলোচনা করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

হরিদাস দাসজীর ব্যবহারিক জীবন ঘটনা বহুল ছিল না। গ্রন্থ-সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রথম এবং শেষ কথা। শ্রীবৃন্দাবন রমন-রেতীর ভাগবতোত্তম শ্রীকৃপাসিন্ধু বাবাজীর সঙ্গে তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। তাঁহার অপ্রকটের অব্যবহিত পরে তাঁহার জীবন কাহিনী কিছু শুনিবার জন্য বাবাজী মহারাজকে প্রশ্ন করা হইলে, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "হরিদাস দাসজীর জীবনের আর কাহিনী কি? তিনি ত লবণ সত্যাগ্রহ করার জন্য ডাণ্ডী অভিযান করেন নাই। তিনি তাঁহার

গ্রন্থাবলীতেই তাঁহার জীবনী রাখিয়া গিয়াছেন।" বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত অভিমতটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবৎ-সেবক রাজনৈতকও নহেন, সমাজ সংস্কারক কিংবা ধর্ম সংস্কারকও নহেন। কাজেই জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হইতে পারে তেমন যুগান্তকারী ঘটনা তাঁহার জীবনে সম্ভবপর নহে। অপর দিকে সাধকের সাধন-জীবনেরও ইতিহাস নাই। সাধক জীবনের পুণ্য কাহিনী চিরদিনই লোক চক্ষুর আড়ালে থাকিয়া যায়। কিন্তু রসাল ফল কি করিয়া সুপক্ক হয় তাহা অজানা থাকিলেও, তাহার রসাস্বাদনে কোন বাধা থাকে না। সেরূপ হরিদাস দাসজীর ব্যবহারিক ও সাধন জীবনের ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিলেও, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের জন্য যে মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তার মধু তাঁহারা নিরবধি সুখে পান করিতে থাকিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব ভক্তের সাধন-জীবনের ইতিবৃত্ত অজ্ঞাত, অব্যক্ত থাকিলেও, বিচক্ষণ সুধীগণ তাঁহার স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ (শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ) দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত মহিমা উপলব্ধি কারিয়া থাকেন। হরিদাস দাসজীর কায়িক-বাচিক-মানস আচরণে এই দুইটি লক্ষণ একান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। গুরু-কৃপা লাভের পর হইতে তিনি সর্বপ্রকার বিলাসোপকরণ ত্যাগ কয়িয়া আদর্শ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের যোগ্য বেশ, বৈরাগ্য ও কায়িক ব্যবহারাদি নিজ আচরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ, প্রতি গ্রন্থের পুঁথি (তুলট কাগজে হস্ত লিখিত পুস্তক) হইতে কপি তৈয়ার, অন্বয়-অনুবাদ এবং প্রুফ সংশোধন নিজেই করিতেন। তিনি নগ্নপদে সর্বত্র গমনাগমন করিতেন। কলিকাতার কোন কোন রাস্তা ময়লাযুক্ত; কাজেই, অন্ততঃ কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি বলিতেন, "জীবনের আর কয়টা দিন বাকী, আর পাদুকা ধারণ করিব না।" তাঁহার বৈরাগ্য ছিল অননুকরণীয়। উহা ভাবাবেগময় ও ক্ষণস্থায়ী ছিল না। দেশে জরীপ

আরম্ভ হইলে, একদিন মুকুন্দ দাসজী তাঁহাকে বলিলেন, "জরীপ আরম্ভ হইয়াছে, বাড়ী জমির কি করা?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "কেন, মহাপ্রভুর সাম্রাজ্যে বাড়ী জমির অভাব আছে?" তাঁহার বৈরাগ্য ছিল যেন 'পাষাণের রেখা'। বৈষ্ণবের সেবা বন্দনা ছিল তাঁহার মজ্জাগত। একদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাসজীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। ছোট ভাইটিত বিব্রত বিভ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাদা, করেন কি? করেন কি?" দাদা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, "ভাই! তুমি ও ত বৈষ্ণব।" তিনি সমস্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, সমস্ত দেবদেবী, এমন কি একটি অজ্ঞান শিশুকে পর্যন্ত শ্রীমুকুন্দের প্রিয়জ্ঞানে সম্মান দিতেন। নিম্নের প্রবচনটি তাঁহাকে অহরহঃ উচ্চারণ করিতে শুনা যাইত।

"যৎকিঞ্চিৎ তৃণ-গুল্মকীটক-মুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ প্রকটিতং নিষ্ঠাঙ্কিতং যাজ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্বং ময়া বন্দ্যতে॥"

—তৃণ, গুল্ম, কীট পর্যন্ত যাহা কিছু সমস্তই শ্রীমুকুন্দের প্রিয় ও তাঁহার সেবার উপকরণ; প্রেমিক ভক্ত সর্বত্রই গোষ্ঠ অর্থাৎ ব্রজ দর্শন করেন। শাস্ত্র এই অপ্রাকৃত দর্শনের শিক্ষাই পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ সুদর্শন প্রাপ্তি ব্রহ্মাদিদেব গণেরও প্রার্থনীয়।

হরিদাস দাসজী গ্রন্থ সেবার মাধ্যমে শাস্ত্ররূপী ভগবৎ কৃপাবতারের যে প্রেম-করুণা আস্বাদন করিয়াছেন তাহা তিনি আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া নিজে নিঃস্ব হইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিয়া নিতে কিংবা তাঁহার গুণ গ্রহণ করিতে লোক হয়ত এখন আসিবে না। তাহা না হইলেও, কালক্রমে তাঁহার গুণ অবশ্যই আদৃত হইবে। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, এরূপ হয়ত আরও অনেক আছেন। তাঁহার ছিল সরল অনাড়ম্বর জীবন। এরূপ জীবন হয়ত

আরও অনেকে যাপন করিতেছেন। কিন্তু তৃণ, গুল্ম, কীট পর্যন্ত যাহা কিছু সমস্তই শ্রীমুকুন্দের এই জ্ঞানে সর্বত্র গোষ্ঠ দর্শন অল্প জনের ভাগ্যেই লাভ হইয়াছে। তাঁহার জীবন ছিল সুসঙ্গত সঙ্গীতের মত ছন্দময় সুন্দর।

হরিদাস দাসজী মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত এবং ষড় গোস্বামী কর্তৃক ব্যাখ্যাত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আচরণ করিয়া গিয়াছেন। কাল-প্রবাহে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ছায়ায় যে সকল উপধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি সে সকলের একান্ত বিরোধী ছিলেন। যাঁহারা গোস্বামি-পাদদের অনুশাসনের ও আদর্শ আচরণের অনুসরণ করিতেন, তিনি তাঁহাদেরই সঙ্গ-লোভী ছিলেন—"মুই তাঁর দাস।" হরিদাস দাসজী শ্রীরূপ-সনাতন—শ্রীজীবের আবির্ভাবিত গ্রন্থরাজির সেবায় নিজ জীবনকে একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যে সব গ্রন্থ-রত্ন মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই—তিনি সে সকল গ্রন্থ কোথায় পাওয়া যায় এবং পাওয়া গেলেও, কিরূপে সেই সব গ্রন্থকে নির্ভুল পাঠোদ্ধার-ক্রমে মুদ্রিত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা যায়—এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া গোপনে আর্তির সহিত 'হা শ্রীরূপ, হা শ্রীসনাতন, 'হা শ্রীজীব' বলিয়া বিগলিত চিত্তে দিবারাত্রি অশ্রু বর্ষণ করিতেন। গোস্বামিপাদগণ তাঁহার কাতর রোদনে দয়ার্দ্র এবং প্রসন্ন সুমুখ হইয়া তাঁহাকে প্রার্থিত সেই সেই পুঁথির সন্ধান এবং তাহাদের পাঠোদ্ধারের শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। দুরূহ গ্রন্থের আশয় বুঝিয়া তাহাদের অন্বয় ও অনুবাদাদি করিবার যোগ্যতা দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। একবার তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্তব" গ্রন্থের পুঁথি অনেক অনুসন্ধানের পরও না পাইয়া যমুনার তটে বসিয়া 'হা প্রভু সনাতন' নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন এবং ঝর ঝর নেত্রে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি কাগজের পুটলী

যমুনার তট ঘেঁসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। ঔৎসুক্যের বশবর্তী হইয়া তিনি দ্রুতপদে যাইয়া পুটলীটী তুলিয়া লইলেন এবং খুলিয়া দেখিলেন অন্যান্য কাগজের সঙ্গে শ্রীসনাতন প্রভুর 'শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্তব' গ্রন্থের অতি প্রাচীন একখানা পুঁথি। তদ্দর্শনে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সেই পুঁথিকে মস্তকে ধারণ করিলেন; পরে বক্ষে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘ্রাণ নিতে লাগিলেন। এইরূপ পুঁথির বন্দনা করিয়া শ্রীসনাতন প্রভুর জয়গান করিতেছিলেন। তৎপর স্থির ধীর শান্ত হইয়া গোস্বামিপ্রভুদের নাম স্মরণ করিয়া সেই পুঁথির পাঠোদ্ধারও অনুবাদে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন।

জয়পুরের রাজার পুঁথিশালায় প্রবেশাধিকার লাভ করা অতি কঠিন ব্যাপার। শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের অসীম কৃপায় তিনি সেই পুঁথিশালায় প্রবেশ করিয়া শ্রীরূপ প্রভুর বিরচিত 'শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর' 'অর্থ-রসাত্মক-দীপিকা' নামক একটি টীকা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী ঐ টীকার রচয়িতা। এই টীকাটি সংগ্রহকালে জয়পুরে তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু গোস্বামি প্রভুদের অপার কৃপায় সুস্থ হইয়া তিনি নিষ্ঠার সহিত গ্রন্থ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিরামহীন গ্রন্থসেবা করিতে করিতে একবার তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নেত্রনালী হইতে অবিরাম জল ক্ষরিত হইতেছিল। তাঁহার চিকিৎসক ও শুভানুধ্যায়িগণ গ্রন্থ-সেবা কার্যের গতি মন্দীভূত করার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, রোগের আক্রমণের মুখে সেবাকার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে রোগ প্রবল হইয়া আমাকে মৃত্যুর মুখে নিয়া যায়। অপর দিকে রোগ কালে, সেবার গতি বাড়াইয়া দিলে রোগ নিজেই পালাইয়া যায়।"

হরিদাস দাসজী হরি সেবার অল্প চেষ্টাকেও বহুমানন করিতেন। গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধনাদিতে দুই একটি ভুল থাকিলে, অনেকে তাহা নিয়া গ্রন্থ-সেবাকারীর দোষ কীর্তন করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি বলিতেন, "যে কিছু করে না তার কোন ভুলও হয় না। যিনি সেবা করিতে যত্ন করিতেছেন, তাঁহার দুই একটি ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক।" এরূপে তিনি সেবাকারীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বহু লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শিষ্য গ্রহণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া মহাপ্রভুর আনন্দ বিধানই করিয়াছেন। তিনি তথাকথিত গুরুবর্গগণকে সতর্ক করিয়া বলিতেন, "যাঁহারা গুরু সাজিয়া অযোগ্য শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের ভজন শৈথিল্য এবং শিষ্যগণের ব্যবহারে মনস্তাপ লাভ বারবার লক্ষ্য করিয়াছি।" এজন্য তিনি শিষ্য পরিগ্রহ করেন নাই। মহাপ্রভুর মর্ম্মী পরিকর শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর শিষ্যকরণ বিষয়ে সতর্কবাণী তিনি বার বার উচ্চারণ করিয়াছেন। 'ন শিষ্যাননুবধ্নীত।" (১।২।১১৩) অর্থাৎ বহু শিষ্য করিবে না। শ্রীমুকুন্দ গোস্বামীপাদ কৃত টীকা—"নানুবধ্নীয়াৎ নানুসরেৎ তদনুসরণে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিনা সাধকস্য সাধন-শৈথল্য-প্রাপ্তেঃ; শিষ্যকরণং তু জাতরতীনামেব বিহিতত্বাচ্চ।"—অর্থাৎ শিষ্যকরণের লোভে পরীক্ষা না করিয়াই বহু শিষ্য করিবে না। এরূপ করিলে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা লালসা প্রবল হইবে। তাহাতে সাধকের ভক্তি সাধনের প্রতি শিথিলতা আসিবে। এজন্য যাঁহারা জাত-রতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চরণে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই শিষ্য করণের অধিকারী।

হরিদাস দাসজী অত্যন্ত দৈন্য মণ্ডিত ছিলেন। এজন্য সভায় বসিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে চাহিতেন না। সাধারণতঃ দেখা যায়

কাহারও অল্প কিছু প্রাকৃত সদ্‌গুণ থাকিলে, তাহাই বড় করিয়া প্রচার করিয়া লোক হইতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তৎপর হয়। হরিদাস দাসজীর এরূপ দুর্বলতা ছিল না। মহত্ত্ব প্রচার হইতে পারে এরূপ বিষয় হইতে তিনি দৃঢ়তার সহিত বিরত থাকিতেন। ইহাই তাঁহার ভগবদ্ রতির তটস্থ লক্ষণ জানিতে হইবে।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামিপাদের কাব্য ভাষায় এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

"হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্ন শূন্যা হইলা মেদিনী।"

এখন, প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাস ঠাকুরকে পৃথিবীর শিরোমণি কেন বলিলেন। অবশ্য ইহার একটা উত্তর তাঁহারই পরবর্তী উক্তিতে রহিয়াছে—

"লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার॥"

ইহার মর্মার্থ এই যে, ভগবানের পরিকরগণ তাঁহারই কৃপা মূর্তি। ভগবদিচ্ছায় তাঁহারা মায়াহত পতিতগণের নিস্তার হেতু ভূলোকে অবতরণ করেন। ইহারা অপ্রাকৃত রত্ন এবং পৃথিবীর শিরোমণি। ইহারা মায়াহত জীবগণকে দিব্যজ্ঞান দ্বারা উদ্ধার করিয়া থাকেন। এ জগতে অন্নদাতা, ধনদাতা জীবের দেহ মনের কিঞ্চিৎ আনন্দদান করিতে পারেন বটে, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবগণের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎ কারের বিমলানন্দ একমাত্র ভগবজ্জনই দিতে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করিয়াছেন—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"

—"যে পর্যন্ত মায়িক জীবগণের মস্তক নিষ্কিঞ্চন মহতের পদরজ দ্বারা অভিষিক্ত না হয় তাবৎ তাঁহাদের মতি কখনও শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

যখন কোন ভাগ্যবান জীব ভগবানের রতিমান কোন ভক্তের কৃপা লাভ করেন, তখনই তিনি ভগবদনুভূতির পরমানন্দের সন্ধান পাইয়া থাকেন। এরূপ ভগবজ্জনই পৃথিবীর রত্নস্বরূপ। তাঁহার বিয়োগেই জগৎ রত্নশূন্য হইয়া থাকে।

লক্ষ নাম জপ করিয়া হরিদাস ঠাকুর হইয়াছিলেন এক ভূরত্ন। গৌরগ্রন্থ সেবা করিয়া হরিদাস দাসজীও হইয়াছিলেন অপর আর একটি ভূরত্ন। জপ, তপ, ধ্যান দ্বারা যিনি ভগবানের সেবা করেন, তিনিও ভক্ত; আর যিনি গ্রন্থসেবা দ্বারা ভগবদ্-প্রেম-মাহাত্ম্য প্রচার এবং জীবকুলকে প্রেমাস্বাদন দিয়া কৃতার্থ করেন, তিনিও ভক্ত। ভক্ত-রত্ন হরিদাস দাসজীর প্রতিভার প্রভা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইবার পূর্বে দুরন্ত কাল তাঁহাকে হরণ করিয়া নিয়া গেল। পৃথিবী আবার একটি রত্ন-হারা হইল।

প্রেম-ভক্তির লক্ষণ নির্ণয়ে কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন, "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম-নাম।" সর্ববিধ কামনা বর্জিত হইয়া সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীহরির সেবন প্রবৃত্তিই 'ভক্তি'। অতএব ভক্তগণের জীবন ধারণ কেবল শ্রীহরির সন্তোষ বিধান জন্যই। ইহাই সমস্ত শাশ্বত শাস্ত্রের মর্ম। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নারদ, শুকদেব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি এবং আধুনিক কালের মাধবেন্দ্রপুরী, ষড় গোস্বামিপাদ প্রভৃতি ভক্তরাজদের আচরণে আমরা কায়-মনোবাক্যে শ্রীহরির সন্তোষ বিধান চেষ্টাই লক্ষ্য করি। হরিদাস দাসজীর আচরণেও আমরা পূর্বোক্ত

ভক্তগণের অপ্রাকৃত গুণরাজির প্রকাশ দেখিয়াছি। সদ্‌গুরুলাভের পরে তিনি প্রধানতঃ কীর্তন-সেবা দ্বারা শ্রীহরির প্রীতি বিধানে ব্রতী হন। শ্রীগৌরহরি তাঁহার দ্বারা গোস্বামিগণের রচিত অথচ অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের প্রচার করাইবেন—এই অভীষ্ট তাঁহার শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে তাঁহাকে জানান। এই প্রকার গুরু-আজ্ঞা লাভ করিয়া হরিদাস দাসজী অপ্রকটের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই গ্রন্থ সেবাই করিয়াছেন। যাঁহাদের মধ্যে ভ্রম-প্রমাদ-করুণাপাটব-বিপ্রলিপ্সারূপ দোষ চতুষ্টয় নাই, এরূপ বিশুদ্ধ মহাজনগণের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তিপ্রাপ্ত সৎসিদ্ধান্ত সমূহ, যাহা তাঁহাদের লেখনী হইতে নির্গত হয়, তাই সদ্‌গ্রন্থ। এই সদ্‌গ্রন্থ প্রচারেই প্রকৃত জনকল্যাণ সাধিত হয়। হরিদাস দাসজী এই জনহিতকার্যে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা অর্থ, যশঃ, প্রতিষ্ঠা লাভের দিকে তাঁহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। তিনি বলিতেন, "শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যে সমস্ত অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের আশয়ানুরূপ টীকা ও অনুবাদসহ মুদ্রণরূপ শৃঙ্গার-সেবাই আমার জীবাতু। শ্রীগৌরহরি যেন অপার করুণা শক্তি সঞ্চয় করিয়া আমার এই গ্রন্থ-শৃঙ্গার-সেবা গ্রহণ করিয়া আমাকে আত্মসাৎ করেন। এই সেবা সমাধার জন্যই আমার বাঁচিয়া থাকা, আমার আর অন্য কোন আশা নাই।" তাঁহার এই কথাগুলি যেমন সত্য, তেমন হার্দ।

এখানে হরিদাস দাসজীর গ্রন্থ সেবার দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে। শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী রচিত ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর "অর্থ-রত্নাল্পদীপিকা" নাম্নী টীকার সংগ্রহ বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু আস্বাদনের জন্য শ্রীজীব গোস্বামী 'দুর্গম-সঙ্গমনী' নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা সহ রসামৃতসিন্ধু মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। হরিদাস দাসজী রসামৃত সিন্ধুর আরও দুটি টীকা সংগ্রহ

করিয়া তিনটী টীকা দিয়া তাহার সঙ্গে সমগ্র রসামৃত সিন্ধুর গদ্য ও পদ্যে দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ দিয়ে যে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর উৎকৃষ্ট সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সুধীগণ চমৎকৃত হইয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ কর্তৃক রচিত 'শ্রীমাধব-মহোৎসব' নামক কাব্য-গ্রন্থের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গানুবাদ সহ তাঁহারই চেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নতুবা ইহা অপ্রচারিতই থাকিত। এই কাব্য-গ্রন্থ প্রচারের একটি ইতিহাস আছে। ইহার প্রাচীন পুঁথি যখন তাঁহার হাতে আসিল তাঁহার পাঠোদ্ধার, তাহার উপর শ্রীজীবের লিখন গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুবাদ করা অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। হরিদাস দাসজী এই পুঁথি লইয়া শ্রীখণ্ডের খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের নিকট গেলেন। উভয়ে মিলিয়া পাঠোদ্ধারের বহু প্রয়াস করিলেন। কিন্তু কোন কোন শ্লোকের পদগৌরব এত গূঢ় যে, শ্রীজীবের কৃপা ব্যতীত, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দ্বারা মর্মোদ্ধার অসম্ভব প্রতীয়মান হইল। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তৎপর শ্রীহরিবোল কুটীরে বসিয়া শ্রীজীবের নাম লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল তাঁহার শ্রীচরণ-কৃপা ভিক্ষা করিতে থাকেন। এইপ্রকারে ছয়মাস কাল শ্রীজীবের শ্রীচরণ-ধ্যান-সেবার ফলে তিনি একাকীই সমগ্র গ্রন্থের সমস্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া পরে শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরকে প্রদর্শন করান। তাহা দেখিয়া শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর হরিদাস দাসজীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রচুর আশীর্বাদ করেন এবং বলেন, "পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দ্বারা কখনও গৌর চরণভৃঙ্গ গোস্বামিগণের আশয় বুঝা যায় না—ইহা আজ সত্য সত্যই বুঝিলাম। তোমার উপর গোস্বামি-প্রভুদের প্রচুর কৃপা আছে তাহাও বেশ বুঝা গেল।"

এবার হরিদাস দাসজীর অমর কীর্তি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের রত্ন-প্রদীপ বিশেষ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের পরিকল্পনা ও পরিণতি

সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার মনীষা, প্রজ্ঞা, বিশাল পাণ্ডিত্য যেমন একদিকে প্রকাশিত হইয়াছে অপরদিকে গ্রন্থপ্রনয়ণ কালে দৈনন্দিন কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে তেমন তাঁহার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপার উপর নির্ভরতা, ধৈর্য, মননশীলতা, কর্মকুশলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান হরিদাস দাসজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির দ্যোতক। এই বিশ্বকোষের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে বর্তমানে ততটা নহে, হবে ভবিষ্যৎকালে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের ১ম খণ্ডের ভূমিকায় হরিদাস দাসজী লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধানাবসরে, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রণয়ন কালে, এ জাতীয় একটি কোষগ্রন্থের অভাব এ দীন হীন সঙ্কলয়িতার অন্তঃস্থলে জাগরূক হইলেও, তদুপযোগী যাবতীয় সম্ভারের অসদ্ভাব নিবন্ধন তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। স্বসংকল্প সিদ্ধির জন্য ১৩৫২ সালে কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত হয়। ৩।৪ বৎসর অকুণ্ঠ পরিশ্রমের ফলে গ্রন্থখানির কাঠাম প্রস্তুত হয়।" হরিদাস দাসজী যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠে যোগদান করেন তখন মঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিভাষা বোধক 'বৈষ্ণব মঞ্জুষা' নামে একটি ক্ষুদ্র অভিধানের ২।১ খণ্ড প্রচলিত ছিল। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস এরূপ। বহু কৃতবিদ্য লোকও গৌড়ীয়গণের দুরধিগম্য পরিভাষার মধ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদকে অনুরোধ করেন যেন তিনি সরল একটি অভিধান প্রকাশ করেন যাহাতে তাঁহাদের বক্তৃতা, তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ, ভাষ্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি শুনিয়া পড়িয়া বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া গোস্বামিপাদই প্রথমে বৈষ্ণব মঞ্জুষা নামে একটি অভিধান প্রণয়ন করেন। ইহার ২।১ খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরই

প্রভুপাদ দেহ রক্ষা করেন। আচার্য পুরীদাস তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। তিনি এখন হরিদাস দাসজীর উপর অভিধান সমাধার ভার ন্যস্ত করেন। হরিদাস দাসজী অভিধানের ভার গ্রহণ করিয়াই 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' নাম পরিবর্তনক্রমে 'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' নামকরণ করিয়া শব্দ চয়ন আরম্ভ করেন। পুরীদাসজী ঐ নাম পরিবর্তন বিনা আপত্তিতে মানিয়া নিয়াছিলেন। যে দিন শব্দচয়ন আরম্ভ হয় সে দিনের ঘটনাটি হইয়াছিল অদ্ভুত। হরিদাস দাসজীর আহ্বানে বহু বৈষ্ণব মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিয়া প্রথম ভক্তিসিদ্ধান্ত পাদের ভজন গৃহে, তৎপর পুরীদাস দাসজীর ভজন গৃহে এক অপূর্বভাবে বিভাবিত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নেত্রে আনন্দাশ্রু, অঙ্গে রোমাঞ্চ, মুখ মণ্ডলে বিবর্ণত্ব এই সাত্ত্বিক বিকার-ত্রয় তাঁহার দেহকে বিভূষিত করিয়াছিল। তিনি নৃত্য করিতে করিতে সমবেত বৈষ্ণবগণের প্রত্যেককে আলিঙ্গন পূর্বক যে নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা হইতে শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ের নিম্নের শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিলেন—

(প্রহ্লাদের প্রতি পৃথিবীর উক্তি)

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ-কীর্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।

—তোমার মত ভক্তদর্শনই নেত্রদ্বয়ের সার্থকতা, তোমার মত ভক্তের শ্রীচরণদর্শনই দেহধারণের সার্থকতা এবং তোমার মত ভক্তের গুণ-কীর্তনই জিহ্বার সার্থকতা। হরিদাসজী এই ব্যাপারে সকলকে শিক্ষা দিলেন যে, ভক্তি-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইলে ভক্তিবল চাই। নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দ্বারা কখনও ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রন্থের তাৎপর্য বুঝা যায় না। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি, শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি ভক্তিরস গ্রন্থের এবং শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভাগবত সন্দর্ভ (ষট্‌সন্দর্ভ), শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রন্থের বৈষ্ণব পরিভাষার অর্থবোধ করিয়া

বৈষ্ণব অভিধান প্রণয়ন কার্যে শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব গোস্বামি পাদদের এবং কবিরাজ গোস্বামীর আশয় অনুধাবন করার প্রয়োজন। এই সব গোস্বামি প্রভুদের কৃপাশক্তি যাঁহার হৃদয়ে বর্তমান, একমাত্র তিনিই এরূপ অভিধান প্রকাশের যোগ্য। হরিদাস দাসজী আবার তাঁহার এই সেবাকার্যের সহায়রূপে যাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও যোগ্য করিয়া লইবার জন্য তাঁহাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন দিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।

হরিদাস দাসজী 'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে'র শব্দ চয়ন, তাহার অর্থ, তাৎপর্য তথ্য প্রভৃতি লিখনে যে অসামান্য কৃতিত্ব, মৌলিকতা ও তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া গৌড়ীয় মঠের পণ্ডিত-মণ্ডলী বিস্মিত হইয়াছেন। ষট্ সন্দর্ভ, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ, গোপাল চম্পূ (পূর্ব ও উত্তর খণ্ড), শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু, তাহার টীকা ত্রয়, শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি ও তাহার টীকাদ্বয়, শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃত, সংক্ষেপ ভাগবতামৃত, শ্রীবৈষ্ণব-তোষিণী, বিরুদাবলী, স্তব-মালা, স্তবাবলী, বিদগ্ধ মাধব নাটক, ললিত মাধব নাটক, গোবিন্দ ভাষ্য প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের শব্দ চয়ন ও সমস্ত কঠিন পরিভাষার তাৎপর্য প্রকাশ এত সহজভাবে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, তাহা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাকে গোস্বামি পাদদের সাক্ষাৎ কৃপামূর্তি বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

হরিদাস দাসজী প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়া 'গৌরহরি বোল' বলিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া কীর্তন করিতেন। তৎপর শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার পার্ষদগণের নাম কীর্তন ও কৃপাভিক্ষা করিয়া তিনি 'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে'র সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। চারিদিকে গোস্বামি-গ্রন্থ-রাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১৭ ঘণ্টা গ্রন্থ-সেবায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

হরিদাস দাসজী শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের উপকরণ শব্দ চয়ন কার্য সমাধা করিয়া মাতৃকাক্রমে শব্দ-সজ্জনা শেষ করিলেন। তিনি গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অপর দিকে, মঠের আচার্য শ্রীপুরীদাস গোস্বামি পাদদের এবং অপর ভাগবত-

গণের গ্রন্থরাজির নির্ভুল পুনর্মুদ্রণ কার্য নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। হরিদাস দাসজী আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া মুদ্রণ কার্য সামাধা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ধীর ব্যক্তি আরব্ধ কার্য সমাপ্ত না করিয়া কখনও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি গৌড়ীয় মঠের সেবা পরিষদ হইতে প্রেস কপি ফেরৎ আনিয়া নিজেই মুদ্রণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। একাকী নিঃস্বাবস্থায় এত বড় বিরাট কার্য কিরূপে সমাধা করিবেন, এই চিন্তা দ্বারা তিনি মোটেই পীড়িত হন নাই। নাম-যজ্ঞের হোতা শ্রীরামদাস বাবাজীর প্রদত্ত বীজমন্ত্রটি—''কোন ভয় নাই, জয় গুরু বলিয়া লাগিয়া যাও''—স্মরণ করিয়া গ্রন্থ মুদ্রণে ব্রতী হইলেন। তাঁহার নিরপেক্ষতা গুণে তুষ্ট হইয়া অনন্তগুণ-বারিধি শ্রীহরি তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। ধনবলহীন, জনবলহীন হইয়াও শ্রীগৌর গদাধরের সাক্ষাৎ করুণাবলে তিনি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভি-ধানের মুদ্রণ কার্য সমাধা করিলেন। তাঁহার প্রকট কালেই অভিধানের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ২য় খণ্ডের শেষ চার ফর্মার প্রুফ দেখার কালেই তিনি অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন। তাঁহার অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই সদাশয় সরকারের ও বদান্য জনসাধারণের সাহায্যে এবং কয়েকজন সুধী ব্যক্তির অদম্য চেষ্টায় ২য় খণ্ড ও প্রকাশিত হইয়াছে।

নিষ্কিঞ্চন হরিদাস দাসজী এত বড় বিরাট কার্য একাকী নিরপেক্ষভাবে সম্পাদন করিয়াছেন তাহা হইতে শিক্ষা সুস্পষ্ট যে, যিনি যতটা শ্রীহরির কৃপার উপর নির্ভরশীল এবং ধনজনের অপেক্ষা হইতে মুক্ত তিনি তত শ্রেষ্ঠ ভক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা তাঁহার আচরণে সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রত্যেক ব্যবহারে ও আচরণে মহাপ্রভুর উপদেশ নির্ব্যলীক অনুসরণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উপদেশ দিয়াছেন—

''বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥—চৈঃ চঃ অন্ত্য।

আবার শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

''তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥'' চৈঃ চঃ অন্ত্য।

মহাপ্রভুর এই শিক্ষা হরিদাস দাসজী নিজ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। বাহিরের দিকে কপর্দকহীন, বিরক্ত, দ্বিতীয় সঙ্গহীন হরিদাস দাসজী প্রেমধনে ধনী হইয়া তাঁহার সমগ্র জীবন গ্রন্থ সেবা যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব প্রভুগণ যেরূপ বৃক্ষতলাবাসী হইয়া নিরন্তর লেখনী সঞ্চালনে অপূর্ব ভক্তি-সিদ্ধান্তামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, হরিদাস দাসজীও তদ্রূপ তাঁহাদের ভৃত্যানুভৃত্য অভিমানে নিরন্তর গ্রন্থ সেবা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ভাণ্ডারে বিবিধ গ্রন্থ-রত্ন উপহার দিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব ভক্তের "অন্তরানন্দ বহির্জ্বালা।" তেমনটি ছিল হরিদাস দাসজীর। প্রেস ও দপ্তরীর টাকার তাগীদে তিনি সর্বদা অস্বস্তি বোধ করিয়াছেন। তার উপর রোগের প্রকোপ। উচ্চ রক্তের চাপ ও উদরে সঞ্চিত বায়ু তাঁহার দেহকে বড়ই দুঃখ দিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ৭৫৲ টাকা বৃত্তি দিতেন অবশ্য কিন্তু তাহা তিনি গ্রন্থ-সেবায়ই ব্যয় করিতেন। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। অতি সামান্য এবং অতি সাধারণ আয়োজন বিশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। "আজীবন জিহ্বা না জানিল স্বাদ।" তবুও বলিতেন, আনন্দে আছি। মূর্তিটিই ছিল আনন্দের। হাসপাতালে অন্তিম শয্যায়ও 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তর হইত, 'আনন্দে আছি।" গ্রন্থ-সেবা করিয়াই তিনি সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এতে আর সন্দেহ নাই। এমন একটি সিদ্ধ বৈষ্ণবের তিরোধানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ অবলা হইল এবং বাংলার সংস্কৃতি সাধনার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হইল। চৈতন্য যুগে হইয়াছিল এক হরিদাসের নির্যাণ, আর এ যুগে হইল এক হরিদাস দাসের নির্যাণ। একজন ছিলেন ব্রহ্ম হরিদাস, অপর জন ব্রহ্ম ও হরিদাস দাস।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দত্ত

(শ্রীসুদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিক "বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস" প্রবন্ধ লেখক)

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীহরিবোল কুটীর
পোড়াঘাট, নবদ্বীপ।

শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর
১৫এ, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫।

বুক নিউজ
৩৭।৪, রামতনু বোস লেন, কলিঃ-৬

নরেশ চক্রবর্ত্তী (প্রেসিডেন্সি প্রফেসার)
৮৭, আমার্হাষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬